ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

১ম ভাগ—১ম সংখ্যা। বৈশাখ—১৩০০।

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ঃ—

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার (নবজীবন-সম্পাদক) ; শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল্ ; শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্ ; শ্রীরামগোপাল ঘোষ, বি, এল্ ; শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

১। পূর্ণিমা (পদ্য) ১
২। ইসারা ৪
৩। সূচনা ৫
৪। ভালবাসা ৯
৫। বেলুনে প্রেম (একটী বিদেশীয় গল্প) ১৩
৬। সম্বন্ধ নির্ণয় (পিতা ও পুত্র) ১৯
৭। ১২৯৯ সন শেষ ২৮
৮। সমালোচন ২৯

হুগলী,
সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৈশাখ—১৩০০।

এই সংখ্যার মূল্য ৵০ দুই আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হইবে। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার সম্পাদকতার ভার লইয়াছেন, কোন ব্যক্তি বিশেষ ইহার সম্পাদক নহেন।

সম্পাদক-সমিতির নাম আপাততঃ প্রকাশিত হইল না। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনের জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

সাবিত্রীযন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গ বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপ হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ। বৈশাখ, সন ১৩০০ সাল। ১ম সংখ্যা।

পূর্ণিমা।

১

(আমি) পারি না বহিতে, এ রূপের ভার,
(আমার) আকুল হইল দেহ।
(আমি) খুঁজিয়া বেড়াই, প্রণয়ী আমার,
দেখা যে দিলনা কেহ!
(আমার) বুকের ভিতরে, সুখের পাথারে,
ছুটিছে প্রেমের বান।
(দেখ) দুকূল ভাসা'য়ে, উঠিছে উথলি,
আমার আকুল প্রাণ।
(আমি) বলি বলি করি, বলা যে গেল না,
সাধের মরম কথা!
(আমি) পারিনা ভাসিতে, এ রূপ রাশিতে,
লইয়া সুখের কথা।
(আমি) ভেসে ভেসে যাই, কূল নাহি পাই,
তবু যে হ'লনা দেখা!
(আমি) এমন করিয়া, অকূলে পড়িয়া,
ভাসিতে পারিনা একা।

২

(ওহে) কে আছ ভুবনে, প্রণয়ী তেমন,
করহে হৃদয় দান !
(আমার) রূপের সাগর, মথিত করিয়া,
করহে পীযূষ পান।
(আমি) নয়ন ভরিয়া, যৌবন ঢালিব,
ঢালিব রূপের বান।
(আমি) শ্রবণ ভরিয়া, ঢালিব সঙ্গীত,
হৃদয় ভরিয়া প্রাণ।
(আমি) জগত ঘুরিয়া, হৃদয় ভরিয়া,
রেখেছি প্রকৃতি শোভা।
নিতি নব নব, সুষমা দেখাব,
প্রেমিক-মানস-লোভা।
নিশির নির্জ্জনে, বিশ্ব কার্ সনে,
কহে কি নিগূঢ় কথা।
(আমি) পেয়েছি সন্ধান, হৃদয়ে করিয়া,
লইয়া যাইব তথা।

৩

(আমি) আপনার তরে, আপনা সঁপিব,
চাহি না হে প্রতিদান।
(আমি) তোমাতে মজিয়া, তোমারে ভজিয়া,
জুড়া'ব আমার প্রাণ।
(তুমি) বলিবে কেবলি, সুখের কামনা,
সরা'য়ে মনের বাধ।
(আমি) নয়নে বদনে, হৃদয়ে পড়িয়া,
মিটা'ব মনের সাধ।
(যদি) নাহি মিটে ক্ষুধা, বলিবে সে কথা,
ক্ষোভ না রাখিবে বুকে।

(আমি) গলিয়া গলিয়া, যাইব মিশিয়া,
তোমার সাধের সুখে।
এ রূপ যৌবন, এই দেহ মন,
প্রণয় পূরিত প্রাণ।
এস প্রাণবঁধু, হৃদয়ে ধরিয়া,
করহে বারেক ত্রাণ।

৪

দিবসের কাযে, সাজে নানা সাজে,
বিচিত্র মানব মতি।
(আমি) চিনিতে পারিনে, হৃদয় তাহার,
দিবসে কুটিল গতি।
নিরজন বুকে, প্রাণ একা থাকে,
সরূপ দেখিতে পাই।
তাই নিশি হ'লে, আসি ধীরে ধীরে,
প্রণয়ী খুঁজিয়া যাই।
মনের মতন, মেলেনা যে জন,
ভাঙা চোরা সবি প্রাণ।
এ রূপ যৌবন এত আকিঞ্চন,
তাহে কি কুলায় স্থান !
(আমি) আধ আধ সাধ, পারি না মিটাতে,
খুঁজিয়া বেড়াই ভরা।
ওহে পরিপূর্ণ, লুকা'য়ে কোথায়,
আইস নিকটে ত্বরা।

ইসারা।

জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ,
সহেতু সর্ব্ববিদ্যানাং ধর্ম্মস্চ ধনস্চ।

আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বিন্দু পরিমাণ, কিন্তু তুমি যদি আমাকে উপেক্ষায় অবহেলিত না করিয়া, রাগে পদ দলিত না করিয়া, তোমার বিপুল বক্ষে আমাকে রক্ষা কর, তাহা হইলে হয় ত আমি বিন্দু বিন্দু করিয়া তোমার ঘটে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চিত করিয়া দিতে পারি।—মনে নাই, সেই যে একটি ক্ষুদ্রপ্রাণী নবনীত-পুতলী রাঙ্গা চেলীতে জড়াইয়া আদর করিয়া ঘরে তুলিয়াছিলে,—আজি দেখিতেছ না, সেই ক্ষুদ্র জীব তোমার হৃদয়ে কি বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। আদর করিয়াছিলে, ভাল বাসিয়াছিলে বলিয়াই, না এতটা হইয়াছে—আমাকেও তুমি ভাল বাসিয়া, একবার আদরের চক্ষে বক্ষে ধারণ কর, ভাল দেখই না কেন? আমিই বা কি করি! আমি কি করিব—তাহা আমি জানি না, জানিলেও আমি প্রথম আলাপে কিছু বলিতেই পারিব না—আমি ছোট, আমার ছোট মুখে বড় কথা সাজিবে কেন?

লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের একটি মাত্র চক্ষু ছিল, সেটি আবার অতি ক্ষুদ্র। কাজেই লক্ষ্মীকান্ত বলিত “ঐ যে অনেক লোকের নাকের দুদিকে দুটা আলু পটলের মত ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্ করে, ছ্যা সে অতি বিশ্রী; চোক থাকিবে ইসারায়।” আমিও বলি, আমাকে তুমি ইসারার মধ্যেই ধরিয়া লইও। ভাল, অনেক দিন ধরিয়াত লম্বা চৌড়া কাঁদুনির প্রশ্রয় দিয়াছ—এখন একবার কিছুদিন ইসারাকে আশ্রয় দিলে ক্ষতি কি? আমি তোমাদের চোখে চোখে থাকিব, চোখের আড়াল হইব না। তোমরা যখন আহ্লাদে ইসারা ইসিরি করিবে, তখন ত আমার আহ্লাদ ধরিবেই না—তোমাদের করুণ কটাক্ষেও আমি কাতর হইব না। আমি চাহি না,—গগনভেদী চীৎকার—আমি যে বুক-চেরা ইসারা। আমি চাহি না,—বিজয়রোলের অট্ট অট্ট হাস—আমি যে বিনীত বিজিতের অদৃষ্ট ইসারা। আমি চাহি না,—কাঁদুনির ফাঁদুনি—আমি যে চোখের কোণের বিন্দু জলের অযাচিত ইসারা। আর, কাজে কাজেই আজি আমার এই খানে সমাপ্তি—আমি যে অতি ক্ষুদ্র ইসারা।

সূচনা।

সকলেরি জীবনে এমন অবসর অনেক থাকে যাহা অতিবাহিত করিবার জন্য অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়। বালকে খেলা করে, প্রৌঢ়ে শাস্ত্র আলোচনা করেন, বৃদ্ধে হরিনাম করেন, কিন্তু যুবায় কি করিবেন ভাবিতে হয়। উপন্যাস বা নভেল পাঠ যুবকের পক্ষে সুখকর বটে; সাধারণে তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু সে ইংরাজী ভাষায়। দেশীয় ভাষায় সুখপাঠ্য উপন্যাস অতি অল্প, নভেল নাই বলিলেই হয়। ইংরাজীতে এরূপ পুস্তক বিস্তর আছে—এত আছে যে সমস্ত জীবন পাঠ করিলেও নভেল বা উপন্যাস পাঠ সমাপ্ত হয় না। ইংরাজের নভেল বা উপন্যাস পাঠে ইংরাজের সামাজিক গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের বা ধর্ম্মাধর্ম্মের আলোচনা হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের স্বজাতির এ সকল কথাও ত অবশ্য জ্ঞাতব্য; তাহার আলোচনার উপায় কি? পুরাণে অতি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান ও অতি সুন্দর আদর্শ চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ইংরাজীতে শিক্ষিত যুবকের চক্ষে সে সকল অত্যদ্ভুত, অলৌকিক “আজগুবি” ব্যপার বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তাহায় শিক্ষার উপযোগী শ্রদ্ধা হয় না, সুতরাং সে সকল পাঠে স্পৃহাও হয় না। যদি বা কখন স্পৃহা হয়, তবে শ্রদ্ধার অভাবে তাহার যথোচিত মর্ম্মগ্রহ হয় না। এরূপ প্রকৃতির পাঠকেরা অগত্যা হয়, অবসর অপব্যয় করেন, নয় ইংরাজী নভেল বা উপন্যাস পাঠ করিয়াই সময় অতিবাহিত করেন। স্বদেশের জ্ঞাতব্য কথা তাঁহাদের নিকট অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। যাঁহাদের গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহারা কেহ কেহ ইংরাজী ভাষায় সাময়িক পত্রিকাদি বা বিজ্ঞান দর্শন পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতেও সময়ের সদ্ব্যয় হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেরূপ কঠিন অধ্যয়নে কয় জনের অনুরাগ দেখা যায়? পাঠাবস্থায় যুবকদিগের স্বাধীন চিন্তা বা গুরুতর বিষয়ের আলোচনার অবসর থাকে না। কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন তাহাতে সখ করিয়া বা জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য গুরুতর অধ্যয়নে তাঁহারা মনোনিবেশ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ কালেজের সংকীর্ণ শিক্ষা বশতঃ দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থ দূরে থাকুক, Nineteenth century, Fortnightly বা

Saturday Review প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় আলোচিত গুরুতর বিষয়গুলি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি কুলাইয়া উঠে না। আমরা অবশ্য সকল শিক্ষিত যুবকের কথা বলিতেছি না। সাধারণের কথাই বলিতেছি। যাঁহাদের প্রতিভা আছে তাঁহারা অল্প বয়সেই বিস্তর গুরুতর কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রতিভা কিন্তু অতি বিরল। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যদি প্রতিভা সম্পন্ন কোন যুবক থাকেন, তাঁহাদের উপরোক্ত কথায় অভিমান করিবার কারণ নাই। আমরা সাধারণের একজন—সাধারণের কথাই বলিতেছি। বস্তুত শিক্ষিত সাধারণ যুবকবর্গের জন্যই দেশীয় ভাষায় মাসিক পত্রিকার প্রচার হওয়া আবশ্যক। পত্রিকার উদ্দেশ্য যে কেবল শিক্ষা প্রদান তাহা নহে। লেখক মাত্রেই কিছু এমন বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন নহেন যে তিনি পাঠক মাত্রেরই গুরুস্থানীয় হইবার উপযুক্ত পাত্র। লেখক তাঁহার নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ করিবেন পাঠক, তাহায় কিছু জ্ঞাতব্য থাকে গ্রহণ করিবেন, ভুলভ্রান্তি থাকে তাহার আলোচনা করিবেন। অধিকন্তু যদি পাঠক সহৃদয় হয়েন তবে লেখকের সে ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া দিবেন। ফলতঃ আমাদের পত্রিকার উদ্দেশ্য তাহাই। আমরা সকল বিষয়েরই অনুশীলন করিব, সে অনুশীলনে লেখকের আত্মোন্নতি ত আছেই, পক্ষান্তরে যদি অন্যের সেরূপ অনুশীলন বৃত্তি তাহার দ্বারায় কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচালিত হয় তাহাতেও ব্যক্তিগত ও সমাজগত মঙ্গল আছে। আমরা জানি এবং যাঁহারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান পরিপুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারাও জানেন যে প্রবোধচন্দ্রোদয় হইতে আধুনিক নব্য-ভারত ও সাহিত্য পর্য্যন্ত পত্রিকার প্রচারে কত শত ইংরাজীতে শিক্ষিত যুবকবৃন্দের বিজাতীয় বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা সত্বেও বঙ্গভাষার প্রতি মতি গতি ফিরিয়াছে—বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠে স্পৃহা হইতেছে—বঙ্গভাষায় রচনা করিতে সাধ হইতেছে—সর্ব্বাধিক সুখের কথা—বঙ্গভাষাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে অভ্যাস হইতেছে। পত্রিকার সৌভাগ্য যত হউক না হউক, বঙ্গভাষার প্রচুর মঙ্গল সাধিত হইতেছে সুতরাং স্বদেশের ও স্বজাতীর মঙ্গল বই আর কি বলিব। ইহার হেতু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে পূর্ব্বগামী পত্রিকার সম্পাদকেরা কিছু আর লোকের হাতে ধরিয়া তাঁহাদের মতি

গতি পরিবর্ত্তন করেন নাই বা তাঁহাদের হাত ধরিয়া তাঁদের লেখক করিয়া দেন নাই। সম্পাদকেরা আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও যত্নে যতদূর সম্ভব ভাষার উন্নতি পক্ষে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, দশটা ভাল কথা—দশটা উচ্চ ভাব বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইতে লাগিল—তাহা দেখিয়া শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি বঙ্গভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। লোকে বুঝিল যে চেষ্টা করিলে নির্জীব অসার বঙ্গভাষায়ও, মহৎ চিন্তা বা মধুর ভাব প্রকাশ করা যায়। মাতৃভাষা সহজেই বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভাষা। ইংরাজী ভাষায় যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, পরভাষা অপেক্ষা আপন ভাষায় হৃদয়ের ভাবগুলি প্রকাশ করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত সুখবোধ করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গ ভাষার স্ফূর্ত্তির অভাবেই লোকে ইংরাজিতে মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং এরূপ ঘটনায় বঙ্গভাষায় তাঁহাদের অনুরাগ হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? দিন দিন মহৎ ভাবগুলি দেশীয় ভাষায় সজ্জিত হইয়া পরিচিত মূর্ত্তিতে পাঠকের চক্ষে পতিত হওয়ায়, ক্রমশঃ দেশের প্রাচীন শাস্ত্র ও পৌরাণিক কথা শিক্ষিত যুবকেরা আর পূর্ব্বের ন্যায় জটিল ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবহেলা না করিয়া সেই গুলির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে লাগিলেন। বিষয়গুলি ইংরাজী ধরণে পরিলক্ষিত পরিচালিত ও পরিব্যক্ত হওয়ায় দেশীয় মূর্ত্তি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিলেও, ইংরাজী শিক্ষিত লোকের পক্ষে তাহাদের মূল অবয়ব নিতান্ত অপরিচিত থাকিল না। তখন পাঠক স্বদেশের ও স্বজাতীর মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে উৎসুক হইলেন। এইরূপে ভাষার বর্ত্তমান উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। ইহাতে কতদূর শুভ ফল ফলিয়াছে তাহা পরলোক গত মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা রচনার সঙ্গে আধুনিক রচনার একবার তুলনা করিয়া দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। অপর দেশের ভাষার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে না, গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে মাসিক পত্রিকা প্রচারে যেরূপ শুভ ফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে তাহা দেখিয়া আমাদের এই চেষ্টা ফলবতী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও লিপিশক্তি সকলি অপ্রচুর। আমরা কার্য্যে ব্রতী হইলাম তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য কতক অবসর ক্ষেপণ করা, কতক বা স্বাধীন চিন্তার চালনা করা এবং গৌণ উদ্দেশ্য যাঁহারা

আভাঙা কালেজি গোরা তাঁহাদের মাতৃভাষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা। আমরা উন্মুক্ত হৃদয়ে বলিতেছি যে এরূপ কালেজি গোরাদের নিকটেই আমাদের আশা ভরসা বিস্তর। তাঁহাদের যে বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অধ্যবসায় আছে, তাহার পরিচয় তাঁহারা সেনেট গৃহে বারম্বার দিয়াছেন। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদিগকেই চিহ্নিত বা (Covenanted) শিক্ষিত ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের গুরুতর রাজকার্য্যের ভার যেরূপ চিহ্নিত (Covenanted) কর্ম্মচারীর দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে—আমাদের ভাষার গুরুতর কার্য্য সেইরূপ উপাধি প্রাপ্ত যুবকবর্গের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে বলিয়া আমাদের আশা ভরসা। এক্ষণে তাঁহাদিগকে এ কার্য্য ক্ষেত্রে সৌখিন সৈন্যরূপে (Volunteer) পরিণত করিতে পারিলেই আমাদের আশা ফলবতী হয়। আমরা তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব চেষ্টা ও যত্ন করিতে ত্রুটি করিব না। এক্ষণে তাঁহাদের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা তাঁহারা যেন আমাদিগকে “ দেশীয় ” বলিয়া আমাদের সঙ্গ ত্যাগ না করেন।

পূর্ণিমায় সকল বিষয়েরই আলোচনা হইবে। যে কোন বিষয়ের রচনা উপাদেয় হইবে, তাহাই ইহাতে প্রকাশিত হইবে। তবে সাধারণের অশুভকর ও অরুচিজনক বিষয় ইহাতে প্রকাশিত হইবে না। রচনাদি নির্ব্বাচনের জন্য ইহার সমিতি গঠিত হইয়াছে, সেই সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে। খ্যাতনামা লেখকদের রচনা সমিতি কর্ত্তৃক পরম সাদরে গৃহীত হইবে। শিক্ষিত যুবকবৃন্দ অনুগ্রহ করিয়া পূর্ণিমায় প্রকাশ করিবার জন্য রচনাদি প্রেরণ করিলে সমিতির অভিলাষ ও উদ্যম সকলি সফল হইবে।

ভালবাসা।

একদিন নৌকাপথে যাইতেছিলাম। সহসা গগনমণ্ডল মেঘে সমাচ্ছন্ন হইল। বায়ু বহিল, নদীর জল স্ফীত হইয়া তরঙ্গায়িত হইল। মাঝীরা উল্লাসে “দরিয়াকা পাঁচ পীর” বলিয়া পা’ল তুলিয়া দিল, প্রবলবেগে তরঙ্গ ভেদ করিয়া নৌকা চলিতে লাগিল। ভয়ে প্রাণ আকুল হইল। মাঝীরা বলিল “বাবু তুফানে ভয় কি? হা’ল ও পা’ল ঠিক থাকিলে তুফানে বা বাতাসে নৌকার কিছুই করিতে পারে না।” কথাগুলি বড়ই মিষ্ট বোধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মন সুস্থির হইল। হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে চারি ঘণ্টার পথ আমরা এক ঘণ্টায় অতিক্রম করিলাম।

ভাবিলাম আমি যাহা দেখিয়া ভয় পাইলাম, মাঝীরা তাহা দেখিয়া উল্লসিত হইল, আমি যাহা বিপদের কারণ বলিয়া মনে করিলাম, তাহাই আমার সহায় হইল। হরি হরি জীবনে কত ভ্রমই রহিয়াছে, তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কখনও শুভক্ষণে দুই একটা ভ্রম বুঝিতে পারি, নতুবা সকলই রহিয়া যায়। এই যে হৃদয়ে ভালবাসার তুফান উঠিয়া থাকে, তাহাতেও ত যারপর নাই আকুল হইয়া থাকি। ভালবাসার আবেগময় হৃদয় লইয়া কত লোকের চরণতলে মস্তক অবলুণ্ঠিত করি, অনেকেই বক্ষে পদাঘাত করিয়া চরণ অপসারিত করিয়া লয়, আর তাহা ধরিতে দেয় না। আনন্দমনে ভালবাসার তপোবনে প্রবেশ করি, দেখিতে দেখিতে উহা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তপোবন মুহূর্ত্ত মধ্যে দাবানলে ভস্মীভূত হইয়া যায়। উল্লাস মনে আকাশের চাঁদ দেখিতে থাকি, আনন্দধারা হৃদয়ের স্তরে স্তরে বহিতে থাকে, অকস্মাৎ মেঘজালে সে শশাঙ্কভাতি বিমলিন হইয়া পড়ে, জগৎ অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া সন্ত্রাস উৎপাদন করে। কাল যাহার আগমনে গৃহ আমার আনন্দোৎসবে পূর্ণ, হৃদয় আমার উৎসাহ স্ফূর্ত্তিতে ভরপূর, আজ সে আনন্দমূর্ত্তি কোথায় চলিয়া গেল, গৃহ মন শূন্য পড়িয়া রহিল, সংসার মরুভূমিতে পরিণত হইল, চিতানল জ্বলিয়া উঠিল, যন্ত্রণার তীব্র দংশনে প্রাণ যার পর নাই ব্যাকুল হইল। মর্ম্মপীড়িত হইয়া কহিলাম ভালবাসা কালকূট, ভালবাসিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইল, আর ভাল বাসিব না, নির্ব্বাক্ ও নির্ম্মম হইয়া সংসার শ্মশানে নিমীলিত নেত্রে বসিয়া রহিব, সংসারের সংস্রব আর রাখিব না।

নিরাশ-সাগরে ডুবিতেছিলাম, সহসা মাঝীদের কথা মনে পড়িল। “হা’ল ও পা’ল ঠিক থাকিলে তুফানে ভয় কি?” মন যদি দৃঢ় হয় তবে ভালবাসা বিপর্য্যয়ে ভয় কি? বরঞ্চ চারিঘণ্টার পথ এক ঘণ্টায় যাওয়া যায়।

ভাবিয়া দেখিলাম কথাটী ঠিক্। আমি শোকে বা বিপদে পড়িয়া যাহা মনে করি তাহা অনেক সময়ে ঠিক হয় না। ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া এই যে মনে করি আর ভালবাসিব না, কিন্তু কাজে কি তাহার কিছুই করিতে পারি? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর ভাল বাসিব না। সব দিক্ ঠিক্ হইল আর ভাল বাসিব না। অনন্ত শূন্যপানে চাহিলাম, দেখিলাম সবই শূন্য, মধ্যে কতকগুলি তারকা জ্বলিতেছে, তাহাদিগকে লইয়া আকাশপটে লিখিলাম “ভালবাসা কালকূট।” তখন নিশ্চিন্ত মনে আঁধার জগতে বসিয়া রহিলাম। এ কি? চক্ষে জল আসিল কেন? হৃদয়ের প্রতিজ্ঞা যে ভাসিয়া গেল। এ আবার কি? দলে দলে ভালবাসার পাত্র আসিয়া জুঠিল। যাহাদের মুখ আর দেখিব না বা দেখিতে পাইব না বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, তাহারা সকলেই আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল। স্মৃতি মন্দিরের আলোক জ্বলিয়া উঠিল, দেখিলাম হৃদয়ে ভালবাসার তুফান খেলিতেছে, তাহা প্রশমিত করিবার সাধ্য আমার নাই। যেখানে যে ভালবাসার পাত্র আছে, সকলেই হৃদয় অধিকার করিয়া আছে, কাহাকেও ভুলিবার উপায় নাই। কা’ল যাহাকে শ্মশানে রাখিয়া আসিলাম, আজ সে আবার ভালবাসা পাইবার জন্য আসিয়াছে। আত্মা আত্মাকে ভুলিতে পারে না, উভয়ের মধ্যে কত কথাই হইতেছে, উভয়ে আবার নূতন রাজ্যে নূতন কুটীর নির্ম্মাণ করত সুখে বসবাস করিবার কত কল্পনাই করিতেছে।

তবে আর ভালবাসা ছাড়িল কৈ? অচ্ছোদ সরোবরের লতাপত্রমণ্ডিত নিভৃত প্রদেশে নৈশসমীর ভেদ করিয়া এ কাহার সঙ্গীত শ্রুত হইতেছে? বিরহবিধুরা মহাশ্বেতা ভালবাসা ভুলিতে পারে নাই, তাই এখন জীবিত থাকিয়া প্রেমসঙ্গীতে হৃদয়ের সন্তাপ দূর করিতেছে, কাহার সাধ্য যে সে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়া সে সমাধি ভঙ্গ করিয়া বলিতে পারে “অবোধ বালিকা, ও হলাহল আর পান করিও না, ভালবাসা ভুলিয়া গৃহে ফিরিয়া যাও।” না, না, মহাশ্বেতাকে এ কথা কেহ বলিও না, এ সঙ্গীতে কেহ বাধা দিও না। এ প্রেমকে কেহ হলাহল বলিও না। যে প্রেম ক্ষুধা তৃষ্ণা

জয় করিয়া, ভয়কে পদদলিত করত, অনন্তধামগত আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া ক্ষুদ্র বালিকার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছে, সে প্রেম অমৃত না গরল? সে প্রেম তুচ্ছ করিও না। উহা মৃত সঞ্জীবনী, শেল সংবিদ্ধ চিত্তের বিশল্যকরণী।

ভালবাসা ভুলিতে পারি না, ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। ভালবাসা না পাইলে বাঁচি না। আধার ভিন্ন এ আবেগ প্রশমিত হইবার নহে। একটী শিশুকে কোলে করিতে ইচ্ছা হইল, তাহার সুধামাখা হাসিটুকু দেখিতে বাসনা হইল, কত চেষ্টা করিলাম, শিশু কোলে আসিল না, সে হাসিল না, অমনি মন কাতর হইয়া পড়িল, ধীরে ধীরে কাতরভাবে কহিলাম “হায় আমি কি নরাধম, শিশু আমার ভালবাসা লইল না, আমার হাসিতে হাসিল না।” কাতর নয়নে আবার তাহার দিকে তাকাইলাম— সে কাতর দৃষ্টির অর্থ এই “শিশু! তোমার কি দয়া নাই, আমি তোমাকে বুকে করিব বলিয়া এত ব্যাকুল হইয়াছি, তুমি কি দয়া ক’রে একবার আমার বুকে আসিয়া সন্তাপ দূর করিবে না।” এবার শিশু হাসিয়া উঠিল। যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলাম, উল্লাস মনে তাহাকে বুকে করিলাম, চক্ষু দিয়া জল পড়িল। শিশু মনে মনে হাসিয়া বলিল “খুব দেখা গেল, তুমি আবার ভালবাসা ভুলিবে? কেমন ভালবাসা নাকি গরল?” পরাস্ত হইয়া কহিলাম না ভালবাসা গরল নহে, উহা অমৃত, আমাকে সেই অমৃত হইতে বঞ্চিত করিও না।

গৃহিণী আমার মনোমত নহে বলিয়া সর্ব্বদা আক্ষেপ করি; আমি কল্পনার তুলিতে যে চরিত্র আঁকিতে পারি, ভগবান তাহা পারেন না বলিয়া তাঁহার উপর কত রাগই করি, আমার ফরমাজ মত তিনি কাজ করিতে পারেন না বলিয়া কতই অসন্তোষ প্রকাশ করি, বিরক্তচিত্তে তাই গৃহিণীকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিলাম, মনে ভাবিলাম ভালবেসে কাজ নাই, বেশ একা থাকিব, একা থাকা অপেক্ষা আর সুখ নাই। এক দিন দুই দিন বেশ চলিয়া গেল। মন যেন কেমন কেমন হইয়া উঠিল। কিছুই ভাল লাগে না। ভাবিয়াছিলাম ভগবানের অসার সৃষ্ট জীব চাহি না, আমার কল্পনার মানসমোহিনীর অনুধ্যান করিব। ক্রমে সে কল্পনা শুকাইয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে পীড়িত হইলাম, বিকার উপস্থিত, মৃত্যু সন্নিকট,

সহসা জ্ঞান হইল, চাহিয়া দেখিলাম পদপ্রান্তে বসিয়া গৃহিণী আকুল মনে কাঁদিতেছে। সে সুন্দর ছবি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আজ যেন আমি নূতন চক্ষু পাইয়াছি, দেখিলাম চারিদিকে প্রেমমন্দাকিনী বহিয়া যাইতেছে, গৃহিণী তাহাতে পরিস্নাত হইয়া সমাসীন। হৃদয় বিগলিত হইল, ভক্তির উচ্ছ্বাসে বিশ্বপতির চরণে প্রণিপাত করিয়া কহিলাম "ভগবান! তোমার অসহায় জীব ভালবাসা ভিন্ন বাঁচিতে পারে না, আজ বুঝিলাম যে ভালবাসা গরল নহে, উহা সুখের উৎস, শান্তির প্রস্রবণ, জীবনের কোমল কানন ও চন্দ্রের সুধা।

অনেক দেখিয়া শুনিয়া এখন বুঝিয়াছি যে ভালবাসাকে উপেক্ষা করিতে পারি না, সে অধিকার নাই। এমনি প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি যে ভালবাসার জন্য যতই কেন শোক তাপ পাই না কেন, তথাপি ভালবাসার ভাব হৃদয় হইতে নির্ম্মূল করিতে পারি না। পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করি, তথাপি পরস্পরকে না দেখিলে থাকিতে পারি না। ভালবাসা হইতে ক্ষোভ, অভিমান, শোক, তাপ, সমুদ্ভূত হয়, আবার ভালবাসাতেই তাহা নিবৃত্ত হয়। যাহাকে সুখ বলি, তাহার মূলে ভালবাসা বৈ আর কিছুই নহে। হাস্য আমোদ আহ্লাদ সকলই ভালবাসা হইতে নিঃসৃত। উহাই জীবনের প্রকৃত আলোক।

ভালবাসা নিঃস্বার্থ হইলেই অমৃত, নতুবা গরল। আমি অপরকে ভালবাসি, ভালবাসাই আমার প্রকৃতি, আমি কিছু প্রত্যাশা করি না, অপরকে ভালবাসিয়া আমি সুখী হই, ইহাই ভালবাসার অমৃতময় ভাব। আমাকে কেহ ভালবাসে না। আমি লোকের এত করি, কিন্তু লোকে আমার কিছুই করে না, এই মানসিক ক্ষোভ যত ক্লেশের কারণ। এই ক্ষোভ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই তাহা হইতে গরলের উৎপত্তি হয়। এই জন্য নিষ্কাম ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা।

কিন্তু নিষ্কাম ভালবাসাতেও ক্লেশ আসিয়া উপস্থিত হয়। স্নেহের বস্তুকে প্রাণ মনে ভাল বাসিতেছি, কা'ল সে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল, আর তাহাকে ভালবাসিতে পারিব না, দেখিতে পাইব না, তাই হৃদয় কাঁদিয়া উঠিতেছে, এ হৃদয়মন্দিরে যাহাকে বসাইয়াছিলাম, সে চলিয়া গেল, হৃদয় শূন্য পড়িয়া রহিল, তাই এত মনস্তাপ, এ দুঃখের কারণ মোহ, সাংসারিকতা। দুই দিনের বিচ্ছেদে আকুল হইলে চলিবে কেন? এ বিচ্ছেদ ঘটিবে তাহা ত বুঝিয়া চলিলে ও মনকে প্রবোধ দিলে আর কষ্ট থাকে না। তাই নিষ্কাম নির্লিপ্ত ভালবাসা হইলে আর মনস্তাপ পাইতে হয় না। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। হৃদয়ের ভালবাসা এমন কোন পাত্রকে প্রধানতঃ আশ্রয় করা উচিত যে বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। সেই অক্ষয় মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে পারিলে আর ভাবনা থাকে না। এ সংসারে অপরকে ভালবাসিয়া আমরা ভালবাসা শিক্ষা করি। ভালবাসা শিক্ষা করি শুদ্ধ সেই অনন্ত মহাপুরুষকে ভালবাসিবার জন্য। যাহাদিগকে ভালবাসি তাহারা সকলেই আমাদের শিক্ষাগুরু তাহারা সকলেই ভগবদ্ভক্তির বিকাশ করিয়া দেয়। আজ যে প্রাণের প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিলাম, সে আমাকে কত ভালবাসা শিখাইয়াছে, সেই ভালবাসা আজ বিশ্বপতির চরণে সমর্পণ করিলাম। আজ হৃদয়ে যে ভালবাসার তুফান উঠিয়াছে, তাহাতে শ্রদ্ধা হা'ল ও ভক্তি পালের সংযোগে অগ্রসর হইব, দেখিতে দেখিতে স্বর্গের অপূর্ব্ব ঘাটে যাইয়া জীবনতরী সংলগ্ন হইবে, চারিঘণ্টার পথ এক ঘণ্টায় যাইয়া উপনীত হইব, মাঝীদের কথা সত্য হইবে, জীবন সফল হইবে। সেই আনন্দঘাটে উপনীত হইবা মাত্র স্নেহের পাত্র সকল একে একে আসিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবে, তখন আনন্দোচ্ছ্বাসে হৃদয় বলিয়া উঠিবে "না, না, তোমাদিগকে ভালবাসিয়া কোন অপকার্য্য করি নাই, যে ভালবাসাকে গরলময় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা প্রকৃতই অমৃতময় দেখিতেছি, আজ তাহারই মাহাত্ম্যে এই সর্ব্বসন্তাপহারক স্থানে উপনীত হইয়া ধন্য হইলাম।

বেলুনে প্রেম।

(একটী বিদেশীয় গল্প।)

আমি লণ্ডন নগরে একটী ধনবান্ গৃহস্থের বাটীতে বাস করিতাম। অর্থাভাবে লেখা পড়া শিক্ষা করিতে পারি নাই, কিন্তু বেলুনে উঠিতে ও উত্তমরূপে বেলুন চালাইতে শিখিয়াছিলাম। সেই গৃহস্থের একটী সুন্দরী যুবতী কন্যা ছিল। তাহার নাম মেরী। আমি সদা সর্ব্বদা তাহার কাছে

থাকিতে ভাল বাসিতাম, সে যেখানে যাইত আমি সেখানে যাইতাম। সে আমায় কখনও নিষেধ করিত না। মেরী ঘোড়ায় চড়িতে পারিত, দাঁড় টানিতে জানিত, মৎস্য ধরিত, সাঁতার দিত ও লাফা লাফি দৌড়া দৌড়ি করিয়া বেড়াইত, এমন কি আমি তাহার সহিত ছুটা ছুটী করিয়া উঠিতে পারিতাম না। কিন্তু এই রূপে মেরীর সহিত আমার বিলক্ষণ ভাব হইয়াছিল। মেরী এক দিন কহিল "তুমি আমাকে বেলুনে চড়াইতে পার?" আমি কহিলাম "চেষ্টা করিব।"

বলিতে কি যদিও মেরী আমায় বড় গ্রাহ্য করিত না, তথাপি তাহার সৌন্দর্য্যে ও স্বভাবে আমি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, তাহাকে দেখিলেই আমার আনন্দ হইত। তাহার ছুটা ছুটী ও লাফা লাফি দেখিতে বড়ই ভাল বাসিতাম। মনে ২ করিতাম যদ্যপি মেরী আমায় বিবাহ করে তাহা হইলে আমি কতই সুখী হইব।

এক দিন নৌকা করিয়া উভয়ে একত্রে মৎস্য ধরিতে গিয়াছিলাম। নির্জ্জন নদীর পুলিনে সুন্দরী মেরীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলাম "মেরি! আমি তোমায় বড় ভাল বাসি। তুমি যদ্যপি আমায় বিবাহ কর তাহা হইলে আমি বড় সুখী হই।"

মেরী উত্তর দিল—"মূর্খের মতন কথা কহিও না, আমার বড়সীতে কেঁচো গাঁথিয়া দাও,"

আমি বলিলাম "ছি মেরি! যখন বিবাহের কথা হইতেছে তখন কেঁচোর কথা কেন?"

মেরী ক্রোধভরে কহিল "দেখো অধিক মূর্খতা করিও না; তাহা হইলে আমি এখনি তোমায় বোট্ হইতে ঝুপ্ করিয়া ফেলিয়া দিব।"

আমি পুণশ্চ সেই প্রস্তাব উথাপন করাতে সে তাহার বাক্য কার্য্যে পরিণত করিল, আমাকে ঠেলা দিয়া বোট্ হইতে জলে ফেলিয়া দিল এবং আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। আমি সাঁতার দিয়া পুনশ্চ বোটে উঠিলাম। বড় দুঃখ ও রাগ হইল, মনে ২ বলিলাম "প্রতিশোধ লইব"। তৎপরে বাটীতে গিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিলাম কিন্তু যে আমায় দেখে সেই হাসে, আমি বুঝিলাম সকলে ঐ ঘটনা জানিতে পারিয়াছে। মেরী সকলের কাণে ২ বলিয়া দিয়াছে—তাহারা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। আমি আবার মনে ২ প্রতিজ্ঞা করিলাম, "যদি আমি যথার্থ পুরুষ হই তাহা হইলে এই কার্য্যের প্রতিশোধ লইবই লইব।"

ঘটনা ক্রমে এক দিন এক জন বিখ্যাত দ্যো-নাবিক (বেলুন পরিচালক) সহরে একটী বেলুন আনিয়া উপস্থিত করিল। বেলুন দেখিতে বিস্তর লোক আসিল। বেলুন শীঘ্র আকাশে উঠিবে বলিয়া ফুলিয়া বৃহৎ গোলাকৃতি ধারণ করিল। মেরীও তথায় উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম "মেরি! তোমাকে বেলুনে চড়াইতে প্রতিশ্রুত ছিলাম, তুমি অদ্য বেলুনে উঠিবে?" জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে মেরী ছুটীয়া এক লাফে বেলুনে উঠিয়া বসিল। আমি বেলুন-চালকের সহিত পরামর্শ করিয়া সে দিন বেলুন চালনের ভার গ্রহণ করিলাম। কিন্তু মেরীকে বলিলাম "বেলুন-চালক পীড়িত, সে আজ বেলুন উড়াইতে পারিবে না"—মেরীর মুখের হাস্য গেল। সে কহিল—"কেহ কি এখানে নাই যে উহা চালাইতে পারে। তুমি ত চালাইতে জান শুনিয়াছি" আমি কহিলাম—"হাঁ জানি"।

মেরি বলিল "তবে শীঘ্র আইস বিলম্ব করিও না, এখনি বাবা আসিবেন।"

উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলে মেরীকে বেলুনে যাইতে নিষেধ করিল কিন্তু মেরী কাহারও কথা শুনিল না। আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বেলুন ছাড়িয়া দিলাম। দেখিতে ২ বেলুন স্বর্গাভিমুখে উঠিতে লাগিল। একটু-মাত্র বাতাস ছিল না সেই কারণ বেলুন ঠিক সোজা উঠিতে লাগিল। মেরী আনন্দে করতালি দিতে ২ কহিল "বেশ্ মজা"। আমরা গাছ পালা বাড়ী ঘর অতিক্রম করিয়া যত উপরে উঠিতে লাগিলাম মেরী ততই আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। ক্রমে যখন বেলুন এত উচ্চতে উঠিল যে তথা হইতে মনুষ্যাদিসকল ক্ষুদ্র চিহ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল তখন মেরী জিজ্ঞাসা করিল—"বোধ করি তুমি দ্যো-নাবিকের কার্য্য উত্তমরূপ জান? আমি বেশ সুযোগ পাইলাম এবং বলিলাম"—উঠিতে বেশ জানি কিন্তু তত সহজে নামিতে জানি না।

মেরি কহিল "এ কথার মানে কি?"

আমি বলিলাম—"উপরে উঠিতে হইলে কেবল এই সকল বালুকার বস্তা নীচে ফেলিয়া দিতে হয়।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক বস্তা ফেলিয়া দেখাই-

লাম। মেরি মৌখিক সাহসের সহিত কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—"তুমি নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেছ"—

আমি কহিলাম—"না, আমি মাটীতে কি আকাশে আস্তে যাইতে ভালবাসি না" এই বলিয়া আর এক বস্তা বালুকা নিক্ষেপ করিলাম।

মেরী কহিল—"তুমি নিশ্চয় পাগল হইয়াছ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"সুন্দরি! তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া পাগল হইয়াছি বটে, কিন্তু তুমি বড় নিষ্ঠুর, বল তুমি আমার ভালবাসা প্রতিদান করিবে? তুমি আমার স্ত্রী হইবে?"

মেরী ভয় সত্ত্বেও একটু হাসিয়া কহিল—"আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর এক দিন দিয়াছি, তুমি কি এত শীঘ্র তাহা ভুলিয়া গিয়াছ।"

আমি কহিলাম "ভুলি নাই, বেশ স্মরণ আছে কিন্তু আজি আমি তদপেক্ষা ভাল উত্তর চাই। ঐ যে আর পাঁচটী বালির বস্তা দেখিতেছ যতবার আমার প্রস্তাবে তুমি অস্বীকৃতা হইবে ততবার এক একটী করিয়া ঐ গুলি নিক্ষেপ করিব। সেই কারণ সুন্দরি! এখনও বলিতেছি আমার পত্নী হইতে সম্মত হও।"

মেরী ক্রোধভরে কহিল—"না হইব না, কথনই হইব না। আর আমার প্রতি তুমি এইরূপ অভদ্রতাচরণ করিও না।"

আমি হাসিয়া কহিলাম—"সুন্দরী সে দিন তুমি বোট্ হইতে ফেলিয়া দিয়া আমার প্রতি বড় ভদ্রতা করিয়াছিলে।" এই কথায় সাহসী মেরী পুণশ্চ হাসিয়া উঠিল; কিন্তু আমি আবার বলিলাম "আমায় বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছ?"

মেরি কহিল—"কথনই না, তুমি যদি ধ্রুব তারার কাছেও আমায় লইয়া যাও তথাপিও সম্মত হইব না।"

ক্রোধে মেরির নয়ন ও কপোল যুগল রঞ্জিত হওয়াতে সে এরূপ সুশ্রী দেখিতে হইয়াছিল যে একবার মনে করিলাম আর ভয় দেখাইব না। কিন্তু ভাবিলাম এখনো নিরাপদে আরো উচ্চে উঠিতে পারি এবং নিজের প্রতিজ্ঞাও মনে পড়িল। দ্বিরুক্তি না করিয়া গান গাহিতে গাহিতে আর একটী বস্তা ফেলিয়া দিলাম।

মেরী ভয়ে কহিল—"আর উপরে উঠিও না, এইবার নামিতে চেষ্টা

কর। আমি এ কথা কাহাকেও বলিব না! দেখ, এত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি যে নিম্নে গৃহ বাটী সকল একটী একটী চিহ্নের ন্যায় দেখাইতেছে। আমার কথা রাখ, আর উঠিও না।"

আমি কোন উত্তর না দিয়া কেবল গীত গাহিতে লাগিলাম। বেলুন উঠিতে থাকিল। মেরী আবার কহিল 'যদি তুমি এখনি না নাম তাহা হইলে বাবাকে নীচে গিয়া সব বলিয়া দিব। আমি আবার একটী বস্তা হস্তে করিয়া বলিলাম "সুন্দরি! বিবাহে সম্মত আছ?"

মেরী কহিল—"বলিয়াছি না"। আমি অমনি ঝুপ্ করিয়া আর এক বস্তা ফেলিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী রণ সঙ্গীত গাহিলাম। মেরী অত্যন্ত ক্রোধভরে দণ্ডায়মান হইল এবং রাগে অতি সুশ্রী দেখাইতে লাগিল। সে কম্পিত স্বরে কহিল——

"আমি মনে করিতাম তুমি ভদ্রলোক, কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নয়। একজন মুটে স্ত্রীলোকের প্রতি এরূপ ব্যবহার করে না। তুমি জান এই পাগলামীতে তোমার ও আমার উভয়েরই বিপদ আছে।"

আমি বলিলাম—"তোমায় আমি এত ভালবাসি যে তোমার সঙ্গে মরিলেও আমার সুখ আছে।"

মেরী এই কথায় ক্রোধভরে আপন কৃষ্ণ কেশরাশি বদনমণ্ডল হইতে অপসারিত করিয়া একদৃষ্টে আমার পানে আরক্ত নয়নে দেখিতে লাগিল। তৎকালিন তাহার সৌন্দর্য্য অমানুষিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে কহিল—"আমার আজ্ঞায় তুমি এখনি বেলুন নীচে লইয়া চল।"

আমি উত্তর না দিয়া গীত গাহিতে গাহিতে আর এক বস্তা বালুকা লইয়া বলিলাম—

"সুন্দরি! আমরা অনেক উচ্চে উঠিয়াছি, শেষ চন্দ্রের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করার অপরাধ হইবে। এই বেলা বল আমার পাণিগ্রহণ করিবে?"

মেরী এই কথা শুনিয়া দুঃখিত ভাবে বসিয়া পড়িল। আমি বালির বস্তা ফেলিয়া দিলাম। মেরী হাঁটু পাতিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—

"সে দিন যাহা করিয়াছি তজ্জন্য আমায় ক্ষমা কর, আমি বড় অন্যায় করিয়াছি, স্বীকার করিতেছি। নীচে লইয়া চল আমি তোমার ভগ্নী হইব।

আমি কহিলাম—"পত্নী নহে?"

সে কহিল—"না না আমায় ক্ষমা কর।"

চতুর্থ বস্তা এইবার ফেলিলাম। কিন্তু আরও অধিক উচ্চে যাওয়া অন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু হাসিতে হাসিতে মেরীকে বলিলাম।—

"সুন্দরি! শুনিয়াছি স্বর্গেও কখন কখন বিবাহ হইয়া থাকে; আমাদের বিবাহ তথায় হইবে?" এই বলিয়া পঞ্চম অর্থাৎ শেষ বস্তা হস্তে করিলাম। আর মেরীকে বলিলাম—

"আইস, বল দেখি তুমি আমার জীবনের সঙ্গিনী হইবে? না মরণের সঙ্গিনী হইবে?" মেরী নিরুত্তর হইল। আমি বস্তা বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে বলিলাম—

"মেরি! শীঘ্র অঙ্গীকার কর।"

এইবার মেরী কাঁদিয়া ফেলিল; তাহার ক্রন্দন দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। মনে করিলাম আর তাহাকে কষ্ট দিব না। এমন সময়ে সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "শেষ বস্তা আর নিক্ষেপ করিও না, আমি তোমায় বিবাহ করিতে সম্মত হইলাম"। আমি বলিলাম—

"তুমি অন্তরের সহিত এই বাক্য বলিতেছ?"

সে কহিল "হাঁ।"

আমি বস্তাটী রাখিয়া বেলুনের বাষ্প নিঃসরণ করিতে লাগিলাম। বেলুন ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল। নীচে নামিয়া যখন মেরীকে বিবাহের কথা আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, সে আমার গালে এক চড় বসাইয়া দিল এবং পিতার নিকট গিয়া সকল কথা বলিয়া দিল। তাহার পিতা একটী যষ্টি আনিয়া আমায় কহিল "দুরাত্মন্! আমি তোমার পৃষ্ঠে এই যষ্টি ভাঙ্গিব।" এই বলিয়া তিনি আমার পৃষ্ঠদেশের সহিত সেই যষ্টির বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন।

আমি তথা হইতে পলায়ন করিলাম। এক্ষণে পাঠকবর্গ বিচার করুন, মেবীর সহিত আমার বিবাহ হওয়া উচিত ছিল কি না?

সম্বন্ধ নির্ণয়।

১

পিতা ও পুত্র।

কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জগতের যাবতীয় বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইতেছে। কি প্রাকৃতিক, কি সামাজিক, কি দৈহিক, কি নৈতিক, কি ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়মগুলি, অধিক পূর্ব্বের কথা নহে, গত পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। এই পরিবর্ত্তনে জগতের উন্নতি কি অবনতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই কিছু না কিছু বিচার করিয়া থাকেন। এরূপ বিচার না করিয়া মানব তিষ্ঠিতে পারে না। এক দিকে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ও আচার ব্যবহার ভীষণ শাসন দণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান, অন্য দিকে কাল-সাগরের সর্ব্ব বিধ্বংসী উত্তাল তরঙ্গরাশি পতনোন্মুখ হইয়া ধাবিত, এতদুভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্রপ্রাণী জীব,—কাজেই তাহাকে সভয় চিত্তে আপন আশ্রয় স্থান খুঁজিতে হয়। তাহাকে ভাবিতে হয়, কোন্ পথে যাইলে সে নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে—কোথায় দাঁড়াইলে তাহার জীবনসর্ব্বস্ব স্নেহ মমতার লীলাক্ষেত্র যে সংসার তাহাতে তাহার নিজের কিছু রাখিয়া যাইতে পারিবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আপন আপন সাধ্যমত একটা মীমাংসা করিয়া লন্। অনেকে এরূপ জটিল কথার নানা প্রকার মীমাংসা করিতেছেন। কিন্তু হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কোন সর্ব্ববাদীসম্মত মীমাংসা হইয়াছে কি না তাহা আমরা অবগত নহি। যদি সে বিষয়ের কোন মীমাংসা, পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ জ্ঞাত থাকেন, তবে দয়া করিয়া তাহা আমাদিগকে অবগত করাইলে আমরা পরম কৃতার্থ হইব।

গার্হস্থ্য জীবনের অন্যান্য কথার মধ্যে আধুনিক পিতা পুত্রের সম্বন্ধ বিচার একটি অতি গুরুতর কথা। পিতা পুত্রের প্রতি কিরূপ, ও পুত্র পিতার প্রতি কিরূপ, আচরণ করিবেন তাহা হিন্দুর দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ কাল মীমাংসার বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে হিন্দুর মধ্যে এক দিন পিতা পুত্রের সম্বন্ধ অপেক্ষা মহত্তর ও মধুরতর সম্বন্ধ আর ছিল না,

আজ সেই হিন্দুকে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইতেছে—না করিলে গার্হস্থ্য সুখ সচ্ছন্দতা থাকিতেছে না। পূর্ব্বে হিন্দু সন্তান ভাবিতেন—

পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ, পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

পিতার এরূপ অর্চ্চনা জগতে কোন দেশে কোন কালে কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া জানি না। আর, এখন হিন্দু সন্তান ভাবেন "ও সকল কাল্পনিক কথা; প্রাচীন হিন্দু কল্পনাপ্রিয় ছিল, কার্য্য কুশলতা তাহার আদৌ ছিল না, তাই হিন্দু যেখানে কিছু মাত্র ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশের সুযোগ পাইতেন সেই খানেই আপনাকে ভুলিয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়া, কতকগুলা অস্বাস্থ্যকর কাল্পনিক ভাবের প্রশ্রয় দিতেন। প্রতি কার্য্যে কল্পনা মিশ্রিত করিলে যে জীবধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা ঘটে তাহা ভাবিতেন না"। সেকালে পিতা ভাবিতেন যে, পুং নামক নরক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পুত্রের প্রয়োজন। এখনকার পিতা ভাবেন যে, পুত্রের দ্বারায় তাঁহার যে কোন ভবিষ্যৎ মঙ্গল হইবে তাহার আশা ভরসা নাই। পুত্র নিজে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে সেই ভাবে তাহাকে মানুষ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে পারিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল। পূর্ব্বে পিতা ও পুত্রে ইহ পরকালের সম্বন্ধ ছিল, এখনকার পিতা পুত্রের মধ্যে সেরূপ কোন সম্বন্ধের অভাব হইয়া পড়িয়াছে। শুধু পিতা পুত্র কেন বলি, এক্ষণে পতি ও পত্নীতে, পিতা মাতা ও কন্যাতে, ভ্রাতা ভগ্নীতে, বন্ধুতে বন্ধুতে, প্রভু ও ভৃত্যে, রাজায় ও প্রজায়—এ সকলেরি পরস্পরের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহার সঙ্গে যে পরকালের কিছুমাত্র সংস্রব থাকিতে পারে তাহা প্রায় কেহই সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহাদের সেরূপ বিশ্বাস কিছুমাত্র আছে, তাঁহারা সময়ের ভাবগতিক দেখিয়া, পরকালের মঙ্গলের জন্য আর বড় একটা অন্যের মুখাপেক্ষা করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগ্নী, আত্মবন্ধু প্রভৃতির সহিত ইহকালের সম্বন্ধ কোনরূপে বজায় রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল, পরকালের সম্বন্ধ ত দূরের কথা। এইরূপ বিশ্বাস বশতই এত গৃহবিবাদ, এত আত্মবিচ্ছেদ ঘটিতেছে। সে কথা এখন থাক, আমাদের বক্তব্য বিষয়, পিতা পুত্রের সম্বন্ধ নির্ণয়।

আজ কাল একটু চক্ষু খুলিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে পিতা পুত্রের মধ্যে কেমন একটা বিচ্ছেদভাব রহিয়াছে—যেন পরস্পরের আচরণে উভয়ের কেহই পরিতৃপ্ত নহেন। যেন পিতা ভাবিতেছেন পুত্র তাঁহার প্রাপ্য সকলটা দিতেছেন না। পুত্রও ভাবিতেছেন যেন তাঁহার যাহা দেয় তাহা অপেক্ষা পিতা অধিক দাবী করিতেছেন। উভয়ের মধ্যে সে অসীম ভাব আর নাই—একটা স্বার্থ ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কালধর্ম্মে পুত্র ভাবিতেছেন যে মনুষ্য সসীম হইয়া কি কখন একটা অসীম ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে পারে? মানবের প্রত্যেক কার্য্যের ও চিন্তার সীমা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে মানব কখন সীমাবদ্ধ সংসারে তিষ্ঠিতে পারে? পিতা ভাবিতেছেন তিনি যে পুত্রের জন্য এত করিতেছেন, পুত্র ত তাঁর জন্য তাহার শতাংশের একাংশও করিতেছে না। এইরূপে উভয়ের মধ্যে একটা দেনা পাওনা ভাবের উদয় হইতেছে। সুতরাং যেখানে দেনা পাওনার কথা, সেখানে একটা চুক্তি না করিলে চলিবে কেন? সেই চুক্তির অভাবে উভয়ের মনোমালিন্য ঘটিতেছে। পূর্ব্বে পিতা সন্তানের অহেতুকী শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও আনুগত্য বা অধীনতা প্রত্যাশা করিতেন। পিতার কথা পূর্ব্বে সন্তানের নিকট রাজবিধি অথবা সমাজবিধি অপেক্ষাও অধিকতর সম্মানের সহিত প্রতিপাল্য ছিল, তিনি পুত্রের চক্ষে রাজা—গুরু—শিক্ষক, বন্ধু, এমন কি, দেবতার দেবতা অপেক্ষাও গুরুতর ব্যক্তি ছিলন। এখন পুত্র ভাবেন যে, পিতাকে ভক্তি করিব, শ্রদ্ধা করিব, ভাল বাসিব, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যে ও চিন্তায় তাঁহার প্রভূত্ব রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার নিজের অস্তিত্ব কোথায়? আরও ভাবেন যে মানব সমাজ দিন দিন সভ্যতার উর্দ্ধতর স্তরে উত্থিত হইতেছে; স্বাধীন চিন্তার বলে কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, সকল বিষয়েরই নেতৃবর্গ উদারনীতি অবলম্বন করিতেছেন। এই উদার নীতির দিনে সংসার সম্বন্ধেও উদারনীতি অবলম্বন করা বিধেয়, নহিলে অন্তর বাহিরে যে সংঘর্ষণ হইবে তাহাতে মহা বিপ্লব ঘটিবে। বহু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, যে মানব তাহার নিজত্ব একেবারে ত্যাগ করিতে পারে না, যে মানবের নিজত্ব নাই সে ব্যক্তি মানব নামের যোগ্য নহে। পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে ফ্রান্স সভ্যতার আদর্শ স্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত লেখক লিখিয়াছেন;—

"The ideal of modern progress is to arrive at absolute freedom for every individual; upon the one condition that every individual shall respect the equal right of his fellow-men to such freedom."—(*Eugine Veron.*)

ইউরোপীয়দিগের এইরূপ ভাবপূর্ণ গ্রন্থাদি পড়িয়া এদেশের সন্তানেরা যে স্বাধীনতার জন্য উৎসুক হইবেন তাহার আর সন্দেহ কি? পিতারা যে এ সকল কথা না বুঝেন তাহা নহে। তাঁহারাও কালের লক্ষণ অনুসারে প্রাচীন ধর্ম্ম ও আচার নির্দ্দিষ্ট আপন অধিকার কতক ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইতেছেন। এক্ষণে উভয়ের মধ্যে কিরূপ আচরণ প্রচলিত হইবে তাহাই বিবেচ্য। উভয়ের সম্মতি ক্রমে একটা সাধারণ নিয়ম প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। এরূপ প্রথা অবশ্য বাৎসল্য ও পিতৃভক্তির উপাদানে গঠিত করিতে হইবে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে পিতা পুত্র সুবিধা মত একটা আচার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছেন! সে নির্দ্দিষ্ট আচরণে তাঁহাদের পারিবারিক সুখসচ্ছন্দতা কতদূর ঘটিতেছে তাহা বাহিরের লোক অবগত নহেন। সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের গার্হস্থ্য নিয়মের সহিত অন্য ব্যক্তির গার্হস্থ্য নিয়মের ঐক্য না থাকায়, সর্ব্ববাদীসম্মত কোন একরূপ প্রথার অভাব হইয়া উঠিয়াছে। যদি কেহ ভাবেন যে একের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সহিত অন্যের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সামঞ্জস্য না থাকিলে ক্ষতি কি? আমরা বলি যে তাহায় এত ক্ষতি আছে যে অন্য কোনরূপ ঘটনায় সমাজের তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। গৃহে গৃহে ভিন্নরূপ প্রথা অবলম্বিত হইলে লোকে কালক্রমে সমাজ শাসনে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিবে, তাহাতে সমাজের বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে। ফলেও তাই হইতেছে, আমাদের সমাজ বন্ধন দিন দিন এতই শিথিল হইতেছে যে পরিশেষে আমাদের জাতিত্ব, ধর্ম্ম ও আচরণ কি ভাবে পরিণত হইবে তাহার নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তির সমষ্টিতে গৃহ, গৃহের সমষ্টিতে সমাজ; অতএব ব্যক্তি বিশেষের কার্য্যের ও চিন্তার শৃঙ্খলা না থাকিলে গৃহের শৃঙ্খলা থাকে না, তেমনি আবার গৃহের শৃঙ্খলার অভাবে সমাজের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য আমরা বলি যে আধুনিক পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির মধ্যেই সম্বন্ধ বন্ধনের যে শৈথিল্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহার, যেরূপ হউক, একটা গঠন হওয়া আবশ্যক। এ প্রবন্ধে আমরা পিতা পুত্রের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব; ভগবানের কৃপায় যদি আমাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, তাহা হইলে আমরা ক্রমশঃ পরিবারস্থ অন্যান্যেরও সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইব।

পিতা পুত্রের ভাবী সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে তাহাদের উপস্থিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদের হেতু অনুসন্ধান করা বিধেয়। এরূপ ঘটনার কারণ কি? পিতা পুত্রের মধ্যে কে অপরাধী? এখনকার পিতারা যে পূর্ব্বকালের পিতৃগণ অপেক্ষা ন্যায়পরতা বা স্নেহ মমতায় হীন তাহা সহসা বলিতে পারি না। অথবা আধুনিক পুত্রেরা যে সেকালের পুত্রের অপেক্ষা অধিক বিপ্লব-প্রিয় তাহাও সহসা সিদ্ধান্ত করা যায় না। প্রাচীন কালে সমাজ ও ধর্ম্মের বন্ধন দৃঢ় ছিল। সমাজ ও ধর্ম্মের দ্বারা, পুত্রের উপর পিতার যে অধিকার, তাহা পরিষ্কার রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনিই গৃহের অধ্যক্ষ ছিলেন। কেবল যে আইন-কানুন দ্বারায় তাঁহার অধ্যক্ষতা রক্ষিত হইত তাহা নহে। তিনি নিজেও তাঁহার প্রভুত্ব রক্ষা করিতে জানিতেন। তাঁহর প্রভুত্ব রক্ষার জন্য তাঁহাকে রাজদণ্ড বা সমাজদণ্ডের সহায়তা লইতে হইত না। যদি কোন পিতা কোন স্থলে আপন প্রভুত্ব রক্ষায় অসমর্থ বা পরাঙ্মুখ হইতেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে আলস্যপরায়ণ বা দুর্ব্বলমতি অথবা দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া উপহাস বা ঘৃণা করিতেন। এখনকার পিতৃবর্গের সে দার্ঢ্য নাই। কেন যে তাহা নাই তাহার বহুল কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ পরাধীনতায় তাঁহাদের মানসিক বল ক্ষয় হইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয়তঃ দায়িদ্র্য বশতঃ বহু পরিবার প্রতিপালনে তাঁহারা অসক্ত হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহাদের সন্তান সন্ততি অধিক অথচ প্রচুর অর্থ নাই, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে যখন পুত্রকে টাকা কড়ি দিয়া যাইতে পারিবেন না, তখন পুত্রের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করিবার ইচ্ছাও তাঁহার পক্ষে অনুচিত। অর্থই আজ কাল সম্বন্ধ স্থাপনের প্রধান উপাদান হইয়াছে। তাঁহারা ভাবেন না যে অর্থ ব্যতীত ও অর্থ অপেক্ষা শ্রেয়তর উপায়ে সম্বন্ধ স্থাপন হইতে পারে। পুত্র সাধারণত দেখিতে পান পিতাও অর্থ লইয়া বিব্রত; দেখিতে পান যে পিতা কি ধর্ম্ম, কি নীতি সকল বস্তু অপেক্ষাই অর্থের প্রাধান্য অনুসরণ করেন।

আরও দেখেন সমাজে অর্থ ও বিদ্যারই আদর, এই দুই ব্যতীত আর কোন বিষয়ের গৌরব তাঁহার দৃষ্টিপথে প্রায়ই পতিত হয় না। সুতরাং যে স্থলে পিতার অর্থ বা বিদ্যা, বুদ্ধি বা পদ সম্ভ্রম না থাকে, সে স্থলে পুত্র পিতাকে, পিতার উপযুক্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করেন না। তাঁহারা ভাবেন না যে অর্থ ও বিদ্যা বুদ্ধি বা পদ মর্য্যাদা ব্যতীত জীবনের এমন একটা গুরুতর সম্বন্ধ আছে যাহা বিচ্ছিন্ন হইলে জীবন শুষ্ক, শূন্য ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে পিতা যদি প্রাচীন কালের ন্যায় তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যত হয়েন, তাহা হইলে পুত্র কাজেই তাঁহাকে অত্যাচারী পিতা ভাবিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদে উদ্যত হন। এইরূপে সাধারণেরও পিতা পুত্রের আচরণ সম্বন্ধে মতের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

প্রাচীন প্রথা অনুসারে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পিতার অধিকারে প্রধান অঙ্গ তাঁহার প্রভুত্ব। আধুনিক পিতা পুত্রের উপর সে প্রভুত্ব স্থাপনে দিন দিন বীতস্পৃহ হইতেছেন। সন্তানের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার যেমন এই নিস্পৃহতা বৃদ্ধি হইতেছে, সন্তানেরও তেমনি দিন দিন স্বাধীন ইচ্ছা প্রবলতর হইতেছে। পিতার আপন প্রভুত্ব লাঘব করিবার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আপন মর্য্যাদা দিন দিন সঙ্কুচিত হইতেছে। পিতা ভাবিতেছেন যে পুত্র সৎপথ অবলম্বন করিয়া আপন ইচ্ছানুরূপ পথে গমন করুক। যদি সে আপন ইচ্ছায় সৎপথে গমন না করে, তবে তাহাকে স্নেহ মমতার প্ররোচনায় সৎপথে আকৃষ্ট করিতে হইবে, তাহাতেও যদি কোন ফল না দর্শে তবে সে সন্তান আপনিই কষ্ট পাইবে, তাঁহার কার্য্য তিনি করিয়াছেন। পিতা যে সৈন্যাধ্যক্ষ্যের ন্যায় কেবল আজ্ঞা প্রয়োগ করিবেন, আর পুত্র যে পদাতিকের ন্যায় কেবল তাহা পালন করিবেন ইহা পিতা কিম্বা পুত্র এতদুভয়ের কাহারই অভিপ্রেত নহে। এখনকার বিশ্বাস যে পিতা পুত্রের উপর কেবল মাত্র কতকটা পুত্রের প্রীতিকর আধিপত্য স্থাপন করিতে গেলে, তাহার প্রভাবে উভয়েরি হৃদয় ক্ষেত্রে স্নেহ মমতার সিঞ্চনে যে সকল সুকোমল ও সুমধুর লতা বিতান জন্মে তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু বাস্তবিক কি, পিতা পুত্রের প্রতি তাঁহার যে কর্ত্তব্য তাহা এই ভাবে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয়েন? সন্তানের উপর পিতার যে প্রভুত্ব তাহা কি কেবল প্রভুত্বের জন্য? সে প্রভুত্বের সঙ্গে সন্তানের শুভাশুভের কি

কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই? যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহাদিগকে আমরা ভ্রান্ত বলিতে সঙ্কুচিত নহি। পিতার আধিপত্য স্থাপনের অনিচ্ছায় কি অদৃষ্ট পূর্ব্ব ফল ফলিতেছে তাহা পরে বিবৃত করিতেছি।

পিতা হয় ত ইহাও ভাবেন যে নিরন্তর শাসন বাক্য ব্যবহার করিলে শাসন বাক্যের গৌরব থাকে না। শাসন বাক্যের অপ্রাচুর্য্যে শাসনের অসাধারণ শক্তি জন্মে। লঘু দোষেও শাসন, গুরু দোষেও শাসন, বিনা দোষেও শাসন বাক্য প্রয়োগ করিলে পুত্র অভ্যস্থ হইয়া গিয়া শাসনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইবে। অতএব কেবল শাসন নীতি অবলম্বনে অভীষ্ট ফল লাভ হইবে না, বরং তাহায় উভয় পক্ষের অনিষ্ট আশঙ্কা আছে। পক্ষান্তরে কদাচিত শাসননীতি অবলম্বনে আশানুরূপ গুরুতর ফল দর্শিয়া থাকে। কিন্তু কথাটি কি ঠিক? আমরা কার্য্যে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে সন্তানের প্রতি আজ্ঞা প্রচারে আমরা যতই সঙ্কুচিত হই, সন্তান আজ্ঞা গ্রহণে ততই অনভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং যদি এমন সময় উপস্থিত হয় যে গুরুতর শাসন না করিলে চলিতেছে না, তখন কঠোর শাসন অবলম্বন করিলে সে শাসন সন্তানের অনভ্যস্ত চিত্ত বৃত্তিতে এতই কঠোর ভাবে আঘাত করে যে সন্তান পিতাকে নিতান্ত নির্ম্মম ও পামর বলিয়া ভাবিতে উদ্যত হয়। আর যদি পিতা বরাবর শাসন প্রথা প্রচলিত রাখেন তাহা হইলে পুত্র পিতার সে শাসন স্বাভাবিক ও তাঁহার অধিকারভুক্ত বলিয়া কতক অপ্রীতিকর হইলেও তাহা অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

যাঁহারা ভাবেন যে শাসনের দিন কাল গিয়াছে, তাঁহারা অধিকতর ভ্রান্ত। মানুষে এখনো এতদূর পুরুষত্ব হীন হয় নাই যে তাহারা ভাবিতে পারে যে শাসন নীতির আর কোন আবশ্যকতা নাই। গৃহে পিতার শাসনের অভাব হইতেছে বটে, কিন্তু পিতা সন্তানের শাসন হস্তান্তর করিতেছেন মাত্র। তিনি নিজ হস্তে শাসন চালনা না করিয়া, তাঁহার প্রতিনিধি, সন্তানের যে শিক্ষক, তাঁহার দ্বারাই সে কার্য্যের পরিচালনা করিতেছেন। তাহায় কি অশুভ ফল ফলিতেছে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন। গৃহে যেমন পিতা শাসন করেন, পুত্রও সেইরূপ পিতার উপর স্নেহের একটা আধিপত্য করেন। শিক্ষকের উপর ছাত্র সে আধিপত্য করিতে অক্ষম। কেননা শিক্ষক একজন অপরিচিত ব্যক্তি।

সন্তান তাহার অধিকাংশ সময়ই শিক্ষকের অধীনে থাকে, সুতরাং কেবল শাসন দেখিয়া তাহার ধারণা হইয়া যায় যে শিক্ষকই শাসন করিবার কর্ত্তা—পিতা নহে। শিক্ষককে পুত্র যে ভয় করে, সে ভয়ের সহিত পিতৃভক্তি ও পিতৃপ্রেম মিশ্রিত হইয়া যে একটী অতীব মধুর ভাবের সৃষ্টি হয় তাহা আস্বাদন করিবার সুযোগ পুত্রের থাকে না। তাহারা বুঝিতে পারে না যে শাসনের অধিকার পিতারই। তিনি কতক সময়াভাবে, কতক বা অন্য কারণে আপনার সে অধিকার শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন মাত্র। পিতাও শাসন কার্য্য একজন অপরিচিতের হস্তে অর্পণ করায় পুত্রের চরিত্র গঠনে কর্ত্তব্য-বিমুখ হইতেছেন। তিনিও ভাবেন না যে তাঁহার সহিত পুত্রের যে সম্বন্ধ, শিক্ষকের সহিত ছাত্রের তাহার এক বিন্দুও নাই, এবং পুত্রের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সহিত শিক্ষকের ইষ্টানিষ্টের সংস্রব নাই।

এ প্রবন্ধে আমাদের প্রথম কথা আধুনিক পিতা পুত্রের সম্বন্ধ নির্ণয়। সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে পরস্পরের কার্য্য নির্ণয় করিতে হয়। এত দূরে আসিয়া আমরা উহাদের কার্য্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব। আমরা পারতপক্ষে শাস্ত্রীয় কথার দোহাই না দিয়া ব্যবহারজ্ঞানে বা কার্য্যাভিজ্ঞতায় যেরূপ দেখিতে পাইতেছি, সেই রূপই বলিব। পিতার প্রথম কার্য্য সন্তানের উপর প্রভুত্ব স্থাপন। দ্বিতীয় কার্য্য সন্তানের শিক্ষা। তৃতীয় কার্য্য সন্তানের জন্য সংস্থান করা। আমরা আপাততঃ এই তিন ভাগেই পিতার কার্য্যকে বিভক্ত করিব। সন্তান যত বড়ই হউন, আমাদের বিবেচনায় তাঁহার উপর পিতার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকা বিধেয়। বাল্যকালে পুত্র যখন শিক্ষার পাত্র, তখন ত পিতার শাসন না থাকিলে পুত্রের কোন শিক্ষাই হয় না। তখন পিতা পুত্রে প্রধানত শিক্ষক ও ছাত্র সম্বন্ধ। যাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে তাহার উপর প্রভুত্ব না থাকিলে কি কখন শিক্ষা হইয়া থাকে? বাল্যকালের কথা কেন বলি, যে বয়সেই হউক, প্রভুত্ব ব্যতীত কেহ কখন কাহাকেও শিক্ষা প্রদান করিতে পারে না। আজ কাল যুবক বৃন্দের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায়ই তর্ক চলিতেছে। সে তর্কের মাথা নাই, মুণ্ডু নাই। সে কেবল তর্কের জন্য তর্ক। কোন বিষয় শিক্ষা করিবার বা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত তর্ক করিলে সে তর্কের কোন ফলই নাই। যে দুই

জনের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হয়, তাঁহাদের একের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধা না থাকিলে, সে তর্কের মীমাংসা হয় না। কেবল কথা কাটাকাটি হয় মাত্র। অন্যের প্রভুত্ব স্বীকার না করার ফলেই এইরূপ অকারণ তর্ক সৃষ্টি হইতেছে। যে বিষয়েই হউক, একটা প্রভুত্ব স্থাপন না করিতে পারিলে কোন কার্য্যই সফল হয় না। সাধারণের সম্বন্ধেই যখন এই নিয়ম তখন পিতার সম্বন্ধে যে পিতা পুত্রের মন, বুদ্ধি, বিদ্যা, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রভৃতির স্রষ্টা, সেই প্রভুত্ব কতদূর প্রয়োজন তাহা একবার ভাবিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। পিতার কর্ত্তব্য শৈশবে প্রতি কার্য্যে শিশুর উপর তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপন করা। প্রভুত্ব স্থাপন করিতে হইলে যে নিষ্ঠুর আচরণ করিতে হইবে তাহা নহে। পশুর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে হইলেও অযথা সেরূপ আচরণ করিতে হয় না। সারকাসে বাঘের সঙ্গে মানুষকে খেলা করিতে দেখিয়া, উৎসুক হইয়া সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে সে বাঘের উপর এতদূর আধিপত্য কিরূপে স্থাপন করিয়াছিল। সে ব্যক্তি উত্তর দিয়াছিল যে ব্যাঘ্রের প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য করিয়া তাহাকে ততদূর বশীভূত করিতে পারিয়াছিল, তাহার সে কথা বড়ই সত্য। আমরাও বিবেচনা করি যে সন্তানের প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলেই সন্তান সম্পূর্ণরূপে বশীভূত থাকিবে। কোমলমতি সন্তানের প্রবৃত্তিও কোমল, সে প্রবৃত্তিকে ইচ্ছানুরূপ ভাবে গঠিত করা পিতার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার নহে। ইহার অতি সহজ উপায় সন্তানকে অধিকক্ষণ পিতার সঙ্গ ত্যাগ করিতে না দেওয়া। পুত্রকে সদা সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া বাল্যাবস্থা হইতেই তাহার মন, বুদ্ধি ও চিত্তের প্রত্যেক গতির উপর ধীরে ধীরে আধিপত্য স্থাপন করিতে হইবে। কেবল উপদেশ দ্বারায় আধিপত্য ঘটে না, নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারায় আধিপত্য স্থাপন করিতে হইবে। কোমল প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্যে এইরূপ আধিপত্য স্থাপন করিলে, কালে পিতার প্রভুত্ব পুত্রের উপরে এতই বদ্ধমূল হইয়া যাইবে যে তাহা আর সহজে বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ও তাহার বিদ্যা শিক্ষার ভার বহন করিয়া পিতা ভাবেন যে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য করা হইতেছে। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। পিতা পুত্রের কি ইহাই সম্বন্ধ? ইহ সংসারে

আপনার প্রতিনিধি যে পুত্র, তাহার সম্বন্ধে কি পিতার এইটুকু কর্ত্তব্য? যে পুত্র পিতার আশার আশা, অভিলাষের অভিলাষ, সুখের সুখ; যে পুত্রের অস্থি, মেদ, মজ্জা ও শোণিতের সঙ্গে পিতার পিতৃত্ব বিজড়িত, সে পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্যের কি সীমা আছে? কে বলে মানব সসীম? কে বলে সংসার সীমাবদ্ধ? মানব হৃদয়ের যিনি সীমা নির্দ্দেশ করিতে চাহেন, স্নেহ মমতাকে যিনি সীমায় আবদ্ধ করিতে চাহেন, তিনি বালুকার বন্ধনে সমুদ্রকেও বন্ধন করিতে পারেন। ক্রমশঃ

১২৯৯ সন শেষ।

"রাই কুড়িয়ে বেল্।" বেল্‌রূপী অনন্ত কালের একটি সোর্‌সে গড়িয়ে পড়ে সেই বেলের মধ্যে প্রবেশ করিল। সালট্‌া শাল বিশেষ। এই গত এক বৎসর কালমধ্যে কেবল "নাকাল" হওয়া গেছে।

মুখে নাকে চোকে।
ছোট কর্ত্তার ঝোঁকে॥

"জারি-জুরি" বন্ধ হইয়াছিল। বাঙ্গালীর স্কুল ইনেস্পেক্টরী বল্‌ছেন "শ্রীহরি" আর চৌকিদারী, পঞ্চাতি, তাও "ইতি।" স্বায়ত্তশাসন, শ্মশানে পাত্‌চ্ছেন আসন এবং এডুকেশান, প্রায় অবসান। তবে "লম্ফন" "উল্লম্ফন" এ সকলের বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়াছে।

আম, আলু, রবিশস্য গেছে। কিন্তু রবির অবশ্য পোষ্য পুত্রটি আছে। এই আশা ভরসা, কেননা লোকে বলে মোলেই বাঁচি।

৯৯ নিরানব্বইএর ধাক্কা গেল। এখন নব বর্ষ ১৩০০ সাল। কাল, মহাকাল, অনন্তকাল মধ্যে "বর্ষ"। সেই কাল যখন "পুরাণ" তখন কালাংশ, বর্ষ, কেমন করে "নব"? বর্ষ গতে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি, না হ্রাস পায়? মানুষ ঠিক্ থাকে, কেবল তার সজ্জা-আবরণ, নূতন পুরাতন হয়।

কালের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আর আমাদের শৈশব, বার্দ্ধক্য এবং যৌবন। যিনি তিনটীর ঘাড় ভাঙ্‌তে পারেন, ত্রি ঘুচিয়ে এক কর্‌তে পারেন, তিনিই বাহাদুর তাহার "আহা!" করা দূর হয়। তাকে কাল আর নাকাল কোর্‌তে পারে না। সে সকাল সকাল একটা "জাঁকাল" গোচ হয়ে পড়ে।

১২৯৯ সালের অধিকাংশ শীত গেছে এবং তার সঙ্গে "বাদল"। ইণ্ডিয়া ক্রমে ব্রিটানিয়া হলো। যদি "শীত" "বাদল" জন্য "অদল বদল" হয়, তা হলে কি আমরা দীন, ক্ষীণ, হীন, "বেলাত" প্রাপ্ত হব? স্মরণ করা উচিত যে আমাদের ভাগ্যে "বে" ঘুচে কেবল "লাত"।

একটা বৎসর তো গেল। এর্ মধ্যে তুমি ভাই কি কর্‌লে? কালের গায় কালীর না ফুল খড়ির আঁচড় দিলে? ভাই উকিল? তুমি কোন্ বিধবা রমণীর সত্য সত্ব রক্ষা করিয়াছ? ভাই ডাক্তার? তুমি কোন্ অর্থ হীন ভদ্রের উৎকট পীড়ার শান্তি করিয়াছ? ভাই পাদরী, ব্রাহ্ম প্রচারক? তুমি কোন্ যুবককে, পতিতা মহিলাকে ধর্ম্মপথে লইয়াছো? আর তোমাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করি ভাই? নিজের নিজের অন্তর দিকে চেয়ে দেখো তো? তথায় বোল্‌তার চাক্ না পদ্ম-মধুর চাক্ হয়েছে?

আর এই বৎসরের শেষে রেওয়া মিলাও তো? কত অপ এবং সৎকর্ম্ম করিলে তার একটা ঠিক্ ধরো তো? পূর্জিঁটা ঠিক্ আছে কি না তাহাও মিলেএ দেখো।

আর মনে রেখো শ্রী ভগবান বিষ্ণু চক্রধারী। তাঁর চক্র নিয়ত ঘুরছে। কাস্তেতে যেমন ধানের শিষ কাটে, তেম্‌নি তুমি সেই চক্রে কোন্ দিন কাটা পোড়্‌বে।

সমালোচন।

সমালোচনের জন্য আমরা অনেকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ণিমার আকার ছোট। সবিস্তারে সমালোচন করা আমাদের পক্ষে একরূপ অসাধ্য। ভরসা করি সহৃদয় পাঠক ও ঔৎসুক গ্রন্থকারগণ আমাদিগকে নিজ গুণে মার্জ্জনা করিবেন।

১। **আরক্ত বর্ণপরিচয়**—শ্রীকামিনীনাথ তলাপাত্র এম, এ, বিদ্যাবাগীশ প্রণীত। ইরম্মদ যন্ত্রে শ্রীমণিরাম মেটের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য আধ পয়সা। পুস্তকখানি লাল-কালীতে মুদ্রিত। তদনুসারেই বোধ হয় নাম করণ হইয়া থাকিবে। গ্রন্থকার সংস্কৃত উপাধিধারী। বোধ হয় "আরক্ত" শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও আছে। ভরসা করি

লাইব্রেরির শাস্ত্রী মহাশয় “আরক্ত” শব্দের কোন প্রকার মিলিটারী ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থকারের সরকারী সাহায্য বন্ধ করিবেন না।

২। **ভূতর বাপের শ্রাদ্ধ**—প্রেতযোনী নহে। গ্রন্থকার চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাল্যকাল হইতে বাবু ভূতনাথ হালদারকে জানেন ও সবিশেষ স্নেহ করেন বলিয়াই বিশেষ উদ্যম সহকারে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কি করিয়া খোলার জন্য কদলি বৃক্ষ নির্ব্বাচন করিতে হয়, কি করিয়া ডাইরেক্টর অব্ এগ্রিকলচার সাহেবকে আবেদন করিয়া যথার্থ কুশ আনয়ন করিতে হয় ; মেয়ে হাঁসপাতাল প্রভৃতির জন্য দানের ব্যবস্থা, শ্রাদ্ধ বাড়ীর নৈশ কার্য্য কলাপের ইঙ্গিত প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা এই পুস্তক পাঠে জানা যায়। নিজের উইলের অঙ্গীভূত করিবার জন্য সকল হিন্দুরই এক এক খণ্ড এই পুস্তক ক্রয় করা উচিত। বিদ্যার্থী নাবালগগণের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে আমরা শিক্ষা—বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়কে এই পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্যের মধ্যে পরিগণিত করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকারের মামীও আফিসের একজন কেরাণীর স্ত্রীর ‘সই’।

৩। **ধারাপাত**—গ্রন্থকার আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। গ্রন্থকার পেন্সনভোগী, মিরাট অঞ্চলে সরকারী ঘোড়ার নেটীব ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার উপার্জ্জনক্ষম এক মাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র কলিকাতার একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ‘একটর’ ছিলেন। অধুনা তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এই ধারাপাত রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধু।

৪। **কয়লার খনি**—(পদ্য)। গ্রন্থকার বহুকাল যাবৎ সীতারামপুরে একজন ডিলিভারী ক্লার্ক ছিলেন। স্থানে স্থানে সেক্ষপীর, দান্তে, হাফেজ, বেদব্যাস প্রভৃতির ছায়া থাকিলেও কাব্যাংশে এই গ্রন্থ কাহারই ন্যূন নহে। খনিতে, বাউরী মহিলা পা পিছলাইয়া পড়িলে, অপোগণ্ড শিশুর আর্ত্তনাদ ও তদ্দণ্ডে সাহেবের কষাঘাত অতীব মনোহর হইয়াছে। স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। এই কাব্যেরই প্রুফ্ সংশোধন করিতে করিতে মহাকবি রসরাজের নিয়তি-প্রাপ্তি হইয়াছে।

৫। **ঘুঘুডাঙ্গায় একবেলা**—গ্রন্থকার নাম গোপন করিয়া ভাল করেন নাই। এরূপ গ্রন্থ লিখিবার জন্য সকলকেই যে বিদেশে যাইতে হইবে তাহার কিছু মানে নাই।

গ্রন্থকারের দেশভক্তি বেশ আছে—

বাহিরখণ্ড হইতে ঘুঘুডাঙ্গার টিকিট কিনিলাম। টিকিটের কাগজ গুণকাগজের ন্যায়। এই গুণকাগজেই আমরা বাল্যকালে পুস্তকের মলাট দিতাম। সকলেই যদি পুস্তকের মলাট গুণকাগজে দেন তাহা হইলে আর বাঁধাইবার খরচা লাগে না। আর মার্বেল-কাগজ কিনিয়াও বিলাতী বণিকদের সিন্দুক পূর্ণ করিতে হয় না। বাণ্ডিলের সূতাও কিনিতে হয় না। আমরা যে সূতার কথা বলিলাম তাহা সূতানটী গ্রামের “সূতা” নহে।

* * * * *

গবেষণাও বেশ আছে—

ঘুঘুডাঙ্গাই যে দমদমা বা দমদম তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন যে নল থাকড়া হইতেই দমদম নামের উৎপত্তি। অপর পক্ষে প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ ঘুঘু নামক একটি পক্ষীর উল্লেখ করেন। উক্ত পক্ষী সচরাচর “ঘু” “ঘু” শব্দ করিয়া থাকে। (Vide, Max Muller, Science of Language)। * আমরা ঘুঘুডাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে (ওয়াটারবেরী ওয়াচ) একটি মাত্র অট্টালিকায় ৩টি ঘু ঘু দেখিয়াছিলাম। ঐ স্থানে একটি গোরা বারিক আছে। সেখানে প্যারেডের সময় ডম ডম করিয়া রণডঙ্কা বাজিয়া থাকে। সুতরাং সাহেবেরা ডম ডম ও বাঙ্গালিরা দম দম বলিয়া থাকেন। ফলত ঘুঘুডাঙ্গা ও বারিক-দমদমের মধ্যে কোনরূপ নৈসর্গিক সীমানা নাই। উভয় স্থানকেই ঘু ঘু ডাঙ্গা বলাই প্রশস্ত।

* * * * *

ঘুঘুডাঙ্গার উপর দেবগণের ও রাজগণের বিশেষ অনুগ্রহ আছে। রেলওয়ে লাইনে নিত্য দৈব দুর্ঘটনা হয় না। আর কে না জানে, স্পেন্সরের বেলুন এই ঘুঘুডাঙ্গা হইয়াই বারাশত পার হইয়া সুন্দর বনের আবাদ-অঞ্চলে যাইত। ধ্বংশাবশেষ ভূ-খণ্ডেই ঘু ঘু চরিয়া থাকে—এ প্রবাদ কবির কল্পনা মাত্র।

---

*গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। মিণ্টো সাহেব বলিয়াছেন উহা ঘু ঘু শব্দ নহে পরন্তু “পুর-পুর” শব্দ।

৬। **ভৌগলিক বিবরণ**—সতীশ বাবু এরূপ গ্রন্থ না লিখিলেই পারিতেন। ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আমাদের কোন দেশে যাইবার আবশ্যকতা নাই। বিশেষত দাদাভাই নরোজী ভারতে সিভিল হইবার পরীক্ষা চালাইবেন। আর যখন বিষয়-কর্ম্মের কথাই মনে থাকে না—যখন লসীয়েট সাহেবের স্মরণ-শক্তি-ব্যবসার এতই পসার—তখন কতকগুলা ছাই ভস্ম সুকুমারমতি বালকদিগের মুখস্থ করাইয়া ফল কি? আমাদের মাথার দিব্য কেহ যেন অমনি পাইলেও এই পুস্তক পাঠ না করেন। গ্রন্থকার একজন বেরোয়া বদমাইস্ কছমের লোক।

৭। **দুর্গা-প্রদীপ**—বার্ষিক সংবাদ-পত্র। আকার পুরাণ সুলভ সমাচারের ন্যায়। বর্ষে বর্ষে সন্ধিপূজার সময় প্রকাশিত হইবে। ইহাতে বৎসরের প্রতিদিনের কোম্পানির কাগজের দর ও মালামালের দর থাকিবে। যাঁহারা বর্ষাকালে গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইবেন তাঁহারা একখানি করিয়া বোল্তার টোপ-চাক ও ২টী করিয়া ধনেখালির বাটালী বঁড়্শী উপহার প্রাপ্ত হইবেন।

৮। **বাইজী-সঙ্গীত-হিল্লোল**—গ্রন্থকার প্রথমে স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। পরে ব্রাহ্ম হয়েন ও দিন কতক দে বাবুদের বেনাভারুই অঞ্চলে নাএব ছিলেন। দাঙ্গার মোকদ্দামায় মেয়াদ হওয়ায় জেল হইতে পলায়ন করিয়া পবন-পেয়ারী বাইজীর সঙ্গে ভেড়ুয়া হইয়া চীন, ব্রহ্ম, জাপান, তাতার, বিষ্ণুপুর, লক্ষৌ, নাটোর, ঘোষপাড়া প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া বাইজীর সহিত ঝগড়া হওয়ায়, অধুনা নাম বদলাইয়া বাইজীর গানের খাতা চুরি করিয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন। মধ্য-আফ্রিকার সম্রাট্ কাম্‌ফিচ কচূ ইঁহাকে "ঠান্‌দিদি" উপাধি দিয়াছেন। পরমহংস ব্রহ্মাবধূত বাবাজী এক খণ্ড উপহার পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। দাশুরায়ের বিরহ হইতে একটু আধটু চুঁরিও আছে। গ্রন্থকার রাগ করিবেন না।

পুঃ—যাঁহারা পূর্ণিমায় সমালোচন দেখিতে চাহেন, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় গ্রন্থ যে কোন ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়া দিবেন। সমালোচন অন্তে কাহাকেও পুস্তক ফেরত দিব না।

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

১ম ভাগ—২য় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ—১৩০০।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ঃ—

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার; শ্রীনবীনচন্দ্র সেন; শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল্; শ্রীপার্ব্বতীচরণ ঘোষ, বি, এল্; শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ; শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

বিষয়। পৃষ্ঠা।
১। আবাহন (পদ্য) ৩৩
২। মুকুন্দ দাস ৩৫
৩। মহামায়া ৪১
৪। "বউ কথা কও" এবং পাপিয়া ৫০
৫। জ্যোতিষ প্রবন্ধ ৫৩
৬। ভারতবর্ষ—কর্ম্মভূমি ৫৮
৭। অমিয় নিমাইচরিত ৬১

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জ্যৈষ্ঠ—১৩০০।

এই সংখ্যার মূল্য ⁄১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হইবে। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার সম্পাদকতার ভার লইয়াছেন, কোন ব্যক্তি বিশেষ ইহার সম্পাদক নহেন।

সম্পাদক-সমিতির নাম আপাততঃ প্রকাশিত হইল না। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাস্থল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনের জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রীযন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩০০ সাল। { ২য় সংখ্যা।

আবাহন।

"পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

১

ভুবন ভরিল পাপে, অবনী আকুল তাপে,
শস্যশূন্যা হইলা ধরণী।
অন্ন নাহি মিলে আর, চারিদিকে হাহাকার,
রোগে শোকে জরা জীর্ণ প্রাণী॥
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান আর, যে ছিল সহায় তার,
পরিপূর্ণ তাহা অহঙ্কারে।
চিত্ত মন দুই আঁখি, মোহেতে রেখেছে ঢাকি,
পথ-হারা ঘোর অন্ধকারে॥
বলেছিলে তুমি সখা, বিপদেতে দিবে দেখা
বিপদের বাকি কিবা আর।
এসহে প্রাণের হরি, শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ধরি,
পরিত্রাণ কর অভাগার॥

২

তোমারে ডাকিতে হবে, শুনিতে পাইবে তবে,
না ডাকিলে রহিবে নিদয়।
“দয়াময়” বলে তবে, কেহ কি ডাকিবে ভবে,
মিছা হবে নাম “দয়াময়”॥
না কহিলে মনোদুখ, যদি না জুড়াবে বুক,
“সখা” বলে কে ডাকিবে আর।
না চাহিতে প্রাণ খুলে, যদি নাহি দিবে ঢেলে,
কেমন সে প্রণয় তোমার॥
সম্পদে রাখিবে একা, বিপদেতে দিবে দেখা,
এ কেমন তোমার বাসনা।
ভাল যদি বেসে থাক, সুখে দুখে কাছে থাক,
কেন কর দুখের কামনা॥

৩

কাঁদিব কাঁদিব করি, কাঁদিতে যে নাহি পারি,
ফুটে উঠে রোষ অভিমানে।
কাঁদিতে কাঁদিতে দেখা, তা হতে যে ভাল একা,
বাজিবে সে দুজনারই প্রাণে॥
দেখিতে নারিব আমি, দেখাতে নারিবে তুমি,
দুজনায় রহিব বিমুখ।
তাই বলি ওহে সখা, নয়নে দিওনা দেখা,
গোপনে জুড়াও আসি বুক॥
হৃদয়ে হৃদয়ে যত, বিরহে কি সুখ তত,
বিরহেরে ভাল বাস কেন।
এবার পাইলে দেখা, শিখাইব প্রাণ সখা,
মিলন সে মধুর কেমন॥

মুকুন্দ দাস।

১। দিল্লীতে মোগল সম্রাটগণের প্রাধান্য সময়ে, সম্রাট সাহজাহানের রাজত্ব কালে, তাঁহার সুশাসনের প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে বহুকাল ব্যাপিয়া প্রায় অবিচ্ছেদে শান্তির সুখময়ী ছায়া বিরাজ করিত। তৎকালে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষই দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিত; কেবল দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ ও রাজপুতানার কোন কোন দেশ বাহুবল প্রভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সময়ে রাঠোর বংশীয় রাজপুত কুলতিলক মহারাজ যশোবন্ত সিংহ মারবার দেশে রাজত্ব করিতেন। এই বীরপুরুষ দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং দিল্লীশ্বরের একজন প্রধান সহায় ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি স্বয়ং একজন অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার অনুচরবর্গের বল ও বীর্য্য প্রভাবে দিল্লীতে আপন প্রাধান্য বজায় রাখিয়া রাজপুত কুলোচিত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। রাজা যশোবন্ত সিংহের অনুচরবর্গের মধ্যে মুকুন্দ দাস অগ্রগণ্য ছিলেন। মুকুন্দ দাস কুম্পাওয়াত দলের অধিনেতা ও মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মন্ত্রী ছিলেন এবং রাজকার্য্য উপলক্ষে সর্ব্বদাই তাঁহাকে সম্রাটের সংস্পর্শে আসিতে হইত।

২। একদা কোন কর্ম্মচারির দ্বারা সম্রাট মুকুন্দ দাসকে কোন আদেশ করিলে, উন্নতমনা ও স্পষ্টবাদী মুকুন্দদাস তদুত্তরে যাহা বলেন, তাহাতে সম্রাট ক্ষুব্ধ হয়েন ও তৎকর্ত্তৃক অবমানিত মনে করিয়া মুকুন্দ দাসের এই দণ্ড বিধান করিলেন যে মুকুন্দ দাস নিরস্ত্র হইয়া একটি ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিবেন। ইহা শুনিয়া মুকুন্দ দাস কিছু মাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। রঙ্গভূমি প্রস্তুত হইলে একটি বৃহৎকায় ব্যাঘ্র আনীত হইল। চঞ্চল স্বভাব ব্যাঘ্র বঙ্গভূমি মধ্যে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে ও মধ্যে মধ্যে বাহিরের মনুষ্যগণকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতেছে। ক্রীড়া ছলে তাঁহাকে নিপাতিত করা সম্রাটের এক মাত্র উদ্দেশ্য বুঝিয়াও, নির্ভীক মনে ও মল্লবেশে রঙ্গভূমি মধ্যে মুকুন্দ দাস বীরবিক্রমে প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ব্যাঘ্র তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ও ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রোষ-কষায়িত লোচনে তীব্র

দৃষ্টিতে মুকুন্দ দাসও তাহার দিকে চাহিয়া বীরদর্পে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে ব্যাঘ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “রে মিয়া সাহেবের ব্যাঘ্র, যশোবন্ত সিংহের ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হও।” এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া ভীত হইয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, ব্যাঘ্র সেই অসাধারণ তেজস্বী বীর পুরুষের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। অবনত মস্তকে ও কুণ্ঠিত ভাবে পশ্চাৎ ফিরিয়া রঙ্গভূমির অপর প্রান্তে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মুকুন্দ দাস বলিলেন “শত্রু সম্মুখীন হইতে সাহস না করিলে তাহাকে আক্রমণ করা রাজপুতের ধর্ম্ম নহে।”

৩। এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া সম্রাট যার পর নাই চমৎকৃত হইলেন এবং প্রসন্ন হইয়া মুকুন্দ দাসের কৃত অপরাধ ক্ষমা করিলেন ও তাঁহাকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করতঃ “নহুর খাঁ” উপাধি প্রদান করিলেন। তদবধি রাজপুত ইতিহাসে মুকুন্দ দাস “নহুর খাঁ” নামে অভিহিত হইতেন। মুকুন্দ দাসের তেজস্বিতা ও বীর্য্যমত্তা বংশ পরম্পরায় অধিকার করিবার উত্তরাধিকারী বংশধর আছে কি না সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলে মুকুন্দ দাস অকুতোভয়ে বলিলেন “আপনার আদেশে সহধর্ম্মিণী বিরহিত হইয়া আটক হইতেও দূর দেশে এখন আমরা যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত আছি, অতএব মাদৃশ লোকের পুত্র কিরূপে হইবে?” এই উত্তর হইতেই বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে রাজপুত বংশোদ্ভব রাঠোর কুলতিলকগণ ভয় কাহাকে বলে তাহা আদৌ জানিতেন না।

৪। সম্রাটের রাজ সভায় মুকুন্দ দাস কখনই কুণ্ঠিত ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন না। সেই হেতু এক সময় যুবরাজ সাহাজাদা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আজ্ঞা করেন যে, যে বৃক্ষের শাখা ভূমি হইতে অনতি উচ্চে অবস্থিত, তাহার তলা দিয়া মুকুন্দ দাস অশ্বারোহণে সবেগে অশ্ব চালনা করিবেন এবং বৃক্ষ শাখার নিকটবর্ত্তী হইলেই দুই হস্তে তদবলম্বন পুর্ব্বক অশ্ব ছাড়িয়া দিবেন। বৃক্ষ তল দিয়া সবেগে অশ্ব চালনা করিয়া বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বৃক্ষ শাখা ধরিয়া অশ্ব ছাড়িয়া দেওয়া বীর পুরুষ রাজপুতগণের একটি সাধারণ ক্রীড়া, ইহাতে প্রায়ই রাজপুত যুবকগণ আহত হইতেন, তত্রাচ বীরভাবে মত্ত হইয়া রাজপুত বংশীয় বীরপুরুষগণ ইহাতেই বিপুল আনন্দ লাভ করিতেন ও আপন আপন বল বিক্রমের

পরিচয় দিতেন। মিবারের ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে বুনেরা দেশাধিপতি এই ক্রীড়াতেই মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তৎকালে যদিও রাজপুত বীরগণ সাধারণতঃ ঐরূপ ক্রীড়া করিতেন তথাচ সাহাজাদা জানিতেন যে কোন উচ্চ পদস্থ ও উচ্চ বংশীয় রাজপুতকে ঐ ক্রীড়া করিতে বাধ্য করিতে পারিলে তদ্দ্বারা তাঁহার অবমাননা করা হইবে; এবং মুকুন্দ দাসকে ঐ ক্রীড়া করিতে বাধ্য করিয়া তাঁহার অপমান করাই সাহাজাদার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু সাহাজাদা বিফল মনোরথ হইলেন। সাহাজাদার আদেশ শুনিয়া মুকুন্দ দাস নির্ভয়ে বলিলেন “আমি বানর নহি। যদি আমার বল বীর্য্য দেখিবার অভিপ্রায় থাকে তবে যাহাতে আমার তরবারি চলে এরূপ ক্রীড়া কৌতুক করিতে আমায় আজ্ঞা করিবেন।” তদনন্তর সিরোহী দেশাধিপতি দেওড়া রাজ সুরতান সিংহের বিরুদ্ধে সমগ্র রাঠোর সৈন্য লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতে সাহাজাদা মুকুন্দ দাসকে আদেশ দিলেন।

৫। সুরতান সিংহ এই সংবাদ পাইয়া স্বদেশের পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সুরতান সিংহ জানিতেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে মুকুন্দ দাসের প্রতিদন্দ্বী হওয়া তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত কার্য্য। আবু পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে অচলগড় নামক দুর্গে সসৈন্যে বাস করিতে লাগিলেন। দেওড়া বংশীয় রাজপুতগণের অধিকৃত যত দুর্গ ছিল তন্মধ্যে অচলগড় দুর্গ পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে এরূপ অবস্থিত যে সামান্য সৈন্যের দ্বারাই তাহা সহজে সুরক্ষিত হইতে পারিত এবং শত্রু প্রবেশের কোন সম্ভাবনাই থাকিত না। সেই জন্য তৎকালে নিকটবর্ত্তী দেশের রাজাগণ অচলগড় দুর্গকে দুর্ভেদ্য বলিয়া জানিতেন। দেওড়া রাজ সুরতান সিংহ একজন প্রবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ বলিয়া ক্ষত্রিয় সমাজে পরিচিত ছিলেন, এবং আপন সৈন্যের সাহায্যে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি অচলগড়ে নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিয়া সদর্পে পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যে বল সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ যাত্রার আদেশ দিয়া সাহাজাদা ভাবিয়াছিলেন যে নিশ্চয়ই মুকুন্দ দাস এই যুদ্ধে অচলগড় আক্রমণ করিতে গিয়া পরাভূত ও নিহত হইবেন।

৬। এদিকে মুকুন্দ দাস যুদ্ধের বিশেষ আড়ম্বর করিয়া সুযোগ

অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ও চর প্রমুখাৎ সুরতান সিংহের কার্য্য কলাপের সংবাদ লইতে লাগিলেন। এক দিন রাত্রিযোগে অল্প মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে গোপনে অচলগড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিঃশব্দে প্রহরীকে হত্যা করতঃ সুরতান সিংহের শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সুরতান সিংহ পালঙ্কে শয়ন করত গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার পাগড়ী রহিয়াছে দেখিয়া তদ্দ্বারা মুকুন্দদাস সুরতান সিংহকে তাঁহারই পালঙ্কের সহিত দৃঢ়রূপে বদ্ধ করত আপন অনুচরবর্গ দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া মুকুন্দ দাস দুর্গ আক্রমণ সূচক নিনাদ করিতে অনুচরবর্গকে আদেশ দিলেন। সেই শব্দে দেওড়া বংশীয়গণের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তাহারা যুদ্ধ সজ্জায় রাজার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া মুকুন্দদাস বলিলেন “দেখ, তোমাদের রাজার জীবন আমার হাতে, যদি তোমরা আমার বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে এই মুহূর্ত্তেই তোমাদের সম্মুখে তোমাদের রাজাকে নিপাতিত করিব। যদি তাঁহার মঙ্গল চাও, নিরস্ত হও ; তোমাদের সমক্ষে রাজা সুরতান সিংহকে লইয়া যাইব বলিয়াই আমার আগমন সংবাদ তোমাদিগকে জ্ঞাত করাইয়াছি। আমি রাজা সুরতান সিংহকে আমার রাজার নিকট লইয়া যাইব।” এই কথা শুনিয়া দেওড়া বংশীয়গণ কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া চিত্রিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল ; যুদ্ধ করিতে কাহারও সাহস হইল না। তাহারা যুদ্ধ করিলে হয়ত মুকুন্দ দাস পরাভূত ও নিহত হইতেন ; কিন্তু পাছে রাজার অমঙ্গল ঘটে, ইহা ভাবিয়া দেওড়া বংশীয়গণ যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইল।

৭। মুকুন্দ দাস রাজা সুরতান সিংহকে রাজা যশোবন্ত সিংহের নিকট লইয়া গেলেন। রাজা সুরতান সিংহ বন্দী হইলেও যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক রাজা যশোবন্ত সিংহ তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পরে সম্রাটের নিকট তাঁহাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া যথাবিহিত সম্মান পূর্ব্বক সম্রাটকে অভিবাদন করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু রাজা সুরতান সিংহ উত্তর করিলেন “আমার জীবন সম্রাটের হস্তে, কিন্তু আমার সম্মান আমার হস্তে ; এই মস্তক কখনও মনুষ্যের নিকট অবনত হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও কখন হইবে না।” রাজা যশোবন্ত সিংহ দেখিলেন বিষম বিভ্রাট উপস্থিত।

এদিকে যথাবিধি সম্মান পূর্ব্বক রাজা সুরতান সিংহ সম্রাটের সভায় পরিগৃহীত হইবেন বলিয়া রাজা যশোবন্ত সিংহ তাঁহাকে বাগ্দান করিয়াছেন। ওদিকে রাজা সুরতান সিংহ সম্রাটের প্রতি যথারীতি সম্মান দেখাইতে কিছুতেই সম্মত নহেন। ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া রাজা যশোবন্ত সিংহ এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। যে গৃহে রাজসভার অধিবেশন হয় তথায় তাঁহাকে সাধারণ পথ দিয়া লইয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। ঐ সভাগৃহ প্রবেশের অপর একটি দ্বারে এধার ওধার করিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত উচ্চে একটি কাষ্ঠফলক দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন ও সেই দ্বার দিয়া রাজা সুরতান সিংহকে রাজ সভায় লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। রাজা যশোবন্ত সিংহ ভাবিয়া ছিলেন যে এই দ্বার দিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিতে হইলে দ্বারের সম্মুখীন হইবা মাত্র সুরতান সিংহ অবশ্য প্রথমতঃ মস্তক অবনত করিবেন। এবং রাজা সুরতান সিংহ সম্রাটের অভিবাদন করিলেন কি না সম্রাট তাহা বিশেষ বুঝিতে পারিবেন না। রাজা যশোবন্ত সিংহের এই কৌশলটি রাজা সুরতান সিংহ বুঝিতে পারিলেন এবং সেই দ্বার দিয়া রাজ সভায় প্রবেশের সময় প্রথমে তন্মধ্যে পাদ প্রবিষ্ট করত সর্ব্বশেষে মস্তক প্রবেশ করিয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

৮। ইতিপূর্ব্বে বিশেষ চেষ্টা করিলেও দিল্লীশ্বর অচলগড় জয় করিতে পারেন নাই। এই দুর্গ আক্রমণ করিতে দিল্লীশ্বর যত সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন রাজা সুরতান সিংহের বীর্য্য প্রভাবে সে সমস্তই তাঁহার নিকট পরাভূত হইয়াছিল। প্রভূত অর্থ ও অসংখ্য সৈন্যের সাহায্যেও যে কর্ম্ম দিল্লীশ্বর সাধন করিতে সক্ষম হয়েন নাই, তাহা রাজা যশোবন্ত সিংহের অনুচর মুকুন্দদাসের বাহুবলে অনায়াসে সুসাধিত হইল।

৯। উন্নতমনা রাজা সুরতান সিংহের বীর পুরুষোচিত সরল ও অকপট ব্যবহার দেখিয়া সম্রাট যার পর নাই চমৎকৃত হইলেন। তিনি সম্রাটের প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া সম্রাট তাঁহার প্রতি কিছু মাত্র রুষ্ট হয়েন নাই, বরং রাজা যশোবন্ত সিংহ কর্ত্তৃক তাঁহাকে আশ্বাস দেওয়ার কথা ভাবিয়া সম্রাট রাজা সুরতান সিংহকে সম্পূর্ণরূপ ক্ষমা করিলেন, ও তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য ও তদন্তর্গত প্রদেশ ছাড়িয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, রাজা সুরতান সিংহ বলিলেন

“আমি অচলগড়কে অমূল্য জ্ঞান করি, অতএব আমাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া তথায় ফিরিয়া যাইতে পারি এরূপ আদেশ দেন ইহাই আমার এক মাত্র ভিক্ষা।” উদার চেতা সম্রাট তাহাই করিলেন। তদনন্তর রাজা স্থরতান সিংহ আবু পর্ব্বত প্রদেশে স্বাধীন ভাবে রাজ্য করিতে লাগিলেন। মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে দেওড়া বংশীয় রাজপুতগণ কখন দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন নাই।

১০। মুকুন্দ দাসের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাঠোর বংশীয় রাজপুত বীরগণ সাহসিকতার ও বীর্য্যমত্তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন। জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া সম্রাটের আদেশ তাঁহারা পালন করিতেন। অধিক কি, দিল্লীর সম্রাটের আদেশ পালন করাই অনেকে জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য মনে করিতেন। এই বংশীয় বীরগণের বাহুবল প্রভাবে দিল্লীশ্বর সমগ্র ভারতবর্ষে আপন প্রভুত্ব স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং সময়ে সময়ে বিদেশীয় শত্রুগণকে ও দুর্দ্দান্ত আফগান জাতিকে পর্য্যন্ত জয় করিতেন। এই বংশীয় বীরগণের মধ্যে মুকুন্দ দাস ও রাজা যশোবন্ত সিংহ স্বয়ং অগ্রগণ্য ও উদাহরণ স্থল ছিলেন। সম্রাট সাহাজাহান প্রকৃত প্রস্তাবে গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। এই মহাপুরুষ রাজপুতকে প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস করিতেন ও সেই বিশ্বাসের সমগ্র ফল লাভ করিতে সক্ষম হইতেন। ইনি রাজ ধর্ম্মের মর্য্যাদা জানিতেন ও পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন। ইনি হিন্দু মুসলমান অভেদে রাজ্য করিতেন। ইহাঁর রাজত্ব কালে ভারতবর্ষ একটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল এবং ভারতবাসিগণ পরম স্থখে বাস করিত। বাস্তবিক ভারতবর্ষ আর কখন সেরূপ সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিবে ও ভারতবাসিগণ আর কখন সেরূপ সুখে কাল যাপন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এই মহাপুরুষ কেবল পুত্র বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া পরিণাম দর্শিতার সমগ্র পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েন নাই; এবং বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজ্যচ্যুত হইয়া ক্লেশ পাইয়াছিলেন। হা মাতঃ ভারতভূমি! ভারতবাসী এক্ষণে সেরূপ বিশ্বাসী হউক আর না হউক, রাজার নিকট এক্ষণে আর সেরূপ বিশ্বাসী নহে। ভারতবাসীর কপাল পুড়িয়াছে।

মহামায়া।

ঘটনা সূত্রে সহরে আসিয়া বাস করিতেছি। কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, দশ জনের নিকট একটু প্রতিপত্তিও হইয়াছে। অনেকেই আমাকে সাধু পুরুষ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই জন্য বেশ সুখ শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলাম। মনে ভাবিলাম লোকে আমাকে এত ভক্তি করে, কৈ আমি ত তাহাদের কিছুই করিতেছি না? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম পরোপকার জন্য এ জীবন উৎসর্গ করিব। প্রথমতঃ দীন দুঃখীর জন্য হোমিওপেথি ঔষধ আনিয়া প্রতিদিন নিয়মিতরূপে বিতরণ করিতে লাগিলাম। অবসর মত রোগীদিগকে দেখিয়া আসিতাম। আমার প্রতিবেশী একজন ডাক্তার ছিলেন, সময়ে সময়ে তাঁহার উপদেশ লইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতাম। ডাক্তার অনেক সময়ে সহাস্যে বলিতেন “ভাই তোমার জন্য আমাদের ক্ষতি হইতেছে” আমি সে কথা উপহাস বলিয়া মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। ক্রমে জানিতে পারিলাম যে তাহা উপহাস নহে।

এ জগতে দীন দুঃখীর উপকার অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকে, কাজেই আমি যে সামান্য উপকার করিতাম তাহাতেই আমার প্রতিপত্তির সীমা পরিসীমা রহিল না। ক্রমে অনেক দূরের লোক পর্য্যন্ত আসিয়া আমার নিকট হইতে ঔষধ লইয়া যাইত।

এক দিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছি, সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল, বোধ হইল কে যেন ডাকিতেছে। বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্মিত হইলাম। গৃহপ্রাঙ্গণে এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী। আমাকে দেখিয়া রমণী ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাতরস্বরে কহিল “বাবা! আমি আপনকার কাছে আসিয়াছি, আমার স্বামীর বড় ভেদ বমি হইতেছে, আমরা গরিব লোক, ডাক্তারকে টাকা দিবার সাধ্য নাই, আপনি রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই।” আমি সাহস দিয়া কহিলাম ভয় কি? আমি ভাল ঔষধ দিতেছি, তাহা সেবন করাইলে তোমার স্বামীর অসুখ সারিয়া যাইবে।” এই সময়ে আমার পত্নী আসিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, আমি ঔষধ আনিতে গেলাম। অনতিবিলম্বে

কয়েক শিশি ঔষধ আনিয়া সেই রমণীকে দিয়া ব্যবস্থা বলিয়া দিলাম। আমার স্ত্রী কহিলেন্ "এত কথা কি আর ওর মনে থাকিবে? মেয়ে মানুষ কি আর বুঝে সুজে ঔষধ খাওয়াইতে পারিবে? তাতে আবার স্বামীর অসুখ! এ ঔষধ দেওয়া না দেওয়া সমান।" আমি স্ত্রীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মনে মনে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া সেই রমণীকে কহিলাম "তুমি চল, আমি যাইতেছি।" তখন ঔষধের বাক্স লইয়া সেই রমণীর সহিত বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল। আকাশে চাঁদ হাসিতেছে, কিন্তু সমুদায় সুধা যেন আসিয়া আমার হৃদয়রাজ্য প্লাবিত করিতেছে। পরোপকার কি এত মধুর! রমণীর পতিভক্তি ভাবিতে ভাবিতে মুগ্ধ হইতেছিলাম। শেষে আপন স্ত্রীকে স্মরণ হইলে ভাবিলাম—আমি ধন্য, তাই এমন স্ত্রী পাইয়াছি, পরের পতিকে বাঁচাইবার জন্য কে আপন পতিকে বিপদে পাঠাইতে পারে? স্ত্রী যে আমাকে নিষেধ না কয়িয়া বরঞ্চ আগ্রহের সহিত এই কার্য্যে প্রেরণ করিলেন, ইহাতে আমি যার পর নাই উৎফুল্ল হইলাম। পথে যাইতে যাইতে মনে কত ভাবের উদয় হইতে লাগিল।

প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা একটী ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখীন হইলাম। দ্বার অবরুদ্ধ, গৃহে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। রমণী ডাকিবামাত্র ভিতর হইতে একজন বৃদ্ধা দরজা খুলিয়া দিল। আমরা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বৃদ্ধা কহিল "ভয় নাই—এখন একটু ঘুমাইতেছে।" আমি ধীরে ধীরে রোগীর পার্শ্বে যাইয়া তাপমান যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া ও নাড়ী দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম রোগী সংজ্ঞাহীন, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সে কথা প্রকাশ না করিয়া নানা প্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে রোগীর চৈতন্যোদয় হইল। রোগী বিস্মিত হইয়া আমার মুঁখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি কহিলাম "ভয় কি? আমি ডাক্তার, বিনা পয়সায় তোমার চিকিৎসা করিব, যে ঔষধ দিতেছি, ইহাতে তোমার সব অসুখ সারিয়া যাইবে।" মুখে যে বিস্ময়ের চিহ্ন ছিল, তৎপরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতার কোমল আভা বিকসিত হইল—দেখিয়া আমার চিত্ত বিগলিত হইল; মনে মনে কহিলাম "ভগবান! কৃপা করিয়া এ দীন দুঃখীর জীবন দান কর।"

যে রমণী আমার নিকট ঔষধ আনিতে গিয়াছিল তাহার নাম মহামায়া বয়স ১৫।১৬ বৎসর মাত্র, পরমা-সুন্দরী, দেখিলে ভদ্র মহিলা বলিয়া বোধ হয়। সে যে কৃষকপত্নী সে কথা সহসা কেহ ভাবিতে পারে না। যে বৃদ্ধার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি সে মহামায়ার প্রতিবেশী। পূর্ব্বে একবার ঐ বৃদ্ধার সঙ্গে মহামায়া গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল, সেই সময়ে বৃদ্ধার ঔষধের প্রয়োজন হওয়ায় সে আসিয়া আমার নিকট ঔষধ লইয়াছিল, মহামায়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া আমার বাড়ী দেখিয়াছিল। আজ স্বামী উৎকট পীড়াগ্রস্ত, মহামায়া যার পর নাই শোকাকুলা। ঔষধ আনিবার জন্য সে বৃদ্ধাকে কত বলিল, কিন্তু বৃদ্ধা রাত্রিতে এতদূর যাইতে সাহস করে নাই, অগত্যা রোগীর কাছে বৃদ্ধাকে রাখিয়া মহামায়া আমার নিকট গিয়াছিল।

আমরা যাইবামাত্র বৃদ্ধা যেন পরিত্রাণ পাইল, সে এ কথা সে কথা বলিয়া নিজের বাড়ী চলিয়া গেল।

রোগীর একবার চৈতন্যোদয় হইয়াছিল, পুনরায় রোগ বৃদ্ধি হইল। কত যত্ন করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না। শেষ রাত্রিতে রোগী পত্নীকে শোকে ও দুঃখে ভাসাইয়া ইহ সংসার হইতে চলিয়া গেল।

উন্মাদিনী ভাবে পতির চরণে পড়িয়া মহামায়া হাহাকার ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সে দৃশ্য বর্ণনার অতীত। আকুল ভাবে আমি বাহিরে আসিয়া বসিলাম, কিছুতেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না, কিছুতেই মহামায়াকে সান্ত্বনা করিতে পারিলাম না।

কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া যাইয়া মহামায়ার স্বজাতীয় কয়েকজনকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার স্বামীর সৎকার করিয়া দিলাম। চিতানল যখন জ্বলিয়া উঠিল, তখন তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার জন্য মহামায়া ছুটিল, কয়েক জন তাহাকে ধরিয়া রাখিল, ধরিবা মাত্র সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। অনেক কষ্টে তাহার সংজ্ঞালাভ হইলে, তাহাকে তাহার বাড়ীতে আনা হইল। পূর্ব্ব রাত্রিতে যে বৃদ্ধা ছিল, তাহাকে একটী টাকা দিয়া মহামায়ার কাছে থাকিতে বলিলাম এবং মাসে মাসে কিছু দিব সে কথাও বলিলাম। মহামায়াকে কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। একজন প্রতিবেশী বৃদ্ধের হস্তে পাঁচটী টাকা দিয়া কহিলাম "বাপু তুমি এই মেয়েটীর দেখা

শুনা করিও, এবং উহার যাহা আবশ্যক হয় তাহা কিনিয়া দিও। আমার হাতে এখন আর টাকা নাই। যখন আবশ্যক হইবে আমাকে জানাইলে পাঠাইয়া দিব।” বৃদ্ধা আমাকে প্রণাম করিয়া তাহাতে সম্মত হইল। তখন মহামায়াকে উদ্দেশ করিয়া কহিলাম “মা, আজ হইতে আমি তোমার বাপ হইলাম, তুমি কেঁদনা, আমি তোমাকে কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিব।” এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে শোকাকুল মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

অপরাহ্ন একটার সময়ে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। দাস, দাসী, বন্ধু, বান্ধব চারি দিকে আমার অনুসন্ধান করিতে বাহির হইয়াছেন, পত্নী আমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছেন। আমাকে দেখিয়া সকলে সুস্থ হইলেন। আমি কিছু কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলাম “আমাকে পাঠাইলেই বা কেন? আবার কেঁদে আকুলই বা কেন হইলে? যাহার পলকে প্রলয় জ্ঞান হয় তাহার স্বামীকে বাক্সে পুরিয়া রাখিতে হয়।” স্ত্রী একটু ক্ষুব্ধ বচনে কহিলেন “এমন করে কাঁদাবে তাহা জানিলে সত্য সত্যই বাক্সে পুরিয়া রাখিতাম। কোথায় কা’ল রাত্রি আর আজ বেলা দ্বিপ্রহর—কোন উদ্দেশ নাই।” সহসা পত্নীর মুখে যেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল, ব্যস্ত ভাবে আমাকে কহিলেন “সে যাহা হউক, এখন যে জন্য গিয়াছিলে সে খবর কি? সে মেয়েটীর স্বামী রক্ষা পেয়েছে ত?” আমার কাছে সমুদায় শুনিতে শুনিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, আমিও আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বে যে ডাক্তার বাবুর কথা বলিয়াছি, তিনি পরম্পরায় শুনিলেন যে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে রাত্রিতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি বিশেষ কৌতুহলী হইয়া আমার বাড়ীর চাকরাণীকে ডাকিয়া গোপনে সবিশেষ জানিলেন যে সে স্ত্রীলোক অল্পবয়স্কা ও পরমা সুন্দরী। শেষে সিদ্ধান্ত হইল যে কোন বেশ্যা আসিয়া চতুরতা পূর্ব্বক আমাকে লইয়া গিয়াছে। আমি এ সব কথা তখন কিছুই জানিতে পারি নাই, তবে বৈকালে যখন বেড়াইতে গেলাম তখন দেখিলাম আমাকে দেখিয়া অনেকে ঈষৎ হাসিতেছে। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনের এই প্রথম অপবাদ।

ইহার কয়েক দিন পরে একদিন সেই অনাথা বিধবাকে দেখিবার জন্য মন বড়ই ব্যগ্র হইল। তাহাকে দেখিবার জন্য বৈকালে বাহির হইলাম। ক্রমে কুটীরের নিকটে আসিয়া রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। হতভাগিনী মহামায়া সন্তপ্ত হৃদয়ে ভূতলে পড়িয়া স্বামিশোকে কাঁদিতেছে। ধীরে ধীরে কাছে যাইয়া কহিলাম “এ কি মা! চিরদিন কি এমনি করে কাঁদ্‌তে হবে? যাহা হবার তাত হয়েছে, এখন কাঁদিলে কি ফল হইবে? শোক তাপ ভুলিয়া গিয়া এখন ঠাকুর দেবতার নাম কর, যাহাতে পরকালে সদ্‌গতি হয় তাহার চেষ্টা কর।” মহামায়া নীরব হইল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রণাম করিবে, হঠাৎ অশৌচের কথা মনে পড়ায় আর প্রণাম করিল না। তখন কাতর ভাবে কহিল “বাবা! আমার কেউ নাই, আমি কার কাছে দাঁড়াইব, কে আমায় রক্ষা করিবে? যে বুড় মেয়ে মানুষটীকে আমার কাছে থাকিতে বলিয়া গিয়াছিলেন সে ভাল লোক নহে—আমি কাল থেকে একা আছি, রাত্রিতে বড়ই ভয় হয়। বাবা! আমি যে অন্য কোন খানে যাইব আমার এমন কেহই নাই।” শুনিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলাম, প্রকাশ্যে কহিলাম “মা! তুমি কোন ভাবনা করিও না, আমি তোমার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিব, আমি তোমার বাপ থাকিতে তোমার ভয় কি মা?” মহামায়াকে এইরূপ বলিয়া আমি পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের বাড়ীতে যাইয়া জানিলাম যে বৃদ্ধ জামাই বাড়ী গিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া মহামায়ার কাছে জানিলাম যে বৃদ্ধকে যে পাঁচ টাকা দিয়াছিলাম তাহার এক পয়সাও সে মহামায়াকে দেয় নাই। যার পর নাই রাগ ও বিরক্তি হইল। তখন গ্রামের চৌকিদারকে ডাকিয়া মহামায়ার বাড়ীতে রাত্রিতে থাকিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া ও মহামায়াকে কিছু টাকা দিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

পথে আসিবার সময়ে আমার প্রতিবেশী ডাক্তার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে তথায় দেখিতে পাইয়া একটু বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সংক্ষেপে বলিলাম যে একজন অনাথা স্ত্রীলোককে দেখিতে গিয়াছিলাম।

ডাক্তার। এ আবার কোন স্ত্রীলোক? আমি কহিলাম “আপনি কিরূপে জানিবেন? আপনি ত আর তাহাকে দেখেন নাই?”

ডাক্তার। এ কি সেই স্ত্রীলোক?

আমি। আপনি কোন্ স্ত্রীলোকের কথা কহিতেছেন?

ডাক্তার। যে স্ত্রীলোক আপনাকে একদিন রাত্রিতে ডাকিয়া লইয়া যায়, এ কি সেই স্ত্রীলোক?

আমি। আজ্ঞা হাঁ।

ডাক্তার বাবু সহাস্যে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন "বেশ, আপনার ঔষধের বেশ গুণ আছে, আমাদের যদি সেরূপ থাকিত তবে আর ভাবনা কি ছিল।"

ডাক্তার বাবু যেরূপ ভঙ্গিতে কথা কহিলেন তাহা আমার আদৌ ভাল লাগিল না, দুঃখিত মনে বিরক্ত চিত্তে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার পর মহামায়ার স্বামীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে আমি কতক টাকা ব্যয় করিলাম, ফল কথা আমারই ব্যয়ে শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইল। কৃষক ও কৃষকপত্নীরা এরূপ নিমন্ত্রণ কখনও খায় নাই, আজ তাহাদের আনন্দ ধরিতেছে না। তাহারা কেহ কেহ বলিল স্বয়ং ভগবান আসিয়া মহামায়ার সহায় হইয়াছেন। ডাক্তার বাবুও এ ঘটনার কথা শুনিলেন কিন্তু তিনি তাহার অন্য অর্থ করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে সেই গ্রামের কয়েক জন কুচরিত্র যুবক মহামায়াকে কুপথে লইয়া যাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু আমার ও চৌকিদারের ভয়ে তাহারা বিশেষ কোন অত্যাচার করিতে পারিল না।

এক দিন রাত্রিতে আমি নীচে বৈঠকখানায় বসিয়া পড়া শুনা করিতেছি, ক্রমে রাত্রি অনেক হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হইল দ্বারে যেন কে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা খুলিয়া দেখিলাম মহামায়া! মহামায়া আমাকে দেখিয়া কাতরভাবে চরণতলে বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কোন কথা বলিতে পারিল না। আমি ব্যস্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু সে শীঘ্র কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল "বাবা! কয়েক জন লোক আসিয়া আমার ঘরে আগুণ লাগাইয়া পলাইয়া গিয়াছে, আমি ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি।" আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলাম "আমি তোমাকে ভাল ঘর তৈয়ার করিয়া দিব। এক্ষণে তুমি আমার স্ত্রীর নিকটে থাক।" এই বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে আসিলাম। আমার স্ত্রী তাহাকে আদর করিয়া কত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রাত্রিতে স্ত্রী বলিলেন "আমি শুনিয়াছি মেয়েটীর আর কেউ নাই। যেরূপ দৌরাত্ম্য হইতেছে তাহাতে উহার আর একা থাকা উচিত নহে। আমার ঘরে বেশী লোক নাই, ও থাকিলে আমার খুব সুবিধা হইবে, ওকে দেখে আমার বড় মায়া হইয়াছে।" আমারও সেই ইচ্ছা ছিল, কাজেই সেই দিন হইতে মহামায়া আমার পরিবারভুক্ত হইল। তাহার যে জমি জমা ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া ৩০৲ ত্রিশটী টাকা মাত্র হইল।

ডাক্তার বাবু এ কথা শুনিয়া সকলকে বলিয়া দিলেন। সন্দেহ দৃঢ় হইল, ক্রমে অনেকেই আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দীহান হইলেন। আমার প্রতি লোকের যে শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, তাহার অনেক লাঘব হইল; তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি মনে বড়ই বেদনা পাইলাম। মনের দুঃখের কথা পত্নীকে জানাইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন "ও কথাও কি গ্রাহ্য করিতে আছে? নীচ যদি উচ্চ ভাসে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।" আমি কতক আশ্বস্ত হইলাম।

আমার ভাগ্যদোষে আর একটি ঘটনা ঘটিল, তাহাতে লোকের সন্দেহ আরও বাড়িল। এই সময়ে আমার শ্বশুর বাড়ীতে একটী শুভ কর্ম্মোপলক্ষে আমার স্ত্রীকে তথায় যাইতে হইল। আমার ইচ্ছা ছিল মহামায়া তাঁহার সঙ্গে যায়, কিন্তু তিনি বলিলেন "আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব, অনর্থক খরচ বাড়াইবার দরকার কি? মহামায়া গেলে আমার গরুটীর বড়ই কষ্ট হইবে, আমি আর কাহাকেও ততদূর বিশ্বাস করিতে পারি না।" বাড়ীতে অন্য কোন স্ত্রীলোক ছিল না, সমুদায় সংসারের ভার মহামায়ার হাতে পড়িল। মহামায়া আসা অবধি আমার গৃহস্থালীর অতি সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কাহারও কোন বিষয়ে কোন প্রকার অসুবিধা ছিল না। আমার স্ত্রী তাহার চরিত্রে এতদূর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে ক্রমে টাকা কড়ি সমুদয় তাহার হস্তে দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত মনে পড়া শুনা ও পূজা আহ্নিকে সময় অতিবাহিত করিতেন। মহামায়া আমাদিগকে সাক্ষাৎ ইষ্ট দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাহার সে ভাব দেখিয়া আমার

চিত্ত স্নেহে একান্ত বিগলিত হইল। আমি তাহাকে কন্যা নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলাম।

এই সময় আমি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। মহামায়া দিবা রাত্র আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। আমার স্ত্রী বাড়ীতে নাই, এই জন্য কাহারও প্রবেশের বাধা ছিল না। একদিন ডাক্তার বাবু আসিয়া দেখিলেন আমি জ্বরে ছট্‌ফট্‌ করিতেছি, আর মহামায়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার মস্তকে জল সিঞ্চন করত পাখার বাতাস দিতেছে। মহামায়া সঙ্কুচিতভাবে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। তাহার বয়স, সৌন্দর্য্য ও তদানীন্তন ভাব দেখিয়া ডাক্তার বাবুর মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল তাহা সুদৃঢ় হইল। তিনি প্রস্থান করিয়া মনের বিশ্বাস অনেককে জানাইলেন। কেহ কেহ স্বচক্ষে আসিয়া দেখিয়া গেলেন। আমার কলঙ্ক চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

মহামায়া আমার পীড়া গুরুতর দেখিয়া ডাক্তার বাবুর দ্বারা আমার স্ত্রীকে তারযোগে সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি ব্যস্তক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে আমি আরোগ্য লাভ করিলাম, দশ জনের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলাম, তখন বুঝিলাম আমার বৃথা কলঙ্ক খুবই প্রচার হইয়াছে।

একদিন আমার স্ত্রী ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছেন। ডাক্তার পত্নী বিষবৃক্ষ পড়িতেছিলেন, আমার স্ত্রী কথায় কথায় বলিলেন ও সব বই পড়া অপেক্ষা মহাভারত ও পুরাণ পড়া ভাল। ডাক্তার পত্নী ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন “আমি ত বিষবৃক্ষ পড়িতেছি, আর তুমি যে ভাই বিষবৃক্ষ নিজের বাড়ীতে পুতিয়া জল সেচন করিয়া বাড়াইতেছ। আমার বিশ্বাস ছিল তুমি বুদ্ধিমতী, কিন্তু এখন দেখিতেছি তোমার কিছু মাত্র বুদ্ধি নাই। তুমি পুরুষ মানুষের মন জান না। পুরুষকে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই।”

আমার স্ত্রী কহিলেন “ও পাপ কথা মুখেও আনিও না। আমার স্বামী সাক্ষাৎ সদাশিব। তাঁহাকে কেহ কখনও অবিশ্বাস করিতে পারিবে না।”

ডাক্তার পত্নী কহিলেন “আর বাহাদুরি করিও না, আমাদের তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, থাক কিছু দিন, সবই দেখিতে পাইবে।” আমার স্ত্রী কাঁদ কাঁদ ভাবে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পর দিন একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে স্ত্রীলোকদের নিমন্ত্রণ ছিল, আমার পত্নীও তথায় গিয়াছিলেন। ক্রমে আমার কথা উঠিল। নিন্দার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া আমার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহের সুখশান্তি ফুরাইল। এতদিন লোকের সুখ্যাতিতে তৃপ্ত ছিলাম। মনে করিতাম সৎকার্য্যের পুরস্কার সুখ্যাতি। এখন সে ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলাম, তথাপি মনে কিছু মাত্র সুখশান্তি রহিল না। এত যে উৎসাহ স্ফূর্ত্তি ছিল, তাহা অপগত হইল, দিন দিন নিরাশায় ডুবিলাম। পত্নীর মনে যে এত সৌভাগ্য গর্ব্ব ছিল তাহা অস্তমিত হইল। অনাথা মহামায়া কতক কতক বুঝিতে পারিয়া জীবন্মৃতা হইল। তাহার সে মলিন, বিমর্ষ ও সঙ্কোচ ভাব দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

আমার নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া স্ত্রী আর কাহারও বাড়ীতে যাইতেন না কিম্বা কাহারও সহিত মিশিতেন না, মন দুঃখে সর্ব্বদাই বাড়ীতে থাকিতেন। মনে সুখ না থাকিলে অতি প্রিয়জনকেও আদর করা যায় না, এজন্য তিনি পূর্ব্বে মহামায়াকে যেরূপ আদর করিতেন, এখন আর ততদূর করিতেন না, আমিও পারিতাম না। মহামায়ার হৃদয় ভক্তি ও মমতায় পূর্ণ ছিল, কিন্তু সে ও অবস্থায় পড়িয়া সঙ্কুচিত ভাবে চলিতে লাগিল। সুতরাং গৃহস্থাশ্রমের যে মধুরতা এতদিন উপভোগ করিতেছিলাম তাহা ক্রমে অন্তর্হিত হইল।*

এই সময়ে একটী ঘটনা ঘটিল যাহাতে মনে করিলাম এবার মিথ্যা কলঙ্ক অপনীত হইবে, কিন্তু লোকনিন্দা করিয়া যাহাদের আনন্দ হয়, তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার কোথায়? সতীত্বের যিনি মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি ছিলেন, তিনি অগ্নি পরীক্ষার দ্বারাও মিথ্যাপবাদ পরিক্ষালিত করিতে পারেন নাই, সামান্য মানবের ভাগ্যে আর অধিক কি হইবে?

(ক্রমশঃ)

---

*নায়িকা যদি স্বামীর সুখ্যাতি অপেক্ষা স্বামীকে অধিক ভাল বাসিতে শিখিতেন এবং নায়ক যদি আপন যশঃ অপেক্ষা আপন স্ত্রীকে অধিক ভাল বাসিতে শিখিতেন তাহা হইলে এ সংসারের সুখশান্তি ভঙ্গ হইত না। সঃ।

“বউ কথা কও”

এবং

পাপিয়া।

এখনও বসন্তের জের আছে। ঝাড়ে, ঝোড়ে, বাগানে, লোকের ভবনে “বউ কথা কও” পাখী নিজ পরিচায়ক বুলি বলিতেছে। অন্য ঋতু অপেক্ষা এই সময় মানিনীর মান কিছু বেশী। ভর্ত্তা মজুকুর মান-ভঞ্জনে ব্যাপৃত এবং “বউ কথা কও”কে মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। পাখী সারা রাত্রি সাধিতেছে “বউ কথা কও”। পাখীও ধন্য! মুহূর্ত্ত বিরাম নাই, অবিরাম এগার ঘণ্টা কাল চীৎকার।

আবার বলি, পাখী ধন্য। বায়না নাই, ফিজ নাই, মুহুরীর তহুরী নাই, পরের জন্য সারা রাত্রি প্রাণপণে চীৎকার, ডাক হাঁক অর্থাৎ বক্তৃতা করা। আর আমাদের সাধারণ উকিল মোক্তার কি করেন? আধ ঘণ্টা বোকে পূরো এক ঘণ্টা কপালে, চোকে, মুখে রুমাল বুলান, বরফ, জল কি বিলাতী পানি খান। মক্কেলের সৌভাগ্য ফলিলে, ফিজ পকেট জাত করত হয়তো বৃন্দাবন হইতে মথুরা ওরফে হুগলি হইতে হাবড়া “শ্রীহরি” করেন, রাইরূপী মক্কেলকে আক্কেল দিয়া কুব্জারূপী মক্কেলের মনোরঞ্জন করেন।

“বউ কথা কও” কেবল পরার্থে পরিশ্রম করে। নিঃস্বার্থ পাখী পরম পবিত্র পরোপকার ব্রতে ব্রতী। অজ্ঞান মূঢ় পাখী সাধু, প্রকৃত দ্বিজ, স্বার্থশূন্যচিত্ত ঋষি। আর আমরা কেবল নিজের স্বার্থ জন্য বিব্রত।

হয়তো কেহ বলিবেন, কেন? আমাদের গিরেন, নরেন, বীরেন এঁরা তো পরার্থ অনেক চীৎকার, ওরফে বক্তৃতা করেন। করেন বটে, কিন্তু সেটা কি উদ্দেশ্যে? মিউনিসিপাল (ময়লা + সাফ্ + অল প্রত্যয়) কমিসনার, পরে চে-য়াঁর-মান (এর যে আরও মান) এবং তৎপরে রায় বাহাদুর (রায় প্রকাশে বাহাদুর) হইবার নিমিত্ত। “বউ কথা কও” এর মত এঁরা কেহ নিঃস্বার্থ বক্তা নন।

মান অভিমান একই পদার্থ। তবে মান স্ত্রীলোকের, আর অভিমান পুরুষের, অনেক সময়ে এইরূপ কথিত হয়। আমরা আমাদের “তিনির”

মান ভাঙিতে ব্যস্ত, কিন্তু নিজের অভিমান অহং জ্ঞান প্রতি একবারও দৃষ্টি করি না। অগ্রে নিজের রোগের চিকিৎসা পরে অন্যের পীড়া শান্তির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বোধ হয় অনেকেই “মানভঞ্জনের” ছবি দেখিয়াছেন। শ্রীমতী মানে মগ্না, নয়ন-মুদিতা। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার পদসন্নিধানে উপবিষ্ট। এই দৃশ্যে ইহাই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে যে মানুষ অভিমানস্ফীত হইলে, সম্মুখস্থিত সর্ব্বব্যাপী ভগবানকেও দেখিতে পায় না, তাঁহাকে হারায়। রাধিকার তাই ঘটিয়া ছিল।

আনায় হউক, কড়ায় হউক, ক্রান্তিতে হউক, সকল ব্যক্তিতেই অভিমান আছে। উকিলের অভিমান তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, সব জানেন। আইন, বে-আইন, সব অবগত। হাকিমের অভিমান তিনি হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। তিনি মস্‌জিদের মোল্লা। তিনি দাঁড়াইলে সকলকে দাঁড়াইতে হয়, তিনি বসিলে সকলেই বসে। তিনি লোককে “ওট্ বস্” করান। মামলা হারিলে লোকে “বোসে” পড়ে, জিতিলে গরম হয়ে উঠে। ডাক্তার চিকিৎসকের অভিমান তিনি বড়ি প্রয়োগে (রোগী শুদ্ধ নয়) “জর জ্বালাকে” যমের বাড়ী পাঠান। যাজকের অভিমান তিনি লোকের (দেশী হউক আর বিলাতী হউক) “কৃষ্ণপ্রাপ্তি”র বিধান করেন। পণ্ডিতের শিক্ষকের অভিমান, তিনি “গরুকে” মানুষ করিতে সক্ষম। এইরূপে সকলেই অভিমানে পূর্ণ। যেমন বাষ্প দ্বারা রেলের গাড়ি, তদ্রূপ অভিমানে অহং জ্ঞানে জগৎ চলিতেছে। অহং জ্ঞানের বিলোপে জগৎ অসৎ বিলুপ্ত হয়।

অভিমান রোগের কিন্তু তেমন ঔষধ নাই। আপদ, বিপদ, দুঃখ, ক্লেশ, শোক, তাপ দ্বারা এই রোগের সময়ে সময়ে উপশম হয় বটে—কিন্তু আরাম হয় না।

তবে অভিমানের ঔষধ কোথায়? ঔষধ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব-চরিত্রে। যার জন্য মনে অভিমানের উদয় হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই প্রচুর পরিমাণে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের ছিল। তিনি সৌন্দর্য্যের, রূপের আদর্শ ছিলেন। তাঁহাকে “সোণার গৌরাঙ্গ” বলা হইত। তাঁহার পাণ্ডিত্যের অন্য পরিচয় অনাবশ্যক। পণ্ডিতভূমি নবদ্বীপেও তিনি “পণ্ডিত নিমাই” নামে অভিহিত হন। ধীশক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট যে নৈয়ায়িক রত্ন রঘুনাথ শিরোমণির

“বিষয় বিশেষে” নিমাই পণ্ডিতই সন্দেহ দূর করিতেন। “কুলে শীলে” জাত্যংশেও শ্রীগৌরাঙ্গ দেব অতি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহোপাধ্যায়গণও তাঁহার শিষ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং নবদ্বীপ হইতে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্ম বিস্তৃত হয়। এ হেন “নিমাই পণ্ডিত” সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, “অভিমান শূন্য নিমাই নগরে বেড়ায়।” শ্রীগৌরাঙ্গদেব দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক লোকের নিকট হরিনাম যাচ্ঞা করিতেন। “নাম” লইয়া আমাকে কিনিয়া লও, এই বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই ভাবে “প্রেমের বন্যা” আনিয়া জগৎ ভাসাইয়াছিলেন। অভিমান বর্জ্জিত না হইলে, ব্যবহারে নিমাই না হইতে পারিলে, তোমার পর-প্রেম লাভ ঘটিবে না। তুমি অন্যের ভাল-বাসা পাইবে না। তুমি পরকে প্রীতি দিতে পারিবে না। “জলে জল বাদে, জলে জল মিশায়।” আর জল নীচগা। মনকে “নীচু” না করিলে মন অন্য মনকে ধরিতে অন্য মনে মিশাইতে পারে না। তাহা না হইলে প্রেম দেওয়া এবং পাওয়া যায় না।

বসন্তে অশান্ত ভাবে আর একটী পাখীকেও অনবরত ডাকিতে শুনা যায়। সেটি “পাপিয়া”। পাপিয়া বলে “চোক্ গেলো।” পাপিয়ার এই বুলি বলিবার কোন কারণ আছে? কল্পনা দেবী বলিতেছেন “আছে।” দেবী বলিতেছেন পাপিয়ার দুটী শব্দ, পাপ+ইয়া (ইয়া অর্থে এই) পাখী বলে মানুষের এই এই পাপ দেখে আমার চোক্ জ্বলে গেলো।

বিশেষতঃ এই বসন্তে লোক অশান্ত হইয়া নানাবিধ অপকর্ম্ম করিতেছে কল্পনা দেবীর কথা একান্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। “কতক মতক” যেন সত্য বো হয়।

“বৌয়ের” মান ভাঙ্গিবার কারণ বাবুজি “বউ কথা কও” হন। এখন জিজ্ঞাসা এই বাবুজি কি “পাপিয়া”ও হন। কল্পনা দেবী আবার বলিলেন “হন বই কি।” বলিলেন বাবুজিও বলেন, চোক্ গেলো। আমার বাড়ীর সম্মুখে শ্যামা দোতালা বাড়ী কোর্ছে। এ আমি দেখ্তে পারি না। গীর্জে উকিল আমার ফৌজদারি কেস্ নিচ্ছে। উম্সে আমাকে ঠেলে কাঙ্গাল কাঁসারীর সদস্য (সত্+দস্যু) হইয়াছে। এ সব আমার চক্ষুশূল। দেখে আমার চোক্ গেলো।”

এবারও কল্পনা দেবী অঠিক কন্ নাই। মন্ত্রিবর “হৃষ্টপাথর” সাহেবের উন্নতি কন্‌সার্ভেটিভ্ দলের চক্ষে সহ্য হইতেছে না। বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি ডফ্ সাহেবের শিষ্যদের পক্ষে কষ্টদায়ক হইয়াছে। বাঙ্গালিরা বহুতর বড় বড় সরকারী কাজ পাইতেছে ইহাতে অনেক সাহেবকে কষ্টে আঁখ্ কচ্লাইতে হইতেছে। টমাস্ ইভানস্ সাহেবকে দেখ্লে শুঁড়ীদের চোক্ পুড়ে যায়। এইরূপে মানুষ পরশ্রী কাতরতা হেতু “চোক্ গেলো”—হাঁকরাইতেছে।

এই রোগটির ঔষধও শ্রীগৌরাঙ্গ দেব। গৌরাঙ্গ দেব প্রেম দ্বারা জগৎ জয় করিয়াছিলেন। প্রহারককেও প্রেম-হার দান করিয়াছিলেন। তুমি ভাই! ও তাই করো। তা হলে আর “চোক্ গেলো” বলে চীৎকার করিতে হইবে না।

হুগলী।
১৫ই বৈশাখ। ১৩০০ সন।

জ্যোতিষ প্রবন্ধ।

পুরাকালে অস্মদ্দেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ আদর ও যত্ন ছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ এই শাস্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন। তৎকালে নানা দেশে ইহার সবিশেষ আলোচনা হইত। কালক্রমে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয় করিয়া, নিজ রাজ্য স্থাপন করে, ও হিন্দু জাতীর সমুদায় কীর্ত্তি নাশ এবং শাস্ত্রাদি ধ্বংস করিয়া ফেলে। অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত জ্যোতিঃ শাস্ত্রের অনেক পুস্তক সেই সময়ে নষ্ট হইয়া যায়। তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া, যে সকল জ্যোতিষ গ্রন্থ অবশিষ্ট ছিল,—তাহাও হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তৎকালে নানা কারণে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সকল কারণ বশতঃ জ্যোতিশাস্ত্র বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা মূঢ় ও স্বার্থপর ব্যবসায়ীগণের হস্তে নিপতিত হওয়ায়, এই শাস্ত্রের উপর লোকের আন্তরিক ঘৃণা ও যথেষ্ঠ অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। দৈবজ্ঞ, আচার্য্য, জ্যোতিষী প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই উপযুক্ত পরিমাণে

লেখা পড়া শিক্ষা না করিয়াই, কেবল মাত্র উদরান্নের তরে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, লোক প্রতারণা ও নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি করিতেছেন। এই শ্রেণীর লোকসংখ্যাই এক্ষণে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে। এই সকল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কদাচ আশানুযায়ী ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

জ্যোতিষ সাক্ষাৎ ফলপ্রদ বিদ্যা, তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই।

“অন্যান্য শাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি।
চিকিৎসিত জ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি॥

যে শাস্ত্র পরাশর, ব্যাস, কশ্যপ, নারদ, বৃহস্পতি, মাণ্ডব্য, ভরদ্বাজ, ভৃগু, বশিষ্ঠ, গর্গ, আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, যবনাচার্য্য, বরাহ মিহির, কালিদাস, বলভদ্র, শতানন্দ, রাঘবানন্দ, বিভাকরাচার্য্য, ঢুণ্ডিরাজ, নীলকণ্ঠ, চণ্ডেশ্বর, তাজকাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় আর্য্যঋষিগণ এবং আরিষ্টটল, টলেমী, কেপলার, কোপার্ নিকাস্, হার্শেল প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, অধুনা সেই শাস্ত্র অমূলক ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া একেবারে অগ্রাহ্য করা কদাচ ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না।

যাহা হউক, সাধারণ ব্যক্তি ও শিক্ষার্থীদিগের নিমিত্ত অদ্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রীতিকর বোধ হইলে, ভবিষ্যতে সময়ে সময়ে পাঠকবর্গকে জ্যোতিষ প্রবন্ধ উপহার দেওয়া যাইবে।

জ্যোতিষ সাধারণতঃ দুই প্রকার। ফলিত ও গণিত। যে জ্যোতিষের সাহায্যে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র প্রভৃতির স্থিতি, যোগ ও তাহাদের দৃষ্টিক্রমে মানবের দেহ, ধন, ধর্ম্ম, রাজ্য, আয়, ব্যয়, রোগ, শোক ও মৃত্যুর এবং রাজ্য মধ্যে ঝড় বৃষ্টি ও বন্যার উৎপত্তি ও অপরাপর নানা বিষয়ের ফল সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে ফলিত এবং যদ্দ্বারা আকাশমণ্ডলের গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা, নক্ষত্র, রাশি প্রভৃতির উদয়াস্ত ও গতির বিষয় বিশিষ্টরূপ অবগত হওয়া যায়, তাহাকেই গণিত জ্যোতিষ বলে।

ফলিত জ্যোতিষ বহুভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে (১) সকল প্রকার কোষ্ঠী বা ঠিকুজী গণনা; (২) রোগ শোকাদি গণনা; (৩) ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা ও বজ্র পতনাদি গণনা; (৪) সকল প্রকার প্রশ্ন গণনা; এবং (৫) সুভিক্ষ, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ বিগ্রহাদি গণনা, এই পঞ্চ প্রকার প্রধান। করকোষ্ঠী দর্শনে মানব জীবনের শুভাশুভ ফল গণনা করা ও ফলিত জ্যোতিষের অঙ্গ।

প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে গ্রহ নয়টি। সেই নবগ্রহ এবং ইদানীং ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত অপর দুইটি গ্রহের নাম, আকার, বর্ণ, অবস্থা ও গতির বিষয় সর্ব্বাগ্রে বলা যাইতেছে।

রবি। সৌর জগতে যাবতীয় গ্রহাপেক্ষা রবিই বৃহৎ। ইহা জবা কুসুম সদৃশ লালবর্ণ, গোলাকার এবং উত্তাপের আকর। এই গ্রহ ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল, ও ২৪ অনুপলে, একবার মাত্র রাশিচক্র ভ্রমণ করিয়া আইসে। ইহাকেই রবির বার্ষিক গতি বলে। ইহার দৈনিক মধ্যগতি ৫৯ কলা, ৮ বিকলা ও ১০ অনুকলা। রাশিচক্রের বক্রিমা হেতু রবির গতি কখন শীঘ্র এবং কখন মন্দ হয়। এই নিমিত্তই উক্ত গতিকে মধ্য গতি বলে। ইহার দৈনিক শীঘ্র গতি ১ অংশ, ১ কলা ও ৫ বিকলা। রবির প্রত্যেক রাশি ভোগের কাল এক মাস।

চন্দ্র। চন্দ্র গ্রহ মধ্যে পরিগণিত নহে। উপগ্রহ বলিয়া অভিহিত। এই উপগ্রহ ২৭ দিন, ১৯ দণ্ড, ১৭ পল ও ৪২ বিপলে একবার মাত্র রাশিচক্র প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। ইহা প্রতিদিন রাশিচক্রের মধ্যে, পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে ১৩ অংশ, ১০ কলা ও ১৪ বিকলা করিয়া গমন করিয়া থাকে। ইহাই চন্দ্রের দৈনিক গতি। রবি ৫৯ কলা, ৮ বিকলা ও ১০ অনুকলা গমন করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত চন্দ্র প্রত্যহ সূর্য্য হইতে ১২ অংশ, ১১ কলা, ৫ বিকলা ও ৫০ অনুকলা করিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রগামী হইয়া থাকে। চন্দ্রের এই দৈনিক অগ্রগতি দ্বারাই, এক একটি তিথি হইয়া থাকে। মধ্যগতি দ্বারাই ইহার সংঘটন হইয়া থাকে। রাশিচক্রের বক্রিমা হেতু রবির ন্যায়, চন্দ্রের ও উক্ত গতির, কখন শীঘ্র এবং কখন মন্দ হইয়া থাকে।

চন্দ্রের বৃদ্ধি কালকে শুক্ল পক্ষ এবং ক্ষয় কালকে কৃষ্ণপক্ষ কহে। চন্দ্র, সূর্য্য হইতে ১৮০ অংশ গমন করিলে পূর্ণিমা তিথি হয়। চন্দ্রের প্রত্যেক রাশির ভোগের কাল স্থূল গণনায় ২।০ সওয়া দুই দিবস। চন্দ্র স্বয়ং তেজোময় নহে। রবির কিরণ ইহাতে পতিত হইয়াই আলোকিত হয়। ইহার যে যে অংশ সূর্য্যাভিমুখে স্থিতি করে, সেই সেই অংশ সূর্য্য রশ্মি

প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশমান হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত চন্দ্রের অপর অংশ বালা নারীর কেশের ন্যায় শ্যামবর্ণ থাকে। চন্দ্রের বর্ণ চারি প্রকার। রক্ত, গৌর, শ্বেত ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথি হইতে শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথি পর্য্যন্ত ১৫ পঞ্চদশ দিবস চন্দ্র ক্ষীণ হইয়া থাকে।

মঙ্গল। সৌর জগতের ঠিক মধ্যস্থলে রবি। তৎপরে বুধ, তৎপরে শুক্র, তৎপর পৃথিবী এবং ঠিক তাহার পরেই দুইটি উপগ্রহ সমন্বিত মঙ্গল গ্রহ অবস্থিত। আকাশ মণ্ডলে যতগুলি গ্রহ আছে, তাহাদের মধ্যে মঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা রক্তবর্ণ। এই গ্রহ ৬৮৬ দিন, ৫৮ দণ্ড, ৯ পল ও ২০ বিপলে একবার সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে। ইহার দৈনিক শীঘ্রগতি ৪৬ কলা ও ১৮ বিকলা। মধ্যগতি ৩১ কলা ও ২৭ বিকলা। মন্দ গতি ৪ কলা মাত্র। হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে স্থূল গণনায় মঙ্গলের এক এক রাশি ভোগের কাল ৪৫ দিবস। এবং ৫৪০ দিনে একবার রাশিচক্র ঘুরিয়া আইসে। মঙ্গল ৮০ দিন বক্র এবং ৪ দিন স্থির ভাবে থাকে। বক্র ভাবাপন্ন না হইলে ১ মাস ১৫ দিন করিয়া প্রত্যেক রাশি ভোগ করিয়া থাকে।

বুধ। এই গ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, এবং রবির অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত। ইহার বর্ণ শুভ্র। সূর্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং প্রদোষকালে এই গ্রহ আকাশ মণ্ডলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থূল গণনায় বুধ গ্রহ, প্রত্যেক রাশি ১৮ অষ্টাদশ দিবস করিয়া ভোগ করিয়া থাকে। এবং ২১৬ দিবসে একবার মাত্র রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহার দৈনিক শীঘ্রগতি ৪ অংশ, ৫ কলা, ৩২ বিকলা ও ২১ অনুকলা। মধ্যগতি ৫৯ কলা, ৯ বিকলা ও ২৪ দিবস বক্রগতি এবং ২ দিবস স্থির স্থিতি। শীঘ্রগতি প্রাপ্ত অবস্থায় বুধ ১৮ অষ্টাদশ দিবস করিয়া এক এক রাশি ভোগ করিয়া থাকে।

বৃহস্পতি। বৃহস্পতি কাঞ্চন বর্ণ এবং সমুদায় গ্রহাপেক্ষা বৃহৎ। চারিটি উপগ্রহ (অধুনা আর একটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে) পরিবেষ্টিত হইয়া এই গ্রহ ১১ বৎসর, ৩১৫ দিন, ৩৬ দণ্ড ৮ পলে একবার সূর্য্য পরিভ্রমণ করিয়া আইসে। ইহার দৈনিক শীঘ্রগতি ১৪ কলা, ৪৬ বিকলা। মধ্যগতি ৪ কলা, ৫৯ বিকলা ও ৯ অনুকলা। মন্দগতি ৪৩ বিকলা মাত্র। ইহার ১২০ দিন বক্রগতি ও ৯ দিন স্থির স্থিতি। হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে স্থূল গণনায় বৃহস্পতির এক এক রাশি ভোগের কাল প্রায় ১ বৎসর।

সুতরাং দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করিতে প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকে।

শুক্র। বুধের পর শুক্র গ্রহ অবস্থিত। অপরাপর গ্রহাপেক্ষা এই গ্রহ সমধিক উজ্জ্বল ও বৃহৎ। ইহার বর্ণ সজল জলদ সদৃশ নীলবর্ণ। ইহা গোলাকার নহে। প্রায় ২৯০ দিবস রজনীর শেষ ভাগে পূর্ব্বাকাশে ও উক্ত পরিমিত দিবস সন্ধ্যার সময় পশ্চিমাকাশে এই গ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় দৃষ্ট হইলে সন্ধ্যাতারা এবং অতি প্রত্যূষে দৃষ্ট হইলে প্রভাত বা "শুকতারা" কহে। স্থূল গণনায় ইহার প্রত্যেক রাশি ভোগের কাল ২৮ আটাশ দিবস মাত্র, এবং ৩৩৬ দিনে একবার করিয়া দ্বাদশ রাশি ঘুরিয়া আইসে। ইহার দৈনিক শীঘ্রগতি ১ অংশ, ১৬ কলা, ৭ বিকলা ও ৪৪ অনুকলা। দৈনিক মধ্যগতি ৫৯ কলা, ৮ বিকলা ও ১০ অনুকলা। ৪২ দিন বক্রগতি ও ৪ দিন স্থির স্থিতি। শুক্র ২২৪ দিন, ৪২ দণ্ড, ৩ পলে একবার মাত্র সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এই গ্রহ দেখিতে অতি সুন্দর।

শনি। শনি গ্রহ পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত। দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ইহাকে আকাশমণ্ডলে নিরীক্ষণ করিলে, অতীব অদ্ভুতজনক দৃষ্ট হয়। শনি ৩ তিনটি চক্র (Ring) দ্বারা বেষ্টিত। তাহার মধ্যে দুইটি চক্র সমুজ্জ্বল ; অপরটি প্রভাহীন। এই চক্র তিনটি শনি মণ্ডল হইতে অনেক দূরে ও পরস্পর অসংলগ্ন ভাবে স্থিত। এই চক্রত্রয়ের বহির্ভাগে ৮ আটটি উপগ্রহ শনির চতুর্দ্দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। হিন্দু জ্যোতিষীগণের মতে স্থূল গণনায় শনির এক এক রাশি ভোগের কাল প্রায় আড়াই বৎসর। দ্বাদশ রাশি ভোগ করিতে শনির ২৯ বৎসর ৫ পাঁচ মাস, ১৭ সতর দিবস, বার দণ্ড ও ৩০ ত্রিশ পল অতিবাহিত হইয়া থাকে। ইহার দৈনিক শীঘ্রগতি ৮ আট কলা ও প্রায় ৫ পাঁচ বিকলা। মধ্যগতি ২ কলা ২৩ বিকলা। মন্দগতি ১২ বার বিকলা মাত্র। ইহার ১৪০ দিন বক্রগতি এবং দশ দিবস স্থির স্থিতি।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষ—কর্ম্মভূমি।

স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে নানা ভাবে বলা হইয়াছে, যে এই ভারতবর্ষ কর্ম্ম ভূমি—অন্যান্য দেশ সকল ভোগ ভূমি। কর্ম্ম এবং কর্ম্মের জন্য ফলভোগ—এই দুয়ের মধ্যে যদি কার্য্য কারণ সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে, এক দেশে কর্ম্ম হইবে, অন্য দেশে তাহার ফল ভোগ হইবে, এমন কথা ত শাস্ত্রে নাই। অমুক ঋষি পূর্ব্বজন্মে এই ভারতবর্ষেরই অমুক গ্রামে অমুক ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন, এমন কথাত শাস্ত্র কাহিনীতে শত শত রহিয়াছে; সুতরাং ভারতবর্ষে কর্ম্ম করিয়া জন্মান্তরে, দেশান্তরেই তাহার ভোগ হয়, এমন কথা হইতেই পারে না। এ দেশের লোক যেমন কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আবার নূতন কর্ম্ম করে, অন্যান্য দেশের লোকও সেই রূপই করিয়া থাকে, তবে শাস্ত্রে ওরূপ একটা ভাগ-বাটোয়ারার কথা কেন বলিয়াছেন?

শাস্ত্রোক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য, বোধ হয়, এইরূপ—এ দেশের লোক ভোগ করিবে বটে কিন্তু সে ভোগও কেবল কর্ম্মের জন্য, অন্যান্য দেশের লোক কর্ম্ম করে বটে—কিন্তু তাহাও ভোগের জন্য। এই কথাটি যদি আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, এবং শাস্ত্রের উপদেশ মত কার্য্য করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলেই আমরা এই পুণ্যভূমিতে বাস করিবার অধিকারী; নতুবা ডিক্রুস্, গোমেস্ বা ব্রাউন, স্মিথ—চট্টগ্রাম চুণাগলি প্রভৃতি স্থলে যে অধিকারে বাস করিতেছেন, আমাদের অধিকার তাঁহাদেরই মত।

যদি তুমি গৃহস্থ হও এবং অতিথি দেবতা পিতৃ পুরুষ প্রভৃতিকে নিয়মিতরূপ অন্নজলাদি দান না কর, তবে তুমি নিরামিষ হবিষ্যান্নই ভোজন কর, আর পিষ্টক পলান্নই গ্রহণ কর,—সে কেবল শূকর পেট পূরণ। তোমার আশ্রম পবিত্র পুণ্য তীর্থে হইলেও—বাস্তবিক তুমি ভারতবাসী নহ—এদেশে বাস করিবার তোমার অধিকার নাই।

তবে কি কেবল সৎ-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন সাধু লোকেই ভারতবর্ষে বাস করিবার অধিকারী? না তাহা নহে। সকল প্রকার লোকই এই দেশে চিরকাল আছে ও থাকিবে, তবে সকলকেই কর্ম্মকে প্রধান বলিয়া মানিতে হইবে। আমি রাজসিক ভাবাপন্ন লোক, মণি, মুক্তা, হীরা, জহরৎ জড়িত হইতে আমার বড় ইচ্ছা—আমি কি কামস্কাট্কায় বাস করিব? না, তাহা করিতে হইবে না। আমি জ্যোতির্ব্বিদ্ বিষ-দোষবিদ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পরামর্শ লইয়া, যে সকল রত্ন আমার ধাতুর উপযোগী, যে সকল রত্ন আমার শরীরস্থ বিষ নাশক, সেই সকল ভূরি পরিমাণে ধারণ করিতে পারি। তাহাতে আমার সৎকর্ম্মই করা হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে মণি মাণিক্যের উপভোগ হইবে। এইরূপ সকল কার্য্যেই ভোগটাকে আনুসঙ্গিক ব্যাপার করিতে হইবে। যিনি ভোগকে প্রাধান্য দিবেন, তিনি কর্ম্ম ভূমিতে বাসাধিকারী নহেন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে হরপার্ব্বতী কর্ত্তৃক গ্রন্থ সূচনা হইতেছে। গৌরী জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভাল, যাহারা সৎপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, তাহাদের ক্রমেই যেমন সদ্গতি হইবে, যাহারা অসৎপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, তাহাদের ত তবে ক্রমেই অসদ্গতি হইবে—তাহা হইলে তাহাদের আর নিস্তারের কোন পন্থাই কি নাই?’ মহাদেব বলিলেন, ‘তা নয়—অসৎপ্রবৃত্তিসম্পন্ন লোকে, যদি কোন কর্ম্মের উদ্দেশ করিয়া তাহাদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, তবে তাহাদের তাহাতেই ক্রমে সদ্গতি হইবে। যদি জীব ভোগেচ্ছা না করিয়া, কর্ম্মেচ্ছু হইয়া, সাধনার উপায় স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, মদ্যপান করে, অথবা মাংস ভক্ষণ করে, বা অন্য কিছু করে, তবে তাহাতেই তাহার প্রবৃত্তির ক্রমে নিবৃত্তি হইবে এবং তাহার সদ্গতি হইবে।’

তবেই স্থূল কথা এই দাঁড়াইল, যে ভারতবাসী ঋষি তপস্বীকেও যেমন ভোগেচ্ছা খাট করিতে হইবে, ভারতবাসী লম্পট মাতালকেও সেই ভাবে ভোগেচ্ছা নিয়মিত করিতে হইবে। কর্ম্মের জন্য অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য কার্য্য করিব, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গ ঘটিত ভোগ আসিল, বেশ—স্বর্ণ, মুক্তা, হীরা, জহরৎ আসিল—সোভি বেশ্—দুগ্ধ ক্ষীর নবনীত আসিল, সোভি বহুত আচ্ছা। কর্ম্মের অনুসঙ্গরূপে ঐ সকল ভোগের কোন নিষেধই নাই।

য়ুরোপের ব্যবহার শাস্ত্রের মূল নীতি এই যে, অন্যের ভোগে কোনরূপ ব্যাঘাত উৎপাদন না করিয়া তুমি তোমার নিজস্বই হউক, আর সাধারণস্বই হউক, যে কোন বিষয়, যে কোন ভাবে, উপভোগ করিতে পার। এই নীতির দোষ গুণ যাহাই থাকুক, ইহার মূলে ভোগ এবং ফলে ভোগ, তাহার সন্দেহ নাই। বৃদ্ধ পাদরি সাহেব বলেন বটে—সংসার অনিত্য, ভোগ অসার, কিন্তু তাঁহার চেরেট জুড়ি গাড়ী, এবং তাঁহার বৃদ্ধা মেম সাহেবের বিনোদিয়া বনেটের পার্শ্বে কৃত্রিম কুসুমকলাপ দেখিলে তিনি যে ভোগ-লক্ষ্য জীব তাহাই মনে হয়। এই অনাথ আতুরকে অন্নদান য়ুরোপভূমিতে

হইতেছে না কি? হইতেছে; খুবই হইতেছে—কিন্তু আমাদের দেশ হইতে প্রকরণ পদ্ধতি অনেকটা বিভিন্ন। তথাকার নিয়ম এইরূপ ‘আমি মাসে এক টাকাই দি, আর সহস্র টাকাই দি, আমি সেই টাকা পাঠাইয়া দিব, কোন আম হাউসে, কোন পূয়র ফণ্ডে, কোন চারিটি সোসাইটিতে,—সেখানে গরীব দুঃখী অন্ন পায়, আচ্ছাদন পায়, আশ্রয় পায়—তা বলিয়া কি তাহারা আমার বাড়ী আসিয়া আমাকে হা অন্ন! হা বস্ত্র! বলিয়া বিরক্ত করিবে? তাহা হইলে ত আমার ভোগে ব্যাঘাত হইল—আমি ভোগ-জীবন জীব—আমার সর্ব্বনাশ হইল! না, তাহা হইবে না, আমি দান করিব সত্য, তাহাতে দরিদ্রের দুঃখ দূর হইবে, তাহাও ঠিক্—কিন্তু আমার ভোগে যেন ঘুণাক্ষরেও ব্যাঘাত না হয়।’

এইরূপ সকল দিকেই দেখা যায় যে য়ুরোপের লক্ষ্যই যেন কেবল ভোগের উপর। এমন কি ভগবানের নিকট—ভক্তের যে ঐকান্তিকী প্রার্থনা—তাহাতেও যেন ভোগের গন্ধ মাখান রহিয়াছে বোধ হয়। ‘ভগবন্ আমার নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ন আমাকে দাও,’—অর্থাৎ আমার নিত্য ভোগের যেন ব্যাঘাত না হয়। যাহাদের জীবনের লক্ষ্যই ভোগ, তাহারা ভগবানের কাছে যে সরল ভাবে তাহাই বলে, সে ভাল কথা।

ভাল হউক, মন্দ হউক, বিদেশীয় কোন নীতির বা শাস্ত্রের ভাল মন্দ দেখাইবার জন্য, আমরা লিখিতেছি না। আমাদের শাস্ত্রে বারম্বার বলা হইয়াছে—যে ভারতভূমি কর্ম্মভূমি—অন্যান্য ভূমি ভোগ ভূমি, এই কথাটা বুঝিবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা না করিয়া, আমরা যে ভোগ ভূমির আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে যাই—সেটা আমাদের দারুণ ভুল। এই ভুলে আমরা যে ভুগিতে বসিয়াছি, তাহাই বলিতেছি।

চারি দিকে চাহিয়া দেখুন, ভোগ বৃদ্ধির জন্য ইংরাজিওয়ালা উপার্জ্জনে ব্যস্ত। স্বীকার করি—দুর্দ্দমনীয় অর্জ্জন স্পৃহা বলে ইংরেজ আজি ইংরেজ হইয়াছে। তাহারা যে ভোগ ভূমির লোক—তাহাদের শাস্ত্র ভোগ শাস্ত্র। কিন্তু তুমি কর্ম্ম ভূমির লোক, তুমি ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও সফল হইয়াছ কি? তুমি যে ভোগ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছ—বাস্তবিক তোমার ভোগ বৃদ্ধি হইয়াছে কি? না কেবল অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বহুমূত্র, শ্বাস কাস, অকাল মৃত্যুই বাড়াইতেছ? সভাতেই দেখি, আর সমিতিতেই দেখি, কাছারিতেই যাই, আর কুঠীতেই যাই, তোমার বাড়ীতেই হৌক, আর রেল গাড়ীতেই হৌক—সর্ব্বত্রই ত তোমার মুখে কেবল দুঃখের দোহাই। ঐ রাজা মহারাজ দুর্গাচরণ যতীন্দ্রমোহন হইতে, আর ঐ ক্ষুদীরাম কুঁড়োরাম কেরাণী পর্য্যন্ত—সেই একই কথা—ভাল ক্ষুধা হয় না, ভাল নিদ্রা হয় না, ভাবিতে গেলে মাথা ঘোরে, চলিতে পা টলে, শক্তি নাই, স্পৃহা নাই। ভাই, এইরূপে, এই মূর্ত্তিতে, তুমি কি তোমার ভোগ বৃদ্ধি করিবে? একটু একটু বুঝিতেছ না কি—যে এ কর্ম্ম ভূমিকে তুমি কিছুতেই ভোগ ভূমিতে পরিণত করিতে পারিবে না।

বহু পুণ্যে এই কর্ম্ম ভূমিতে জন্মলাভ হয়। কর্ম্মেই জন্মের সফলতা হয়। অথচ কর্ম্মে ভোগের ব্যাঘাত হয় না। প্রত্যুত কর্ম্মের অনুসঙ্গ ভোগ থাকিলে, ভোগের মলামাটী ধুইয়া যায়—ভোগ কর্ম্মেই পরিণত হয়। এই এত কট্‌কিনায় এত ব্যবস্থায়, দুমুঠা অন্ন পরিপাক করিতে পারিতেছ না, ভাল, কিছু দিন নিয়মিতরূপে অতিথি ব্রাহ্মণের সৎকার করিয়া, দেবতা পিতৃপুরুষদের পূজা করিয়া, অন্ন গ্রহণ করিয়া দেখ দেখি,—সেই অন্ন কেমন সুখদ সুপথ্য হইবে—আজি যাহা শূকর পেটের পূরণ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই আবার তখন পঞ্চ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি বলিয়া জ্ঞান হইবে। তাই বলি, কর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ভোগে পরিণত না করিয়া, ভোগকে কর্ম্মের অনুসঙ্গ করিয়া কর্ম্মে পরিণত কর। আপনা আপনি বুঝ, যে কি করিলে আমরা এই কর্ম্ম ভূমিতে বাস করিবার সত্য সত্যই প্রকৃত অধিকারী।

অমিয় নিমাইচরিত।

শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণন।*

ভারতবর্ষে একজন মাত্র শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ আছেন। তিনিই শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ। ইহা ভাবিতে গেলে মনে একটা গভীর দুঃখের উদয় হয়, কিন্তু সে সঙ্গে একটা সুশীতল সান্ত্বনা আসিয়া ও সে দুঃখের অপনয়ন করে। দুঃখ,—দ্বিতীয় শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ কেহ নাই। আর দুই এক

---

*শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাস কর্ত্তৃক গ্রন্থিত। কলিকাতা বাগবাজার, অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস হইতে প্রকাশিত।

জন শিশিরকুমার ঘোষ থাকিলে বুঝি ভারতমাতার অশ্রুবেগ আরও কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইত, সপ্তশত বৎসরের বিষাদ-মণ্ডিত মুখে আশার বাল-সূর্য্যের হাসি আরও কিঞ্চিৎ উজ্জ্বলতর হইয়া ভাসিয়া উঠিত, ধমনীতে নবজীবনের স্রোত আরও কিঞ্চিৎ খরবেগে প্রবাহিত হইত। সান্ত্বনা,—শ্রীশিশির কুমারের মত প্রতিভাশালী মহাপুরুষ পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের শতাব্দীতে, আমাদের এই দীনা জীবনহীনা জন্মভূমিতে যে একজনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বঙ্গমাতার পক্ষে, বঙ্গবাসীর পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। আমাদের এই শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বহু মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণদাস, ব্যবহার নীতি ক্ষেত্র শ্রীদ্বারকানাথ ও শ্রীউমেশচন্দ্র, দানক্ষেত্রে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র, এবং কাব্যক্ষেত্রে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীমধুসূদন। ইঁহারা সকলেই ক্ষণজন্মা, দেবপ্রতিভাসম্পন্ন ও প্রাতঃস্মরণীয়। কিন্তু শ্রীশিশিরকুমারের মত কাহারও প্রতিভা হিমালয়-সানূ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, গঙ্গা হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে নাই, আসিন্ধু হিমাচল ভারতবাসীর হৃদয়ের উপর এরূপ কার্য্য করে নাই। “অমৃতবাজার পত্রিকা” এবং “অমৃতবাজার পত্রিকা”র শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ নব্যভারতের সঞ্জীবন মন্ত্র। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ নব্যভারতের নবজীবনের প্রণব। মহারাষ্ট্র দেশের বরদা রেলওয়ে ষ্টেশনে একজন বাঙ্গালী পর্য্যটক ‘টিকিট’ কিনিতেছেন। “টিকিট কালেক্টর” একজন মহারাষ্ট্র দেশীয় ভদ্রলোক। পরিধানে ধুতি, গায়ে চাপকান, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি। পর্য্যটককে স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কি বাঙ্গালী?” পর্য্যটক আত্মপরিচয় দিলে তাঁহাকে পরম সমাদরে তাঁহার কক্ষে আহ্বান করিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’র শ্রীশিশিরকুমার ঘোষকে চিনেন?” তিনি শিশিরকুমার সম্বন্ধে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে একটি দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন—“কন্‌গ্রেস ও শিশিরকুমার ঘোষ মাত্র আমাদের ভবিষ্যত আশা।” এরূপে ভারতবর্ষের স্বাধীন বা অধীন রাজ্যে যেখানে যাও সেখানেই শিশিরকুমারের নাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে শুনিবে। দরিদ্রের কুটীর হইতে সম্রাজ্ঞী-প্রতিনিধির প্রাসাদ পর্য্যন্ত শিশিরকুমারের নাম সর্ব্বত্র উৎপীড়িতের আশ্রয়, উৎপীড়নকারীর আতঙ্ক। ভারতের ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে ইংলণ্ডের “মহাসভা” পর্য্যন্ত শিশিরকুমারের প্রতিভা বিদ্যুল্লতার ন্যায় বিচিত্র ক্রীড়া করিতেছে।

যশোহর জেলার একটি সামান্য পল্লীতে, অতি সামান্য অবস্থায়, জন্মগ্রহণ করিয়া, পদগৌরব হীন, অর্থ হীন, আশ্রয় হীন শিশিরকুমার কিসে এতাদৃশ প্রতিষ্ঠাভাজন হইলেন? তাহার একমাত্র উত্তর—প্রেমে। তাঁহার কৃতিত্বের মূলমন্ত্র কি?—প্রেম। তাঁহার অপূর্ব্ব আত্মচরিতের—‘শিশিরকুমার চরিতের’—ভিত্তিভূমি কি?—প্রেম। প্রেমে মানুষকে দেবতা করিতে পারে, দেবতাকে নরলোকে অবতীর্ণ করিতে পারে। প্রেমে পৃথিবীকে স্বর্গ করিতে পারে, স্বর্গকে পৃথিবীতে আনিতে পারে।’ Heaven itself descends in love—প্রেমে স্বয়ং ঈশ্বর অবতীর্ণ হন, ইহা কবি-কল্পনা নহে। আমরা শিশিরকুমারের জীবনে এই মহা সত্যের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। তাঁহার জীবনে প্রেমের কি অপূর্ব্ব আবর্ত্তন। হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে পবিত্র বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রেম-গঙ্গা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত কলেবরা হইয়া এবং ভারতভূমি উর্ব্বরা ও পবিত্র করিয়া আজ কি অনন্ত সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। সেই বিষ্ণুপদ তাঁহার পিতৃমাতৃ প্রেম; সেই অনন্ত সমুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম। তাহার মন্থনের দেবদুর্লভ ফল—**এই অমিয় নিমাইচরিত**।*

শিশিরকুমার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে দীক্ষিত হইলেন। জ্ঞানের ঐরাবতকে উড়াইয়া শিশিরকুমারের প্রেমগঙ্গা শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে অবারিত, অজস্র বেগে ছুটিল। “এই অনন্তের পাছে যে অনন্ত আছে” শিশিরকুমারের “প্রেমসিন্ধু” বহু সাধনার পর সেই অনন্তের দিকে ছুটিল। তখন শিশিরকুমারের হৃদয়ের অবস্থা কি হইল, তাঁহার নয়নে কি স্বর্গ খুলিয়া গেল—তাহা

---

*এই প্রবন্ধে নিমাইচরিত রচয়িতার অতি উৎকৃষ্ট জীবন বৃত্তান্ত অংশটুকু স্থানাভাব বশতঃ অপ্রকাশিত রহিল। কিন্তু সে অংশ এতই উৎকৃষ্ট যে পাঠকবর্গকে তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত করিতে হইল বলিয়া আমরা একান্ত ক্ষুব্ধ হইলাম এবং কল্পনা রহিল যে সুবিধা পাইলে কোন সময়ে তাহা প্রকাশিত করিয়া আমরা নিজেও পরম আনন্দিত হইব এবং পাঠকবর্গেরও আনন্দবর্দ্ধন করিব। সঃ।

বুঝাইবার জন্য তিনি তাঁহার "অভিন্ন কলেবর শ্রীবলরাম দাস"এর যে দুটি পদ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার গ্রন্থের আরম্ভে 'প্রার্থনায়' শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

"তপ্ত বালুকায় আছিনু শুইয়া, চকিতের মত এলো।
শীতল নিকুঞ্জে, যথা ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
গৌর আমায় নিয়া গেল।
কি গুণে আইল, কেন দয়া হলো,
কিছু আমি নাহি জানি।
সরল বলিতে, শ্রীগৌর আমার,
অসাধন চিন্তামণি।
কুঞ্জে নিয়া গেল, অঙ্গ জুড়াইল,
আমি ইতি উতি চাই,
সুন্দর এমন শীতল কানন,
কভু আমি দেখি নাই।"

কি প্রেমাস্পদ, শান্তিরসাস্পদ, আনন্দপ্রদ স্থান! ইহাই বুঝি শ্রীমদ্ভাগবতকারের বৃন্দাবন। ইহাই সেই "শ্যামকুঞ্জ, রাধাকুঞ্জ।" বৃন্দাবনের বালক বালিকাদের গাহিতে শুনিয়াছিলাম—

"শ্যামকুঞ্জ, রাধাকুঞ্জ, গিরি গোবর্দ্ধন,
মধুর মধুর বংশী বাজে এই বৃন্দাবন।"

গীত কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল, হৃদয় উদ্বেলিত করিয়াছিল। কিন্তু কই? সে বৃন্দাবন ত চক্ষে দেখি নাই। আজ শিশিরকুমার সেই বৃন্দাবন দেখাইলেন। সেই বৃন্দাবন তাঁহার হৃদয়ে দেখিলাম। পাশ্চাত্য শিক্ষায় জর্জ্জরিত, পাশ্চাত্য দর্শনে উৎপীড়িত, পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রতারিত আমরা হতভাগ্যগণ কি এই "সুন্দর এমন, শীতল কানন" দেখিতে পাইব না? ভগবন্! তুমি দয়াময়। আমাদের এ দুর্গতি দেখিয়া বুঝি এত দিনে তোমার হৃদয় আর্দ্র হইয়াছে। যেই জীবের উদ্ধারের জন্য তুমি কিশোর বয়সে কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহাদের উদ্ধারের জন্যই বুঝি তুমি প্রতিভাশালী শিশিরকুমারকে এরূপে তোমার শ্রীচরণে আকৃষ্ট করিয়াছিলে এবং তাঁহার হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া তোমার এ 'অমিয়' চরিত প্রণয়ন করাইয়াছ। (ক্রমশঃ)

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

১ম ভাগ—৩য় সংখ্যা। আষাঢ়—১৩০০।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ঃ—

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার; শ্রীনবীনচন্দ্র সেন; শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল্; শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্; শ্রীঅক্ষয়কুমার স্থর, এম্, এ, বি, এল্; শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ; শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	অমিয় নিমাইচরিত	৬৫
২।	জ্যোতিষ প্রবন্ধ	৬৮
৩।	মহামায়া	৭০
৪।	সম্বন্ধ নির্ণয় (পিতা ও পুত্র)	৭৪
৫।	প্রজা-শক্তি	৭৮
৬।	স্বজাতি সমানুভূতি	৮৪
৭।	একটী পুরাতন কথা	৮৯
৮।	গান	৯৫
৯।	উচ্ছ্বাস ("আবাহন" পাঠে)	৯৫
১০।	গৌর-গীতি (পদ্য)	৯৬

হুগলী,
সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আষাঢ়—১৩০০।

এই সংখ্যার মূল্য ⁄১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হইবে। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার সম্পাদকতার ভার লইয়াছেন, কোন ব্যক্তি বিশেষ ইহার সম্পাদক নহেন।

সম্পাদক-সমিতির নাম আপাততঃ প্রকাশিত হইল না। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনের জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রীযন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ। } আষাঢ়, সন ১৩০০ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

অমিয় নিমাইচরিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পাঠক বোধ করি এখন বুঝিয়াছেন "অমিয় নিমাইচরিত" কি অমূল্য গ্রন্থ—বুঝিয়াছেন কি সমুদ্র, কি সাধনার দ্বারা মন্থন করিয়া শিশিরকুমার এই অমিয় তুলিয়াছেন। তাঁহার ভগবতপ্রেম সেই ক্ষীরসমুদ্র, তাঁহার অধ্যবসায় সেই মন্থনদণ্ড এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা সেই মথনরজ্জু। এক মাত্র তাঁহার স্বজাতিকে—মানব জাতিকে—এই অমিয় পান করাইবার জন্য তিনি ক্ষীণ, রুগ্ন শরীরে এ সমুদ্র মন্থনশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। বলরাম দাসের কবিতার দ্বারা তিনি এই মহৎ উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়াছেন—

"যেন উপকার আপনি করিলে
আমি শোধ দিব ধার।
এই জগ মাঝে গৌরাঙ্গ গাওয়াব,
যতদিন বাঁচি আর।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা লিখিয়া লিখিয়া
আগে জানাইব জীবে।
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা কর্ণেতে পশিলে,
অবশ্য তোমার হবে।

এমন পাষাণ ত্রিজগতে নাই
যে গৌরাঙ্গ-লীলা পড়ি,
ধৈর্য্য ধরি রবে মোটে না কান্দিবে,
না দিবে সে গড়াগড়ি।”

আমাদের বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণ-চরিত’ এবং শিশিরকুমারের “অমিয় নিমাই চরিত” আমাদের সাহিত্যে ও ধর্ম্মে দুইটি যুগ সঞ্চারী গ্রন্থ। ‘কৃষ্ণ চরিত’ অনেকে পড়িয়াছেন ; সেই ‘আদর্শ মনুষ্য’ বা ঈশ্বরাবতার দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। এখন একবার “অমিয় নিমাইচরিত” পড়িয়া প্রেমাবতার দেখিয়া প্রাণ শীতল করুন। সত্য সত্যই “এমন পাষাণ ত্রিজগতে নাই” যে শিশির কুমারের এই প্রেমভাণ্ডার গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে আর্দ্র হইবে না। প্রেমে ত হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইবেই, তদ্ভিন্ন এই গ্রন্থ পড়িবার আর একটি গুরুতর প্রয়োজন আছে। তাহা কি ? বলিতেছি।

অনেক দিনের কথা নহে—এমন কি সে দিনের কথা বলিলেও চলে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ণে অঙ্গুলি অর্পণ করিতেন। খৃষ্টান মিশনরির, ও তস্য শিষ্য ব্রাহ্মদের কল্যাণে, ততোধিক কৃষ্ণোপাসকদের কল্যাণে, শ্রীকৃষ্ণের তুল্য নিন্দাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ এ জগতে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আজ “থিওসফিক সোসাইটির” কৃপায় ও বঙ্গ সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্রের ও দু একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের কৃপায়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নয়নাবরণ বোধ হয় কিঞ্চিৎ অপসারিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁহাদের মধ্যে যেন দাঁড়াইবার কিঞ্চিৎ স্থান পাইয়াছেন। এখন চারি দিকে গীতা ও গীতার শ্রীকৃষ্ণ লইয়া দেশব্যাপী একটা তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। অনেকেরই কাছে এখন শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর ‘অবতার’ না হউন, অন্ততঃ ‘আদর্শ-পুরুষ’। পৌরাণিক যুগের শেষ সময় হইতে যে কর্দ্দম রাশিতে শ্রীকৃষ্ণ চাপা পড়িয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই মঙ্গলময় ইচ্ছাক্রমে যেন তাহা সরিয়া যাইতেছে এবং তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্ণ ঐশ্বর্য্যে আমাদের নয়নে আবির্ভূত হইতেছেন। প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাবলে দেশে এক প্রকার ‘কৃষ্ণ ভক্তির’ বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। তথাপি তাঁহার ব্রজলীলা সম্বন্ধে সন্দেহ এখনও বোধ হয় সকলের হৃদয় হইতে সমান ভাবে

অন্তর্হিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ ‘ব্রজলীলা’ অপ্রমাণ্য ও অবিশ্বাস্য বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। এখন যদিও মহৎ ব্যক্তির ন্যায় ভ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ সমালোচনা ‘কৃষ্ণচরিতের’ নূতন সংস্করণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মহাগ্রন্থে ‘কৃষ্ণপ্রেম’ কথাটি কোথাও পাইলাম না। তিনি অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে গোপীদিগের ‘কৃষ্ণভক্তি’ বলিয়াছেন, ‘কৃষ্ণপ্রেম’ বলেন নাই। তাহাদের সেই কৃষ্ণভক্তি পতিভক্তির সদৃশ বলিয়াছেন, কিন্তু পতিপ্রেম সদৃশ বলিতে যেন সাহস করেন নাই। এই পর্য্যন্ত উঠিয়া উপসংহার কালে আবার আরও নামিয়া পড়িয়াছেন। তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন—“ঐতিহাসিক তত্ত্ব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু এই— * * * * *
তিনি শৈশবে রূপ-লাবণ্যে এবং শিশু-সুলভ গুণ সকলে সর্ব্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। * * * * গোপালগণ প্রতি এবং গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি স্নেহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব ও তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।”

এখন জিজ্ঞাস্য যে যখন শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর মাত্র বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ “সর্ব্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন” না বলিয়া “সর্ব্বজনের প্রেমাস্পদ হইয়াছিলেন” বলিতে ক্ষতি কি ? “গোপ বালিকাগণ প্রতি তিনি স্নেহশালী ছিলেন” না বলিয়া “গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি প্রেমশালী ছিলেন” বলিতে ক্ষতি কি ? “কৈশোরেই প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব” প্রচার করিতেছেন, এমন একটি দেবপ্রতিভা-সম্পন্ন, দেবরূপ-সম্পন্ন, বালক দেখিলে আমরা ঊনবিংশতি শতাব্দীর শিক্ষিত মহোদয়গণও কি প্রেমে অধীর হইয়া, তাঁহার পূজা করিতে যাই না ? কোমলপ্রাণা রমণীগণ কি পতি পুত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহার পূজার্থ ছুটিয়া যান না ? প্রেমে অধীর হইয়া তাঁহাকে অঙ্কে লইয়া, বুকে লইয়া, মুখে চুম্বন করেন না ? তাঁহাকে কি আপন পতিপুত্রের অধিক প্রেম করেন না ? যাহারা তাঁহার প্রতি এরূপ প্রেমবান হইবে, তিনি কি তাহাদের প্রতি প্রেমবান হইবেন না ? পল্লীগ্রামে সামান্য একটি সুন্দর সন্ন্যাসী বালক আসিলে কি কাণ্ডটা হইয়া থাকে তাহা কি কেহ দেখেন নাই ? লেখক স্বচক্ষে এরূপ একটি কাণ্ড

দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তবে ‘কিশোর’ শ্রীকৃষ্ণের এবং সরলা অশিক্ষিত ‘কিশোরী’ গোপীগণের প্রেমে কলঙ্ক স্পর্শিবে কেন? কিশোর বয়স্ক একটি বালক ঘোরতর পাপিষ্ঠ হইলে ত সেরূপ প্রেম তাহার পক্ষে অসাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব গ্রন্থে মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিতেরই প্রাধান্য স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু সে কৃষ্ণচরিতের পূজা কুত্রাপি নাই। আসিন্ধু হিমাচল ব্রজলীলার কৃষ্ণেরই পূজা প্রচলিত। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব ব্রজলীলার কৃষ্ণপ্রেমে ও গোপী প্রেমেই দশা প্রাপ্ত হইতেন—কেন? তাহা হইলেই বুঝিতে হইতেছে যে ব্রজলীলার মধ্যে আধ্যাত্মিক, রূপক ও উপন্যাস থাকিলেও এই ‘কৃষ্ণপ্রেম’ ও ‘গোপীপ্রেম’ রূপক কি উপন্যাস নহে। শ্রীচৈতন্যদেব একটি রূপক কি উপন্যাস লইয়া এরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? তাই বলিতেছিলাম শিশিকুমারের এই ‘অমিয় নিমাইচরিত’ পড়িবার একটা অতি গুরুতর প্রয়োজন আছে। এই অসামান্য গ্রন্থ পাঠ করিলে ‘কৃষ্ণপ্রেম’ ও ‘গোপীপ্রেম’ যে কি পবিত্র পাষাণদ্রবকারী ‘অমিয়’ তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। শিশিরকুমারের এই অদ্ভুত গ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকের কাছে দিবার সময় আমরা এই কথাটা আরও খুলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত ব্রজের প্রেমলীলার একটি জীবন্ত, জ্বলন্ত, অভ্রান্ত উদাহরণ। এই প্রেমলীলার পবিত্রতা, উচ্চতা, গভীরতা এবং জীবের পরিত্রাণকারিতা অচিন্তনীয় উদাহরণের ছলে বুঝাইয়া দিবার জন্যই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ আবার শ্রীগৌর হইয়া এই বঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হায়! আমরা পতিত বঙ্গবাসী তাঁহাকে এখনও চিনিলাম না।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

জ্যোতিষ প্রবন্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাহু ও কেতু। রাহু ও কেতু গ্রহগণের মধ্যে পরিগণিত নহে। ইহারা চন্দ্রের পাত মাত্র; এবং বক্রগতি দ্বারা (অপরাপর গ্রহগণের ন্যায় বামাবর্ত্তে ভ্রমণ বা গমন করে না) দক্ষিণাবর্ত্তে ১৮ বৎসর, ৭ মাস, ১৮ দিন, ১৫ দণ্ডে রাশিচক্র ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহাদের দৈনিক গতি ৩ কলা, ১০ বিকলা, ৪৫ অনুকলা। প্রত্যেক রাশি ভোগের কাল ১ বৎসর, ৬ মাস ও কুড়ি দিন। প্রতি বৎসর ইহারা ১৯ অংশ, ১৯ কলা ও ৪৪ বিকলা রাশিচক্রে সরিয়া যায়।

হার্শেল বা য়ুরেনাস্। হার্শেল নামক জনৈক ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত (Dr. William Herschel) ইংরাজী ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে সর্ব্বপ্রথম এই গ্রহ আবিষ্কার করেন। তাঁহারই নামানুসারে এই গ্রহের নামকরণ হইয়াছে। এই গ্রহকে য়ুরেনাস্ও বলিয়া থাকে। এই গ্রহ ৮৪ বৎসর, ২৫ দিন, ১৯ হোরা, ৪১ মিনিট ও ৩৬ সেকেণ্ডে, একবার মাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ইহার প্রত্যেক রাশি ভোগের কাল ৭ বৎসর ও ২ দুই দিনের কিঞ্চিদধিক, এবং শনি সদৃশ পাপগ্রহ বলিয়া বর্ণিত। ইহার বর্ণ শুক্রের আভাযুক্ত ঈষৎ নীল। ৮ আটটি উপগ্রহ এই গ্রহের চতুষ্পার্শ্বে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থে এই গ্রহের কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

নেপ্‌চুন্। ইংরাজী ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই গ্রহ নূতন আবিষ্কৃত হয়। ১৬৪ বৎসর, ৮ মাস, ২৬ ছাব্বিশ দিনে, এই গ্রহ একবার মাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ইহার প্রত্যেক রাশি ভোগের কাল ১৩ তের বৎসর, ৮ আট মাস, ২২ বাইস দিন, ৪ চারি ঘণ্টা মাত্র। এই গ্রহের দুইটি মাত্র উপগ্রহ অদ্যাবধি জানা গিয়াছে। ইহাও পাপ গ্রহ মধ্যে পরিগণিত।

উল্লিখিত গ্রহগণের যে রাশি সংক্রমণের কাল লিখিত হইল, তাহা সূক্ষ্ম নহে; স্থূল মাত্র। ঐ নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে উহারা রাশি সংক্রমণ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু ঠিক সেই প্রকৃত অঙ্কাংশে আসিয়া উপনীত হয় না। সেই অঙ্কাংশে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে যে নির্দ্দিষ্ট সময় লাগে, তাহাকে গ্রহগণের সূক্ষ্ম সংক্রমণ কাল কহা যায়। তাহার পরিমাণ এইরূপ—

রবি যে দিবসে, যে বারে, যে রাশির নির্দ্দিষ্ট অংশ হইতে গমন করে, ২৮ বৎসর পরে, ঠিক সেই দিবসে, সেই বারে, সেই নির্দ্দিষ্ট অংশে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অবধি মাস সংখ্যা, মাসের সংক্রান্তি ও যে যে তারিখে যে যে বার তাহা পুনরায় পূর্ব্বমত ঠিক্ সেই সেই রকমই হইয়া থাকে।

এইরূপ চন্দ্র ১৯ বৎসর পরে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানের নির্দ্দিষ্ট অংশে ফিরিয়া আইসে। সেই আগত কালের পর হইতেই আবার পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণিমা, অমাবস্যা তিথি ও নক্ষত্রাদির পূর্ব্বের ন্যায় ভোগ হইয়া থাকে। মঙ্গল ৭৯ বৎসর পরে আপনার নির্দ্দিষ্ট পরিত্যক্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। বুধ ৪৬ বৎসর পরে নিজ অংশে ঘুরিয়া আইসে। এইরূপ বৃহস্পতি ৮৩ বৎসরে, শুক্র ৮ বৎসরে, শনি গ্রহ ৫৯ বৎসরে এবং রাহু ও কেতু ৯৩ বৎসরান্তে পূর্ব্বে পরিত্যক্ত, আপনার সেই বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অঙ্কাংশে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে।

গ্রহগণের রাশি ভোগের নির্দ্দিষ্ট কাল ভোগাবসান হইতে না হইতেই যদি উহারা উহাদিগের পরবর্ত্তী রাশিতে গমন করে, তবে ঐ সকল গ্রহগণকে অতিচারী এবং উক্ত গমন কালকে অতিচার কহা গিয়া থাকে। অতিচারী অবস্থায় গ্রহগণ পরবর্ত্তী রাশিতে ভোগের কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব রাশিতে ফিরিয়া আইসে। কিন্তু যে সকল অতিচারী গ্রহ পূর্ব্ব রাশিতে ফিরিয়া না আসিয়া, যে রাশিতে অতিচারী হইয়া স্থিতি করে, সেই রাশির পরবর্ত্তী রাশিতে গমন করে, তবে সেই সকল গ্রহদিগকে মহাতিচারী কহা গিয়া থাকে। কোন বৎসরে বৃহস্পতি গ্রহ এইরূপ মহাতিচারী হইলে সেই বৎসরকে লুপ্ত সম্বৎসর বলে। (ক্রমশঃ)

মহামায়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গঙ্গাতটে একটী বটবৃক্ষ মূলে একজন অনাথ পথিক উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া ছিল। রোগীটী মল মূত্রে অপরিষ্কৃত থাকায়, কেহই তাহার নিকট দিয়া যায় নাই, জল জল করিয়া কত আর্ত্তনাদ করিয়াছে, কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই। সন্ধ্যার সময়ে মহামায়া গঙ্গায় জল আনিতে যাইয়া রোগীর অবস্থা দেখিয়া শোকাকুল চিত্তে আমাকে সমুদায় বিষয় জানাইল। আমি তৎক্ষণাৎ ঔষধের বাক্স লইয়া রোগীর নিকট উপস্থিত হইলাম কিন্তু সে স্থান এত দুর্গন্ধময় যে আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না, এমন সময় দেখিলাম মহামায়া আসিয়া উপস্থিত। সে তৎক্ষণাৎ যাইয়া রোগীকে পরিষ্কৃত করত ধৌতবস্ত্র পরাইয়া একটী কম্বলে শোয়াইল, আমি স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। তখন রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার রোগ নির্ণয় করত ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলাম। মহামায়া আমার আদেশ মত সাগু প্রস্তুত করিয়া আনিল। তাহা আহার করিয়া ও ঔষধের গুণে ও মহামায়ার শুশ্রূষায় রোগী কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু মহামায়া সমস্ত রাত্রি রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে। প্রাতে যাইয়া দেখিলাম রোগী চৈতন্যলাভ করত ধীরে ধীরে তাহার সহিত কথা কহিতেছে। উৎসাহিত হইয়া রোগীকে বাড়ীতে আনিলাম। মহামায়ার যত্নে এক সপ্তাহের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। সে আর আমাকে ছাড়িল না। আমি তাহাকে মহেন্দ্র বলিয়া ডাকিতাম। সে মহামায়াকে মা বলিত এবং মাতার ন্যায় ভক্তি করিত।

এই ঘটনাতে মহামায়ার সুখ্যাতি চারি দিক বিস্তৃত হইল, কিন্তু অপবাদ ঘুচিল না; তবে লোকের অভক্তি কতক পরিমাণে কমিয়া আসিল। ডাক্তার বাবুর মানসিক ভাবের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হইল না।

আর একটী ঘটনা হইল, যাহাতে মনে করিলাম, ডাক্তার বাবু এবার আমাদের উপর সদয় হইবেন, কিন্তু ফলে তাহার কিছুই হইল না। কোন কারণে যাহার উপর একবার বিদ্বেষ জন্মে, তাহার উপর সহজে প্রসন্ন হওয়া যায় না।

এক দিন রাত্রিতে ডাক্তারপত্নী আকুল ভাবে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। শুনিলাম ডাক্তার বাবু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অপরিমিত সুরাপান করিয়া প্রথমতঃ উন্মত্ত হইয়াছিলেন, পরিশেষে অচেতন হইয়া হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে আসিলাম। মহামায়াও তাঁহার পত্নীর সহিত আসিল। আমি ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম, মহামায়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত হইল, প্রভাত হইলে তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পত্নী তিলকে তাল করিয়া বাড়ীতে এতগুলি লোক আনিয়াছেন, ইহাতে ডাক্তার বাবু যার পর নাই বিরক্ত হইলেন। তবে মহামায়ার কথা শুনিয়া তাহার প্রতি

প্রীত হইলেন, প্রকাশ্যে আপন পত্নীকে কহিলেন "এই গুণেই মহামায়া—বাবুকে বশীভূত করিয়াছে।"

এই সকল অপবাদে আমি তত কাতর হই নাই, ক্রমে আমি উহা উপেক্ষা করিলাম, কিন্তু দশ জনের মুখে আমার নিন্দাবাদ শুনিয়া আমার স্ত্রী মর্ম্মান্তিকী বেদনা পাইতে লাগিলেন, মহামায়ার মনে কিছু মাত্র সুখ রহিল না।

এক দিন মহামায়া আক্ষেপ করিয়া আমার স্ত্রীকে কহিতেছিল "মা! আমি হতভাগিনী আসাতে, বাবার এমন যে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র তাহাতেও লোকে দোষ দিতেছে, আমার ইচ্ছা হয় বিষ খেয়ে মরি, শুদ্ধ অপমৃত্যুর ভয়ে তাহা করিতেছি না। মা! আমার যদি দাঁড়াইবার কোন স্থান থাকিত, তবে এই দণ্ডে আমি তথায় যাইতাম, তাহা হইলে বাবার অপবাদ ঘুচিত।" আমার স্ত্রীর নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। মহেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, সে সমুদয় কথা শুনিয়া মহামায়াকে কহিল "মা! আমার এক মাসী আছেন, তুমি যদি তাঁহার কাছে যাইয়া থাকিতে চাও, তবে আমি বেশ ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি, তোমার আর কোন ভাবনাই থাকে না।" আমার স্ত্রী বিরক্ত হইয়া কহিলেন "যা, তোর ইচ্ছা হয় ত তুই সেখানে যা, আমার মহামায়াকে আমি ছাড়িব না।"

মহামায়া ক্রমে আমার স্ত্রীর মত করাইল, পরে মহেন্দ্রের দ্বারা তাহার মাসীকে আনিল। মহেন্দ্রের মাসীর বাড়ী মেদিনীপুর জেলার কোন এক পল্লীতে। স্থির হইল যে মহামায়া তথায় যাইয়া থাকিবে এবং আমি মাসে মাসে তাহাকে পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিব। মহেন্দ্রর মাসীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, তাহার ইচ্ছা হইল মহেন্দ্রকে বিবাহ দিয়া নিজের ঘরে রাখে। মহামায়া তাহাদের এক জাতীয়া, বিশেষ মহেন্দ্র তাহাকে মাতৃবৎ স্নেহ ও ভক্তি করিত, এজন্য বিশেষ কোন উৎকণ্ঠার কারণ ছিল না। তথাপি তাহার গুণে ও চরিত্রে আমরা এতদূর পরিতুষ্ট ছিলাম যে তাহাকে বিদায় দিতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কিন্তু মহামায়া কিছুতেই আর রহিল না, আমাদিগকে কাঁদাইয়া এবং নিজে কাঁদিতে কাঁদিতে মহেন্দ্রও তাহার মাসীর সহিত প্রস্থান করিল। যাইবার সময় আমি তাহাকে দুই শত টাকা দিলাম, কোন কথা কহিতে পারিলাম না, শোকে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

কৃষকের ভগ্নকুটীরে নিরাশ্রয় হইয়া যে কমনীয় কুসুম পবিত্রতা বিকিরণ করিতেছিল, তাহাকে সযত্নে নিজের ঘরে আনিয়া এতদিন রক্ষা করিতেছিলাম, সে পবিত্র সৌরভে হৃদয়ে কত ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, আজ অপবাদের ভীষণ অত্যাচারে তাহা আমার গৃহ হইতে অপসারিত হইল। তাহাতেও ক্ষোভ ছিল না, কিন্তু হায় পরিণামে যাহা ঘটিল তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়।

মহেন্দ্রের মাসীর বাড়ীতে মহামায়া যাইবার কিয়দ্দিন পরেই তাহার রূপ গুণের কথা চারিদিক রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মহেন্দ্রের মাসীর একটী একতালা কোঠা, একটী গোলা, দুই খানি খড়ের ঘর ও কয়েক বিঘা ধানী জমি ছিল। ঘরে অন্য কোন লোক ছিল না, এখন মহেন্দ্র ও মহামায়া আসিল। মহামায়া আমার নিকট যে ২০০৲ টাকা পাইয়াছিল ও তাহার স্বামীর বিষয় বিক্রয় করিয়া যে ৩০৲ টাকা হইয়াছিল তাহা মহেন্দ্রের মাসীকে দিল, বৃদ্ধার আনন্দের সীমা রহিল না, সঙ্গে সঙ্গে মহামায়ার প্রতি যার পর নাই যত্ন বাড়িল। মহামায়া শীঘ্র আমাদিগকে ভুলিতে পারে নাই। সে মধ্যে মধ্যে কাঁদিত, কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত "আমার বাবা ও মার জন্য মন কেমন করিতেছে।" আমরাও কাঁদিতাম, রাত্রিতে মহামায়াকে স্বপ্নে দেখিতাম, তবে তাহার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিত না, উহা আমাদের মনের ভিতরেই থাকিত। মহামায়ার কান্না থামিয়াছে, কিন্তু আমাদিগকে চিরদিন কাঁদিতে হইতেছে।

মহামায়া যে গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছিল, সেই গ্রামে একজন দুশ্চরিত্র যুবক জমিদার ছিল। সেই ব্যক্তি লোক পরম্পরায় মহামায়ার কথা শুনিতে পাইয়া একদিন কৌশল ক্রমে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যায় এবং সেই দিন হইতেই তাহার পাপ কল্পনা প্রবল হইয়া উঠে। সেই দুরাচার ব্যক্তি প্রথমতঃ মহেন্দ্রের মাসীকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইল না। শেষে মহেন্দ্রকে নানা প্রকারে প্রলোভন, ভয় ও প্রহার দ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টা পায়, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে বল প্রয়োগের ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে জমিদারের দুই জন দরওয়ান আসিয়া মহেন্দ্রকে উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া হাত পা বান্ধিয়া লইয়া গেল। তাহার মাসী ও

মহামায়া ভয়ে ও শোকে মৃতপ্রায় হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই জমিদার স্বয়ং চারি জন দরওয়ান সঙ্গে করিয়া আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল "যদি ভাল চাও তবে দ্বার খোল ও আমি যাহা বলি তাহা শুন, নতুবা তোমাদের কাহারও রক্ষা থাকিবে না। সে তর্জ্জন গর্জ্জনে কেহ দ্বার খুলিল না। পাপাত্মা তখন দরজা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে আনিবার জন্য আদেশ দিল। অমনি দুরাত্মারা দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। সম্মুখে বৃদ্ধাকে পাইয়া তাহাকে বান্ধিয়া ফেলিল, তৎপর অত্যাচারী জমিদার নিজে গৃহে প্রবেশ করত মহামায়ার অন্বেষণ করিতে লাগিল। মহামায়া ছাদের উপর যাইয়া সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়াছে। দুরাত্মারা তাহা বুঝিতে পারিয়া সে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ছাদে উঠিল। আর রক্ষা নাই। দুরাত্মা জমিদার মহামায়াকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। রমণীর যাহা সারসর্ব্বস্ব ধর্ম্ম তাহাই রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া মহামায়া লম্ফ প্রদানে নিম্নে পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পাপাত্মারা তখন ভয়ে পলায়ন করিল। জগতের অত্যাচার ও অপবাদ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া মহামায়া অনন্তধামে চলিয়া গেল।

মহেন্দ্রের পত্রে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার অবগত হইয়া শোকে আমার হৃদয় অভিভূত হইল। তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া আমি সেই গ্রমে আসিলাম।

যে স্থানে মহামায়া পবিত্র জীবন ত্যাগ করিয়াছিল, সেই স্থানে একটী দেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করিলাম। এখনও তাহাকে মহামায়ার মন্দির বলে।

সম্বন্ধ নির্ণয়।

২

পিতা ও পুত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অতএব সন্তানের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য কেবল মাত্র তাহার বিদ্যা চর্চ্চার ভার বহন করা নহে, পুত্রকে আদর্শ-মনুষ্যরূপে পরিণত করাই পিতার প্রিয় কর্ত্তব্য। যাহার সহিত এরূপ সম্বন্ধ তাহার শিক্ষার ভার কি একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিয়া কখন পুত্রবৎসল পিতা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা হয় তাহা কেবলই অর্থোপার্জ্জনের জন্য। এমন কি অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে আত্মম্ভরিতা, দাম্ভিকতা ও তার্কিকতা ব্যতীত আর কিছুই শিক্ষা করিতে পারে নাই। বিদ্যালয় বালকের পক্ষে যেরূপ উপকারক, তেমনি অপকারক স্থান। ঘরে থাকিলে বালক হয় ত লেখা পড়া না শিখিতেও পারে, কিন্তু বিদ্যালয়ে বালক যে সকল দুর্নীতি শিক্ষা করে, তাহা অপেক্ষা সে চিরজীবন মূর্খ হইয়া থাকিলে ভাল থাকিত। এইরূপ ফল দেখিয়া শুনিয়া অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার ভার নিজে গ্রহণ করিবেন কি না, তাহা ভাবিতেছেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির নিকট অপেক্ষা, সক্ষম স্থলে, পিতার নিকট পুত্রের শিক্ষা গ্রহণ করায় যে কত দূর শুভ ফল ফলিয়া থাকে তাহা যিনি (J. S. Mill) জন্ ইষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন। (J. S. Mill) জন্ ইষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেমস্ মিল, পুত্রের শিক্ষার জন্য পিতার কিরূপ কর্ত্তব্য তাহার বহুল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশেও ঋষিরা এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু পাছে পাঠক সে সকল উপাখ্যান বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন সেই জন্য অনুসন্ধান করিয়া সে সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে আমরা চেষ্টা করিলাম না। লোকে বলে জেমস্ মিলের পুত্রকে শিক্ষা দিবার প্রণালী বড়ই কঠোর ছিল। জন্ ইষ্টুয়ার্ট মিল নিজেও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে তিনি পাঠদ্দশায় পিতাকে বড়ই নির্ম্মম বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি নিজেই একথা বলিয়া গিয়াছেন যে যদি তিনি তাঁহার জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহার অন্যান্য সুবিধার মধ্যে, বাল্যকালে পিতার নিকট তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহারি ফলে ঘটিয়াছে। আরও বলিয়াছেন যে সেই পিতৃদত্ত শিক্ষার বলে তিনি তাঁহার সমসাময়িক ছাত্রবর্গ অপেক্ষা পঞ্চবিংশতি বর্ষ অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমরা এমন কথা বলি না যে পিতা মাত্রেই জেমস্ মিল্ হইবেন। তাঁহার মত বিদ্যা বুদ্ধি সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না, তাঁহার ন্যায় অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা সাধারণের কয় জনের আছে? কিন্তু তাঁহার মত, পুত্রের মঙ্গল কামনা, পিতা মাত্রেরই থাকা বিধেয় নহে কি?

আমাদের বিবেচনায় পুত্রের শিক্ষার ভার পিতারই গ্রহণ করা উচিত। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে উচ্চ শিক্ষা দিতে হইলে দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে বহুল অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তাহা কয়জন বাঙ্গালীর আছে? এ কথা সত্য। কিন্তু সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞান ব্যতীত, অথবা এ সকল অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষার বিষয় কি আর কিছুই নাই? আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ কাল লোকের এইরূপ ধারণাই হইয়াছে বটে।

আমরা শিক্ষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। (১) অর্থকরী শিক্ষা, (২) ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা। আমাদের বালকদিগকে অর্থকরী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠান হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভার তাহাদের নিজের উপরই অর্পিত থাকে। বালকে কখন ইচ্ছা করিয়া জ্ঞানলাভ করে না। তাহাদের শিক্ষার ভার তাহাদের উপর স্থাপন করিয়া অনেকে দেখিয়াছেন যে তাহারা শিক্ষার উপযোগী কিছুই শিক্ষা করে না। সুতরাং পিতার অন্ততঃ পুত্রের নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার ভার গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি যেখানেই শিক্ষক ও ছাত্র সম্বন্ধ সেই খানেই প্রভুত্ব বা শাসনের আবশ্যকতা আছে। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে স্নেহ মমতা প্রভুত্বের বিরোধী। আমরা পিতা পুত্রের আচরণ উল্লেখ করিবার সময় দেখাইব যে প্রভুত্ব ও স্নেহ মমতা পরস্পর বিরোধী না হইয়া বরং অতি সুমধুর ভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে। পিতার শাসনে পুত্র বাল্য কালে পিতাকে কঠোর ভাবিলেও ভাবিতে পারে, কিন্তু সে বাল্যকালের কথা। পুত্র পিতার শাসনে শিক্ষিত হইলে, পরিণত জীবনে তাহার হৃদয়ে পিতার যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, সংসারে কি তাহার তুলনা আছে? পুত্রের ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষার যে প্রয়োজন আছে তাহা বোধ করি কাহাকেও প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা, উপদেশ দ্বারা আদৌ হয় না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পিতাকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য প্রতি পদে পুত্রকে আপন দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। পিতা নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রত্যেক কার্য্যের সুযোগে, সন্তানকে নিকটে রাখিবেন। কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে পুত্রের সহিত কথোপকথন করিবেন। এরূপ কথোপকথনে পুত্র যদি কোন রূপ ভ্রান্ত বা অপ্রিয় কথার উল্লেখ করে, তবে তাহাকে তাড়না না করিয়া কৌশলে তাহার ভ্রান্তি বা অপ্রিয় কথার উল্লেখ করিয়া, তাহাকে এরূপ ভাবে বুঝাইতে হইবে যাহাতে পুত্র তাহার জন্য নিজেই লজ্জিত হয়েন। পুত্র শিশু হইলে, এরূপ সহজে তাহার মতি গতির উপর আধিপত্য স্থাপন ঘটে না, তখন তাড়নারও প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেই জন্য চাণক্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন :—

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তেতু ষোড়ষে বর্ষে পুত্রং মিত্র মিবাচরেৎ ॥

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে অতি শৈশবাবধি পিতা যদি সন্তানের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন তাহা হইলে সন্তানের শিক্ষার জন্য কোন প্রকার তাড়নারই আবশ্যকতা থাকে না।

এক্ষণে প্রভুত্ব কথার অর্থ বিচার আবশ্যক—নহিলে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে না। সাধারণতঃ প্রভুত্ব অর্থে ভীতির পরিচালনা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু সত্য সত্যই কি প্রভুত্ব কেবল ভীতিব্যঞ্জক? ওই যে রাজা প্রজার উপর—প্রভু ভৃত্যের উপর—স্বামী স্ত্রীর উপর—গুরু শিষ্যের উপর—জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের উপর প্রভুত্ব পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারা কি সংসারে কেবলি ভীতির সঞ্চার করিতেছেন? ওই যে দিবসে সূর্য্য—নিশায় চন্দ্র—আকাশে মেঘ, পৃথিবীতে জল, প্রকৃতির উপর নিরন্তর প্রভুত্ব করিতেছে—উহারাও কি প্রকৃতিকে কেবল ভীতির ভাবনা শিখাইতেছে? এ সংসারে কে কাহার উপর প্রভুত্ব না করিতেছে? আপন হৃদয়ের দিকে চাহিয়া বল দেখি যে সংসারে এমন কিছু আছে কি যাহার কিছু না কিছু প্রভুত্ব তোমার হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে? কে বলে যে কেবল শ্রেষ্ঠই নিকৃষ্টের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে? ইতিহাস খুলিয়া দেখ—সম্রাট দরিদ্র প্রজার মুখাপেক্ষী—ভুবনবিজয়ী মূর্ত্তিমান প্রতাপ নিতান্ত দুর্ব্বল রমণীর স্নেহে পরাজিত—আপন জীবন-কাহিনী স্মরণ কর, কত শত ক্ষুদ্রের শক্তিতে তুমি পরাস্ত। প্রভুত্বের অর্থ পীড়ন নহে—প্রভুত্বের অর্থ হৃদয়ের উপর আধিপত্য। যেখানে প্রভুত্ব হৃদয়কে উপেক্ষা করিয়া মনের উপর আধিপত্য করিতে চাহে—সেখানে প্রভুত্ব "প্রভুত্ব" নামের যোগ্য নহে। প্রভুত্ব সেখানে পশুত্বে পরিণত। সভ্য জগতে পশুত্বের স্থান নাই—আজ হউক, কাল হউক, দশ দিন পরে হউক, সে পশুত্বের পরাজয় হইবেই হইবে।

তবে কি পিতার সম্বন্ধে সন্তানের পক্ষে ভয়ের কোন আবশ্যকতা নাই?

আছে বৈ কি। ভয় না থাকিলে কি ভালবাসার গভীরত্ব থাকে? যেখানে ভালবাসা সেই খানেই ভয়। তুমি যদি আমায় ভালবাসিয়া থাক তাহা হইলে পাছে তোমার কোন কার্য্যে বা বাক্যে আমি অন্তরে ব্যথা পাই সে জন্য তুমি সতত শঙ্কিত থাকিবে। যদি তোমার হৃদয়ে সে শঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে তুমি আমায় ভালবাসিতে পার নাই। (ক্রমশঃ)

প্রজা-শক্তি।

পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী পণ্ডিতগণ য়ুরোপ ও আমেরিক-ভূমেই প্রজাশক্তির বিকাশ দেখিয়া থাকেন। প্রজাশক্তির স্ফূর্ত্তি, ক্রমোন্নতি, পরিব্যাপ্তি সমাজনীতির সহিত সংসক্তি, রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষ প্রভৃতি কথা উপস্থিত হইলেই তাঁহারা সদর্পে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া প্রাচ্য ভূভাগ দেখাইয়া দেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা রোমের ট্রিবিউন, ফ্লরেন্সের কার্ব্বোনারী, ফ্রান্সের কমূন, রুষিয়ার নিহিলিষ্ট, আয়র্লণ্ডের ফেনিয়ান, আমেরিকার সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতির উল্লেখ করেন। স্পর্দ্ধাসহকারে কংগ্রেস, পার্লমেণ্ট, চেম্বর, রেস্‌চাগ্‌ উচ্চারণ করিয়া স্মিতমুখে শিরশ্চালনে বলিয়া থাকেন যে "ইহা তোমার আসিয়া আফ্রিকায় সম্ভবে না; এখানে রাজা অন্তঃপুরচারী হইলেও মন্ত্রীনামধারী একব্যক্তি রাজা; যথেচ্ছাচারীর আজ্ঞা পালন ভিন্ন এদেশের প্রজা আর কিছু শিখে নাই; যে দেশে জাতিভেদ আছে সে দেশে আবার প্রজাশক্তির কথা কি,—সে ত নিশার স্বপন; ঐ দেখ পারস্য, চীন এখনও কর্দ্দমে পড়িয়া আছে; ঐ দেখ জাপান পাশ্চাত্য মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গাত্রোত্থান করিতেছে; এই দেখ ভারতে আত্মশাসন বিফল হইয়া যাইতেছে—নহিলে চর্ম্মকার-সুতকে আজিও কোথাও আত্মশাসন সমিতির সভাপতি হইতে দেখিলাম না কেন? না; প্রজাশক্তি আসিয়াখণ্ডে, ভারতে, সম্ভবে না। যদি জগতে পরিচিত হইতে চাও, যদি প্রজাশক্তির বিকাশ চাও, তবে সমাজ ভাঙ্গিয়া দেও, সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিয়া নতশিরে জানু পাতিয়া উপবেশন কর, য়ুরোপ তোমার কর্ণকুহরে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দিবেন।"

আপাত-দৃষ্টিতে কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়। এই মত যে ভ্রমসঙ্কুল এই প্রবন্ধে আমরা তাহা দর্শাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু কথাটি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আনুসঙ্গিক দুই একটি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমে পাশ্চাত্য-ভূমে প্রজাশক্তির ক্রম-বিকাশ ও তাহার ফলাফলের কথা কহিতে হইবে। সবিস্তারে আলোচনা করিতে পারিব না।

অতি প্রাচীন কালের কথা কহিতে হইলে য়ুরোপের গ্রীস্‌ ও রোমের কথা কহিলেই চলে। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবগত আছেন যে গ্রীসের হেলটদিগের এবং রোমের প্লীবিয়ানদিগের অবস্থা শোচনীয়তর হইতে শোচনীয়তম সোপানে অবরোহণ করিয়াছিল। এই ভাবে যুগ যুগান্তর কাটিয়া গিয়াছে। যদিও প্রজাগণ আপনাদের শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান ছিল না, তথাপি তাহারা রাজশক্তির ক্রীড়াময়ী বীচিমালা নিরীক্ষণ করিয়া, তরঙ্গ-অঙ্গের সবেগ সঞ্চালনে দৃষ্টি-বিভ্রম উপলব্ধি করিয়া, একরূপ জড়স্থানীয়ই ছিল। অধিক আড়ম্বর না করিয়া স্থূলত ইহা বলিলেই চলিবে যে প্রজাশক্তির বিকাশ বিষয়িণী চেষ্টা কাহারও ফলবতী হয় নাই। পুরাকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া মধ্য-যুগের কথা কহিতে গেলেই, ফিউডাল সিষ্টেম প্রথার উল্লেখ করিতে হয়। আমার অধীনে দশ ঘর প্রজা আছে। আমার কথায় তাহারা বাঁচে, আমার ফুৎকারে তাহারা উড়িয়া যায়, আমার ইচ্ছার উপর তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। আমাকে তাহারা কর দিবে, আমার হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ করিবে, শান্তি-সময়ে আমার জন্য তাহারা কৃষি-শিল্পের উন্নতি সাধন করিবে, যতক্ষণ আমি ততক্ষণ তাহারা। আমি গতাসু হই আর এক ব্যক্তি আমার স্থান অধিকার করিবে। আমি আবার আমার প্রভুর অধীন, আমার মত আর শতজনে আমার প্রভুর অধীন। প্রভুর মত আর পঞ্চাশ জন আর এক জনের অধীন। প্রভুর প্রভু রাজার অধীন। এই ত স্থূলত ফিউডেল প্রথা—ইহা দাস-প্রথা, দাসানুদাস-প্রথা ভিন্ন আর কি? কখন কখন ফিউডেল চীফ্‌ বা সর্দ্দার রাজার বিরুদ্ধাচারী হইতেন। সংসারের কেহ যদি কখন স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে, সেই স্বাতন্ত্র্য কিছুকাল স্থায়ী হইলেও আমরা কি বলিব যে সংসার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে? যদিও সর্দ্দারগণের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন হইতেই ক্রমে ক্রমে পার্লমেণ্ট প্রভৃতি সভার উদ্ভব হইয়াছে, আমরা ইহাতে প্রজাশক্তির বিকাশ দেখিতে

পাই না। রাজার সহিত তুলনায় সর্দ্দারের শক্তি প্রজাশক্তি যদি বলিতে চাহেন, তাহা হইলে প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতাকেই প্রজার ক্ষমতা বলিতে হয়। আমরা ব্যতিরেকের তুলনাও ছাড়িয়া দিয়া একেবারে সর্ব্ব নিম্ন স্তরের প্রজার কথা কহিতেছি। ফলত ইংলণ্ডে এ চেষ্টা হয় নাই। যখন উপপ্লবের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে জেম্‌স্ চার্লসের সিংহাসন টলিয়াছে তখনও এ চেষ্টা হয় নাই। আজি কালি ইংলণ্ডে এ চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহাও আমাদের বিশ্বাস খাস ইংলণ্ডের প্রজামণ্ডলী দ্বারা হইতেছে না—বৈদেশিকের অধ্যবসায়ে ও প্ররোচনায় হইতেছে। বলা উচিত, যে, যাঁহারা রাজা রিচার্ডের লণ্ডন সহর বিক্রয়ের প্রস্তাবে প্রজাশক্তির বিকাশ উপলব্ধি করিয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত আমরা কখনই একমত হইতে পারিব না। রাজার অর্থের প্রয়োজন। পালস্থানে খৃষ্টান—অখৃষ্টানের ঘোর সমর চলিয়াছে। রিচার্ড বড় বীর বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। সর্দ্দারেরা আর টাকা যোগাইতে পারেন না। রাজা তখন বাধ্য হইয়া, অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন যদি অর্থ সমাবেশের জন্য একটি নগর বিক্রয় করিতে চাহেন, তাহা হইলে, তাহাতে আমরা প্রজাশক্তির বিকাশ কিরূপে উপলব্ধি করিব ? অর্থের বল, বল বটে, কিন্তু অন্য প্রকারের। ইংলণ্ডে প্রজার যাহা আছে তাহা রাজা দিয়াছেন।

নিম্নতর নিম্নতম স্তরের প্রজাগণের সমাজনীতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান, সমাজনেতার বিরুদ্ধে অভিযান, প্রথমে ফরাশির রঙ্গমঞ্চেই অভিনীত হইয়াছে। কীট পূর্ণরূপে পদদলিত না হইলে আর আততায়ীকে দংশন করিবার চেষ্টা করে না। চতুর্দ্দশ লুই ফরাশিভূমে যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকেই পারেন না। সেই মন্ত্রের সাধনা করিতে গিয়াই ইংলণ্ডে চার্লসের যোগভঙ্গ হইয়াছে।

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা—এইরূপ সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে—আমি বা দিল্লীশ্বরো বা—এই সঙ্গীত প্রথমে ফ্রান্সের রাজপথে, ফ্রান্সের নদী-বক্ষে, সেলুনে—কাফে শোণা গিয়াছিল। ইংলণ্ডে যাহা কস্মিন্ কালে সম্ভব হয় নাই, যাহা হইবে না, ফ্রান্সে তাহা হইয়াছে ও তাহা হইবে ও পাশ্চাত্য ভূমের অপর দেশে তাহা হইতেছে। চঞ্চলমতি ফরাশি-যুবক যেদিন চিন্তা করিলেন—ভাল, কেন ঐ ব্যক্তি রাজা হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিবে, রত্নরাশি মন্থন করিয়া সুখের নবনীত লোকে কেন উহার মুখে ধরিবে, আর সহায়হীন, সম্পত্তিহীন, ভবনহীন, স্বজনহীন কেন আমি ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুর হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব, কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করিবে না ? কেন উনি ওখানে, কেন আমি এখানে ? কেন উনি রাজা, কেন আমি প্রজা ; উহারও দুই হস্ত দুই পদ, আমারও দুই হস্ত দুই পদ ; উনিও মানুষ, আমিও মানুষ ; আমাতে উহাতে যখন কোন বিভেদ নাই, তখন কোন প্রভেদই থাকিতে দিব না। ঈশ্বর কেন উহাকে সোণার চখে দেখিবেন, আর কেন আমার দিকে চাহিয়াও দেখিবেন না। সে ঈশ্বর থাকেন থাকুন তাঁহাকে মানিব না। সমান হইব, সমান করিব। যুক্তি (Reason) দেবীই সত্য।—সেই দিন জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কে না জানে, যে দিন হৃদয়ের মর্ম্মস্থল-ভেদী, সর্ব্ব-হৃদয় সংস্পর্শী, বিষাদের সাক্ষাৎ ছবি, আশা-বৈরাগ্য জড়িত—ঐ তর্ক, ঐ ক্রন্দন, সঙ্গীতরূপে, পর্ব্বত-কন্দর মন্থন করিয়া, বিজন বিপিন প্রতিধ্বনিত করিয়া, সাগর-ব্যোম পরিব্যাপ্ত করিয়া, নর নারী মাতাইয়া ফ্রান্স প্লাবিত করিয়াছে—সেই দিন রক্তময়ী সিন্‌নদী সাগর বক্ষে শোণিত ধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে,—সার্লমানের, চতুর্দ্দশ লুইয়ের সিংহাসন-খণ্ড বালুকার ন্যায় ফুৎকারে উড়িয়া গিয়াছে। আর লোক-জগৎ, ভীত, স্তম্ভিত, স্পন্দ-রহিত হইয়া নির্নিমেষ-লোচনে রক্তময় অগ্নিময়, উপপ্লবময়, ছিন্নস্কন্ধ ফ্রান্সের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছে ! সেই দিন কি একই দিন, সেই গর্ভাঙ্কই কি অভিনয়ের শেষাঙ্ক—না, তাহা নহে। আজ তাহা য়ুরোপ ভুমের সর্ব্বত্রই মেঘাচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, রঙ্গমঞ্চের পটের অন্তরালে রহিয়াছে। সোসিয়ালিষ্ট, কমূনিষ্ট, নিহিলিষ্ট দলে দলে বিচরণ করিতেছে। বর্ষে বর্ষে মে মাসের প্রথম দিনে তাহাদিগকে আমরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রধান প্রধান নগরে পরিভ্রমণ করিতে দেখিতেছি। বিদ্যুৎ-বিকাশের ন্যায় কচিৎ কোথাও ডিনামাইট-বিভ্রাট পরিলক্ষ করিতেছি। মুকুটধারীগণ, মন্ত্রীগণ, পণ্ডিতগণ ভয়-চকিত হইয়া সমাজ রক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছেন। ভগবানই জানেন ভবিষ্যতের মনে কি আছে।

য়ুরোপ ভূমের প্রজাশক্তির এই যে অপ্রাকৃতিক বিকাশ তাহা কখনই শুভ ফলপ্রদ নহে। যাহা ঘটিয়াছে তাহা রাজার দোষে, তাহা সমাজের

দোষে, তাহা শাসননীতির দোষে। অর্থ-বল-প্রধান দেশে ইহা নিশ্চিতই অনর্থ ঘটাইবে। ইহাতে সামঞ্জস্যের কথা নাই। ইহারা রাজার রাজ্য ভাগ করিয়া লইতে চায় (Land Nationalisation)। রাজার প্রতি ভক্তি নাই। যে টুকু ভয় আছে তাহা ক্রমশ অপসারিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। য়ুরোপে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ভুমণ্ডলের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শৃঙ্খলা, সভ্যতা একেবারে পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে কি না সুধীগণ কাতরে তাহারই চিন্তা করিতেছেন। পাশ্চাত্য-নীতির পক্ষপাতী পণ্ডিত মণ্ডলীকে করযোড়ে কহিতেছি যে আমার ও শিক্ষা ও দীক্ষা কাজ নাই। ও শিক্ষা ও দীক্ষা হয় নাই বলিয়াই আমি এত দিন শান্তি সুখে কাল যাপন করিয়াছি। আমার ভারতে কি হইতেছে, কি হইবে, সে আলোচনা এখন করিব না। কি ছিল তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। বপ, লাসেন, মূলর ভাষা-সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, সমাজ-নীতি, শাসন-নীতি, সম্বন্ধে তাহা যদি কখন কেহ করেন তাহা হইলে সভ্যতা মেরুর কনক শিখরে ভারতবর্ষকে সাদরে সম্ভ্রমে শীর্ষস্থান প্রদান করিতে হইবে।

ঋষিগণ প্রথমেই বলিয়া দিলেন জগৎ সংসার অনিত্য—পরমার্থ মূল। সমাজ সৃষ্টি করিয়া বলিয়া দিলেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য, আর পদ হইতে শূদ্রের উদ্ভব হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রালোচনা করিবেন—বিষয় বৈভবের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই। ক্ষত্রিয় যুদ্ধ বিগ্রহ করিবেন, দেশ রক্ষা করিবেন, রাজকার্য্য করিবেন। বৈশ্য ব্যবসা বাণিজ্য করিবেন—শাস্ত্রালোচনা বা রাজকার্য্য তাঁহার নহে। শূদ্র সেবা করিবেন অর্থে, ধীর গম্ভীরে হস্ত সঞ্চালনে পদ মর্দ্দন করিয়া স্বস্তি সম্পাদন করিবেন তাহা বুঝিতে হইবে না। পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণী দ্বিজাতীর সেবা করিবেন অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া কার্য্য করিবেন। এইরূপে সমাজ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্যাকার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বলিয়া দিলেন, “রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ!” শ্রেণী বিভাগে প্রজাগণকে স্ব স্ব স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বলিলেন ভয় নাই, ক্ষুব্ধ হইও না, অসন্তুষ্ট হইবার কারণ নাই—রাজা তোমারই জন্য—নহিলে রাজা কেন? রাজাকে বলিলেন, প্রজা-পালনই তোমার ধর্ম্ম, প্রজার জন্যই তুমি, নহিলে তুমি নিরয়গামী হইবে। সেতার, তানপূরা, বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ সকলই বাজিবে, এক তন্ত্রে বাজিবে; তদুপরি কণ্ঠস্বর; আলাপ করিতে চাও কর, কিন্তু সুরলয়ে। এই ঐক্যতান চাহে কি? —না, পরমার্থ। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলে ঐক্যতানের প্রতিধ্বনিতে শুনিতেছেন—

সম্ভবামি যুগে যুগে

এ সমাজ-বন্ধন অতীব জটিল-গ্রন্থি। এ ঐক্যতান অতীব কঠোর-সাধন। রামচন্দ্র হেন রাজা, সীতা হেন সতীকে, শূদ্র-প্রজার গুপ্ত কথা শুনিয়া, পঞ্চমাস গর্ভাবস্থায় বনবাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শত সহস্র তর্কিবেলী সহস্র সহস্র বৎসর প্রজাতন্ত্রের আলোচনা করিলেও এ রহস্যের ছায়া মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। বড় বড় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বীর, যাঁহারা য়ুরোপ-ভূমে “জুরি প্রথা” কোথা হইতে আসিল ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না, যাঁহারা আমাদের অতি প্রাচীন পঞ্চায়ৎ প্রথার মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হন না, তাঁহারা “রাজা প্রকৃতি-রঞ্জনাৎ” এই দেববানীর কি অর্থ বুঝিবেন? ইহার ছায়ার ছায়া প্রকারান্তরে ইংলণ্ডে পড়িয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ড এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছেন, আর ধরাধামে সার্দ্ধকোটী বর্গ মাইলের ভূভাগ ব্যাপিয়া উচ্চশিরে বসিয়া আছেন। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের ৪০ কোটী প্রজার প্রত্যেকটিকে ইংরেজ-রাজ রামচন্দ্রের চক্ষে দেখুন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা। চাহি না তোমার পাশ্চাত্য দীক্ষা, বুঝি না তোমার সোসিয়ালিষ্ট, নিহিলিষ্ট, চাহি না তোমার পাশ্চাত্য শক্তি সাম্য——আমার এই-ই ডিমক্রেসী। এই প্রজাতন্ত্রে প্রজাশক্তির জয় ছিল—বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এই মহতী প্রজাশক্তি—নীতি মার্গানুসারিণী, শৃঙ্খলাময়ী। প্রজাশক্তি যিনি নাই বলিয়া তর্ক-জাল বিস্তার করিবেন তাঁহাকে আমরা বলিব জগৎ সংসারই অনিত্য। আজি অনিত্য য়ুরোপ ভূমে যে নিত্য উপপ্লব অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা যদি কেহ প্রশমিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভারতের নিকট মস্তক অবনত করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি, শাসননীতি বিনীত ভাবে শিক্ষা করিতে হইবে। নতুবা ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-সূর্য্য অচিরে অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইবেন।

স্বজাতি সমানুভূতি।

স্বজাতি সমানুভূতি পরম ধন এবং ইহাতে মানুষের অশেষবিধ উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই গুণ এই ধর্ম্ম থাকায়, ইংরাজের এত শ্রীবৃদ্ধি। মহাত্মা ওয়াসিংটানের উপদেশে মার্কিণেরা যে দিন ইংরাজ প্রেরিত চা চিনি এবং জুতা ক্রয় এবং ব্যবহার না করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইল সেই শুভ দিন হইতেই তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অভ্যুদয় হইয়াছিল।

স্বজাতি সমানুভূতি ইয়ঙ বেঙ্গলের নাই বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হয় না। বাঙ্গালী "আপাদ মস্তক" পরদেশ পরজাতি-প্রিয়। তাহার পায়ে ইংরাজী জুতা, কটিতে ইংরাজ প্রস্তুত বিলাতী বস্ত্রের পায়জামা, ইংলিস্ কোটে বক্ষঃস্থল আবৃত, গলায় ফাঁসী-টানা বিলাতী কলার এবং মাথায় বিলাতী টুপি। হুঁকা কোল্কে যোগে তাম্রকূট সেবন পরিবর্ত্তে চুরট; মাগুর মাছের ঝোল ফেলিয়া টিনের চোঙায় রক্ষিত পর্য্যুষিত বিলাতী সূপের আশ্রয় লওয়া এবং টাট্‌কা মুড়ি উপেক্ষা করিয়া হাণ্টলি পামারের চৌদ্দ মাসের বাসী বিষকুট বিংশতি বার কুট কুট করিয়া দাঁতে কাটা তাঁহার অভ্যাস। সীতা সাবিত্রী অপেক্ষা মিস্‌মেরী কার্‌পেণ্টারের কাহিনী ইয়ঙ বেঙ্গলের ভাল লাগে। রামায়ণ ফেলিয়া তিনি ইলিয়ডের আদর করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ঋগ্বেদ কৃষকের গান, পুরাণাদি ঠাকুরমার গল্প মাত্র; এবং আর্য্য দর্শনকারগণ কেবল অসার বিষয় লইয়া মাথা কুটিয়াছেন, এই তাঁহার ধারণা এবং সংস্কার।

কিরূপ করিয়া ছুঁচ, সূতা, ছুরি, কাঁচি, কল্ কব্জা, দেমাটিন, দেশালই প্রস্তুত করিতে হয়; গুলি বারুদ বন্দুক কিরূপ করিলে, সহজে শত্রু নাশ করা যায়; কি উপায়ে কলঙ্ক রটনার ভয় ব্যতীত সাধ্বী বিবাহিতা কামিনীর সম্মান ধ্বংসিত হইতে পারে, যে সব গ্রন্থে এ সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা এবং উপদেশ নাই, ইদানীন্তন সুশিক্ষিত নামধারিদের মতে সে সকল একান্ত হেয় এবং অপাঠ্য। যাহাতে গুরু শিষ্যের, পিতা পুত্রের স্বামী ভৃত্যের সমানত্ব সংস্থাপন এবং মানুষ জীবন কেবল ভোগার্থ, এই মহতী শিক্ষা প্রদান না করে, সে পুস্তক পুস্তকই নয়, কথিত সম্প্রদায়ের এই দৃঢ় সংস্কার।

এই দারুণ ধারণা গতিকে তাহারা স্বজাতি সমানুভূতি দেশ বাৎসল্য শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন এবং পড়িতেছেন। এরূপ হইলেও এ কলঙ্ক যে অপনীত হইতে পারে এ আশা আমাদের আছে।

অধুনাতন শারীরিক অনেক পীড়ার ঔষধ বিলাতী। কথিত সামাজিক ব্যাধির ঔষধও ঐ জাতীয়॥ দেখা যায় যে ব্যাস বাল্মীকি মন্বাদি ঋষিদের বাক্য আমাদের নব্য সম্প্রদায় শুনিতে সম্মত নহেন। খ্যাতনামা মিত্রবরও একদিন বলিয়াছিলেন "আমার গুরু কোমতের একটি উপদেশ আমি উল্লঙ্ঘন করিয়াছি। মৃত ভার্য্যের দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ কোমত্ নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু আমি তদন্যথায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছি।" বিধবাবিবাহনিষেধক আর্য্যশাস্ত্রও যাহা করিতে সক্ষম হয়েন নাই, কোমতের দ্বারা তাহা সংসিদ্ধ হইয়াছিল। রুষীয় ভাষাভিজ্ঞ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক যজ্ঞসূত্র না থাকায় কোন জরমান্ পণ্ডিত আশ্চর্য্য প্রকাশ করায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জারমানিতেই আবার যজ্ঞ সূত্র গ্রহণ করেন। পিতৃ মাতৃ বন্ধু বান্ধবের বাক্য অবহেলা করত তিনি যে যজ্ঞসূত্র ফেলিয়া দিয়াছিলেন, জনৈক জারমান্ পণ্ডিতের কথায় তাহা আবার গললগ্ন করিয়াছিলেন। এক দিন আমাদের শিক্ষা বিভাগের পূজ্যপাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথারীতি স্বীয় পিতৃদেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় শিক্ষা বিভাগের কোন লব্ধ প্রতিষ্ঠ পরিদর্শক তাঁহার তাৎকালিক বেশভূষা দৃষ্টে বলিয়াছিলেন "যদি আপনার মত ব্যক্তিও এরূপ করেন (মরা গরুকে ঘাস খাওয়াইবার চেষ্টা করেন) তাহা হইলে আমাদের আর আশা ভরসা কোথায়?" প্রাজ্ঞ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোন কিছু না বলিয়া স্বকর্ত্তব্য করণে বাড়ীর মধ্যে গমন করিলে পরিদর্শক মহাশয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আপিসে বসিয়া টেবিলস্থিত এক খানি ইংরাজী পুস্তিকা হস্তে লইলেন। মৃত আত্মীয় এবং সাধুজনের চরিত চিন্তায় মানুষের অনেক উপকার আছে, এইটি পুস্তিকা লিখিত অন্যতম বিষয় ছিল। পরিদর্শক মহাশয়ের ঐ প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইবামাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যাগত হইলে পরিদর্শক মহাশয় বলিয়া উঠিলেন "আজ্ঞে, শ্রাদ্ধটা একান্ত মন্দ জিনিস নয়!" (ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজন গুণও যাহা) করিতে পারেন নাই একজন ইংরাজী লেখকের দ্বারা তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছিল। আমাদের এমনই

বুদ্ধি ভ্রংশ, দুরবস্থা ঘটিয়াছে বটে। আর তাহা না হইলে (বিয়োগ করা যাহার ধর্ম্ম সেই মার্স (Mars) সুত) কর্ণেল অল্‌কাটের স্থানে আমরা যোগ শিক্ষা করিতে যাইব কেন? বিধি কর্ত্তৃক বিশেষ বিড়ম্বিত, তাই ব্যাস বশিষ্ঠের বংশধরেরা ম্যাডাম্ ব্লাভেস্কির নিকট ব্রহ্ম জ্ঞানলাভে ব্যস্ত।

বলা হইয়াছে যে দেশের কথিত কলঙ্ক অপনীত হইবার আশা আছে। কুহকিনী আশা কহিতেছেন "মানুষ যে মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়ে তাহা ধরিয়াই আবার উঠিয়া থাকে। যে সর্পবিষে প্রাণনাশ করে তদ্দ্বারাই আবার প্রাণ রক্ষা হয়।" ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমরা স্বজাতি সমানুভূতি শূন্য হইয়াছি। সনাতন ধর্ম্মের কোন কিছুই আমাদের চক্ষে ভাল লাগে না। আমরা ইংরাজভক্ত; ইংরাজকে দেবতা মনে করি। অন্য ধর্ম্ম, শাস্ত্র সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরাজ, জারমান্ কিছু বলিয়া থাকিলে অথবা বলিলে আমাদের সুশিক্ষিত দল তাহা শিরোধার্য্য করিতে পারেন।

কোমত দর্শন অতি উচ্চতর শ্রেষ্ঠ দর্শন বলিয়া ইউরোপে পরিগৃহীত এবং সমাদৃত। কোমত্ বলিয়াছেন "অন্য জাতীর অগ্রে গঙ্গাতীরবাসীদের আমার প্রকাশিত দর্শন হৃদ্‌বোধ হইবে।" কোমতের এই কথায় ইহাই আভাস পাওয়া যায় যে ভারতবাসীরা তাঁহার দর্শনবাদে অনভিজ্ঞ ছিলেন না; তৎকৃত দর্শনের অনুরূপ দর্শনপূর্ব্ব হইতে ভারতে বর্ত্তমান ছিল। এইরূপ উচ্চদরের সার্টফিকেটের পর আর্য্য দর্শনের প্রতি "লেফ্‌নজোর" করিতে আমাদের সুশিক্ষিত দলের আপত্তি থাকিতে পারে না। বেদ অন্ততঃ ঋগ্বেদ সম্বন্ধে এক ভট্ট মোক্ষমূলারের মতই যথেষ্ট। তবে ঋগ্বেদ কৃষকের গান, আর, সি, দত্ত সাহেবের এই বাক্‌রোধকারী মত ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, because, because, because Mamma—ইনি তেল জল পুষ্ট ডাল ভাত ভুক্ত মানুষ; ব্রিটনভূমে ভূমিষ্ঠ গৌরাঙ্গ নহেন। ভগবৎ গীতা বিষয়ে অধিক বাক্য-ব্যয় অনাবশ্যক। এমন ইয়োরোপীয় ভাষা নাই যাহাতে ইহার অনুবাদ হয় নাই। প্রাজ্ঞ প্রোফেসার মনিয়ার উইলিয়মস্ গীতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন "ইহাতে বাইবেলের তুল্য ঈশ্বর বিষয়ক ভাব আছে।" ভট্ট মোক্ষমূলার এবং অন্যান্য বহুতর জারমান পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যের ভূয়সী প্রশংসা এবং প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই জারমান ভট্টরাজ ভারত স্থানে ইংরাজ কি কি শিখিতে পারেন "What India can teach us" এই পুস্তকে অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। কেমন ভারত আশা মহাশয়গণ! এখন আর্য্য বেদ, দর্শন, গীতা এবং আর্য্য ভাষার প্রতি প্রীতিমান হইবার জন্য আপনাদের অনুরোধ করা যাইতে পারে। কথা কন্ না যে? নীরব কেন? মৌনং সম্মতি লক্ষণং।

বিলাতীয় অন্যান্য সূক্ষ্মদর্শিদের মধ্যে সুবিখ্যাত ডাক্তার ইউয়ার্ট সাহেব গ্রীষ্মকালে বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন "তোমাদের পোষাক দৃষ্টে আমার ঈর্ষা হয়। ইহাই গ্রীষ্ম দেশের উপযুক্ত।" ফলে বাধ্য হইয়া আমাদের ইজের, চাপকান কোট্ মোজা পরিতে হয়। তিন মাস শীত ছাড়া, বাকী ক মাস দেবাদিদেব মহাদেব দিগম্বর সাজিতে পারিলেই আমরা বাঁচি। তবে পুলিস এবং সরকারী পাগলা গারদের ভয়। দেশ কাল বিবেচনা করিয়া প্রসিদ্ধ ডাক্তার চেভর্স এবং ম্যকনামারা সাহেব বিলাতী গোরাদের জন্য খেসারির ডাল আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কেবল উদরাময়ের আশঙ্কায় এদেশে তাঁহাদের ঐ ব্যবস্থার অনুসরণ করা হয় নাই। মৃত রামগোপাল ঘোষ এবং মধুসূদন দত্ত হইতে সুরু করিয়া মকারাদ্য পদার্থ পানভোজী অত্যল্প বাঙ্গালীকে দীর্ঘজীবী এবং স্বাস্থ্যসম্ভোগী হইতে দেখা গিয়াছে এবং যাইতেছে। কম্‌টিকে আর একবার আসরে আহ্বান করিতে হইতেছে। ইহার মতে কি পুরুষ কি নারী ভার্য্যা কি ভর্ত্তা বিয়োগে উভয়েরি পুনঃ পরিণয় নিষিদ্ধ। কাজেই নর নারীর "ঈশ্বরের" অভিপ্রায়ও অবহেলা করিতে হইতেছে। যাহা লইয়া আমাদের পাস্নদমতি যুবকগণ নিয়ত ব্যস্ত, এমন আর কয়েকটি বিষয় আছে। তন্মধ্যে বাল্য-বিবাহ এবং স্ত্রীস্বাধীনতা প্রধান। এই দুই বিষয়ের শুভাশুভ জ্ঞাত হইবার জন্য একবার আল্পস্ পর্ব্বত পারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দেখিতে পাইবেন, জোষাগণ কশা হস্তে পুমানগণকে বলগা-বদন-বাজীবৎ চালাইতেছেন ওরফে খেদাইতেছেন এবং উভয়ে শকট পয়োণালী গত হইয়া দুর্দ্দশার সুখের চরম সীমা প্রাপ্তি হইতেছেন। পাশ্চাত্য গৃহস্থাশ্রম অধুনাতন রমণীগণ কিরূপ রমণীয় করিয়া তুলিতেছেন দেশী রমণী ভার্য্যা সূক্ষ্মদর্শী বিলাত ফেরতেরা তাহা বলিয়া দিতে পারেন। মিল্ একান্ত অন্ধ হইয়া "Subjection of women" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আজ কাল বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে হয়তো "Subjection of men" এই প্রবন্ধ

প্রণয়ন করিতে হইত। পরমাদ্ভুত শিক্ষা প্রভাবে Jane cow মহাশয়েরা John bull হইয়া উঠিতেছেন।

ভাই ইয়ঙ বেঙ্গল! তুমি আমাদের ভয় ভরসার স্থল। কঙ্গ্রেস করিতেছ, বেশ। জুরি নোটিফিকেসন লইয়া ঝগড়া করিয়াছ, তাও বেশ। মিউনিসিপাল বিল্ সম্বন্ধেও বিশেষ কোসিস করিয়াছ, তাহাও বেশ! কিন্তু এতে তুমি ২৪শ আউন্স মাত্রায় দেশ বৎসল হইতে পার না। আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্র সাহিত্য আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রতি প্রীতিমান না হইলে তোমার প্রকৃত স্বজাতি সমানুভূতি কোথায়? তাই বলি এ সমুদায়ে অনুরত হও। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে শ্রদ্ধা কর। ইহাঁদের সুদূর পূর্ব্বপুরুষেরা পরার্থ জীবন ক্ষয় করিয়াছিলেন। ইহাঁরাও তোমার হিতব্রতে ব্রতী, অল্পে তুষ্ট এবং আর্য্য ধর্ম্ম এবং সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সতত সচেষ্ট। তোমাদের গায়ের রক্তে কত শত পাদ্রী চ্যাপলেন্ প্রতিপালিত। তাহারা এক এক জন মাসিক ৪০০৲।৫০০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। আর নবদ্বীপাদি স্থানের পণ্ডিত সামান্য একটি যোড়, কিছু চিনি এবং পাতলা এক খানি পিতলের থালের অধিক প্রাপ্ত হন না। কলির বামুন ইংরাজের পরিবর্ত্তে আর্য্য ব্রাহ্মণের পায়ে মাথা নোয়াইলে, তোমার মানের লাঘব নাই, পক্ষান্তরে যথেষ্ট মঙ্গল আছে। ভট্টাচার্য্য ঠাকুরদের টোলগুলি টোল খাইতেছে। সেগুলি তুলিবার চেষ্টা করিলে তোমার এবং স্বদেশের বিলক্ষণ ইষ্টের সম্ভাবনা। ঐ দেখ চুঁচুড়ার ডাচ্ গভর্ণরের বাটীতে বসিয়া আর্য্য টোলের উন্নতি কল্পে একটী সুদীর্ঘ কায় শ্বেত শ্মশ্রুধারী গৌরবর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজের পেন্সন হইতে মাসিক ১০০৲ টাকা মুক্ত হস্তে দান করিতেছেন। ইনি তোমাদের বাপ খুড়ার শিক্ষাগুরু। পিতৃ-গুরুর পদ অনুসরণে তোমাদের পরম ইষ্টেরি সম্ভাবনা।

উপসংহারে বক্তব্য এই, হয়তো তুমি তোমার নিজের মাথা খাইয়াছ। কিন্তু তাই বলিয়া ছেলে পিলেদের মাথা খাইও না। রুই, চিংড়ি, পাঁটার মাথা ইচ্ছা হইলে খাইতে পার। ইহাদের মাথার দিকে নজোর করিও না। ইহারা তোমার স্নেহের এবং যত্নের ধন। দেব দ্বিজ পিতৃ মাতৃ গুরুজন প্রতি ভক্তি করিতে ইহাদের শিক্ষা দাও। অর্থানর্থকারী ইংরাজির সঙ্গে ইহাদের অল্প অল্প সংস্কৃতে দীক্ষিত এবং টেড়ির স্থানে টীকিধারণে, কোট পাণ্টুলনের বদলে দেশী ধূতি পরণে এবং চাদর উড়নে এবং পদে চিত্ত চমৎকারধ্বনি বুটের পরিবর্ত্তে তালতলার চটি কিম্বা জয়পুরে নাগরা যোজনে প্রবৃত্ত কর। গোবর, চোনা এবং দুগ্ধ ব্যতীত যাহাতে গাভীর অন্য কিছু ইহারা মানস মধ্যে ধ্যান না করে, সে বিষয়ে সতর্ক হইও। ডাল ডাল্লা শাক শুক্ত এবং মাছের ঝোলেই ইহাদের নিমগ্ন রাখিবার যত্ন কর। রাইস ছাড়াইয়া তাহাদের আইস-পিপাসু হইতে দিও না। এই রুবকারির শেষ দুই দফা মোতাবেক কার্য্য করিলে, তোমরা দেশবৎসল, স্বজাতিপ্রিয়, এ কথা তামা তুলসী হস্তে, নিশ্চিত চিত্তে, বিনা ভীতে সর্ব্বত্র মর্ত্তে বলিব।

একটী পুরাতন কথা।

হরি রামের বাগানে গিয়া গাছের সমস্ত আম্রগুলি পাড়িয়া আনিয়াছে। রাম হরির মাতার নিকটে নালিশ করাতে হরির মাতা কহিল "বাবা, অমন কথা বলিওনা হরি আমার তেমন ছেলে নয় যে পরের বাগানে আম পাড়ে। তবে যদি দুটো পেড়েই থাকে তাতেই বা দোষ কি, সেত ছেলে বই বুড়ো নয়।" পক্ষপাতিত্ব মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ গুণ। এই গুণে মাতা পুত্রের দোষ দেখিতে পায় না। এই গুণে চর্ম্মকার জগতে চর্ম্মের ন্যায় আর কোন বিশুদ্ধ পদার্থ দেখিতে পায় না। এই গুণে দেশহিতৈষী ব্যক্তি স্বদেশের কোন দোষ দেখিতে পায় না। অনেক ইতিহাস লেখক এই গুণে স্বদেশীয় দোষরাশির উপর নানা প্রকার আবরণ দিয়া থাকেন, সেই গুলি তাল প্রমাণ হইলেও তিল প্রমাণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন এবং বিদেশীয় সর্ষপ প্রমাণ দোষ গুলিকেও বিল্ব প্রমাণ করিয়া তুলেন। মহারাজা নন্দকুমার জাল করার অপরাধে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। বিলাতি ইতিহাস লেখকের নন্দকুমারকে গালি দিয়া আশা মিটিল না, সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে গালি দিয়া আপন প্রাণ শীতল করিলেন এবং গালাগালি শাস্ত্রে আপন পারদর্শিতা ও নৈপুণ্য পৃথিবীকে দেখাইলেন, কিন্তু ক্লাইভ সন্ধিপত্রে ওমিচাঁদকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে ওয়াট্সনের নাম অক্লেশে জাল করিলেন। কিন্তু সেই অপরাধ তাঁহার গুণ হইয়া দাঁড়াইল; তিনি বাঙ্গালা

দেশের স্বাধীনতা লোপ করিলেন এবং স্বদেশে নানা সম্মানে বিভূষিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে যদি ক্লাইভ ঐ জাল না করিতেন তাহা হইলে অদ্য বাঙ্গালার ইতিহাস অন্য প্রকার লিখিত হইত। পক্ষপাতী লেখক বলিলেন* "কোন কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিবার লোক ক্লাইভ ছিলেন না। আমাদের লিখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে—তিনি নৌ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন সাহেবের নাম জাল করিয়াছিলেন।"

যে লেখক মহারাজা নন্দকুমারের (কল্পিত) জাল অপরাধের জন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চরিত্রের উপর জঘন্য কলঙ্কারোপ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না তিনি যে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে অন্ধকূপ হত্যার দোষভাগী বলিয়া ঘৃণা করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি! তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া লিখিলেন† "কিন্তু এই সকল ব্যাপার অসভ্য নবাবের হৃদয়ে দুঃখ বা দয়ার কিছুমাত্র উদ্রেক করিল না।" কিন্তু নবাবের অন্তঃকরণে দয়ার ও অনুতাপের উদয় হওয়া ইতিহাস লেখক কি প্রকারে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। নবাব কখন ইংরাজ বণিক্‌কে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি দেখিয়াছিলেন যে ইংরাজ বণিক সর্ব্ব ছিদ্রে শুচ্যগ্রের ন্যায় অনায়াসে প্রবেশ করিয়া থাকেন কিন্তু আবার বৃহদাকার ধারণপূর্ব্বক বাহির হয়েন। মেকলে বলিয়াছেন‡ "বাল্যকাল হইতেই সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদিগকে ঘৃণা করিতেন। উহাই তাঁহার মনের এক প্রকার খেয়াল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।" কিন্তু আমরা বলি সিরাজদ্দৌলার ইংরাজদিগকে ঘৃণা করিবার বিশেষ কারণ ছিল। ইহা কেবল whim বা খেয়াল নহে। যখন সিরাজদ্দৌলা দেখিলেন যে একদল বিদেশীয় ব্যবসাদারের এত দূর সাহস হইয়াছে যে তাহারা বাঙ্গালার নবাবের বিরুদ্ধাচারীকে প্রশ্রয় দিতে পারে, নবাবের আজ্ঞার

---

*"Clive was not a man to do anything by halves. We almost blush to write it. He forged Admiral Watson's name."

†"But these things......awakened neither remorse or pity in the bosom of the savage Nabab."

‡"From a child Sirajadowla hated the English. It was his whim to do so."

বিরুদ্ধে পদে পদে কার্য্য করিতে পারে, তখন তাঁহার জ্ঞান জন্মিল যে উক্ত ব্যবসায়ীদিগকে আর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাদিগকে শাসন করা উচিত। তখন তিনি রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আপন কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে যাত্রা করিলেন। কলিকাতা হইতে বণিকগণকে বহিষ্কৃত করিলেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন অপেক্ষা অধিকতর ভীরুতার সহিত যুবক ড্রেক সাহেব (Governor Drake) স্বদলবলে পলায়ন করিলেন। কেবল ১৪৬ জন মাত্র রহিল—তাহারা পলাইতে পারে নাই। ইহাদিগকেই লইয়া Black hole বা অন্ধকূপ হত্যা। এই ঘটনা ইংরাজী ১৭৫৬ সালের ২০শে জুন তারিখে রাত্রিতে হইয়াছিল।

এই স্থানে ইতিহাস লেখকগণ কত দোষ নবাবের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। আমাদিগের বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে নবাব অতিশয় ধীর প্রকৃতি ও মেষ শাবকের ন্যায় ভাল মানুষ ছিলেন। তাঁহার অনেক নিন্দা অনেক ইতিহাস লেখক প্রতি ছত্রে করিয়া গিয়াছেন। তিনি নরহন্তা ছিলেন, তিনি ব্যভিচারী ছিলেন, তিনি স্ত্রীলোকের পেট চিরিয়া ভ্রূণ দর্শন করিতেন ইত্যাদি নানা প্রকার নিন্দা বিদেশীয় লেখকদিগের মুখে উপর্য্যুপরি শ্রবণ করা গিয়াছে কিন্তু সে বাক্য সম্বন্ধে আমরা এস্থলে কিছু বলিতে চাহি না। আমাদিগের এই বিশ্বাস যে Black hole হত্যার কার্য্যে নবাবের কোন গুরুতর দোষ ছিল না। যুদ্ধের পর সচরাচর যে প্রকার ঘটনা হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছিল। অর্থাৎ অনেক সময়ে যুদ্ধ-বন্দীগণের অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছিল। দোষের কথা এই যে একটী সামান্য ঘরের মধ্যে ১৪৬ জন ব্যক্তিকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। একজন ইংরাজী লেখক বলিয়াছেন* "ইহা বাস্তবিক কূপ নহে, অন্ধকারময়ও নহে। অনেক বিশপ পুত্র ইহা অপেক্ষা ভয়াবহ কক্ষে পরাধীন ভাবে রজনী যাপন করিয়াছেন। তবে

---

*"It was not a Hole nor was it black. Many a Bishop's son has slept away a night's loss of liberty in a drearer apartment. The only objection to it was that it could not hold a hundred and forty-six people without loss of life."

দোষের মধ্যে এইটুকু ছিল যে এরূপ সংকীর্ণ স্থানে ১৪৬ জন লোকের সমাবেশ হইতে পারে না, হইলে প্রাণ নাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।”

কথা হইতেছে যে নবাব এ বিষয় কিছু জানিতেন কি না? আমাদের বিশ্বাস তিনি জানিয়া শুনিয়া কখন এ প্রকার কার্য্য করিতে দেন নাই। নবাবের আজ্ঞাতে উক্ত বন্দীগণকে এই ছোট ঘরে (20 ft. Sqr.) রাখা হইয়াছিল। ভেরেলেষ্ট সাহেব কয়েদীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতার গভর্ণর হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন* “এই নিদারুণ নরহত্যা সম্বন্ধে ধরিতে গেলে সিরাজদ্দৌলা এক প্রকার নির্দ্দোষী ছিলেন। সেই লোকদিগকে রাত্রিতে আবদ্ধ রাখিবার জন্য তিনি আদেশ দিয়াছিলেন মাত্র, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বন্দোবস্তের কথা তিনি বলিবেন তাহা কোন মতে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। সেই কয়েদের যে ভীষণ ফল ফলিয়াছিল তাহা তাঁহার কর্ম্মচারিগণের দোষেই সংঘটিত হইয়াছিল।”

মার্সম্যান সাহেব কহেন† “বারান্দার পশ্চাতে যে একটী কক্ষ ছিল যে স্থান সেনানিবেশের কয়েদীগণের কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইত, সেই কক্ষে প্রধান কর্ম্মচারিগণের আদেশ মতে তাহাদিগকে রাখা হইয়াছিল।”

এই সকল হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নবাব বন্দীগণ সম্বন্ধে স্বয়ং কোন প্রকার আদেশ দেন নাই। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী উক্ত স্থান বন্দীগণের থাকিবার জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিল। সেই স্থান ইংরাজগণ স্বয়ং কারাগারের স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিল।

---

*“ Sirajadowla was comparatively innocent of the atrocious massacre. His orders were ‘secure them for the night’ and further directions could not be expected. The horrors of that imprisonment must be laid at the feet of his officers.”

†“ The principal officers then desired the prisoners to move into one of the chambers behind the Veranda which had been used as a prison of the garrison.”

পর দিবস ২৩ জন মাত্র লোক জীবিত ছিল, তন্মধ্যে Holwell ও Verelst ছিলেন। যতদূর বুঝা যায় ইহাদের প্রতি নবাব দয়া প্রকাশ করিয়া ছিলেন। কেননা তাহাদিগকে অধিক প্রশস্ত ঘরে রাখা হইয়াছিল। এবং তাহাদিগের খাদ্যেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল;—যদি নবাবের কোন দুরভিসন্ধি থাকিত তাহা হইলে তিনি কখন এরূপ বন্দোবস্ত করিতেন না। They were cast into more airy prisons and fed upon grain and water. মেকলে এক স্থানে বলিয়াছেন “ Nabab was asleep and he would be angry if any body awoke him” ইহা আর আশ্চর্য্য কি? যদ্যপি একজন সামান্য ইংরাজ হুজুর একজন কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে গেলে “অবকাশ নাই’ বলিয়া সাত বার ফিরাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে বাঙ্গালার বাদসাহ জন কয়েক কয়েদীর জন্য যে নিদ্রা পরিত্যাগ করিবেন বা মাথা ঘামাইবেন তাহা প্রত্যাশা করা সঙ্গত নহে। Mill বলিয়াছেন* “একটী সুবিধাজনক আবাস গৃহের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, কিন্তু কোথায়ও পাওয়া গেল না। এমন সময়ে ইংরাজেরা যে গৃহ কয়েদীদের জন্য ব্যবহার করিতেন, তাহার সংবাদ পাওয়া গেল। আর কোন তদন্ত না করিয়া সেই গৃহে তাহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। ইংরাজেরা ঐ গৃহ কয়েদের উপযুক্ত স্থান বলিয়া সুবাদারের কর্ম্মচারীদিগকে বলিতেন। আর তাহারই ফলভোগ স্বরূপ এই অনর্থ ঘটিল।”

মিল এইরূপ সত্য কথা লেখায় অনেকের দ্বারা ভৎসিত হইয়াছেন কিন্তু তিনি এইরূপ লিখিয়া নবাবের কলঙ্কের কথঞ্চিৎ লাঘব করিয়াছেন।

বড় বড় হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর অনেক স্থানে অনেক সময়ে হইয়াছে। নিষ্ঠুর রাজাগণেরও অত্যাচার অনেক দেশ অনেক সময় সহ্য করিয়াছে।

---

*“ Some search was made for a convenient apartment, but none was found; upon which information was obtained of a place which the English themselves had employed as a prison and into this without further enquiry they were impelled * * * And the English had their own practice to thank for suggesting it to officers of the Soubadar as a fit place of confinement.”

প্রত্যেক ফরাসী রাজ-বিপ্লবের লোমহর্ষণ কাণ্ড কিম্বা ইংলণ্ডে ধর্ম্ম-বিপ্লব ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা Black hole হইবার কাণ্ডে কিছুই অসাধারণ দেখিতে পাইবেন না। অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য মনুষ্য দ্বারা জগতে হইয়া গিয়াছে, যাহার তুলনায় Black hole অন্ধকূপের হত্যাকাণ্ড তত গুরুতর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। Spanish Inquisition যে সমস্ত নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছিল তাহা পাঠ করিলে হৃৎকম্প হয়। Macaulay এক স্থলে East India Company'sর অত্যাচার বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন "The people found the little finger of the Company thicker than the loins of Sirajadowla" ইত্যাদি।

বিদেশী লেখকগণ নিরপেক্ষ ভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা সকল বর্ণনা করিতে চেষ্টা করেন না। যে প্রকারে বর্ণনা করিলে আপনাদিগের স্বার্থের পরিপোষকতা হয় তদ্রূপ প্রায় করিয়া থাকেন। ইংরাজ ইতিহাস লেখক ওয়াটর্লুর যুদ্ধের যত বীরত্ব আপন জাতিকে দিয়া থাকেন, আবার এমত ফরাশি লেখক আছেন শুনিয়াছি, যাঁহারা বলেন উক্ত যুদ্ধে নেপোলিয়ান পরাস্ত হন নাই। জর্ম্মাণরা অন্য প্রকার বলিয়া থাকেন। সত্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ইতিহাস লিখিলে এই প্রকার হইয়া থাকে। আবার এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁহারা সত্যের সহিত অসত্যকে এমনই সুন্দররূপে মিশ্রিত করিয়াছেন যে তাঁহাদের লেখা হইতে সত্য মিথ্যা নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। এই শ্রেণীর লেখক ইতিহাসকে নভেলের ন্যায় পাঠ্য করিতে চাহেন, সেই কারণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যতদূর পারিয়াছেন কল্পনা দ্বারা অতি রঞ্জিত করিয়াছেন। মেকলে এই শ্রেণীর লেখক, তিনি সিরাজদ্দৌলাকেই একটী অদ্ভুত জন্তুর ন্যায় চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু কবি বলিয়াছেন—

"A lie that is all a lie may be met and fought out right
A lie with an atom of truth is a harder matter to fight."

গান।

নব জলধর, শ্যাম সুন্দর, গগনে উদয় ভেল।
জলদে জড়িত, থীর তড়িত, নয়ন ভরিয়া গেল ॥
মেঘ ঝলকে, চপলা চমকে, অমিয় বরখে তায়।
সোহি অমিয়ে, সিনান করিয়ে, পরাণ যুড়ায়ে যায় ॥

উচ্ছ্বাস।

("আবাহন" পাঠে)

ভুবন ভরিল প্রেমে, হরিনাম-রস পানে,
মরুভূমে সুধার সঞ্চার।
শোক তাপ নাহি আর, দূরে গেল হাহাকার,
প্রেমানন্দে ভরিল সংসার ॥
বিদ্যা বুদ্ধি যাহা ছিল, জ্ঞান আসি উজলিল,
পুলকে অবশ হ'ল দেহ।
উড়িল মোহের ছায়া, ঘুচিল সংসার মায়া,
বাধা দিতে না রহিল কেহ ॥
পথ-হারা নাহি আর দূরে গেল অন্ধকার,
ঊর্দ্ধে দেখ বিজলী প্রকাশ।
সাধুগণে উদ্ধারিতে, পাপ তাপ বিনাশিতে,
দেখ মরি হরির বিকাশ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ ধরি, ভবে হরি অবতরি,
বিনাশিছে রিপু ছয় জনে।
দয়ার সাগর হরি, ত্যজিয়া অমরা পুরি,
অবতীর্ণ শুনি "আবাহনে" ॥
একি শুনি চমৎকার, ডাকিতে হবে না আর,
পূর্ণাহুতি পড়িয়াছে হোমে।
পূর্ণিমার পুণ্য দিনে, পাঠ করি "আবাহনে",
প্রেম রাজ্য দেখ ধরাধামে ॥

গৌর-গীতি।

১

ওই দেখ দেখ চেয়ে কে আসিছে ধেয়ে সোণার প্রতিমা ওই !
দুটি বাহু তুলে চলে হৃদি খুলে ভুবন আলোক মই !
ও তার দুনয়নে ধারা মুকুতার ঝারা ধরণী ভাসিয়ে যায় !
ও যে প্রেমে ঢল ঢল অঙ্গ টল মল মাধুরী উথলে তায় !
কিবা দুটি আঁখি ভরা দিঠি মনোহরা অরধ পল্লবে ঢাকা
আহা শিরীষ-কোমল বদন মণ্ডল কাতর-করুণা মাখা !
ও যে নাচিয়া নাচিয়া চলেছে কাঁদিয়া ডাকিয়া কাতর মুখে
"ওরে কে আছ কোথায় পাতকী ধরায় আয়রে আমার বুকে—

২

"ওরে কোথা পাপী তাপী কে জ্বালা জুড়াবি আয়রে নিকটে ছুটে,
আমি হরিনাম ঢেলে বেড়াব ভুতলে যে পার লহরে লুটে,
ওরে মিটাইতে ক্ষুধা ভবে হেন সুধা নাহিরে নাহিরে আর,
তোরা একবার ভুলে রসনায় তুলে দেখরে কেমন তার,
এ যে মিছার সংসার মিছা সুখ তার কি সুখে ভুলিয়ে থাক,
ওরে ধূলা খেলা ফেলে হরি হরি বোলে কাতরে বারেক ডাক,
ওই দিন যে গেলরে বলরে বলরে বদন ভরিয়ে হরি,
আমি রাধা রাধা বোলে নিব কোলে তুলে রাখিব হৃদয়ে ধরি।"

৩

কে তুমি সুন্দর মানব আকার দেবের হৃদয় ভরা !
মধুর নর্ত্তনে শ্রীহরি কীর্ত্তনে ভাসা'য়ে চলেছ ধরা !
মোহিত গগন মোহিত ভুবন তোমার প্রতিমা হেরি,
আকুল জগত অধর-নিঃসৃত সঙ্গীত সেবন করি,
আহা প্রেমের তরঙ্গে নবনীর অঙ্গে অমিয়া ভাসিয়া যায় !
নারী-কণ্ঠ-হার মূরতি তোমার,— কে দিল কৌপীন তায় !
ধরার ধূলায় ধূসরিত কায় সোণার বরণ খোলা !
রাজ-রাজেশ্বর এরূপে তোমার— কে তুমি গৌরব ভোলা !

৪

ওহে জগত-সুন্দর রূপ মনোহর তোমারি মতন কারে,
আমি জাগ্রত স্বপনে হেরি ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়-দ্বারে,
সে যে ধরা নাহি দেয় কোথায় লুকায় মরমে মরিয়া থাকি,
আমি অন্তর-অন্তরে সতত তাহারে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ডাকি,
মন প্রাণ খুলে রাখিয়াছি তুলে করিতে তাহারে দান,
আমি চিনেছি এবার তুমি সে আমার তৃষিত প্রাণের প্রাণ,
ওহে সুধাময় হইলে উদয় যদি হে করুণা করি
এস একবার নিকটে আমার পরাণে জড়া'য়ে ধরি।

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

ম ভাগ—৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ—১৩০০।

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম :—

শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল্ ; শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ; শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্ ; শ্রীদাশরথি ঘোষ এম্, এ, বি, এল্ ; শ্রীআশুতোষ আঢ্য বি, এল ; শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ ; শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

বিষয়। পৃষ্ঠা।
১। শ্মশান-চিন্তা … … … ৯৭
২। নেপাল (জঙ্গবাহাদুর) … … … ১০৩
৩। সম্বন্ধ নির্ণয় (পিতা ও পুত্র) … … … ১০৮
৪। চন্দ্রগুপ্ত … … … ১১১
৫। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ … … … … ১১৫
৬। সাহেবি বাঙ্গালি (পত্র) … … … ১১৭
৭। এক রজনী (উপন্যাস) … … … ১২০
৮। ভারতীয় ও যূরোপীয় ভাব … … … ১২৪

হুগলী,
সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রাবণ—১৩০০।

এই সংখ্যার মূল্য ⁄১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হইবে। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার সম্পাদকতার ভার লইয়াছেন, কোন ব্যক্তি বিশেষ ইহার সম্পাদক নহেন।

সম্পাদক-সমিতির নাম আপাততঃ প্রকাশিত হইল না। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনের জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রীযন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ। শ্রাবণ, সন ১৩০০ সাল। ৪র্থ সংখ্যা।

শ্মশান-চিন্তা।

জগতের ভীষণ দৃশ্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়। সে ভীষণতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মনে হয় আমি ক্ষুদ্র সহায়হীন জীব। এত যে গৌরবে স্ফীত হইয়া, কল্পনার বিচিত্র রথে আরোহণ করিয়া বিশ্ব সংসারে বিচরণ করিতেছি, সে গৌরব নিমেষমধ্যে অস্তমিত ও কল্পনা বিশুষ্ক হইয়া যায়। সাহারার প্রতপ্ত বালুকারাশি যখন দিগন্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়া আকাশ পৃথ্বী পরিব্যাপ্ত করিয়া মহা প্রলয় উপস্থিত করে, প্রবল ঝটিকা যখন মেদিনীমণ্ডল গ্রাস করিতে সমুদ্যত হয়, আগ্নেয় গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত যখন নিমেষ মধ্যে শত শত প্রদেশ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, অথবা মহাসাগরের বিক্ষোভিত উর্ম্মিমালা যখন গভীর গর্জ্জনে হুঙ্কার করিতে থাকে, তখন দর্শকের বল বুদ্ধি সাহস বিলুপ্ত হইয়া যায়। তিনি স্তম্ভিত হইয়া শঙ্কিত হৃদয়ে সে ভীষণতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকেন।

প্রকৃতির এইরূপ ভীষণ দৃশ্য প্রাণ আকুল করে সত্য, কিন্তু নীরবে ধীরে ধীরে ঐ বিজন প্রদেশে যে অগ্নি জ্বলিতেছে তাহাতে প্রাণ অধিকতর কাতর হয় কেন? ঐ শ্মশান ক্ষেত্রে চিতানল জলিতেছে। প্রকৃতির শান্তমূর্ত্তি। সান্ধ্যসমীরণ মৃদু প্রবাহে বহিতেছে। নিম্নে স্রোতস্বিনী মৃদু-কলনাদে বহিয়া যাইতেছে। একখানি ক্ষুদ্র তরণী নদীবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে। শ্মশান পার্শ্বে বেতসীলতা মুখাবনত করিয়া স্বচ্ছ সলিলে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া

মুগ্ধ হইতেছে—সে ছবি বুকে করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উল্লাসভরে তরঙ্গ নৃত্য করিতেছে।

এরূপ শান্ত সমাহিত স্থানে ঐ যে ক্ষুদ্র অনলশিখা জ্বলিতেছে—এ দৃশ্য এত ভয়াবহ কেন? এ দৃশ্যে প্রাণ এত আকুল হইয়া উঠে কেন? শ্মশান দেখিলে জগতের লোক এত কাতর হয় কেন? বীর-হৃদয় স্তম্ভিত ও কম্পিত হইয়া যায় কেন? শ্মশান-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লোকের আদৌ প্রবৃত্তি হয় না কেন? উহার নাম শুনিলে লোকে দূরে পলায়ন করে কেন?

আমি শ্মশানকে অনাদর করিতে পারি না। এই পুণ্যক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া আমি অনেক শিক্ষা পাইয়াছি। আমি অবস্থা দোষে তীর্থপর্য্যটনে অসমর্থ—মনের সে ক্ষোভ শ্মশানদর্শনে বিদূরিত করিয়া থাকি। উহা আমার নিকট মহা তীর্থধাম।

আমার চিন্তাপথ সংরুদ্ধ ছিল, ভাবের কিছুমাত্র বিকাশ ছিল না। আমি নির্জ্জনে থাকিতে পারিতাম না। অন্ধকারে আমার শরীর সন্ত্রস্ত হইত, প্রাণ মন অবসন্ন হইত। আমার মনে হইত মানুষ লোকালয়বাসী, লোকজনের সংসর্গ ভিন্ন সে কিরূপে থাকিবে? চন্দ্রসূর্য্য বিভাসিত জগতে মানুষের জন্ম, সে আঁধারে যাইবে কেন? আমি আলোক পার্শ্বে পতঙ্গ সমূহের নৃত্য দেখিয়া মনে করিতাম আমিও এই প্রকার এক জীব, ভাবিতাম এ জগতে পতঙ্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব। আঁধার রজনীতে বৃক্ষপত্রের অভ্যন্তর হইতে ঝিঁ ঝিঁ রব শুনিতাম, নিম্নে বৃক্ষতলে বসিয়া চক্রবাক যে বিষাদগীত গাহিত তাহাও শুনিতাম—মনে মনে কাতরভাবে কহিতাম "আঁধারবাসী জীব! হায় তোমাদের কি দুর্দ্দশা, তোমরা যদি পতঙ্গ হইতে তবে অন্ধকার ভেদ করিয়া তোমাদের রোদধ্বনি কাহারও হৃদয় ব্যথিত করিত না।

ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, আমি লোকালয়বাসী ও আলোকপ্রিয় হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমি হাসিতে শিখিয়াছি, কাঁদিতে জানি না, ভাসিতে পারি, ডুবিতে জানি না, আমি বলিতে পারি, ভাবিতে জানি না, দেখিতে পাই, কিন্তু ধরিতে পারি না। আমার উৎসাহ আছে, কিন্তু ভরসা নাই, উল্লাস আছে, গাম্ভীর্য্য নাই, বিপদ আছে কিন্তু ধৈর্য্য নাই। আমি অপরকে চিনি, অপরকে ভালবাসি, অপরের ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যস্ত হই, কিন্তু নিজেকে চিনি না, নিজেকে নিজে ভালবাসিতে পারি না, নিজের ভালবাসায় পরিতৃপ্ত হইতে শিখি নাই। বুঝিলাম আমার দুর্গতির সীমা নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিলাম বিজনবাসী হইতে হইবে, আঁধারে ডুবিতে হইবে। এক দিন অন্ধকার রজনীতে সাহসে ভর করিয়া বাহির হইলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। পর দিন আরও কতক দূর গেলাম। এইরূপ অভ্যাস দ্বারা ভয়কে পরাজিত করিলাম। এক দিন দেখিলাম অমানিশার তমিস্রা ভেদ করিয়া চিতানল জ্বলিতেছে। নিকটবর্ত্তী হইয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। চিতানল নির্ব্বাপিত হইল, যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল তাহারা চলিয়া গেল। আমি শ্মশান-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আজ বুঝিলাম আঁধারবাসী লোকের কি আনন্দ। আমার অন্তরাজ্য খুলিয়া গিয়াছে। আমি দেখিলাম এক ভাব-উৎস কেমন সতেজে উত্থিত হইতেছে। আমি ছিলাম একা, এখন কেহ নিকটে নাই, অথচ যেন আর এক জন সঙ্গী পাইলাম। আমি নিজেই নিজের সঙ্গী হইলাম। আগে ভাবিতাম সঙ্গী ভিন্ন থাকা যায় না। এখন বুঝিলাম নিজেকে লইয়া নিজে বেশ থাকা যায়। মনে হইল যদি অনন্তকাল আমাকে একা থাকিতে হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই, আমার আমিকে লইয়া বেশ সুখশান্তিতে থাকিতে পারিব।

শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া এই শিক্ষা পাইলাম। মনের ভয় অপগত হইল। চিন্তায় যে অমৃতময়ী তৃপ্তি তাহার আস্বাদন পাইলাম। নিজেকে নিজে চিনিলাম। পূর্ব্বে নিজের সুখ দুঃখ অপরের উপর নির্ভর করিতাম, এখন বুঝিলাম সকলই আমার আয়ত্ত। আমি নিজের ভাবে নিজে হাসি, নিজের ভাবে নিজে কাঁদি। আমার সুখ দুঃখ আমার সুকৃতি দুষ্কৃতির উপর নির্ভর করে। আমি কেন অপরের অধীন হইব?

শ্মশানক্ষেত্র পাপ প্রলোভন দমনের এক প্রধান সহায়। প্রলোভনে পড়িবার পূর্ব্বে যদি লোক একবার দৌড়িয়া আসিয়া এখানে উপস্থিত হয়, তবে পাপের সাধ্য নাই যে তাহাকে আর স্পর্শ করে। জগতে এমন কোন্ পাপ কল্পিত হইতে পারে যাহা শ্মশানক্ষেত্রে পরাভূত না হইয়াছে? কামিনী-কাঞ্চন হইতে পৃথিবীতে অনেক পাপ প্রলোভনের উৎপত্তি। যাঁহারা

সৌন্দর্য্যের মৃগতৃষ্ণিকায় প্রলুব্ধ, অথবা বিষয় বৈভবে সমাকৃষ্ট, তাঁহারা একবার আসিয়া শ্মশান দৃশ্য দেখিলে আর কদাপি মোহাবৃত থাকিবেন না। অনন্তকাল ঐ চিতানলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জগতের সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির আহুতি দিতেছেন। সেই আহুতির অবসানে সমুদয়ই ভস্মে পরিণত হইতেছে। শ্মশানে এই ভস্মমাহাত্ম্য বিঘোষিত হইতেছে। এ মহা সত্যের অপলাপ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। নীতিবিদ্ পণ্ডিতের উপদেশ অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে, ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদেশ অমান্য ও উপেক্ষিত হইতে পারে, শ্মশানক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া অতুল রূপরাশিকে অগ্নিসাৎ ও ধনকুবেরকে নিমেষ মধ্যে ভস্মীভুত হইতে দেখিয়া কে সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্যকে জীবনের সারসর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিতে পারে? ঐ যে চিতানলের পদতলে ভস্মরাশি নিপতিত রহিয়াছে, উহা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য সমুদয়কে নিষ্পেষিত করিয়া অসারত্বে পরিণত করিয়াছে। গৌরব করিবার কিছুই নাই। কে যেন এক দর্পহারী দাঁড়াইয়া মানবের দর্পকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া কোথায় উড়াইয়া দিতেছেন। ভ্রান্ত মানব! তুমি ইহ জীবনের সুখের জন্য লালায়িত, ইহ সংসারে বিলাস স্রোতে ভাসিয়া মনে করিতেছ তোমার জন্ম সার্থক হইল, একবার আসিয়া ঐ চিতানলের পার্শ্বে দাঁড়াও, দেখিবে অচিরাৎ তোমার মোহের অবসান হইবে। অগণিত শাস্ত্রপাঠে যাহা প্রকৃতরূপে শিখিতে পার নাই, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে শিক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইবে, প্রকৃত সুখ শান্তি কি তাহা বুঝিতে পারিবে। দিনান্তে যিনি মনের আগ্রহে এ শশ্মানভূমিতে বিচরণ করিতে পারেন, বিচরণ করিতে করিতে যিনি নয়নাশ্রু ফেলিতে পারেন, তিনি মহাপুরুষ। তিনিই প্রকৃত সাধক, প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, পাপ তাঁহাকে কিরূপে স্পর্শ করিবে?

শ্মশান শোকসন্তাপিত হৃদয়ের অতীব আরামের স্থল। যে স্থানে প্রিয়তম জনকে চিতানলে আরোহণ করাইয়া শূন্য-হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি, সেই স্থানে আসিলে বিস্মৃতির আবরণ ভেদ করিয়া শোকানল জ্বলিয়া উঠিলেও, সে স্থান বড়ই মুগ্ধকর। যে স্থানে প্রিয়তমকে শেষ শায়িত দেখিয়াছিলাম, সেই স্থানে আসিয়া বোধ হয় যেন আবার তাহাকে দেখিতেছি। ঐ যে সেই সুন্দর মুখ খানি হাসিতেছে, আমি পার্শ্বে বসিয়া কতবার চুম্বন করিতেছি—ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ যেন শোকানন্দে ভাসিয়া উঠে। অপ্রণয়ী লোকে শ্মশান দেখিয়া ভয় পায়, সে প্রিয়তমের ছবি আর দেখিতে চায় না, অথবা দেখিতে পাইলে ভয়-বিহ্বল হয়, কিন্তু যাহার হৃদয় স্নেহের অনন্ত উৎস, সেই স্নেহশীল হৃদয়ের প্রিয়তম জন যে স্থানে অন্তিমে শয়ন করিয়াছেন সে স্থান কি কখন ভয়াবহ হইতে পারে? হায় সে স্থানে শয়ন করিতে কে না চায়? সে সুখের কি তুলনা আছে? দুগ্ধফেন-নিভ শয্যা চাহি না, অমরাবতীর নন্দনকাননে অধিবাস করিবার বাসনা করি না, প্রিয়তমের অন্তিম শয্যায় একবার শয়ন করিতে চাহি, একবার জন্মের মত প্রিয়জনকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই স্থানের মধুরতা জগৎকে জানাইতে চাহি। হায় অদৃষ্টে সে ভাগ্য নাই, তাই হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি।

শ্মশানভূমি আমার পরিচিত অতি আদরের স্থান। এই স্থানে আমার জনক জননীকে শেষ শয়ন করিতে দেখিয়াছিলাম। সেই স্থান আমার কাশীধাম। বোধ হয় যেন স্বর্গের একাংশ স্খলিত হইয়া ঐ স্থান টুকু বিরচিত হইয়াছে। আমি সসম্ভ্রমে উহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যখন চাহিয়া থাকি, কোথা হইতে অশ্রুধারা বহিয়া যায়—এইরূপ অশ্রু প্রবাহে যখন আমার চিত্ত বিধৌত হইয়া যায়, তখন তাহাতে পিতা মাতার পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখিয়া আমি আনন্দে পুলকিত হই। এই শ্মশানক্ষেত্রে সহোদরকে হারাইয়াছি। সংসারের বিপদবিপাকে পড়িয়া যিনি জীবন হারাইয়াছেন, আজ তাঁহার বিষয় ভাবিতেও প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। তথাপি না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। আত্মীয় স্বজনকে ভুলিয়া যাওয়া অপেক্ষা মহাপাতক আর জগতে নাই।

এই কি আমার শ্মশান-চিন্তা শেষ হইল? না না—ঐ দেখ আমার প্রাণের কুমার নয়ন নিমীলিত করিয়া শয়ান রহিয়াছে। আমি অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, উহাকে আমার কোলে একবার তুলিয়া দেও—আমি প্রাণ ভরিয়া একবার উহার মুখ খানি দেখিয়া লই। আর ঐ যে কে শ্মশানের অন্ধকারকে হাসাইয়া জ্যোৎস্নায় পরিমণ্ডিত হইয়া শয়ান রহিয়াছে না, না, উহার কথা কিছু বলিব না, বাক্যে উহা প্রকাশ হইবার নহে—উহা স্বপ্নময়, যোগময়, স্বর্গীয় কি এক কেমন—বর্ণনার অসাধ্য।

এই শ্মশান ক্ষেত্র আমার শেষ শয্যা, আমি কি এখানে না আসিয়া কখনও থাকিতে পারি? ঐ শয্যা রচিত রহিয়াছে, জীবনের এই বেলাটুকু কাটিয়া গেলেই ঐ স্থানে যাইয়া শয়ন করিতে হইবে। এ শয্যার বিরাম নাই। এই স্থানে ভেদাভেদ নাই। সংসারের অতি দীন দুঃখী, দিনান্তেও যাহার ভাগ্যে মুষ্টিমেয় ভিক্ষা যুঠে না সেই ব্যক্তি যে শয্যায় শয়ান, পরক্ষণেই রাজাধিরাজ আসিয়া তথায় শয়ন করিলেন। উভয়ের দেহ ভস্ম মিলিত হইয়া একাকার হইয়া গেল। পণ্ডিত, মুর্খ, দ্বিজ ও চণ্ডাল এমন কি স্ত্রী ও পুরুষে ভেদাভেদ নাই। সকলের ভস্ম মিলিত হইয়া একাকার। সাম্যের এমন পবিত্র ক্ষেত্র বিশ্বরাজ্যে আর নাই।

ঐ যে দেখিতে দেখিতে সুন্দর দেহ খানি ভস্মীভূত হইয়া গেল—উহার পরিণাম কি এই? ঐ যে ধূম্রমালা সমীরণ ভরে উঠিয়াছিল, কোথায় লীন হইয়া গেল, থাকিল শুদ্ধ কিছু ভস্ম। তাহাও বেশী দিন থাকিবে না। সন্নিহিত স্রোতস্বিনীর স্রোতে কতক ভাসিয়া যাইবে, কতক লইয়া দিগন্তবাহী বায়ু ক্রীড়া করিবে। এ মহা বিপ্লবে যে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। ইহাত কোন মতেই সহ্য হয় না।

অধীর হইও না, কাতর হইও না। একবার দেখ ঐ শ্মশানভূমে ও কে বিচরণ করিতেছেন। কপালে অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, স্কন্ধে ভীষণ বিষধর ফণা বিস্তার করিয়া সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে, কণ্ঠে অস্থিমালা, পরিধানে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, হস্তে ত্রিশূল, সর্ব্বগাত্রে শ্মশান-ভস্ম। সংহার মূর্ত্তির কি অপূর্ব্ব সমাবেশ—আবার তাহারই ভিতর কি সুন্দর সৌম্যভাব বিকসিত রহিয়াছে, যোগবিভাসিত নয়ন যুগলের কি মধুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি। সংহারকে অতিক্রম করিয়া অমৃতের জ্যোৎস্না দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ইনি মৃত্যুঞ্জয়—ধরাধামে যোগ মাহাত্ম্য দেখাইতেছেন। ইনি মানবের হৃদয় হইতে শ্মশান ভীতি বিতাড়িত করিয়া অমরত্বের ভাব শিক্ষা দিতেছেন। এ দেহের দুরবস্থা ইনি দেখাইতেছেন—অগ্নি, সর্প, ব্যাঘ্র, অস্ত্রাদিতে ইহা আক্রান্ত, অস্থি ও ভস্ম ইহার পরিণতি—কিন্তু উহার ভিতরে ঐ যে কি এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি—ঐ যে কি বিদ্যমান রহিয়াছে—যাহার বিকার নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই, ক্ষুধা নাই, শ্রান্তি নাই উহাই অমর, উহাই প্রকৃত মনুষ্য। আমি তুমি সকলই সেই। শ্মশানে এ দেহ

পিঞ্জর ফেলিয়া আমরা ঐরূপ—মৃতুঞ্জয়ের ভিতর যে মধুররূপ প্রচ্ছন্ন আছে—সেই রূপ ধারণ করিয়া অমৃত-ধামে চলিয়া যাইব। তখন দেখিব মৃত্যুঞ্জয়ের আর এক রূপ। পার্ব্বতী যে রূপে মুগ্ধ, সেই রূপ তখন বিশ্বচরাচর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখিয়া কৃতার্থ হইব। শিব মঙ্গলময় রূপ দর্শনে তখন চিরানন্দে নিমগ্ন হইব।

নেপাল।

জঙ্গ বাহাদুর।

নেপাল ভারতবর্ষের উত্তর সীমা। হিমালয়ের পাদমূলে সংস্থাপিত, নেপাল একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য। ইহার চারি ধারে সুন্দর প্রাচীর সদৃশ পর্ব্বত শ্রেণীর দ্বারা সংরক্ষিত। নেপালীগণ তাহাদের পরাক্রম ও সাহসের জন্য এখনও বিখ্যাত। যে সকল বীর কেশরীগণ এক সময়ে নিজের নিজের ক্ষমতা দেখাইয়া, স্বদেশ হিতার্থে আপনার অমূল্য জীবনকে, রণস্থলে বিপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই—যাঁহারা জন্মভূমিকে নিজের জীবন অপেক্ষা মহৎ বলিয়া গণ্য করিতেন—"স্বর্গাদপি গরিয়সী" বলিয়া পূজা করিতেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি জগতে ঘোষিত না হইবে কেন? কিন্তু এক্ষণে সে সকল বীরগণ কোথায়? কোথায় তাঁহাদের সে বীর্য্য, অদম্য সাহস, তেজ পরাক্রম সমস্তই তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে—তাঁহারা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তি এখনও ভারত ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাহাদের যশের ধ্বজা এখনও তাহাদের বংশধরগণ রক্ষা করিতেছে, এখনও তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তি বজায় রাখিয়া আপনাদিগকেও যশস্বী করিয়া যাইতেছে। এক্ষণে সেই সকল পরলোকগত খ্যাতনামা বীরগণের কীর্ত্তি কলাপ পাঠকগণকে অবগত করাইবার জন্য অদ্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

নেপালের প্রধান সচিব স্বনাম খ্যাত মহারাজ জঙ্গ বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ বীর সামসের জঙ্গ রাণা বাহাদুর [কে, সি, এস, আই] ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ জন সহোদর ভ্রাতা, ইনি ১৮৭২ খৃঃ অব্দে কলিকাতা Dovton কলেজে কিয়দ্দিবস

অধ্যয়ন করিয়া নেপালে প্রত্যাগমন করেন এবং সর্ব্বজন মনোনীত হইয়া নেপালী সৈন্যের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন।

ইনি নিজের বুদ্ধিমত্তার গুণে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব রাজ-সচিব, পিতৃব্য রাণা উদীপ সিংহের কুটিল ও মন্দ অভিসন্ধি জানিতে পারেন, এবং তদ্দারা যে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া ভ্রাতাদিগের সাহায্যে সুবিধা বুঝিয়া ১৮৮৫ খৃঃ ২১ নবেম্বর তাঁহার পিতৃব্যের দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। রাণা উদীপ সিংহ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের এরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং কয়েকজন অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া প্রতিকুলাচরণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়াছিল এবং অবশেষে অনুচরগণের সহিত বিনষ্ট হন।

এই সময় কতকগুলি ভারতীয় রাজপুত্রগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়া ছিলেন এবং অবশেষে ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এখনও ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন।

১৮৮৮ খৃঃ গোরা জোরেল নাম অভিহিত রণবীর জঙ্গ তাঁহার অদম্য সাহসে নির্ভর করিয়া প্রতি-বিদ্রোহ দ্বারা তাঁহার উচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করেন এবং কয়েকজন সুসজ্জিত অস্ত্র বিশারদ নেপালীদিগের সাহায্যে শিউগুলি হইতে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন, কিন্তু সে সময়ে ইংরাজগণ সকলেই সতর্ক ছিলেন, এবং তাঁহার সমস্ত ষড়যন্ত্র কোরকেই উচ্ছেদ করিয়া ছিলেন।

রাণা সামসের জঙ্গ ১৮৯২ খৃঃ ২৫শে মে Knight Commander Star of India উপাধি প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নেপাল একটি স্বাধীন রাজ্য। ইহা গুর্ক্ষার অন্তর্গত একটি উপত্যকা মাত্র। এস্থলে গুর্ক্ষাদিগের অভ্যুত্থান ও তাহাদিগের ক্ষমতার কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইহারা দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, স্থূল দেহ বিশিষ্ট এবং যুদ্ধ কার্য্যে অত্যন্ত পটু। ১৭৬৮ খৃঃ এই স্থলে নোয়ার নামক, খর্ব্বাকৃতি মাঙ্গলিয়ন জাতীয় কতকগুলি জাতির বাস ছিল তাহারা অত্যন্ত সহিষ্ণু, কার্য্যক্ষম ও গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ। ইহারা নেপালে কাটমুণ্ড, পাটান, ভাটগাঁও ও কীর্ত্তিপুর নামে ৪টি ছোট ছোট রাজধানীতে ৪ ভাগে বিভক্ত হইয়া বাস করিত। নেপালের পূর্ব্বে কিরাণ্ড ও লিম্বু জাতির বাস ছিল। পশ্চিমে গারওয়ালের নিকট পর্ব্বতের পাদদেশে, কাশগ্রামে কাশিয়া মধ্যস্থলে মঙ্গরা ও উত্তরে গৌরাঙ্গ জাতি বাস করিত, এবং এই তিন জাতীয় মনুষ্যদিগকে পার্ব্বতীয় বলিয়া অভিহিত করা হইত। পার্ব্বতীয়গণ যুদ্ধকার্য্যে অত্যন্ত পারগ এবং অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন রাণা চতুর্ভুজ সিং শিশোদীয় চিতোর হইতে কয়েকজন বীর্য্য-সম্পন্ন রাজপুতগণ সমভিব্যাহারে গুর্ক্ষা আক্রমণ করিতে উপস্থিত হন, সেই গুর্ক্ষার একটি তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেখানে পবিত্র গোরক্ষ দেবের মন্দির অবস্থিত, যাঁহাকে শাস্ত্র বিশারদ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ, নানাউপচারে পূজা করিত; যেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সুগন্ধি হোম ও নানা বাদ্যাদিতে পবিত্র উপত্যকাকে আরও পবিত্র ও শান্তিময় নিকেতন করিত, সেই শান্তিপূর্ণ পবিত্র স্থানে রাণা তাঁহার অনুচরগণ সহ শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সহসা পাল্‌পা রাজধানী ও খায়শের কয়েকটি ছোট ছোট গ্রাম হস্তগত করেন।

ইহার প্রায় ৪ শত বৎসর পরে (১৭৬৭ খৃঃ) গুর্ক্ষার তৎকালীন রাজা পৃথ্বীনারায়ণ নেপালের প্রায় সমস্ত স্থান নিজের আয়ত্ত্বাধীন করিয়া লয়েন এবং আক্রমণের জন্য তেল্‌-লামার পরিখা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্তু অকাল মৃত্যু তাঁহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিল। তাহার পর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ সদর্পে কুমাউন জয় করেন, এবং আরও পশ্চিমে অগ্রসর হন কিন্তু বীরকেশরী রণজিৎ সিং ও তাঁহার অনুগত শিখ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক তাহাদের গতিরোধ হইয়াছিল। সুতরাং এই স্থলে একটি সামান্য যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং অতি অল্প দিবস মধ্যেই শিখগণ কর্ত্তৃক কাঙ্‌রা দুর্গ অধিকৃত হয়।

এই সময় প্রায় ১২০০ শত শিখ সৈন্য সহ রণজিৎ সিং গুর্খা রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করেন এবং নগরের প্রান্তরে সুন্দর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া শিবির স্থাপন করেন। বীর বিকারাম ইহাদের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিলেন, যে ইহারা ক্রমে ক্রমে নগর আক্রমণ করিবে এবং দুর্গের অন্তরাল হইতে অল্প সেনা লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু

বীর বিকারাম সতর্ক হইলেন এবং ২০০ শত মাত্র গুর্খা সেনা লইয়া তাহাদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলেন ও একজন বিশ্বস্ত সেনা দ্বারা বিপক্ষদিগের দুর্গের পথ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের পলায়নের পথ সকল অবরোধ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর সবলে শিবির আক্রমণ করেন এবং সম্মুখে যে সকল শিথগণকে পাইয়াছিলেন নিহত করিয়া রণজিৎ সিংহকে তাঁহার থাল্‌শা সৈন্যগণ সহ পর্ব্বত হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। এই যুদ্ধে গুর্ক্ষার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বীর শ্রেষ্ঠ কুমার আমীর সিং অদম্য তেজ ও প্রভূত পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য কখনও চিন্তা করেন নাই যে গুর্ক্ষা রাজ্য, পঞ্জাব রাজ্যের সহিত মিলিত হইবে। দীর্ঘকায় শিথগণ মনে করিয়াছিল যে সামান্য থর্ব্বাকায় পার্ব্বতীয় সৈন্য কি কখন তাহাদের সহিত সম্মুখ সমরে জয়লাভ আশা করিতে পারে? ইহা কেবল দুরাশা মাত্র। যে শিথগণ তাহাদের পরাক্রমের জন্য বিখ্যাত, যাহারা মনে করিলে ভারতে সর্ব্বত্র কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহাদের সহিত কি কখন সামান্য পার্ব্বতীয় সেনা সমযোগ্য হইতে পারে? কিন্তু হায়! ফলে বিপরীত দাঁড়াইল। তাহাদের গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেল। পঞ্জাব কেশরী তাঁহার দুর্য্যক্ষ্য প্রতাপের ব্যর্থতা দেখিয়া অবশেষে শৃগালের চাতুরী উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; এবং বৃটীশদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কয়েকজন ইংরাজ সেনা সমভিব্যাহারে, দক্ষিণ সীমার অনবরোধিত স্থান হইতে নেপাল আক্রমণ করিলেন।

যে সৈন্যবল এক সময় ভাগীরথী হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, যাহাদের প্রতাপ এখন সমস্ত ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ শাসিত করিয়া সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন করিয়া রাখিয়াছে সেই সেনাবল এক্ষণে পঞ্জাব কেশরী ও তাঁহার অনুচরগণ সহ নেপাল আক্রমণ করিয়াছে। গুর্ক্ষা সৈন্যগণ মহারাষ্ট্র কিম্বা অন্যান্য জাতির ন্যায় ইংরাজদিগের আক্রমণে রণস্থলে পৃষ্ঠ দেখাইয়া পলায়ন করে না, তাহারা পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল, এদিকে ইংরাজ মার্টিণ্ডেল (Martindale) ও অপর একজন দক্ষিণ সীমা রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ভুটানের পশ্চিম দিক হইতে ইংরাজ সৈন্য অক্টার্লনি (Octerlany) ও অপর দুই একজন সহ নগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই তুমুল যুদ্ধ অনেক দিন পর্য্যন্ত হইয়াছিল এবং ইহাতে উভয় দলের বহু সংখ্যক প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে শিথদিগের বিক্রম ও বীরত্বের গৌরব ধূলার সহিত মিলিত হইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ তাঁহার এই প্রভূত তেজশালী বীরগণের এত শীঘ্র পতন হওয়াতে একবারে নিরুদ্যম হইয়া পড়িলেন এবং কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সে আশাও বিফল হইল। গুর্ক্ষাগণ পূর্ব্ববৎ সুদৃঢ় হইয়া সদর্পে নেপাল রক্ষা করিতে লাগিল।

এই ঘটনার প্রায় ৪৮ বৎসর পরে (১৮৫৭ খৃঃ) ভারতবর্ষে আর একটি মহৎ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, কিন্তু সে সময় নেপাল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মিত্র ছিল।

যখন লর্ড ক্লাইড (Clyde) ১৯০০০ সৈন্য লইয়া শেষ লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিতে উদ্যত হন, সেই সময় জঙ্গ বাহাদুর ১১০০০ গুর্ক্ষা সৈন্য লইয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিয়া ইংরাজদিগের সাহায্য করেন। অযোধ্যার তালুকদারগণ মনে করিয়াছিল যে যদ্যপি তাহারা আপনাদিগকে বিপক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের শেষ আশ্রয় স্থল নেপালের সাহায্য লইবে কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে নেপালীগণ ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছে তখন তাহারা অগত্যা লক্ষ্ণৌর রক্ষার আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সিপাহীগণ তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক এইরূপে নিবারিত হওয়াতে তাহাদের হৃদয় একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল।

এই সময় এক ঘোষণা পত্র প্রচার হইল যে যাহারা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বৃটীশ রাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধ সমস্ত ক্ষমা করিয়া ইংরাজ রাজ্যে জায়গীর দিয়া আশ্রয় প্রদত্ত হইবে। অনেকেই এই ঘোষণা পত্রের মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিল। অনন্তর হিন্দুদিগের বৃথা হত্যা দর্শনে কাতর সহৃদয় মহারাজ জঙ্গ বাহাদুরের প্ররোচনায় এই কাল যুদ্ধের অবসান হয়।

এক্ষণে ঐ সমস্ত নেপালীগণ যাহারা এখনও ভুটান ও ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছে; যদ্যপি তাহারা সেই সেই দেশের মধ্যে ক্ষমতাশালী হইয়া প্রধান হইতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা সেই সমস্ত দেশের অসভ্য জাতি দিগকে বশীভূত করিয়া আসমুদ্র পর্য্যন্ত তাহাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারিত।

সম্বন্ধ নির্ণয়।

৩

পিতা ও পুত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পুত্রের উপর প্রভুত্ব করিতে হইলে পিতার কিসে সন্তোষ, কিসে অসন্তোষ, সেই কথা পুত্রকে অতি শৈশব হইতেই শিক্ষা দিতে হইবে—এ শিক্ষা যে পুত্র কেবল পিতার নিকটেই গ্রহণ করিবেন তাহা নহে। গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য শিশুকে বাল্যকাল হইতেই সে শিক্ষা প্রদান করেন। মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা আত্মপরিজন সকলেই শিশুকে সর্ব্বদা সেই শিক্ষা প্রদান করিবেন। এইরূপ উপায়ে সন্তানের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ধারণা পুত্রের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যাইবে।

এইরূপে পুত্রের হৃদয়ে পিতার প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে পিতা অতি সহজেই সন্তানকে ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু এরূপ শিক্ষার নানা প্রতিবন্ধকও আছে। পুত্র নিরন্তর পিতার নিকটে থাকে না, পিতার নিকটে পুত্রকে আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব নহে—পুত্র একটু বড় হইলেই দশ জনের সঙ্গে মিশিবে, দশ জনের কথা বার্ত্তা শুনিবে, হয় ত তাহার পিতৃদত্ত শিক্ষার বিরোধী অনেক কথা তাহার শ্রুতিগোচর হইবে—তাহাতে সুফল কুফল উভয়ই ফলিতে পারে। সুফল ফলিলে সুখের বিষয়—কুফল ফলিলে তাহা নিবারণের উপায় কি ? আজ কাল আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালী চলিতেছে সে প্রণালীতে এরূপ বিঘ্ন নিবারণের সম্পূর্ণ উপায় কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এখন কালেজে শিক্ষা না হইলে, শিক্ষা মঞ্জুর নহে। আমি নিজে এরূপ শিক্ষাকে দূষিত শিক্ষা বলিয়া থাকি। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে গুরুগৃহে যে শিক্ষা-প্রণালী ছিল আমার বোধ হয়, তাহাতেই শিশুদের নির্দ্দোষ শিক্ষা হইত। গুরু একজন হওয়াই বিধেয়—দশ জন গুরু হইলে, শিক্ষার বিঘ্ন ঘটে। পিতা অক্ষম হইলে কোন এক উপযুক্ত গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করাই ছাত্রের পক্ষে মঙ্গলজনক। এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন যে এরূপ প্রণালীতে শিক্ষা অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। একজনের সকল বিষয়ে সমান দক্ষতা থাকে না। যে বিষয়ে গুরু পারদর্শী পুত্র সেই বিষয়েই উত্তম শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। একথাও সত্য।

আমাদের উদ্দেশ্যও তাহাই। আমরা বলি যে কোন এক বিষয়ে দুই তিন জনের নিকট শিক্ষা লইলে, ছাত্র ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত শ্রবণ করিয়া কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম হয় না। আমরা আরও বলি যে এককালে দুই তিন বা ততোধিক বিষয়ের শিক্ষা করা অবিধেয়—যেরূপ আমাদের দেশে চতুষ্পাঠীতে ছাত্রেরা কোন এক বিষয়ে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করিয়া বিষয়ান্তর শিক্ষার জন্য অন্য কোন চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া থাকে তদ্রূপ প্রণালীই শুভকর। এ সকল কথা আমাদের প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনার বিষয় নহে, প্রসঙ্গক্রমে যতটুকু আবশ্যক তাহাই বলিলাম। নতুবা আরও অনেক আনুসঙ্গিক কথার মীমাংসা এই স্থানে করিলে ভাল হইত। যথা বালকদিগের স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) বা নিজত্ব (Individuality) কিরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে তাহার আলোচনা করা এস্থলে বিধেয় ছিল। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা আছে অন্য কোন প্রবন্ধে এ সকল কথার বিস্তারিত আলোচনা করিব। তাই এ প্রবন্ধে উহাদের বিচার করিতে নিরস্ত হইলাম।*

এক্ষণে পিতা পুত্র পরস্পরের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

সন্তানের পক্ষে পিতা গৃহ-দেবতা। সন্তানের উচিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, পিতার চরণ বন্দনা করা, এবং রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বেও ওইরূপ আচরণ করা। অবসর কালে পিতার চরণ প্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদ সেবা করা ও তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করা—পিতা অসুস্থ হইলে, নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত পিতার সঙ্গ ত্যাগ না করা, এবং পিতা কিসে সুস্থ থাকেন তদ্বিষয়ে সাধ্যমত

---

*আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, তাঁহার "Conduct in society" নামক পুস্তকে এ সকল কথার কতক আলোচনা করিয়াছেন, পাঠক মহাশয়কে একবার সেই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

END

REEL NO. BSP-86.

শুশ্রূষা করা। পিতার আজ্ঞা সন্তান কিরূপে প্রতিপালন করিবেন তাহার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কেন না তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের রামায়ণ মহাভারতে রহিয়াছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে পিতা যদি চুরি পরদার বা হত্যা প্রভৃতি ঘোরতর পাতক করিতে আদেশ করেন, সন্তানের কি সে আদেশ পালন করা বিধেয়? পিতা হইয়া সন্তানকে এরূপ আদেশ করিতে পারেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যে পিতা সেরূপ আদেশ করেন তিনি পিতার উপযুক্ত নহেন—সন্তান সেরূপ পিতাকে ব্যাধিগ্রস্ত ও জ্ঞানশূন্য ভাবিয়া তাঁহার আদেশ পালন না করিয়া তাঁহার মানসিক ব্যাধি নিবারণের উপায় করিবেন। আমরা সভ্য ব্যক্তিদের কথাই বলিতেছি। অসভ্য অশিক্ষিত ও নীচ প্রকৃতির লোকের কথা বলিতেছি না। পিতার অপ্রিয়জনক কোন কার্য্য ও চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া সন্তানের পক্ষে অধর্ম্ম, এইরূপ চিন্তা সন্তান আপন হৃদয়ে পোষণ করিবেন। সন্তান বিদ্যালয়ে বা অন্য কোন স্থানে নানা প্রকার মত শ্রবণ করিবেন, সে সকল মত যদি তাঁহার বিবেচনায় তাঁহার পিতৃদত্ত উপদেশের বিরোধী বলিয়া মনে হয়, তবে পিতার নিকট বসিয়া তদ্বিষয়ের আলোচনা করিবেন। পিতা যদি সন্তানের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আপন মত পরিবর্ত্তন করেন ত ভালই, নতুবা সন্তান সে সকল মত তাঁহার পিতার অপ্রিয় ভাবিয়া পরিহার করিবেন। কোন বিষয়ে মনে কোন প্রকার দ্বিধা উপস্থিত হইলেই সন্তান পিতার নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট তদ্বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিবেন। যে কোন বিষয়ের হউক, পিতার নিকট উপদেশ লইতে সন্তানের কোন প্রকার দ্বিধা হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এমন কি স্ত্রীর সম্বন্ধেও কোন প্রকার মানসিক অসুখের কারণ হইলে পিতার নিকট তদ্বিষয়ের উপদেশ লইতে সন্তানের কোনরূপ সঙ্কোচ করা বিধেয় নহে।

পিতা ও সন্তানকে সর্ব্বদা মিষ্ট সম্ভাষণ করিবেন, সর্ব্বদা নিকটে রাখিবেন, অবসর কালে সন্তানের সঙ্গে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ করিবেন, সকল বিষয়ের আলোচনা করিবেন, সন্তানের মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া যাহাতে সন্তানের চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কথাবার্ত্তা ও আচরণ করিবেন। সন্তানের অপ্রীতিকর ভাব বা কার্য্য, সন্তানের অশুভজনক না হইলে, পিতারও কর্ত্তব্য তাহা পরিত্যাগ করা। দুই জন শিক্ষিত বন্ধু পরস্পরের প্রতি যেরূপ আচরণ করেন, সন্তান উপযুক্ত হইলে, পিতা পুত্রের মধ্যে তদ্রূপ আচরণ বিধেয়। বাল্যকালে পিতা সন্তানের উপর কেবল স্নেহের আধিপত্য করিবেন, তাড়নার আবশ্যকতা হইলে কেবল মাত্র লঘু তাড়না করিবেন, নিষ্ঠুরতা একেবারেই নিষিদ্ধ। পিতা পুত্রের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিলে, পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইবে, তাহাতে পিতার দ্বারা সন্তানের কোন শিক্ষাই ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। সন্তান অপ্রিয় কার্য্য করিলে, পিতা অভিমান করিবেন, ও বাক্যে ও কার্য্যে সন্তানকে দেখাইবেন যে তিনি তাহার আচরণে মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন। অবসর কালে সন্তানকে নিকটে ডাকিয়া পিতা রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও অন্যান্য গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবেন। সন্তান উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে, সন্তানের সঙ্গীত ও বাদ্য বা কোনরূপ বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে রুচি থাকিলে, পিতার কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে সন্তানের অভিলাষ পূরণ করা। পুত্রের মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া যাহাতে সন্তানের সৎপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হয়, পিতার তাহাই কর্ত্তব্য। তিনি প্রতি কার্য্যে আপন দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। পিতার প্রতি পুত্রের আচরণ যেমন কঠোর সাধনা, পিতা মনে করিবেন, সন্তানের প্রতি তাঁহার আচরণও সেইরূপ কঠোর সাধনা। পুত্রকে আদর্শ মনুষ্য করিতে হইলে আপনাকেও আদর্শ মনুষ্যরূপে পরিণত করিতে হইবে। সুতরাং কেবলমাত্র নীতি ও ধর্ম্মোক্ত আচরণ পিতার অনুসরণ করা বিধেয়।

চন্দ্রগুপ্ত।

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ। গ্রীক, রোম ও অন্যান্য প্রাচীন দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ প্রাচীন ইতিহাস নাই, যাহা আছে অতি বিরল ও অল্প, একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের উন্নত অবস্থায় গ্রীস ও চীন দেশ হইতে পরিব্রাজকেরা আমাদের দেশে ভ্রমণ করিতে আসিতেন; তাঁহারা যাহা যাহা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা ঐ সময়ের রীতি নীতি ও অবস্থার বিষয় আমরা অনেক অবগত হইতে পারিয়াছি।

সম্বন্ধ নির্ণয়।

৩

পিতা ও পুত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পুত্রের উপর প্রভুত্ব করিতে হইলে পিতার কিসে সন্তোষ, কিসে অসন্তোষ, সেই কথা পুত্রকে অতি শৈশব হইতেই শিক্ষা দিতে হইবে—এ শিক্ষা যে পুত্র কেবল পিতার নিকটেই গ্রহণ করিবেন তাহা নহে। গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য শিশুকে বাল্যকাল হইতেই সে শিক্ষা প্রদান করেন। মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা আত্মপরিজন সকলেই শিশুকে সর্ব্বদা সেই শিক্ষা প্রদান করিবেন। এইরূপ উপায়ে সন্তানের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ধারণা পুত্রের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যাইবে।

এইরূপে পুত্রের হৃদয়ে পিতার প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে পিতা অতি সহজেই সন্তানকে ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু এরূপ শিক্ষার নানা প্রতিবন্ধকও আছে। পুত্র নিরন্তর পিতার নিকটে থাকে না, পিতার নিকটে পুত্রকে আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব নহে—পুত্র একটু বড় হইলেই দশ জনের সঙ্গে মিশিবে, দশ জনের কথা বার্ত্তা শুনিবে, হয় ত তাহার পিতৃদত্ত শিক্ষার বিরোধী অনেক কথা তাহার শ্রুতিগোচর হইবে—তাহাতে সুফল কুফল উভয়ই ফলিতে পারে। সুফল ফলিলে সুখের বিষয়—কুফল ফলিলে তাহা নিবারণের উপায় কি? আজ কাল আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালী চলিতেছে সে প্রণালীতে এরূপ বিঘ্ন নিবারণের সম্পূর্ণ উপায় কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এখন কালেজে শিক্ষা না হইলে, শিক্ষা মঞ্জুর নহে। আমি নিজে এরূপ শিক্ষাকে দূষিত শিক্ষা বলিয়া থাকি। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে গুরুগৃহে যে শিক্ষা-প্রণালী ছিল আমার বোধ হয়, তাহাতেই শিশুদের নির্দ্দোষ শিক্ষা হইত। গুরু একজন হওয়াই বিধেয়—দশ জন গুরু হইলে, শিক্ষার বিঘ্ন ঘটে। পিতা অক্ষম হইলে কোন এক উপযুক্ত গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করাই ছাত্রের পক্ষে মঙ্গলজনক। এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন যে এরূপ প্রণালীতে শিক্ষা অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।

একজনের সকল বিষয়ে সমান দক্ষতা থাকে না। যে বিষয়ে গুরু পারদর্শী পুত্র সেই বিষয়েই উত্তম শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। একথাও সত্য।

আমাদের উদ্দেশ্যও তাহাই। আমরা বলি যে কোন এক বিষয়ে দুই তিন জনের নিকট শিক্ষা লইলে, ছাত্র ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত শ্রবণ করিয়া কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম হয় না। আমরা আরও বলি যে এককালে দুই তিন বা ততোধিক বিষয়ের শিক্ষা করা অবিধেয়—যেরূপ আমাদের দেশে চতুষ্পাঠীতে ছাত্রেরা কোন এক বিষয়ে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করিয়া বিষয়ান্তর শিক্ষার জন্য অন্য কোন চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া থাকে তদ্রূপ প্রণালীই শুভকর। এ সকল কথা আমাদের প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনার বিষয় নহে, প্রসঙ্গক্রমে যতটুকু আবশ্যক তাহাই বলিলাম। নতুবা আরও অনেক আনুসঙ্গিক কথার মীমাংসা এই স্থানে করিলে ভাল হইত। যথা বালকদিগের স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) বা নিজত্ব (Individuality) কিরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে তাহার আলোচনা করা এস্থলে বিধেয় ছিল। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা আছে অন্য কোন প্রবন্ধে এ সকল কথার বিস্তারিত আলোচনা করিব। তাই এ প্রবন্ধে উহাদের বিচার করিতে নিরস্ত হইলাম।*

এক্ষণে পিতা পুত্র পরস্পরের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

সন্তানের পক্ষে পিতা গৃহ-দেবতা। সন্তানের উচিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, পিতার চরণ বন্দনা করা, এবং রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বেও ওইরূপ আচরণ করা। অবসর কালে পিতার চরণ প্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদ সেবা করা ও তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করা—পিতা অসুস্থ হইলে, নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত পিতার সঙ্গ ত্যাগ না করা, এবং পিতা কিসে সুস্থ থাকেন তদ্বিষয়ে সাধ্যমত

---

*আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, তাঁহার "Conduct in society" নামক পুস্তকে এ সকল কথার কতক আলোচনা করিয়াছেন, পাঠক মহাশয়কে একবার সেই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শুশ্রূষা করা। পিতার আজ্ঞা সন্তান কিরূপে প্রতিপালন করিবেন তাহার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন ; কেন না তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের রামায়ণ মহাভারতে রহিয়াছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে পিতা যদি চুরি পরদার বা হত্যা প্রভৃতি ঘোরতর পাতক করিতে আদেশ করেন, সন্তানের কি সে আদেশ পালন করা বিধেয় ? পিতা হইয়া সন্তানকে এরূপ আদেশ করিতে পারেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যে পিতা সেরূপ আদেশ করেন তিনি পিতার উপযুক্ত নহেন—সন্তান সেরূপ পিতাকে ব্যাধিগ্রস্ত ও জ্ঞানশূন্য ভাবিয়া তাঁহার আদেশ পালন না করিয়া তাঁহার মানসিক ব্যাধি নিবারণের উপায় করিবেন। আমরা সভ্য ব্যক্তিদের কথাই বলিতেছি। অসভ্য অশিক্ষিত ও নীচ প্রকৃতির লোকের কথা বলিতেছি না। পিতার অপ্রিয়জনক কোন কার্য্য ও চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া সন্তানের পক্ষে অধর্ম্ম, এইরূপ চিন্তা সন্তান আপন হৃদয়ে পোষণ করিবেন। সন্তান বিদ্যালয়ে বা অন্য কোন স্থানে নানা প্রকার মত শ্রবণ করিবেন, সে সকল মত যদি তাঁহার বিবেচনায় তাঁহার পিতৃদত্ত উপদেশের বিরোধী বলিয়া মনে হয়, তবে পিতার নিকট বসিয়া তদ্বিষয়ের আলোচনা করিবেন। পিতা যদি সন্তানের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আপন মত পরিবর্ত্তন করেন ত ভালই, নতুবা সন্তান সে সকল মত তাঁহার পিতার অপ্রিয় ভাবিয়া পরিহার করিবেন। কোন বিষয়ে মনে কোন প্রকার দ্বিধা উপস্থিত হইলেই সন্তান পিতার নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট তদ্বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিবেন। যে কোন বিষয়ের হউক, পিতার নিকট উপদেশ লইতে সন্তানের কোন প্রকার দ্বিধা হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এমন কি স্ত্রীর সম্বন্ধেও কোন প্রকার মানসিক অসুখের কারণ হইলে পিতার নিকট তদ্বিষয়ের উপদেশ লইতে সন্তানের কোনরূপ সঙ্কোচ করা বিধেয় নহে।

পিতা ও সন্তানকে সর্ব্বদা মিষ্ট সম্ভাষণ করিবেন, সর্ব্বদা নিকটে রাখিবেন, অবসর কালে সন্তানের সঙ্গে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ করিবেন, সকল বিষয়ের আলোচনা করিবেন, সন্তানের মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া যাহাতে সন্তানের চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কথাবার্ত্তা ও আচরণ করিবেন। সন্তানের অপ্রীতিকর ভাব বা কার্য্য, সন্তানের অশুভজনক না হইলে, পিতারও কর্ত্তব্য তাহা পরিত্যাগ করা। দুই জন শিক্ষিত বন্ধু পরস্পরের প্রতি যেরূপ আচরণ করেন, সন্তান উপযুক্ত হইলে, পিতা পুত্রের মধ্যে তদ্রূপ আচরণ বিধেয়। বাল্যকালে পিতা সন্তানের উপর কেবল স্নেহের আধিপত্য করিবেন, তাড়নার আবশ্যকতা হইলে কেবল মাত্র লঘু তাড়না করিবেন, নিষ্ঠুরতা একেবারেই নিষিদ্ধ। পিতা পুত্রের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিলে, পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইবে, তাহাতে পিতার দ্বারা সন্তানের কোন শিক্ষাই ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। সন্তান অপ্রিয় কার্য্য করিলে, পিতা অভিমান করিবেন, ও বাক্যে ও কার্য্যে সন্তানকে দেখাইবেন যে তিনি তাহার আচরণে মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন। অবসর কালে সন্তানকে নিকটে ডাকিয়া পিতা রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও অন্যান্য গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবেন। সন্তান উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে, সন্তানের সঙ্গীত ও বাদ্য বা কোনরূপ বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে রুচি থাকিলে, পিতার কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে সন্তানের অভিলাষ পূরণ করা। পুত্রের মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া যাহাতে সন্তানের সৎপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হয়, পিতার তাহাই কর্ত্তব্য। তিনি প্রতি কার্য্যে আপন দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। পিতার প্রতি পুত্রের আচরণ যেমন কঠোর সাধনা, পিতা মনে করিবেন, সন্তানের প্রতি তাঁহার আচরণও সেইরূপ কঠোর সাধনা। পুত্রকে আদর্শ মনুষ্য করিতে হইলে আপনাকেও আদর্শ মনুষ্যরূপে পরিণত করিতে হইবে। সুতরাং কেবলমাত্র নীতি ও ধর্ম্মোক্ত আচরণ পিতার অনুসরণ করা বিধেয়।

চন্দ্রগুপ্ত।

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ। গ্রীক, রোম ও অন্যান্য প্রাচীন দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ প্রাচীন ইতিহাস নাই, যাহা আছে অতি বিরল ও অল্প, একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের উন্নত অবস্থায় গ্রীস ও চীন দেশ হইতে পরিব্রাজকেরা আমাদের দেশে ভ্রমণ করিতে আসিতেন ; তাঁহারা যাহা যাহা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা ঐ সময়ের রীতি নীতি ও অবস্থার বিষয় আমরা অনেক অবগত হইতে পারিয়াছি।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন সেই সূচিভেদ্য তমসা দূরীভূত করিবার জন্য তাম্র,ফলক, প্রস্তর ফলক, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি ও ধর্ম্মপুস্তক পরিব্রাজকদিগের বৃত্তান্ত ও গ্রন্থকারদিগের লেখনীরূপ আলোকই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন। এই উপায় অবলম্বন করিয়াই আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাবিত বিষয় বিবরিত হইতেছে।

যখন মগধ রাজ্য নন্দবংশীয় নৃপতিগণের অধীনে ছিল, সেই সময়ে, (৩২০ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব) মহাবীর মেসোডোনিয়ান আলেকজাণ্ডার (সেকেন্দার সাহ) ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়া সিন্ধু নদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বেহারের দক্ষিণ খণ্ড ঐ সময়ে মগধ রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এক সময়ে ঐ মগধ রাজ্যে অনেক প্রতাপান্বিত নরপতিগণ বাস করিতেন, তন্মধ্যে অদ্যকার প্রস্তাবিত চন্দ্রগুপ্ত প্রধান ছিলেন।

ব্রহ্ম দেশীয় পালি ভাষায় চন্দ্রগুপ্তের বৃত্তান্ত এই প্রকারে লিখিত আছে। চন্দ্রগুপ্তের মাতা কপিল বংশ সম্ভূতা তৎকালীন কোশল রাজ্যের নরপতিগণের সহিত কপিল বংশীয় রাজাগণের মনোবিবাদ চলিতেছিল। কোশলাধিপতি কপিল বংশীয় নরপতিগণকে হত্যা করিতে আসিতেছে শুনিয়া কপিল বংশ সম্ভূতা চন্দ্রগুপ্তের মাতা আপন শিশু সন্তানকে লইয়া অপর এক স্থানে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে স্থানে চন্দ্রগুপ্তের মাতা বাস করিতেন তথায় একটি গোশালা ছিল, ঐ গোশালায় কতকগুলি বৃষ থাকিত। চন্দ্রগুপ্তের মাতা শিশু সন্তানের চির দুঃখ বিমোচনের জন্য ঐ গোশালার দ্বারে তাহাকে শয়ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে বৃষগণ গোশালা হইতে বাহির হইবার কালীন সন্তানকে পদদলিত করিয়া মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, চন্দ্র নামে একটি বৃষ ঐ শিশু সন্তানকে দেখিবামাত্র পদদলিত করা দূরে থাকুক, অপর বৃষগণ তাহাকে পদদলিত না করে এই আশয়ে গোশালার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল। চাণক্য (কেহ কেহ বলেন জনক) নামে একজন ব্রাহ্মণ দূর হইতে এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন তিনি ঐ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আপন আলয়ে লালন পালন করিতে লাগিলেন, এবং এই গোশালা একজন—গুপ্তর থাকায় ও ঐ শিশু চন্দ্র নামীয় বৃষ কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়ায় ঐ শিশু সন্তানের নাম চন্দ্রগুপ্ত রাখিয়াছিলেন।

মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মগধ দেশে পুরবংশীয় জরাসিন্ধু নামে এক রাজা ছিলেন। জরাসিন্ধুর পরে ঐ মগধ দেশে প্রায় ৩৬।৩৭ জন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিলে পরে পরাক্রান্ত নন্দ মগধ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতেই ঐ বংশের নামকরণ হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশীয় পালি ভাষা মতে নন্দবংশীয় শেষ রাজার নাম ধনেন্দা। যে কারণেই হউক ঐ রাজা ধনেন্দার সহিত চাণক্যের বিবাদ চলিতেছিল। চাণক্যের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান পণ্ডিত ঐ মগধ রাজ্যে আর কেহই ছিল না। ধনেন্দাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধ দেশের রাজা করিব এই তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়া উঠিল।

চন্দ্রগুপ্তকে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া চাণক্য ধনেন্দার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রগুপ্তও গোপনে ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। রাজা ধনেন্দা এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া চন্দ্রগুপ্তকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। এই সময়ে দিগ্বীজয়ী আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ মানসে সিন্ধু প্রশাখা শতদ্রু নদীর তটে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন। মহোদয় আলেকজাণ্ডার চন্দ্রগুপ্তের অভিলাষ জানিতে পারিয়া তাহাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। কিন্তু অধ্যবসায় সম্পন্ন চন্দ্রগুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি লোক সংগ্রহ করিয়া ধনেন্দাকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং চাণক্যর সাহায্যে মগধ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

চাণক্য এই প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায় সম্পন্ন না হইলে চন্দ্রগুপ্ত কখনই মগধ রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারিতেন না সেই জন্য চাণক্যকে নিসিয়াভিলি কিম্বা জার্ম্মণ বিসমার্কের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে মগধ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কুরু, পাঞ্চাল, বৈদেহী, কোশল, কাশী অর্থাৎ তৎকালীন যত প্রাচীন রাজ্য ছিল, সমুদয় পরাজয় করিয়া পূর্ব্ব বেহার হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পাটলীপুত্র অর্থাৎ আধুনিক পাটনায় আপন রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ইহাকে প্রধান রাজধানী করিয়াছিলেন। গ্রীক রাজা সেলুকসের দূত মেজেসথান্সে তাহার রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব ৪১৭

হইতে ৩১২ পর্য্যন্ত তিনি পাটলিপুত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। মেজস থানেস আপন গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের অপ্রতিহত প্রভাব ও রাজ্যের সুশাসন বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহারই গ্রন্থে পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে চন্দ্রগুপ্তর ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং নয় সহস্র হস্তী রাজ্য রক্ষার জন্য সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকিত।

বাস্তবিক এই প্রাচীন সময়ে চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় অপর কোন প্রতাপান্বিত রাজা ছিল কি না সন্দেহ। তিনি রাজ্য সুশাসন করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারীদিগকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একদল কর্ম্মচারীরা রাজ্যের শিল্প বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করিতেন। দ্বিতীয় দল বিদেশী ও পথিকগণের সেবা শুশ্রূষার পর্য্যবেক্ষণ করিত, তৃতীয় দল রাজকর, চতুর্থ বাণিজ্যাদি ও পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দল বাণিজ্যাদি উৎপন্ন ক্রয় বিক্রয়ের জন্য নিয়োজিত থাকিত। সৈনিকেরাও ঐ প্রকারে ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল। এতভিন্ন অপরাপর রাজকর্ম্মচারীরা রাজ্য সুশাসন জন্য অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিত। চন্দ্রগুপ্ত বিদেশীয় পণ্ডিতগণকে আপন রাজ্যে আহ্বান করিয়া যথোচিত পুরস্কার দিতেন। তাঁহর মন্ত্রীবর্গ ব্রাহ্মণ, সৈনিকেরা ক্ষত্রিয়, এবং শিল্পী ও অন্যান্য কৃষকবর্গ বৈশ্য ও শূদ্র ছিলেন।

ব্রহ্মদেশীয় পালিভাষায় চন্দ্রগুপ্তর উক্ত বিবরণ লিখিত আছে কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থকারগণের ইহাতে মত ভেদ দেখা যায়। তাহাদের মতে নন্দ বংশীয় রাজা নন্দর নয় পুত্র, তন্মধ্যে জেষ্ঠ চন্দ্রগুপ্ত এক ক্ষৌরকার পত্নী রাজকিঙ্করীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত জেষ্ঠ ও নিজ গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও দাসীপুত্র বলিয়া তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিত। রাক্ষস ও শকটার নামে রাজার দুই বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিল। শকটার সহিত রাজা নন্দর ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, প্রতিহিংসা লইবার জন্য শকটার দেশ ভ্রমণ কালীন দেখিতে পাইলেন যে, একটি মাঠে একটি কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ এক মনে এক একটি কুশ উপড়াইয়া তাহাতে ঘোল ঢালিয়া দিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় চাণক্য কহিয়াছিলেন যে "কিয়ৎদ্দিন হইল তিনি বিবাহ করিবার জন্য এই পথে যাইতেছিলেন পায়ে কুশ বিদ্ধ হওয়ায় বিবাহে ব্যাঘাত হইয়াছে, সেই জন্য তিনি কুশ উপড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দিতেছেন; তাহা হইলে কুশ আর বর্দ্ধিত হইবে না।" চাণক্যের এই কথা শুনিয়া ও তাঁহার আকৃতিতে তাঁহাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত বিবেচনা করিয়া শকটার প্রতিহিংসা লইবার উপযুক্ত সময় হইল। বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে রাজা নন্দ সভা মধ্যে চাণক্যের শিখা আকর্ষণ করিয়া অবমাননা করায় তিনি রাজাকে অভিসম্পাৎ করিয়াছিলেন এবং শকটার সাহায্যে তাহাকে বিনাশ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তর বিষয়ে গ্রন্থকারদিগের এই মতভেদ, এত দীর্ঘকাল পরে সম্যকরূপে মীমাংসিত হওয়া অতীব দুরূহ। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশীয় শেষ রাজা ধনেন্দ্রাকে অন্যায়রূপে আহত করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবেমগধ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং মৌর্য্য (অর্থাৎ ময়ূরের চূড়া) বংশ স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্রের নাম বিমহুসুত্র এবং পৌত্রের নাম অশোক। এই অশোকই পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্মাশোক বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

চিত্তবৃত্তি-নিরোধ।

এই প্রবন্ধটীর শিরোভাগ দৃষ্টে পাঠক যেন মনে না করেন যে লেখক যোগশাস্ত্র বিষয়ের কোন উপদেশ ইহাতে সন্নিবেশিত করিবেন। ইদানীং ইংরাজী বিদ্যার পারগ যুবকগণের মধ্যে যোগ কি, যোগাভ্যাস সংসারে থাকিয়া সাধিত হইতে পারে কি না, এবং তাহা হইলে কি উপায়ে তাহা সাধিত হইতে পারে, ইহার অনেক পর্য্যালোচনা হইতেছে। এই যোগ কি এবং যোগাভ্যাসই বা কি তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যে কোন গ্রন্থ পাঠ করা যায় কিম্বা যে কোন সাধু ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করা যায় তাহাতে প্রথমেই এই উপদেশ পাওয়া যায় যে চিত্ত নিরোধ কর নতুবা যোগ কি, কিম্বা যোগাভ্যাস বা কি তাহা জানিতে সক্ষম হইবে না, কেবল কতকগুলি বাক্য বিন্যাস মাত্র কর্ণকুহরে প্রবেশ হইবে, প্রকৃত কথা কিছুই বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধারী যুবক, ঐ উপদেশ পাইয়া কিছু মাত্র অগ্রসর হইতে পারে না, কারণ চিত্ত নিরোধ যে কি, ও কাহাকে বলে তাহা পুস্তক পাঠ কিম্বা সাধু ব্যক্তির নিকট

ক্রিয়া-হীন বাচনিক উপদেশ দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা অতীব সুকঠিন, তথাপি ক্রিয়াবান সাধুদিগের মুখে যে সকল উপদেশ পাওয়া যায় তদনুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলে মন শান্তি অভিমুখে অগ্রসর হয় তাহার সন্দেহ নাই। উপদেশ গৃহীতার অবস্থা ভেদে ঐ সকল উপদেশ ফলোপদায়ক হয়। সংস্কৃত গ্রন্থে মানসিক বৃত্তি সমূহের যে শ্রেণী বিভাগ আছে তাহা সহজে বুঝিবার উপায় অতি বিরল। ইংরাজী গ্রন্থে মানসিক বৃত্তির যে শ্রেণী বিভাগ কিম্বা যেরূপ পরিচয় আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সহজে বুঝা যায়। "চিত্ত নিরোধ" এই বাক্যের মধ্যে চিত্ত শব্দের অর্থ মনের সমস্ত বৃত্তির আবেগ বুঝায়। এই আবেগের স্থল দুইটী প্রথম বহির্জগৎ, দ্বিতীয় বহির্জগতের প্রতি মনের বৃত্তির আবেগ বশতঃ যে সকল ভাব মনের স্মৃতি শক্তিতে সন্নিবেশিত থাকে সেই সকল ভাবের প্রতি বর্ত্তমান সময়ে মনের বৃত্তির আবেগ যখন উপস্থিত হয় তখন ঐ সকল ভাব মনের বৃত্তির আবেগের স্থল হইয়া উঠে। যেমন কোন পরম সুন্দর পদার্থ নয়ন গোচর হইলে মনের ভালবাসার উদ্রেক হইয়া ঐ ভালবাসাই চিত্তের আবেগ হয়, তেমনি কোন সুন্দর বস্তু নয়নের সম্মুখে না থাকিলেও পূর্ব্বে কোন সুন্দর পদার্থ দেখিয়া ভালবাসার আবেগ মনে যে উদ্রেক হইয়াছিল সেই ভালবাসার ছবি মনের স্মৃতিতে যে সন্নিবেশিত ছিল সেই ছবির প্রতিও মনের বৃত্তির আবেগ হইতে পারে। সুতরাং সেই ভালবাসার ছবি ও মনের বৃত্তির আবেগের স্থল হইয়া থাকে। মনের বৃত্তির এই দুই প্রকার আবেগ নিরোধ করার নাম চিত্ত নিরোধ বলে। নিরোধ অর্থে নষ্ট করা কিম্বা একেবারে গতিরোধ বুঝায় না, নিরোধ করার অর্থ উক্ত মনের বৃত্তি সমূহকে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় ইচ্ছার অধীন করা, বহিরিন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দ্বারা বহির্জগতে যে সকল ছবি মনের মধ্যে উদিত হয় সে সকল ছবি মনে পতিত বা উদিত হইতে না পারে, এরূপ চেষ্টাকে চিত্ত নিরোধ বলে না, ঐ সকল ছবি স্বাভাবিক নিয়মে মনে পতিত বা উদিত হইয়া থাকে কিন্তু ঐ সকল ছবি মনে উদিত হওয়ায় মনের বৃত্তির আবেগ যাহাতে না জন্মায় তাহার নামই চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ। চিত্তের আবেগ নিবৃত্ত না হইয়া পুনঃপুনঃ কোন বস্তু সম্বন্ধে উদিত হইলে তাহা অভ্যাস বশত আসক্তি হইয়া উঠে এবং কোন বস্তু সম্বন্ধে আসক্তি জন্মিলে তাহা হইতে মনকে মুক্ত করা অতীব দুরূহ হইয়া উঠে, আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা শাস্ত্রের প্রধান উপদেশ কিন্তু আশক্তি শূন্য হইতে হইলে মনের বৃত্তির আবেগ কি প্রকারে আয়ত্বাধীন করিতে পারা যায় তাহা জানা কর্ত্তব্য -- কেবল জানিলেও ফল নাই তাহা কার্য্যে পরিণত করা চাহি।

ক্রমশঃ।

সাহেবি বাঙ্গালি।

(পত্র)

ভাই ঈশান।

তুমি লিখিতেছ "আমাদের উদ্দেশ্য সাহেবি বাঙ্গালিদের বাঙ্গালির ঘরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং ইত্যাদি।"

সাহেবি বাঙ্গালি কাহাকে বলিব এবং কাহাকে উক্ত শ্রেণী হইতে পরিত্যাগ করিব আজ কালকার দিনে তাহা স্থির করাও আমার পক্ষে দুষ্কর হইয়াছে। এখন শুনিতে পাই যে কর্ণেল আলকট নাকি আমাদিগকে হিন্দুয়ানির আদর শিখাইয়াছেন; বঙ্কিম বাবু এখন কৃষ্ণোপাসনার পথ প্রদর্শক, শশধর তর্ক চুড়ামণি সনাতন ধর্ম্মের যুক্তিদাতা, আর রাজা শশিশেখরের ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে সোণার ভারত নূতন করিয়া গঠিত হইবে!! কেশব বাবু যখন ইংলণ্ড দেখিয়া আসিয়া ফুঁ ফিরাইলেন তখনকার কথা আজিকে আর লোকের মনে নাই। আর দ্বারী বাবুর মৃত্যুর পরে কমটির মতটা নিতান্ত নগণ্য দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তুমি যে "সাহেবি" ছাঁদের উপরে ব্যাজার সেই সাহেবি এক সময়ে Young Bengal এর গর্ব্বস্থল হইয়াছিল; কমটির শিক্ষাতেই তোমার দাদা, বঙ্কিম বাবু এবং কেশব বাবু স্তম্ভিত হইয়াছিলেন; আর সেই কমটির সূচনা ধরিয়াই আমি বলিতেছি যে আজকার দিনে বাঙ্গালির স্বরূপ অবস্থা এবং সাহেবি ছাঁদ মধ্যে বিভেদ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছে।

যে সাহেবির কথা বলিতেছ তাহার দোষ এই যে ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার বাসনা কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। The present must not break off from the past. কিন্তু ইংরাজ বাহাদুরের প্রযত্নে সাহেবি এখন দেশ জুড়িয়াছে। বাঙ্গালির সাহেবি? খিচুড়ি বন্ধ হইবে কি প্রকারে? যখন সহপাঠী সত্যেন্দ্র ইংলণ্ড হইতে সিবিলিয়ান হইয়া আসিলেন তখন হইতে আমি বুঝিয়াছি যে বিলাত ফেরতদের সাহেবি দেখিয়া ব্যাজার হইবার অধিকার নাই। আমরা আপনাদিগের কৃত কর্ম্ম দোষেই মরিতেছি। যাহারা টিকী দেখিলেই উপহাস করা সঙ্গত মনে করিত, তাহারা "নেকটাই" আর "মঙ্কিকোট" দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলে অসহনীয় হয় ভিন্ন আর কি বলিব। তবে কি টিকী রাখাই শ্রেয়? কই তাই বা বলিতে পারি কই? সুতরাং আমার জিজ্ঞাস্য টিকী, টেড়ি এবং টিকী সংযুক্ত টেড়ি এই তিনের মধ্যে শেষের দুটী ত্যাগ করিবার জন্যে তুমি কি বাঙ্গালি ভায়াকে হুকুম করিবে?

আমি টিকীর কথাটী বলাতে হয়তো একটু রূঢ় বাক্য হইল। আমি টিকী পদার্থটাকে একটা symbol গণ্য করিয়া লিখিতেছি মাত্র। কিন্তু বলা বাহুল্য যে আজকার দিনে যে টিকী রাখার Ethics অবধারণ করিতে বসিব—আমি বুড়ো হইলেও আজিও এতটা বুড়োমি করিতে অক্ষম।

যথার্থই টিকী এক বিচিত্র symbol হইয়াছে। এই দেখ এই যে তোমাকে আমি পত্র লিখিতেছি; এই ভাষাটা আমাদিগের শিক্ষিতা যুবতীগণের পক্ষেও যদি নিতান্ত দুর্ব্বোধ না হয় তথাচ খুব বলিতে পারি যে বৃদ্ধ চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য আজ বেঁচে থাকিলে এতখানি টিকী-কাটা-বাঙ্গালা ভাষা কখনই উদরস্থ করিতে পারিতেন না। সত্য মিথ্যা তুমিই বল।

আমাদিগের বাঙ্গালা এক বিচিত্র বস্তু। তাই আমি টিকীকাটা বাঙ্গালার কথা বলিলাম। আমি ভাবিয়া দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন চরিত, বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণ চরিত এবং ভূদেব বাবুর সামাজিক প্রবন্ধ—কেবল তা নহে—মাইকেলি ধবল কবিতা (blank verse) আর তোমাদের নবীন কাব্য কিছুই টিকীওয়ালাদিগের নিকটে বোধগম্য নহে। সুতরাং আমাদিগের বর্ত্তমান ভাষা "বাঙ্গালা" পদে বাচ্য কি না তাহাও সন্দেহ স্থল? কথক ঠাকুর বেদিতে বসিয়া যে কথা কন তাহাতে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের সাহায্য গ্রহণ করিতে কখনও দেখিলাম না। ঘরের মেয়েদের কাছে রামায়ণ মহাভারত

পড়িতে গেলে "শিক্ষিতা" সুন্দরী ছাড়া কালীপ্রসন্নের আদর দেখিতে পাই না।

অতঃপর মনের ভাব! আমাদের মনের ভাব এতই বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে বঙ্কিম বাবুর লেখার মধ্যে "কুন্দ-নন্দিনী কান্দিয়া পলায়ন করিল" কেবল এইটুকু বড় গাঢ় কথা বলিয়াই আমার সংস্কার। আমার লেখা পড়িতে গিয়া বাবুভেয়েরা কুন্দের মত পলায়ন করেন, মনে করিয়া আমার অনেক দিনের ক্ষোভ ছিল বটে। কিন্তু এখন বলি কই দেখাও দেখি যে একজন খাঁটী টিকিওয়ালা "সামাজিক প্রবন্ধ" ও "কৃষ্ণ-চরিত্রের" রসাস্বাদন করিতে সক্ষম?

তবে কি ধরণের বাঙ্গালিত্ব এখন ভারতের কপালে শোভা পাইবে তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। ইংরাজি ধরণে ভাব সাজাইতে না পারিলে এখনকার বাঙ্গালি বাবুরা (নায় বঙ্গবাসী) বাঙ্গালা বুঝিবেন না। কিন্তু ইংরাজি ধরণ শিখাইবার জন্যে যদি বলি যে "ভাই ঈশান আমার নিজের লেখা ছাই হয়েছে আমি কমটীর কথা উদ্গীর্ণ করিয়াছিলাম—কম্‌টী খানি একবার যত্ন করিয়া পড়" তা হলে ভাই তুমিও আমার উপর চটিয়া যাইবে। ফলতঃ তোমার চটিবার কারণ আছে। কেননা ইংরাজি বই পড়িয়া শিখিবার চেষ্টা করা আর দু বৎসর বিলাত বেড়াইয়া সাহেব হইবার বাসনা সমান বিড়ম্বনা। আমাদের ভাগ্যে আছে সাহেবাধম সাহেবের সাহেবির নকল ও আড়ি বা Reaction রূপ ডাল খিচুড়ি ভাব।

আমি বলি সাহেবি ডাল খিচুড়ি যা হচ্ছে তা হোক। আমরা প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মের বিষয়ে উপদেশ দিবার বিষয়ে পক্ষে কি না সেটা সংসয় স্থল। আর গ্রাডুএটদিগের মনঃপূত বাঙ্গালা লেখা ও সম্ভবপর মনে করি না। কেননা আমি যে অজীর্ণ ইংরাজি বঙ্গীয় অক্ষরে ঢালিয়া দিব গ্রাডুএট মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলেই অবলীলা ক্রমে সেই ইংরাজ উপদেশ বিষয়ে আমার গুরু মহাশয়দিগের সহিত আলাপ করিতে পারেন। অতএব এখন টিকীওয়ালাদিগের সমীপেই আমাদিগের উপার্জ্জিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ভক্তিভাবে নিবেদন করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি। সুতরাং তাহার যদি কোন উপায় থাকে তাহার চেষ্টা দেখ।

যতই বক্ বক্ করি আমাদের পক্ষে ইংরাজি ভাষাই প্রধান সম্বল।

অতএব ইংরাজিতে যেটুকু শিখিয়াছি তাহা মাষ্টার বাবুর ধরণে "a can এক পারি" "My head ঘরে বাবার মাতা স্কুলে মাষ্টারের মাতা" এই প্রণালীতে শিখাইবার চেষ্টা না করিয়া অন্য প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। এক, অশিক্ষিতা মাতা, ভার্য্যা, ভগিনী এবং কন্যাকে আমাদিগের শিক্ষার সারভাগ গোপনে অন্দরমহলে শিখাইবার চেষ্টা করা আবশ্যক। সেটা মুখে ভিন্ন হইবে না। আর আবশ্যক টিকীওয়ালা মিন্‌সেদের নিকটে আমাদিগের পেটের কথা ব্যক্ত করা।

তা তোমার কথার উত্তরে আমি তোমাকেই লিখিতে বলি যে অধ্যাপক মহাশয়েরা আমাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন এবং তাহা বুঝিয়া তাঁহারা আমাদিগের ভ্রম ঘুচাইতে পারিবেন এই ব্যবস্থার সদুপায় কি? আমি বলি যে তোমরা এই বিষয়ে যদি কিছু বল তবে আমি বুড়া বয়সে একটু শিক্ষালাভ করিতে পারি।

কেননা আমার মনের সংস্কার এই যে কমটির মত জানিতে পারিলে অধ্যাপক মহাশয়েরা অতি সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। কিন্তু কি করিয়া যে অধ্যাপকের বোধগম্য করিয়া কমটির মতের ব্যাখ্যা করিব, তাহা আমি স্থির করিতে পারি নাই।

এক রজনী।

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রের আলোক বড় ক্ষীণ। সেই ক্ষীণালোকে বিভাসিত হইয়া ক্ষুদ্র-কায়া সরস্বতী কাশীগঞ্জের নিম্ন দিয়া অবসাদপূর্ণ গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। নদীর উভয় তীর অতি উচ্চ, তদুপরি নানাবিধ আরণ্যপাদপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহুদূর বিস্তৃত রহিয়াছে। চন্দ্রের ম্লান জ্যোতি সেই ঘন পত্রাবলির শ্রেণী ভেদ করিয়া ক্বচিৎ মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে। দূরে এই তরুরাজির প্রান্তে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ স্তূপাকার পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উপরে, পার্শ্বে, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ-গুল্ম-লতাদি জন্মিয়াছে। তাহাতে স্থানটীর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। সঙ্গীবিহীন পথিক সহসা দিবাভাগেও এই পথ বহিয়া চলিতে বড় একটা সাহসী হয় না।

প্রবাদ আছে, এই স্থানটী সর্ব্ব প্রকার দুষ্ক্রিয়ার আশ্রয় স্থান। নানাবিধ ভৌতিক ও মানবিক অভিনয় এই নির্জ্জন স্থানে সদা সর্ব্বদা হইয়া থাকে। এই সকল কারণে লোকে এই স্থানটীকে ডাকিনীপোঁতা বলে।

সেই রজনীতে একটী রমণী সেই ভগ্নাট্টালিকার ইষ্টক বহিয়া লতা গুল্মের সাহায্যে উপরে উঠিতেছিল। ইষ্টক সকল প্রায়ই স্খলিত হইয়াছিল, পদভরে স্থানচ্যুত হওয়ায় উপরে উঠিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল। কিন্তু সেই রমণী দৃঢ়তার সহিত সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে উপরে উপস্থিত হইল। কিঞ্চিদ্‌দূরে সম্মুখে একটী ভগ্ন ক্ষুদ্র গৃহ, গৃহের চতুষ্পার্শ্বে গুল্ম-লতার নিবিড় জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। কেবল মধ্যে একটী সঙ্কীর্ণ পথরেখা বিদ্যমান আছে। রমণী সেই পথ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে প্রতিফলিত হইয়া নৃমুণ্ড মালিনীর কৃষ্ণ-চিক্কণ মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছিল। দেবীর সম্মুখে অগ্নি, পার্শ্বে এক জটাশোভিত সন্যাসী ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। রমণী প্রবেশ করিয়া গললগ্নবাসে দেবীর চরণে প্রণিপাত করিল, পরে সন্যাসীকে প্রণাম করিয়া কিঞ্চিদ্‌দূরে এক পার্শ্বে উপবেশন করিল।

দণ্ডার্দ্ধেক সন্যাসী ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া গাত্রোত্থান করিল, এবং মন্ত্রে ও পুষ্পে দেবীকে অর্চ্চনা করিল। পরে সেই উৎসর্গীকৃত পুষ্প দ্বারা রমণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসনে উপবেশনান্তর বলিল—মা তোমার কুশল ত? স্বামীর কুশল ত? এ অসময়ে এখানে কেন মা? মন কি এখনও স্থির হয় নাই, এ বুড়ার উপর কি এখনও বিশ্বাস হয় নাই? এত অবিশ্বাস কেন মা?

রমণী নম্রভাবে উত্তর করিল—ঠাকুর, আমি আর একবার জানিতে আসিয়াছি, ইহার কি আর অন্য কোন উপায় নাই। ঠাকুর এই মার দিব্য আমাকে প্রবঞ্চনা করিও না। ধর্ম্মের ছলে অধর্ম্মে লিপ্ত করিও না। তোমার দিব্য, সত্য করিয়া বল আর কি উপায় নাই?

সন্যাসী কিঞ্চিদ্ গম্ভীর স্বরে বলিল—অবোধ মা, আর কোন উপায় দেখিলে কি এ পথে আসি! এ অধম হিন্দু জাতির উদ্ধারে আপাততঃ আর কোন সুবিধা দেখিতে পাই না। এরা দুর্ব্বল হইয়া আত্মরক্ষার ক্ষমতা হারাইয়াছে।

রমণী একটু থামিল, পরে বলিতে লাগিল—রমণীর স্বর আবেগপূর্ণ—‘দেখ ঠাকুর, আমি স্ত্রীলোক—হীনবুদ্ধি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শূন্যা। তোমরা পণ্ডিত, জ্ঞানী। তোমাদের পরামর্শে আমার হস্তক্ষেপ অনুচিত, তাহা আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু ঠাকুর আমার দিব্য, আর একবার ভাবিয়া দেখ কি গুরুতর কার্য্যে আমার স্বামীকে নিয়োজিত করিতেছ, ভাবিয়া দেখ এই কার্য্যের কি বিষময় পরিণাম হইতে পারে! তুমি পরামর্শ না দিলে আমার স্বামী কখনই এ পথে আসিতেন না। ঠাকুর এখনও সময় আছে, ভাবিয়া দেখ, ভাবিয়া দেখ, এ পাপ পথ হইতে ফিরিয়া যাও।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিল, পরে গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল—বাছা এত দিনেও কি এই সুযুক্তির মর্ম্ম বুঝিলে না? আমায় ভাবিয়া দেখিতে বলিতেছ? কি ভাবিয়া দেখিব মা? ভাবিয়া দেখিব কি হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম কেন পদদলিত ও কলুষিত হইতেছে! ব্রাহ্মণের আচরণ কেন লোপ পাইতেছে! সমাজমধ্যে এত বিশৃঙ্খলা, এত অশিষ্টাচার প্রশ্রয় পাইতেছে! ভাবিয়া দেখিব কি হিন্দু রমণীর জীবনধন সতীত্বরত্ন কেন দিবসরজনীতে নির্দ্দয়ভাবে অপহৃত হইতেছে? কেন হাহাকার ধ্বনি, মর্ম্মভেদী অশ্রু গৃহস্থের ঘরে ঘরে ঝরিতেছে। ধর্ম্মের উচ্ছেদ, সতীত্বের ধ্বংস, সামাজিক ও পারিবারিক সুখের নাশ, এ সব কথা আর কত দিন ধরিয়া ভাবি মা? এই সকল বিশৃঙ্খলার মূলে কুঠারাঘাত করা যে কোন উপায়েই হউক বিধেয়। মা কত আর ভাবি? ভাবিবার সময় গিয়াছে, এখন কার্য্য চাই।

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল। চক্ষু বিস্তৃত ও উজ্জ্বল হইল। সন্ন্যাসী অট্টহাসি হাসিল। অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিল। শিখা জ্বলিয়া উঠিল, বর্দ্ধিতালোকে দেবীমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল; দেবীর প্রতি চাহিয়া বলিল—‘ঐ দেখ মা হাসিতেছে। আর ভয় কি?’

সন্ন্যাসী নীরব হইল। রমণী অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল—ঠাকুর, এ তর্কের কথা নহে। তুমি যাহা যাহা বলিলে সকলই অতি সত্য। কিন্তু ঠাকুর তোমাদের কার্য্যে এই সকল অমঙ্গল কি দূরীকৃত হইবে তাহা ভাবিয়াছ? ম্লেচ্ছকে দূর করিয়া ফিরিঙ্গিকে নগর দিলেই কি সকল গোল মিটিবে? ফিরিঙ্গিকে ক’দিন চিনিয়াছ ঠাকুর যে উহাদের উপর এত বিশ্বাস! আমি তর্ক করিতে আসি নাই। কিন্তু আমি বেশ জানি যে অসৎ উপায়ে কখনও কাহারও মঙ্গল হয় নাই হইবেও না।

সন্ন্যাসী—‘মা কথাগুলি বড় বুদ্ধিমতীর ন্যায় বলিতেছ। কিন্তু মা এ জগতের গতি বড়ই জটিল, অনেক স্থলে বাঁকা পথ দিয়া চলিতে হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অশ্বত্থামা হত গজ ইতি রূপ বাঁকা পথে চলিয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। তা অন্যে কা কথা।’

রমণী—ঠাকুর! তোমাকে তর্কে পরাজয় করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইতেছে। প্রভু, প্রতিপালক, আশ্রয়-দাতাকে রক্ষা সর্ব্বতঃ ধর্ম্ম। সেই প্রভুর বিনাশ সাধনে উদ্যত! এ কি ঘোরতর অধর্ম্ম নয়? হউক না কেন ওমরা দুর্বৃত্ত পাপাচারী—কিন্তু ঠাকুর পাপের শাস্তি বিধান করিবার তুমি আমি কে? ছি! ছি! বিশ্বাসঘাতকতা! নিমকের অপমান! অধর্ম্মাচরণ! অনিশ্চিৎ আশায় ঘোর বিপদে নিমজ্জন! ঠাকুর এখনও ফের, এখনও তোমার ধর্ম্মের ভাণ ছাড়িয়া দিয়া আমার স্বামীকে নিবৃত্ত কর। তুমি না কর, দেখিব আমি স্বামীকে ফিরাইতে পারি কি না, আমার জোর গুরুমন্ত্রণাবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না!

বলিতে বলিতে রমণীর গর্ব্বিত আনন আরক্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আরক্ত লোচনের কটাক্ষ দৃপ্ত সৌদামিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হইল, অরুণাভ ওষ্ঠাধর ঈষৎ কুঞ্চিৎ ও পরস্পরে দৃঢ় সংলগ্ন হইল। সন্ন্যাসী সেই স্ফীত গর্ব্বিত রমণীর সৌন্দর্য্য হেরিয়া পুলকিত হইয়া বলিল—মা রমেন্দ্র রায়ের উপযুক্ত পত্নী তুমি বটে। তুমি স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া বীরহৃদয়কে উৎসাহিত কর। তোমার বলেই দুষ্টের দমন হইবে ও তোমার স্বামী যশস্বী হইবে।

রমণী—‘অধর্ম্মে শ্রেয়ঃ হয় না। সন্ন্যাসী জানিও আমি তোমার বিপক্ষ, স্বামী আমার।’ এই বলিয়া রমণী সগর্ব্বে উঠিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ।

ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় ভাব।

য়ুরোপীয়দের মধ্যে আমরা মাত্র ইংরাজকে কথঞ্চিৎ জানি। পাশ্চাত্য অন্য জাতির অভিজ্ঞান, আমরা ইংরাজ হইতে কিছু কিছু পাইয়াছি। ইংরাজের শিক্ষানুসারে, আমাদের সেকেন্দার সাহ, জুলিয়স সিজার এবং নোপোলিয়ন বোনাপার্টির অভিজ্ঞান। ইংরাজ বলিয়া দিয়াছেন, তিনিই য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শীর্ষ স্থানীয়। আমাদের শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় ও ইংরাজের এই কথায় বিশ্বাস করত তাঁহাকে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া জানিতেছেন। তাঁহারা ইংরাজকে নরদেবতা বলিয়া জানেন, বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। সেই নর-দেবের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা একান্ত আবশ্যক।

অধুনাতন য়ুরোপীয় ভাব সকলের অঙ্কুর রূঢ় এবং অস্ফুট ভাবে প্রথমতঃ গ্রীসে জাত হয়। গ্রীসে সমুদ্ভূত হইয়া পরে রোমে পরিপুষ্ট এবং সেখান হইতে ফ্রান্স জার্ম্মাণি এবং ইংলণ্ডে প্রকটিত হয়। মাসিডান, নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ, পার্শিয়া এবং ভারতবর্ষ অবধি গ্রীস স্বীয় অধিকার ভুক্ত এবং রোম স্বীয় বিরাট রাজ্য-শরীর ভূমধ্য সাগরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করেন। এখন রোমের পদচিহ্ন ধ্যান পূর্ব্বক রুষিয়া এবং ইংলণ্ড আপনার রাজ্য-শরীর অতি বিপুলরূপে বিস্তার করিতেছেন। ইংরাজ সাহঙ্কারে বলেন তাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখন অস্ত যায় না।

ইংরাজের দেশ অতীব শীতল। শীতে ইংরাজকে কার্য্যে রত করে। শীত প্রধান দেশে লোকেরা শীঘ্র কৃষিকার্য্যে রত হইতে পারে না। তাহারা বহুকাল ধরিয়া মৃগয়া দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ইংরাজকে বহুদিন ধরিয়া প্রাণী হিংসা করিতে হইয়াছে।

এইরূপে জিঘাংসা অতি পূর্ব্ব হইতে ইংরাজের হৃদয়াধিকার করিয়াছে। অধিকন্তু ইংরাজের বাসভূমি ইংলণ্ড দ্বীপ সংকীর্ণ স্থান বিধায় তাহা হইতে ইংরাজ সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। কাজেই বহু পূর্ব্বকাল হইতে বৈদেশিক দ্রব্যাদি সমানয়নের জন্য তাহাকে যত্ন করিতে হইয়াছে এবং তিনি বণিক বৃত্তি রত এবং পরদেশ গমনে অভ্যস্ত হইয়াছেন। এই অভ্যাস বশতঃ পর দ্রব্যে তাহার লোভ জন্মিয়াছে এবং তিনি বিলক্ষণ লোভী হইয়াছেন। এই লোভ বশতঃ তিনি সমুদ্র পথে অগ্রসর হইয়া অনেক জাতিরই দেশ এবং রাজ্যাদি আত্মসাৎ করিয়াছেন। পশ্চিমে আমেরিকা, উত্তরে গ্রীন্‌লাণ্ড, দক্ষিণে কেপকলনি এবং অষ্ট্রেলিয়া এবং পূর্ব্ব দিকে পিগু অবধি ইংরাজ হস্ত বিস্তৃত করিয়াছেন। ইংরাজের লোভ, গ্রহণেচ্ছা এত প্রবল যে ত্রিভুবন বিজয় এবং করগত করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইবেন কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। তাঁহার চিত্ত নিহিত প্রবল জিঘৃক্ষা পরিতোষ জন্য বিধাতাকে হয়ত নূতন পথিবীর সৃষ্টি করিতে হইবে।

"আমি সাগর অধীশ্বরী"—আস্পর্দ্ধা সহকারে ইংরাজ এই উপাধিও গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজের অহঙ্কারের সীমা নাই। আর অর্জ্জিত লোভ বশতঃ তিনি পরদেশের দ্রব্য-জাতে স্বদেশস্থ ভাণ্ডার এবং পর রাজ্যের ধনরত্নে স্বদেশের কোষ সকল পূর্ণ করিতেছেন। ইংরাজ ধন মদে মত্ত এবং পদ গর্ব্বে বিষম গর্ব্বিত। রোমেরও এক দিন এই ভাব ছিল। সিডানের সমরের পূর্ব্বে ফ্রান্সও এই ভাবে বিভোর হইয়া ধরা কম্পিত করিয়াছিলেন।

হিন্দুর কিন্তু অহিংসা পরমধর্ম্ম। হিন্দু সন্তুষ্ট চিত্ত এবং নম্রশীল। হিন্দু রাজাদের যুদ্ধেচ্ছা, বিজয় লালসা থাকিলেও তাঁহাদের ইংরাজের ন্যায় হৃদয়ব্যাপী প্রবল জিঘৃক্ষা ছিল না। আর্য্য ভূপতির ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া অন্য দেশ অধিকার করার দৃষ্টান্ত অত্যল্পই পাওয়া যায়। "সুজলাং সুফলাং" স্বদেশ মধ্যে দিগ্বজয়ে বাহির হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজয় স্বীকার করিলেই তিনি বিজয়ী রথ প্রত্যাবৃত্ত করিয়া লইতেন। ইংরাজের ন্যায় পর রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার সামর্থ্য শোষণ করিতেন না।

হিন্দু সতত সন্তুষ্ট চিত্ত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক যেরূপ কথিত হইয়াছে, অঋণী এবং অপ্রবাসী হইলেই এবং দিবসের অষ্টম ভাগে শাকান্ন ভোজন পাইলেই হিন্দু পরম হৃষ্ট। হিন্দুর প্রবাসে অসাধ এবং শাকান্নে তৃপ্তি, সুতরাং হিন্দু লোভ এবং হিংসা পরায়ণ নহেন। তাহার চিত্তে, পর দেশ, পর রাজ্য, পর দ্রব্য, পর ধন এবং পর সত্ত্বাধিকার গ্রহণ চিন্তা নাই। তাহার ভোগ বিলাসিতা এবং অহঙ্কার নাই বলিয়া তাহাকে ঋণ করিতে এবং উত্তমর্ণের উৎপীড়ন সহিতে হয় না। আমাদের ইয়ং বেঙ্গলের ন্যায় পূর্ব্ব কালের হিন্দু পক্ষধারিণী কল্পনা কামিনীর সাহায্যে শূন্যে পরিভ্রমণ

করিতেন না। দুর্জ্জয় আশার দাস হইয়া তিনি অধঃ ঊর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত এবং উৎক্ষিপ্ত হইতেন না সুতরাং সন্তোষ এবং সুখলাভে সক্ষম হইতেন।

বাহ্য জগৎ অর্থাৎ প্রকৃতি (nature) দেবীকে জয় করিয়াছি বলিয়া ইংরাজ আস্পর্দ্ধা করেন। বহ্নি, বায়ু, বারি প্রভৃতি ভূত সকলকে তিনি দাসের ন্যায় খাটাইয়া থাকেন। কিন্তু অন্তর্জগৎ জয়ে তিনি একান্ত অক্ষম। নব্য দর্শন শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের পিতামহ লর্ড বেকান দারুণ চিত্ত বৃত্তির একান্ত দাস ছিলেন। ইংরাজ মাত্র আত্ম সুখ-সেবায় ব্যস্ত। কিসে নিজের এবং নিয়ত বামে বিরাজিতা রমণীর উত্তম পানাহার এবং পরিচ্ছদ সংগ্রহ হইবে কেবল তজ্জন্যই ইংরাজ ব্যাকুল। বহির্বিষয় ব্যতীত অন্যত্র ইংরাজের দৃষ্টি প্রায় পড়ে না। পড়িলে তিনি দড়ি কম্পাস লইয়া পর দেশ বিভাগ করিয়া লইবার জন্য আফ্রিকায় প্রবেশ করিতেন না, এবং শোণিতপাতে কুণ্ঠাশূন্য হইতেন না।

আর্য্য শাস্ত্র আর্য্য জাতি অন্য গুরুতর বিষয় লইয়া ব্যস্ত ছিল। ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয় লইয়া কালক্ষেপে আর্য্যদের প্রবৃত্তি ছিল না। অশ্বাদি পশুকে বশে রাখিবার জন্য তাঁহারা বল্‌গা প্রস্তুত করনে ব্যগ্র হইতেন না। কাম ক্রোধাদি রিপু সমূহকে বশীভূত এবং শাসিত করিবার নিমিত্তই সমস্ত শারীরিক এবং মানসিক বল প্রয়োগ করিতেন। নিগ্রহ না করিয়া তদ্‌সমুদয়কে দমন এবং যথাযথ পথে চালিত করা তাঁহাদের এক মাত্র কার্য্য এবং জীবনের লক্ষ্য ছিল।

ভীষ্মদেবের শরশয্যা একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার। "পিতামহ" তীক্ষ্ণশীর্ষ শরজাল বিদ্ধ হইয়া শায়িত। এরূপ অবস্থাতেও চিত্তের কোনরূপ চাঞ্চল্য কি ক্লেশ প্রকাশ নাই। তিনি শান্ত এবং ধীর ভাবে অবস্থিত, যেন পিপীলিকা মাত্রও তাঁহার দেব দেহ স্পর্শ করে নাই। কেবল ইহাই নয়, তদবস্থায় তিনি মহাভারতোক্ত শান্তি পর্ব্বের অতি জটিল এবং গুরুতর বিষয় সকল যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, তিনি কি উপায়ে এই লোকাতীত কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন? উত্তর, যোগবলে। আত্মসংযমগুণে, যোগাভ্যাস বলে, ভীষ্ম দেব দেহের উপর, প্রবল ইন্দ্রিয়গণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ভীষ্ম দেব স্বীয় আত্মাতেই রমণ করিতেন। শারীরিকি সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিত না।

শুনা আছে কলিকাতার কেল্লা হইতে তোপ হইতেছিল—অল্প দূরে একটি "বধির" এবং তাহার সঙ্গী একটি লোক। সঙ্গীকে কেল্লার দিকে চাহিতে দেখিয়া বধির কারণ জিজ্ঞাসা করায় সঙ্গী বধিরের কাণের নিকট উচ্চস্বরে বলিলেন "তোপ হইতেছে"। বধির উত্তর করিল "সব ভক্ খেয়ে যাচ্চে যে" অর্থাৎ শব্দ নাই কেবল ধূমোদ্গীরণ হইতেছে। মানুষটি এমনি কালা যে নিকটে কেল্লায় তোপধ্বনি হইল কিন্তু তাহা শুনিল না। ভীষ্ম দেবের চিত্ত-কর্ণ ঐ কালার কর্ণেন্দ্রিয় স্বরূপ। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সুখ দুঃখের নিনাদ তাঁহার চিত্তকর্ণে প্রবেশ করিত না। হয় তো ইংরাজি শিক্ষিত নব্যগণ ভীষ্ম দেবের এই বৃত্তান্তটি গলাধঃকরণে অসমর্থ হইবেন। কিন্তু যে জাতির সাহিত্য ইতিহাসে এরূপ বৃত্তান্ত বিবৃত, সেই আর্য্য জাতি যে ঐরূপ কার্য্য করণে সমর্থ, তাহা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারেন।

সত্যের সমাদর, সত্য প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা জাতীয় প্রকৃতি নির্ণীত হইয়াথাকে। দেখানো হইয়াছে যে ইংরাজ মাত্র বহির্জগৎলইয়াই ব্যস্ত। ইংরাজের সত্য নিষ্ঠা যে বিশেষ প্রবল নয় তাহা দেখাইবার জন্য একটু প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে।

ভিরাফোবিয়া (Viraphobia) অর্থে সত্য-ভীতি। রুষ ইংরাজকে সত্য-ভীরু বলেন। বলেন ইংরাজ সত্যকে ডরান। সুবিখ্যাত জান্ ষ্টুয়ার্ট মিল ইংরাজকে মিথ্যাপ্রিয় বলিতেন। কোন সময়ে তিনি পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য হইবার ইচ্ছুক হইলে তাঁহার ভোটারগণ তাঁহার পৃষ্ঠ পূরক হইতে অগ্রসর না হইবার তিনি মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহাদিগকে গালি দেন। কিন্তু এরূপ করাতে তাহারা তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীত হন এবং তাঁহাকে সভ্য পদে মনোনীত করেন। ইংরাজ সত্য কি মিথ্যা প্রিয় এই ইষু সম্বন্ধে আমরা রুষের এবং জান্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সাক্ষ্য দর্শাইলাম। এ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেরপ্রমাণ আছে কি না তাহার একটু আলোচনা করা যাউক।

গত ১২ই জুলাই কলিকাতা টাউন হলে বক্তৃতা কালে মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে ইংরাজ ভারতবাসী সম্বন্ধে স্বীয় সত্য পালনে তেমন যত্নশীল নহেন। স্বার্থের ব্যাঘাত সম্ভাবিত হইলে ইংরাজ সত্যের গৌরব রক্ষার্থ ইতস্ততঃ করেন।

সকল জাতির মধ্যেই বিশেষ বিশেষ গালিদানে প্রহারের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ কোন জাতীয় লোককে অন্য যত প্রকার নিন্দা করা যাউক, তাহারা বাক্য দ্বারা প্রতিবাদ করিবে, ক্রোধে প্রহার করিতে যাইবে না। কিন্তু গালি বিশেষ তাহাদের পক্ষে এতই অসহ্য যে প্রহার না করিয়া থাকিতে পারে না। যথা হিন্দুকে "মাতৃ উচ্চারণ" করিলে তিরস্কারককে প্রহার করিতে উদ্যত হয় কিম্বা প্রহার করে। মুসলমানও ঐরূপ করেন। দেখা যায় মিথ্যাবাদী (liar) বলিলে ইংরাজ কথার জবাব না দিয়া একবারে ঘুষি ধরিয়া থাকেন। ইংরাজ কি সত্যকে হিন্দু মাতার মত পবিত্র জ্ঞান করেন?

কার্য্যে ত তাহা দেখা যায় না। তবে ঘুষি তোলেন কেন? ইংরাজের তাদৃশ ব্যবহারে এই বুঝা যায় যে সাধারণতঃ ইংরাজ মিথ্যাবাদিতা দোষের প্রতিবাদে অক্ষম।

আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় কোন স্পষ্টবাদী ব্যক্তি তাঁহার প্রণয়াস্পদ কোন ইংরাজকে বলিয়াছিলেন যে আপনার জাতীয়েরা বড়ই মিথ্যাবাদী। ইংরাজটি অতি উচ্চ দরের লোক, জীব কাটিয়া মুখভঙ্গি করত ঐ কথার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, "অমন কথা বলিও না, আমরা কখন মিথ্যা বলি না, সত্যের সৃষ্টি করি মাত্র।"

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। প্রায় সকল ইংরাজই দেখা করিবার ইচ্ছা না থাকিলে বাড়ীতে থাকিয়াও বাড়ীতে নাই এই অপ্রকৃত কথা ভৃত্যের দ্বারা আগন্তুককে জানাইয়া থাকেন। ইংরাজ মধ্যে এইটী একটি সাধারণ প্রথা (conventionalism) হইলেও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অনুমোদিত নহে। যে সমাজ এই রীতির প্রবর্ত্তক তাহা কোন ক্রমেই শুদ্ধ সত্য নিষ্ঠ নহে। ইহার কুফল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইংরাজ এই ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া মিথ্যা কথন প্রবণতার পরিচয় দিতেছেন।

স্থূল কথা ছাড়িয়া একটু সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। ইংরাজ নির্ভীক বীরপুরুষ সুতরাং তাঁহার মিথ্যাবাদিতা ভীরুতা প্রণোদিত নহে। যখন তিনি মিথ্যা বলেন, লোভ বশতই বলিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে এতদ্দেশীয় লোকেরা (যাহাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে গ্রীক, রোমীয়, চিনীয় প্রভৃতি অনেকানেক বিজ্ঞ জনগণ একবাক্যে সাক্ষ্য দিয়াছেন; যাহাদের সম্বন্ধে প্রথমাগত ইংরাজরাও ঐ কথা বলিয়াছেন) ৫০০। ৬০০ বৎসর হইতে পুনঃ পুনঃ ধর্ষিত এবং বিড়ম্বিত হইয়া "মনমরা" হইয়া গিয়াছে এবং না বুঝিতে পারিয়া আত্মরক্ষার্থ মধ্যে মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছে।

উল্লিখিতরূপ ইংরাজ স্বয়ং মিথ্যা প্রবণ হইয়াও আজ কাল ভারতবর্ষবাসীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিতে সঙ্কুচিত হন না। অধিকন্তু ভারতবাসীর পবিত্র শাস্ত্রের ও অপ্রকৃত অর্থ করিয়া তাহার নিন্দা করিতে সাহসী হন। আর্য্য শাস্ত্র সত্য সম্বন্ধে কি বলেন শুনুন—"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ নব্রুয়াৎ সত্যং অপ্রিয়ং।" সত্য কহিবে, প্রিয় কহিবে অপ্রিয় ভাবে সত্য কহিবে না। দেখুন হিন্দু শাস্ত্রের কি সুন্দর আদেশ। এই শাস্ত্র আরো বলেন—সত্যরূপং পরম ব্রহ্ম, সত্যংহি পরম তপঃ, সত্য মূলা ক্রিয়া সর্ব্বা, সত্যাৎ পর তরো নহি। কাজেই হিন্দুকে সর্ব্বথা সত্যাচরণ এবং সত্যের আদর করিতে হয়। সত্যের অনাদরে সত্য বর্জ্জনে হিন্দুর ধর্ম্মচ্যুতি এবং অধোগতি এবং তাহাকে সত্যরূপী পরম ব্রহ্ম হারাইতে হয়।

* * *

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

১ম ভাগ— ৫ম সংখ্যা। ভাদ্র—১৩০০।

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ঃ—

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার; শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল্; শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল; শ্রীঅক্ষয়কুমার সুর, এম্, এ, বি, এল্; শ্রীদাশরথি ঘোষ এম্, এ, বি, এল্; শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

১। সত্য অহিংসাদি—নিত্যধর্ম্ম ১২৯
২। আমাদিগের শিক্ষা ১৩৩
৩। এক রজনী (উপন্যাস) ১৩৮
৪। সাহেবি বাঙ্গালি ১৪৪
৫। গান ১৫২
৬। অনুতাপ ১৫৩
৭। ভার্য্যার বিপদ (পদ্য) ১৫৭
৮। আমি তোর এত কি সুন্দর? (পদ্য) ১৫৮
৯। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ১৫৯

হুগলী,
সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাদ্র—১৩০০।

এই সংখ্যার মূল্য ৵১০ দেড় আনা।

পূর্ণিমার গ্রাহকদিগের নিকট

নিবেদন।

পূর্ণিমার গ্রাহকদিগের কৃপায় পত্রিকা খানি স্থায়ী হইবার উপক্রম হইয়াছে। উহার যেরূপ আয় দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে আমাদের বিশেষ উৎসাহ জন্মিয়াছে। গ্রাহক-গণের মধ্যে অনেকে পত্রিকার মুল্য প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা অদ্যাপি মূল্য দেন নাই, তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া মুল্য প্রদান করিলে আমরা বড়ই অনুগৃহীত হইব। বিদেশীয় গ্রাহকের মধ্যে অনেকে আলস্যক্রমে মুল্য পাঠান না তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি। এক টাকার জন্য ডাক ঘরে যাইয়া মনি অর্ডার করা, তাঁহারা তত সুবিধাজনক মনে করেন না। এই জন্য আমরা স্থির করিয়াছি আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা ভ্যালুপেবেলে পাঠাইব। ইহাতে তাঁহাদের অতিরিক্ত কিছুই লাগিবে না, অথচ অসুবিধা কিছুই হইবে না। আশা করি, ইহাতে কেহই অসন্তুষ্ট হইবেন না। যাঁহাদের আপত্তি থাকে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
ম্যানেজার পূর্ণিমা,
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ। ভাদ্র, সন ১৩০০ সাল। ৫ম সংখ্যা।

সত্য অহিংসাদি—নিত্যধর্ম্ম।

যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্য কুর্ব্বণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্॥ মনু ৪। ২০৪

পণ্ডিত লোকে সতত যম পালন করিবে, নিয়মের সেবা নিত্য করণীয় নহে। যম পালন না করিয়া, কেবল নিয়ম ভজন করিলে পতিত হইতে হয়।

এইটি হইল মনুর শাস্ত্র সুতরাং শাস্ত্রবাদী মাত্রেই ঐ উপদেশ-বিধি-মত কার্য্য করিতে বাধ্য। এখন কথাটা বুঝিতে হইতেছে। নিয়মানুষ্ঠানের অপেক্ষা যমানুষ্ঠানের মনু গৌরব করিতেছেন। দেখা যাউক যম নিয়ম কাহাকে বলে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

ব্রহ্মচর্য্যং দয়াক্ষান্তি ধ্যান সত্য মকল্কতা।
অহিংসা স্তেয় মাধুর্য্যো দমশ্চেতি যমাঃ স্মৃতাঃ।

ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্য কথন, সরলতা, অহিংসা, অস্তেয়, মাধুর্য্য, দম এইগুলি যম। আর—

স্নানং মৌনোপবাসেজ্যা স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহাঃ
নিয়মো গুরুশুশ্রূষা শৌচাক্রোধাপ্রমাদতা।

স্নান, মৌনাবলম্বন, উপবাস, যজ্ঞকার্য্য, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় সংযমন, গুরু-শুশ্রূষা, শৌচ, অক্রোধ এবং সাবধানতা—এইগুলি নিয়ম।

যম নিয়মের লক্ষণ ও বিভেদ বিচারে অনেক সূক্ষ্ম তর্ক হইতে পারে, সে সকল ছাড়িয়া দিয়া এখন মোটামুটি এই বুঝিতে পারা যায়, যে হিংসা না করা, চুরি না করা, মিথ্যা না বলা, কপট ব্যবহার না করা, কেহ দোষ করিলে দণ্ড না দেওয়া, বা দাদ না তোলা, রূঢ় বাক্য না বলা, ভোগেচ্ছায় কোন কার্য্য না করা—এই সকল সংযমের কার্য্য এবং জীবে দয়া ও ভগবানে ভাবনা—মানবের অবশ্য করণীয় নিত্য কার্য্য। এই গুলির পালন সকল সময়ে সকল অবস্থায় করিতেই হইবে, ইহাতে তিথি নক্ষত্রে বাধ পড়ে না, বর্ষায় বা বসন্তে, প্রাতে বা সন্ধ্যায় করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, মাসান্তে বা পক্ষান্তে করিতে হইবে না, এমনও কোন কথা নাই।

আর স্নান করা, মৌনব্রত করা, উপবাস করা, যজ্ঞ করা, বেদ পাঠ করা, উপস্থ নিগ্রহ করা, গুরু সেবা করা, অন্তর্ধৌতি ও বহির্ধৌতি করা, ক্রোধ পরিবর্জ্জন এবং সাবধনতা—এই সকল নিয়ম পূর্ব্বক করিতে হয়। নিত্য করিতে হয় না। স্নান, উপবাস, ব্রত যজ্ঞ, এ সকল কি সমস্ত রাত্রি দিনই করিবে? না! অসুস্থ হইলে করিবে? এ সকল কোন্ কোন্ সময়ে করিতে হইবে, তাহার বিধি আছে, আর কোন্ কোন্ সময়ে করিতে হইবে না, তাহার নিষেধও আছে। এই জন্যই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—যমানুষ্ঠান সতত করিবে, নিয়মানুষ্ঠান নিত্য করণীয় নহে।

মনুর বাকি কথাটুকু—যম না করিয়া, কেবল নিয়ম ভজন করিলে (মানবের) পতন হয়—এটুকু গাঢ় উপদেশ পূর্ণ, শাস্ত্র মুখে বিজ্ঞান বার্ত্তা, এবং এ সময়ে সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

দিব্য প্রাতঃ স্নান করিয়া ফোঁটা কাটিয়া, গরদের জোড় পরণে স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে বাড়ী আসিয়া, পূজা, হোম, তর্পণাদির অনুষ্ঠান করিলাম, কিন্তু তাহার পর সমস্ত দিন কেবল মিথ্যাচার আর কপটাচার, ভণ্ডামি, লোকের বাপান্ত, আর আহারের লোভান্ত,—এইরূপ নিয়ত করিয়া, যদি লোকের পতন না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র মিথ্যা, বিজ্ঞান মিথ্যা—সকলই মিথ্যা। যমানুষ্ঠান না করিয়া, কেবল নিয়ম ভজন করিলে, মানবের পতন হয়—তাহাতে কি সন্দেহ আছে? চারি দিকেই এই বিজ্ঞান বার্ত্তার জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে।

কোন্ গুলি যম, আর কোন্ গুলি নিয়ম, এতদ্বিষয় নির্দ্দেশে শাস্ত্রকারগণ মধ্যে সামান্য মতভেদ থাকিলেও যম নিয়মের প্রকৃতি ভেদ বেশ বুঝিতে পারা যায়। কেহ কেহ বলেন, যে পাঁচটি মাত্র যম—সেগুলি এই—

অহিংসা সত্য-বচনং ব্রহ্মচর্য্য মকল্কতা,
অস্তেয়মিতি পঞ্চৈতে যমা বৈ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

মহর্ষি পতঞ্জলিও বলেন যম পাঁচটি—আর সেগুলি এই—

অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ

এইরূপ যত মত ভেদই থাকুক—হিংসা না করা, মিথ্যা না বলা, পরস্বাপহরণ না করা, আর ভোগসাধন ত্যাগ করা, এই কয়েকটি বিষয় যে যম, তাহা স্থির আছে।

এখন এস দেখি! ভাই সকল, দাদা সকল, বাপ সকল, আমরা সকলে কায়মনোবাক্যে ঐ চারিটি যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করি। ভারতোদ্ধার, বঙ্গোদ্ধার যথেষ্টই হইয়াছে; এখন এস, দেখি, দিন কতক আমরা আপনা আপনি আত্মোদ্ধারের চেষ্টা করি। আমি যদি ক্রমেই পতিত হইতে থাকি, তাহা হইলে আমার দ্বারা কোন কিছু উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে কি? তা কখনই নাই। আমাদের দ্বারা দেশোদ্ধারের চেষ্টা—এক দিকে ভণ্ডামি, অন্য দিকে পাগলামি। আমাদের এই অধঃপতনের অবস্থা হইতে, কোন রূপে যদি আমরা উদ্ধার পাই—তবেই আমাদের রক্ষা, নতুবা আমাদের সদ্গতি অসম্ভব।

তবে কি আমরা কেবল আত্ম স্বার্থের দিকেই দেখিব, কিসে আপনি রক্ষা পাই, তাহাই ভাবিব? অন্যের বিষয় কি কিছুই ভাবিব না? না, তা কেন? আমরা আপনারা যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করিব। আমাদের সন্তান সন্ততিগণ যাহাতে ঐরূপ অনুষ্ঠানরত হন, পোষ্যবর্গের মধ্যে অনুগত ব্যক্তিরা যাহাতে ঐরূপ করেন, এবং যদি আমাদের প্রকৃত শিষ্য সেবক কেহ থাকেন, তবে তাঁহারাও যাহাতে অহিংসাদি ধর্ম্ম পালন করেন, সে বিষয়েও কায়মনোবাক্যে, দৃষ্টান্ত উপদেশাদি দ্বারা চেষ্টা করিব। যদি মরণ কালে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে আমি নিয়ত যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছি, অনেক সময় কৃতকার্য্য হইয়াছি—আর পাঁচটি যুবা পুরুষকে সেইরূপ অনুষ্ঠানরত রাখিয়া চলিলাম—তবে কি সুখের মৃত্যুই না হইবে!

কার্য্যত যতই কেন বিপরীতাচরণ করি না কেন,—হিংসা করা, মিথ্যা বলা, পরস্বাপহরণ করা, যে অধর্ম্ম, তাহা আমরা অনেকে বুঝি। কিন্তু “ভোগসাধন অস্বীকার” করা যে একটা ধর্ম্ম, এমন কি সকলের অবশ্য পালনীয় নিত্য ধর্ম্ম—এ কথাটা আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে লাগে না। কাহারও কিছু ক্ষতি করিলাম না, কাহারও কিছু মনে কষ্ট দিলাম না, এমন দিনে দুটা নাংড়ার আম খাইয়া একটু রসনার তৃপ্তিসাধন করিলাম, আর তাহাতেই পাপ হইল, এ কথাটা বুঝা আজিকার দিনে বড়ই কঠিন।

আমরা অন্য দেশের ধর্ম্মনীতির কথা বরং কিছু কিছু জানি, আমাদের সনাতন ধর্ম্মের নাকি কিছুই জানি না ;—তাহাতে এই ভোগ বিষয়ে, অন্যান্য দেশের নীতির সহিত আমাদের আর্য্যভূমির নীতির সম্পূর্ণ বিরোধ ;—কাজেই কথাটা বুঝা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন দাঁড়াইয়াছে। অথচ বোধ হয়, যে সনাতন ধর্ম্মাচারের, ঐ ভোগেচ্ছা বিরতিই মজ্জা। স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে বলেন, যে এই ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, অন্যান্য দেশ সকল ভোগভূমি। অর্থাৎ ভারতবাসীর পক্ষে ভোগ বাসনা নিয়তই সংযত করা কর্ত্তব্য।*

ধর্ম্মশাস্ত্রে, যোগশাস্ত্রে দেখা যাইতেছে, যে ব্রহ্মচর্য্য—যম ধর্ম্মের মধ্যে এবং আমাদের নিত্য পালনীয়। এই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা-কালের, বা আশ্রম বিশেষের পালনীয় ব্রহ্মচর্য্য নহে। ইহা সকল আশ্রমীরই সেবনীয়। যে ব্রহ্মচর্য্যে উপস্থনিগ্রহাদি কঠোর ব্রত আবশ্যক, তাহা এ ব্রহ্মচর্য্য নহে। যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যাইতেছে—যে উপস্থ-নিগ্রহ নিয়মের মধ্যে। এবং তাহা ব্রতোপবাসাদির মত সময়ে সময়ে কর্ত্তব্য। অবশ্য পালনীয় ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ বিজ্ঞান ভিক্ষু করিয়াছেন—ব্রহ্মচর্য্যং ভোগসাধনানামস্বী করণং—ভোগ সাধন হইতে বিরতি থাকাই ব্রহ্মচর্য্য। আর সেই ব্রহ্মচর্য্য সনাতন ধর্ম্মবাদী মাত্রেরই অবশ্য পালনীয় নিত্য কার্য্য।

এ ব্রহ্মচর্য্যে, দেবতা অতিথি ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া দিয়া শাস্ত্রানুগত উত্তম আহার গ্রহণ করিতে নিষেধ নাই। ঋতুকালে এবং নিষিদ্ধ কাল ব্যতীত অন্য সময়ে উপযাচিত হইয়া, স্ত্রী সঙ্গমের বিধি আছে। ভোগেচ্ছা না করিয়া সকলই ভোগ করিবার ব্যবস্থা আছে।

---

*জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা দেখ।

অহিংসা সত্য মস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
এতৎ সামাজিকং ধর্ম্মং চাতুর্বর্ণে হ ব্রবীন্মনুঃ॥ মনু। ১০।৬

(অন্যত্র) মনু বলেন, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, এগুলি চারিবর্ণের সামাজিক ধর্ম্ম।

সকল আশ্রমীর, সকল বর্ণের যাহা সাধারণ ধর্ম্ম, অথচ অবশ্য পালনীয়, তাহাত ঐরূপই হইবে। অতি কঠোর বলিয়া যে এই ব্রহ্মচর্য্য আমরা পালন করিতে পারি না, এমন নহে। শিক্ষা-দোষে আমাদের প্রবৃত্তিগুলা হইয়াছে নিতান্ত নোংরা ; তাহাতেই আমরা এত কষ্ট পাইতেছি। দিবা রাত্রি কেবল ভাবিব—ভোগ ভোগ ভোগ—সুখ সুখ সুখ। কাজেই আমাদের অধঃপতন চলিয়াছে। যদি পূর্ব্বের মত একবার ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া চিন্তা করিতে পারি, তবেই এই অধঃপতন হইতে আমাদের রক্ষা হইবে।

আমাদিগের শিক্ষা।

আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সাধারণতঃ অতি সংকীর্ণ। স্কুল কলেজে আমরা যে শিক্ষা পাই ভবিষ্যদ্-জীবনে তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেশের বিশেষ কোন উপকার হয় না। অথচ, সকলেই জানেন, খান কতক সার্টিফিকেট কোনও রকমে হস্তগত হইলে, আমাদের শিক্ষাভিমানটি বিলক্ষণই হয়। এই শিক্ষিতাভিমানী মহাশয়েরা, বাহিরের অতিরিক্ত ব্যবহারিক (Practical) শিক্ষার সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল মাত্র একটি কাজ করিতে সক্ষম হন ; সেটি পুনরুদ্গীরণ, অর্থাৎ শিক্ষকতা। এই যে কেরাণীগিরি কাজটা লোকে সচরাচর অশ্রদ্ধেয় মনে করেন, কলেজের কৃতবিদ্য যুবকেরা কিছুদিন পর্য্যন্ত শিক্ষানবিশী না করিলে এ কাজটাও করিতে সক্ষম হন না। এই ত গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার দৌড়।

এ ছাড়া আরও একটি ভাবিবার বিষয় আছে। আমাদের দেশে কেহ এম, এ, পাশ করিলে লোকের মনে এমনই একটা ধারণা হয়, অমুকের পড়া শুনা শেষ হইয়াছে। অর্থাৎ কি না বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বিদ্যা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার পর সকলই উদরস্থ হইয়া যায়। বাহিরের অজ্ঞ লোকের এরূপ ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয়—তাহাদের ধারণায়

ক্ষতি বৃদ্ধিও কিছুই নাই ; কিন্তু স্বয়ং শিক্ষিতদিগেরও অনেকেরই যে ঐরূপ ধারণা। ইহাতেই যত অনর্থ। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় পরীক্ষার পরে পাঠ্যপুস্তকগুলির প্রতি ছাত্রদের কেমন একটা বিদ্বেষভাব উপস্থিত হয়—সেগুলিকে তাড়াতাড়ি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিতে পারিলেই যেন শান্তিবোধ হয়। তখন হইতে যদি কিছু পড়িতে হয় ত নাটক নবেল—দেশী বিলাতী, আর ক্বচিৎ দুই এক খানি আলস্যপরিপোষক দেশীয় সংবাদ পত্র। ফলে এই দাঁড়ায় যে, শেষ পরীক্ষার দুই চারি বৎসর পরে অধীত বিষয়গুলির অধিকাংশের অন্তর্ধান হয়।

অন্যান্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই শেষ শিক্ষা মনে করে না—ফলতঃ শিক্ষার সোপান বলিয়াই জানে। অন্য দেশের সহিত তুলনার প্রয়োজন নাই। এদেশেই শিক্ষিত কয়েকজন ইংরেজের সহিত আমার আলাপ পরিচয় আছে। ইহাঁরা প্রায়ই পরীক্ষার পর হইতে অধীত বিদ্যার অক্লান্ত ভাবে আলোচনা করিয়া এরূপ উন্নতি করিয়াছেন যে, যে সকল দেশীয় ছাত্র পরীক্ষায় ইহাঁদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদিগকে অক্লেশে দুই চারি বৎসর পড়াইতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। একই স্থান হইতে একজন ক্রমাগত উপরে উঠিয়াছেন—আর একজন নীচে নামিয়া আসিতেছেন—কালসহকারে উভয়ের পার্থক্য আকাশ পাতালবৎ হইবারই ত কথা।

ইহাই আমাদিগের শিক্ষার সাধারণ অবস্থা। কতক বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষে, আর বেশীর ভাগ আমাদের প্রকৃতির প্রেরণায় শিক্ষা শুদ্ধ নামেই পর্য্যবসিত হইতেছে। এই যে আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত লোক সহস্র সহস্র থাকিতেও সাহিত্য গণিত বিজ্ঞানাদি কোনও বিষয়ে একটুও নূতনত্ব—একটুও কার্য্যকরী-স্বাধীন চিন্তার আভাস, এক কথায় মৌলিকতা (originality) দেখিতে পাই না, ইহার প্রধান কারণই শিক্ষা-বিড়ম্বনা। এখন পল্লব গ্রাহিতারই দিন—মৌলিকতার আশা মরীচিকা-ভ্রম। শিক্ষায় সাংঘাতিক সৌখিনতা ঢুকিয়াছে—নূতনত্বের আশা দুরাশা মাত্র।

শিক্ষার কার্য্যকারিতার দিকে আমাদের দৃষ্টি কি পরিমাণে প্রখরা তাহা নিরূপণ করিবার একটি উত্তম উপায় আছে। বি, এ, পরীক্ষায় অধীতব্য কোনও কোন বিষয় মনোনয়ন করিবার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদিগকে দিয়াছেন। অধিকাংশ ছাত্র কিন্তু পছন্দ করেন ইংরাজী সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞান। ইংরাজী সাহিত্যটা "অকেজো" এত বড় কথাটা হঠাৎ আজ এখন বলিব না, কিন্তু এটা যে কলেজের "আউট" হওয়ার পরও শিখিতে পারা যায় তাহাতে ত সন্দেহ নাই। আমাদের কেশবচন্দ্র ও কৃষ্ণদাস ত কলেজে ইংরাজী শিখেন নাই। মনোবিজ্ঞানও মাথার মণি, কিন্তু আজ কালকার যে "অন্নচিন্তা চমৎকার" তাহাতে ত মনোবিজ্ঞান দ্বারা কিছু মাত্র উপকারের প্রত্যাশা নাই। এটা চলিতেছে ভৌতিক, অর্থাৎ material উন্নতির পূর্ণ মর্সুম ; এ সময়ে যাহার ভৌতিক জ্ঞান, সুতরাং বহির্দ্দৃষ্টি যে পরিমাণে তীক্ষ্ণ, তাহার ঘরে লক্ষ্মীর দৃষ্টিও সেই পরিমাণে অধিক। মনোবিজ্ঞানে মজিবার সুদিন আমাদের অদ্যাপি হয় নাই। বলিতে পার ব্যবহারজীবীদিগের মনোবিজ্ঞান শিক্ষা করা আবশ্যক—কিন্তু ওকালতী ব্যবসায়ে ত দেশের সমষ্টিগত ধনবৃদ্ধি হয় না—রামের ধন শ্যামের হাতে আসে মাত্র। অপিচ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার বি, এল ও এল এল উদগীরিত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে পাঁচ সাত শত পরলোকগত ধরিলেও ত বড় কম কথা নয়। এত উকীলের অন্ন হইবে কি প্রকারে ?

এইরূপে একে একে দেখাইতে পারা যায় যে সহজ ও "অকেজো" বিষয়গুলিতেই বিষম ভিঁড়। যে বিষয়ের পরীক্ষা দিতে শুধু কেতাবে কুলায় না—cram "কলিকা" পান না—যাহার জন্য চক্ষু মেলিয়া বাহিরের বিশ্বভাণ্ডারে নজর দিতে হয় (মৌলিকতার প্রথম পাঠ), তাহা হইতে আমরা প্রাণপণে পাশ কাটাই। গণিতটা কিছু কুটকচালে—তাই এল, এ, হইতেই অনেকেই উহাকে "এলেক" দেন। ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যায় ছ-দশ বৎসরে দুই একটি ছেলে পরীক্ষা দেয় ত ঢের। এই ধরণের বিদ্যাগুলি ছাপার কেতাব পড়িয়া শিখিতে পারা যায় না—পড়িতে হয় সুবিশাল প্রকৃতি বক্ষঃখচিত বিশ্বনাথের হস্তলিপি দেখিয়া। বুদ্ধিজীবী আমরা অত ঝন্‌ঝাটে গেলে ত !

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিতে অদ্য অধিক প্রয়াস পাইব না—দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব মাত্র।

বর্ত্তমান শতাব্দির প্রারম্ভে, উইলিয়ম রক্সবর্গ (William Roxburgh) নামক উদ্ভিদ্ বিদ্যায় পরম পণ্ডিত এক সাহেব শিবপুরের কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি পূর্ব্ব বঙ্গের কোনও কোনও স্থানে স্বতঃজাত পাটের গাছ আবিষ্কার করেন। তৎপূর্ব্বে আমাদের দেশের লোকে সম্ভবতঃ পাটের রজ্জুরূপ ব্যবহার অবগত ছিলেন, কিন্তু উহা বস্ত্রাদি বয়নেও ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা কেহই জানিতেন না। রক্স্বর্গ সাহেব পাটের নমুনা য়ূরোপে প্রেরণ করেন। তদবধি ইহার আদর ক্রমশঃই বাড়িয়া গিয়াছে। গত বৎসর বঙ্গদেশ হইতে ১৯ লক্ষ মণ পাটের রপ্তানি হইয়াছিল—ইহার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা।

আসাম প্রদেশের অংশ বিশেষে স্বভাব জাত চা-বৃক্ষ কত সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহই চিনিত না, কেহই আদর করিত না। আসামের কাণিয়া * মহাশয়েরা কখন কখন ইহার শাখা কাটিয়া যষ্টি প্রস্তুত করিতেন—এই পর্যন্ত। বৃটিশ বিজয়ের পর উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদেরা চা বৃক্ষের আবিষ্কার করেন। তখন হইতেই অল্পাধিক মাত্রায় ইহার চাষ আরম্ভ হইল। গত ১৮৯১ সালে আসাম ও বঙ্গে ১১ কোটী ৭৫ লক্ষ পৌণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল—ইহার মূল্য ন্যূনকল্পে ৬ কোটি টাকা।

ভূবিদ্যার উপকারিতা সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, স্বর্ণ রৌপ্য তাম্রাদি হইতে পাথুরে-কয়লা কেরোসিন তৈলাদি পর্য্যন্ত যাবতীয় খনিজ পদার্থের আবিষ্কার ভূবিদ্যার সাহায্যেই সংসাধিত হইয়া থাকে। মহীশূরের স্বর্ণখনি, রাণীগঞ্জ, নাগপুর, আসাম প্রভৃতি প্রদেশের কয়লার খনি, নরসৃষ্টির বহু পূর্ব্ব হইতেই ভূগর্ভে নিহিত ছিল। আমরা ক্ষুধায় কাতর হইয়া উহাদের উপরে ছেঁড়া চট বিছাইয়া শুইয়া শুইয়া কতই না হাঁই তুলিয়াছি—আর এখন বিদেশীয়েরা প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার খনিজ উত্তোলন করিয়া ধনকুবের হইতেছেন, আমরা দূরে দাঁড়াইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া দেখিতেছি।

কৃষি-বিজ্ঞান একটা বড় আবশ্যকীয় বিদ্যা। ভারতবর্ষের পনর আনা লোক কৃষিজীবী, অথচ ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই (এখন—ষেঠের কোলে পাঁচটি)—কৃষিবিজ্ঞান শেখান হয় না। সমগ্র ভারতের মধ্যে মান্দ্রাজে একটি মাত্র কৃষি বিদ্যালয় আছে, তাহারও অবস্থা বড় ভাল নয়!

বৈশাখের পূর্ণিমায় আমাদের "সূচনা" প্রবন্ধ লেখক লিখিয়াছেন এ দেশের শিক্ষিত যুবকেরা প্রসিদ্ধ ইংরাজী সাময়িক পত্রগুলি সম্যকরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কথাটা শুনিতে আশ্চর্য্যজনক হইলেও, একটুও অতি রঞ্জিত নয়। জ্ঞান যে শুধু গ্রামার পর্য্যন্ত। বাহিরের খবর ত কিছুই জানা নাই। (অধিকাংশ) কথার মানে ও কর্ত্তা কর্ম্মাদি সম্বন্ধ সকলই বেশ বুঝা যায়, কিন্তু হায়! মর্ম্মবোধ হয় না।

কথিতরূপ বিদ্যার পুঁজি লইয়াই আমাদের অনেককে নানা কারণে লেখক হইতে হয়! কেহ বই লিখিয়া "অথর" হই—কেহ সাময়িক বা অন্যবিধ পত্রাদি লিখিয়া "এডিটর" সাজি। কাজেই অগত্যা অধমতারিণী কল্পনাদেবীর চরণ প্রান্তে লুটোপুটি করিতে হয়,—ফলে খর প্রবাহে উদ্গীরিত হয়—নাটক, নবেল, গানগল্প—নিন্দা, কুৎসা, গ্লানি—আজ্গুবী ধরণের ধর্ম্মব্যাখ্যা, ইত্যাদি, ইত্যাদি, এক কথায় Fiction and trash, অর্থাৎ অবাস্তব ভুষী মাল। কাজের কথার বড় একটা কাছেও যাই না। যাই কেমনে বলুন না? ওদিকে যে পুঁজি নাই!

এই চির প্রচলিত পথের আমরা একটু ব্যতিক্রম করিব বাসনা করিয়াছি। যে সকল দ্রব্য নিত্য দেখি অথচ বুঝি না, সেইগুলি একটু ভাল করিয়া দেখিয়া যতদূর পারি বুঝিতে চেষ্টা করিব। যে চক্ষু বিশ্ববিদ্যালয়ের কেতাবে বাঁধা আছে, তাহাকে একবার বিশ্বপতির পুথির দিকে, ফিরাইতে যত্ন করিব! এ সংকল্প বঙ্গদেশে ও বঙ্গ ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় অতি গুরুতর। বঙ্গ ভাষার "বর্ত্তমান অবস্থায়" বলিলাম—কেননা ভাষার "মা বাপ্"রা ইহার বৈজ্ঞানিক উপযোগিতার দিকে, ইহাকে আটপিঠে করার পক্ষে এ পর্য্যন্ত বড় একটা যত্ন করেন নাই, বেশ সভ্য, ভব্য, কেতা দুরস্ত—নবীন নধর কোমল মধুর করিয়া তুলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

---

*নেকড়ায় ছাঁকিয়া লওয়া হয় বলিয়া আসামী ভাষায় আফিঙের নাম "কাণী"। ইহা হইতে আফিঙ খোরের নাম "কাণিয়া"। আসামের সাধারণ লোক, কাণিয়া বলিয়া সম্বোধন করিলে, বড় খুসী হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সহজে বাধিত করিবার প্রধান উপায় "বর্ কাণিয়া" (বড়-আফিঙ-খোর) সম্বোধন,—তা তিনি আফিঙ খান আর নাই খান।

যেমন আমরা অব্যবসায়ী সভ্য ভব্য সৌখিন বাবু—ভাষাটিও হইয়া দাঁড়াইয়াছে ঠিক তদনুরূপ। ভাষা যে সমাজের জীবন্ত ছবি। এখন যাহা বলিতেছিলাম। সংকল্প অতি গুরুতর। এক আধ জনের কাজ নয়। বঙ্গ মাতার সন্তানগণ মধ্যে যিনি যেখানে চক্ষুষ্মান আছেন, আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা ও ভরসা—সকলেই দয়া করিয়া আমাদিগের চোক ফুটাইতে থাকিবেন। জীবন মরণ সমস্যা। কাল বড়ই শক্ত। অন্ধের সম্বল যে কেবল শত লাঞ্ছনায় মুষ্টিভিক্ষা, সেই মুষ্টিভিক্ষাও ত দুষ্প্রাপ্য।

এক রজনী।

(উপন্যাস।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নগর মধ্যে সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত একটী বৃহৎ প্রাসাদের এক কক্ষে রমেন্দ্ররায় পদচারণ করিতেছিলেন। গৃহটী সুসজ্জিত, বর্ত্তিকালোকে আলোকবিশিষ্ট। রমেন্দ্র রায় যুবা পুরুষ, বলিষ্ঠ গঠন, বয়ক্রম আন্দাজ ত্রিংশতি বৎসর হইবে। তৎকালে রায়ের মুখাবয়ব গম্ভীর যেন কোন বিশেষ চিন্তাযুক্ত। পদবিক্ষেপ যেন চিন্তা-তাড়িত হৃদয়তরঙ্গের সহিত সমসূত্রে আবদ্ধ, তাই রমেন্দ্র কখন থামিতে ছিলেন, কখন দ্রুত চলিতেছিলেন, কখন বা মন্দ স্রোতস্বতী গতির ন্যায় ধীর পদবিক্ষেপে এধার ওধার করিতেছিলেন।

বেড়াইতে বেড়াইতে একটী বৃহৎ বাতায়নের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। রজনী প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। নৈশ গভীরতা সমস্ত নগরীকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। বাতায়ন মধ্য দিয়া স্নিগ্ধ সমীরণ বহিয়া রায়ের চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিল। কিন্তু রমেন্দ্র তখন চিন্তামগ্ন ছিলেন, হৃদয়ের চিন্তা ক্রমে ক্রমে বাক্যে ফুটিয়া উঠিল। রমেন্দ্র বলিতে লাগিলেন—এটা কি বাস্তবিকই ভাণ ? নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কি এইরূপ একটা ছল সৃষ্টি করিতেছি ? না বাস্তবিকই আমরা দেশের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত ? (একটু থামিয়া)—কিন্তু যাহাতে দেশের উপকার হয় তাহাতে যদি নিজেরও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় তাহা হইলে এমন কার্য্য কেন না করিব ? পরোপকার ও আত্মমঙ্গলসাধন অপেক্ষা কি উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম আছে ?—কিন্তু দেশের যে মঙ্গল হইবে তাহা কতদূর নিশ্চয়, বলিতে পারি কি ? কে এখন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে এ বিপ্লবের স্রোত কাহাকে ভাসাইবে, কাহাকে ডুবাইবে ! বলিতে গেলে আমি এখন এ রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী ; আমার হস্তে কোষ, আমার অধীনে সৈন্য। আলি খাঁ রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন, সদা অন্তঃপুরচারী। প্রকৃত পক্ষে সে আমার আশ্রিত স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সে আমার প্রভু, মনিব, ইঙ্গিত মাত্র আমাকে পদচ্যুত করিতে পারে। সে নিজের কার্য্য নিজে বুঝিলে আমার এত প্রভুত্ব কোথায় থাকে ? আমি যাঁর অনুকম্পায় এত বড় হইয়াছি, তাঁহারই উচ্ছেদ সাধনে যত্ন করিতেছি ! প্রভু ও আশ্রয় দাতার বিনাশে বদ্ধপরিকর ! ইহা কি অধর্ম্ম নহে ? বিশ্বাসঘাতকতা কি অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না ?" রমেন্দ্র নীরব হইলেন, করপল্লবে মস্তক মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, পুনরায় সহসা চিন্তাস্রোত খুলিয়া গেল, রমেন্দ্র উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন—"কিন্তু ঐ যে শীর্ণ হিন্দু সমাজের ক্ষীণ করুণ আর্ত্তনাদ সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে, ঐ যে হৃদয় বিদারক স্বর হিন্দু সতীর সতীত্ব অপহরণ ঘোষণা করিতেছে, ঐ যে চারিদিকে ভীষণ রোল, দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক গৃহ ভস্মীকরণ ও লুণ্ঠন সংবাদ প্রচার করিতেছে, এই সকল এবং আরও কত নিদারুণ অত্যাচারের মূলে কুঠারাঘাত করা কি ধর্ম্ম সঙ্গত নহে ? পাষণ্ড ম্লেচ্ছের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রতিকারের উপায় করা সর্ব্বতঃ বিধেয়।" রমেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। মনে মনে কথাগুলির আন্দোলন করিতে লাগিলেন। পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন—"ফিরিঙ্গি যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহাতে উহারা কেবল নগরে বাণিজ্যের কুঠি নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি চাহিয়াছে, আর আমার পক্ষে অন্য কোন বাধ্য বাধকতা নাই। পরন্তু এই বিপ্লব ব্যপদেশে আমি রাজত্ব পাইলে অপরে কেহ কিছু করিতে সাহসী হইবে না, কেননা আমার সহায় এই প্রবল বণিকগণ। এখন মা কালী ও গুরুদেব যা করেন।" হায় রমেন্দ্র রায় ! তুমি যে এত সাবধানে যত্ন করিয়া আশার স্বর্ণজাল বিস্তার করিতেছ, দেখিও যেন ভবিষ্যতে ইহা দ্বারা আবদ্ধ না হও !

যখন রমেন্দ্র রায় ঐরূপ চিন্তামগ্ন, তখন সহসা এক ব্যক্তি দ্রুত পদে ব্যস্ত ভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া অতি ভীত স্বরে বলিল – মহারাজ দস্যুতে রাণী মাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

তীর-বিদ্ধ সুষুপ্ত সিংহের ন্যায় রমেন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—কি ! কি ! দস্যু কোথায়, কি হয়েছে স্পষ্ট করে বল্ ? বার্ত্তাবহ করযোড়ে কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিল—মহারাজ, আজ সন্ধ্যার সময় রাণী মা ডাকিনী পোঁতায় দেবী সন্দর্শনে গিয়াছিলেন। স্থানটী সুবিধা জনক নয় বলিয়া আমি সঙ্গে লোকজন লইতে চাহিয়া ছিলাম। কিন্তু তাঁহার অনুমতি না পাওয়ায় অগত্যা কেবল আমি চারিজন বাহক দ্বারা পাল্কী খিড়কি দ্বার দিয়া গোপনে লইয়া গিয়াছিলাম। ডাকিনী পোঁতার কিঞ্চিদ্দূরে পাল্কী রাখিতে অনুমতি করিয়া তিনি একাকিনী উপরে গিয়াছিলেন। দুই দণ্ড কাল পরে আমরা পাল্কী লইয়া যেমন প্রত্যাগমন করিতেছিলাম, অকস্মাৎ এক দল দস্যু আসিয়া আমাদের উপর পড়িল। মার খাইয়া বাহকগণ কে কোথায় পলাইল, আমাকে মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরে জ্ঞান হইলে মহারাজের নিকট এ ভয়ানক সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। ভৃত্যের অপরাধ মার্জ্জনীয়।

দেখিতে দেখিতে রমেন্দ্র রায়ের মূর্ত্তি ভীষণতর হইয়া উঠিল, ভৃত্য ভয়ে সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। রমেন্দ্র বলিলেন—তাঁহার স্বর কর্কশ – "কোন্ দিকে তারা গিয়াছে তাহা কি কেহই দেখে নাই ?"

"ভৃত্য কর জোড়ে বলিল – মহারাজ, আমার তখন জ্ঞান ছিল না।"

রমেন্দ্র ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। একটী দীর্ঘ নিশ্বাসের পর আর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছিল। ক্রমে ক্রমে দুই চারি বিন্দু তপ্ত অশ্রু গণ্ড বহিয়া পড়িল। রমেন্দ্রের বীর হৃদয় আঘাতে পীড়িত হইতেছিল।

কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইল। তখন রমেন্দ্র ভৃত্যকে অস্ত্র শস্ত্র আনিতে আদেশ দিলেন। অস্ত্র শস্ত্র আনীত হইলে যথাবিধি পরিধান করিয়া কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এদেশে পর্ত্তুগীজ আসিয়াছে। উহারা তখন বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তারে যত্নশীল। কোথাও বিনয়ে, কোথাও কৌশলে, কোথাও বা গৃহ বিচ্ছেদের সাহায্যে পর্ত্তুগীজ-বাণিজ্য শনৈঃ শনৈঃ বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইতেছিল। অনেক মুসলমান আমীর ওমরা তাহাদের চাতুর্য্যে বশীভূত হইয়া উহাদের সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু দুই একজন এই বিদেশীয় বণিকগণকে বড় সন্দিগ্ধ চিত্তে দেখিত। আমাদের কথিত ওমরা আলি খাঁ এই শেষ শ্রেণীভুক্ত। তিনি তাঁহার নগর কাশীগঞ্জে ইহাদের অধিকার দেন নাই। সুতরাং পর্ত্তুগীজদিগের সহিত ওমরার কিছুই সদ্ভাব ছিল না। উহারা বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিছু দিন মধ্যেই সুযোগ উপস্থিত হইল। আলি খাঁর চরিত্র বড়ই দূষিত ও নীচপ্রকৃতিগত। রাজার ঘৃনিত আচারে অনেক মুসলমান প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিল। রাজ্য মধ্যে অরাজকতা হইল। ধূর্ত্ত পর্ত্তুগীজ সুবিধা বুঝিয়া ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল। রমেন্দ্র রায় রাজ্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। পর্ত্তুগীজ দেশউদ্ধাররূপ প্রলোভনে তাঁহাকে হস্তগত করিল। পূর্ব্ব কথিত সন্ন্যাসী ঠাকুর এই কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক। সন্ন্যাসী ঠাকুর রমেন্দ্রের উপদেষ্টা ও গুরু।

সরস্বতী নদীর গর্ভ হইতে দীর্ঘ সোপানাবলী উর্দ্ধে উঠিয়া মারবেল প্রস্তর নির্ম্মিত প্রশস্ত চাতালের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। চাতালের উপরেই সুন্দর অট্টালিকা চন্দ্রালোকে শোভা পাইতেছে। অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বে বৃহৎ সুন্দর উদ্যান। এইটী ওমরার প্রমোদ কুঠির। প্রমোদ গৃহে ওমরা এক হস্তিদন্ত নির্ম্মিত কিংখাপাবৃত পালঙ্কে উপবিষ্ট আছেন। গৃহের পারিপাট্য ও সাজ সজ্জার কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি ? যেন বিলাসিতা অঙ্গ সৌষ্ঠব ঢালিয়া দিয়া সেই গৃহে পড়িয়া আছে। বিংশতি বর্ত্তিকা বিশিষ্ট একটী হীরক খচিত আলোকাধারের স্নিগ্ধ আলোকে সমস্ত গৃহটিআলোকময় হইয়াছে।

ওমরা দেখিতে অতি সুশ্রী, কান্তি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মুখাবয়ব শ্রীযুক্ত, সাজ সজ্জার পারিপাট্য অত্যাধিক। ওমরা বিলাসিতায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া পালঙ্কে অর্দ্ধ শয়ান অবস্থায় থাকিয়া মণি মাণিক্য খচিত দীর্ঘ আলবোলায়

সুগন্ধি তামাকু সেবন করিতেছেন। সেই গৃহের আর এক প্রান্তে একটী রমণী বস্ত্রে সর্ব্ব দেহ আচ্ছাদন করিয়া মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আলি খাঁ কথা কহিল। তাহার স্বর অতি কোমল, মাধুর্য্যের কমনীয়তা মাখান স্নিগ্ধতায় পূর্ণ। যে স্বরে নীচ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, সেই এই স্বর। আলি খাঁ বলিতে লাগিল—

"বিবি! উপভোগেরই জন্য জীবন। সৌন্দর্য্যই উপভোগের জন্য। সৌন্দর্য্য উপভোগ না করিলে সৌন্দর্য্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয়। এ জগতে কাম্য কি, উপভোগ। যে উপভোগ না করিল, তাহার কাম্য নাই। এ জগতে যাহার কাম্য নাই তাহার অপেক্ষা দুঃখী আর কে আছে! বিবি! সৌন্দর্য্যের উপভোগে বিরত হইও না। তোমার অমন অপার্থিব রূপ লাবণ্য, পূর্ণ যৌবন উপভোগ হইতে দূরে রাখিয়া সৌন্দর্য্যের অবমাননাকরিও না। তোমার মধুর হাসির এক কণা দেখিতে আজ আলি খাঁ এত লালায়িত তাহার বৃথা মনোভঙ্গ করিয়া যন্ত্রণা দিও না। আমার জীবন ও ঐশ্বর্য্য কি তোমার সেই এক কণার তুল্যও নহে! ধর্ম্মাধর্ম্ম কি! তোমাদের শাস্ত্রেই ত আছে, পুরুষ রমণীকে প্রার্থনা করিলে তাহাকে প্রত্যাখ্যানে পাপ হয়!"

ওমরা পালঙ্ক হইতে উঠিল। হাসিতে হাসিতে রমণীর দিকে অগ্রসর হইল, বলিল সুন্দরি আমি জানি বাঙ্গালীর মেয়েরা বড়ই লাজুক। আ মরি মরি এ লাজুকতায় কি কমনীয়তা!

আলিখাঁকে নিকটে আসিতে দেখিয়া যে স্ত্রীলোক বসিয়াছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখ হইতে অবগুণ্ঠন সরাইয়া ফেলিল। কৃষ্ণ কুঞ্চিৎ কেশদাম বেষ্টিত একখানি উজ্জ্বল মুখ দীপালোকে বড় ফুটিয়া উঠিল। আলি খাঁ মুগ্ধ, রূপ মোহিত; অগ্রসর হইতেছিল—থমকিয়া দাঁড়াইল, নয়ন ভরিয়া সেই রূপরাশি দেখিতে লাগিল। রমণী গর্ব্বে গ্রীবা তুলিয়া দাঁড়াইল, বিস্ফারিত কটাক্ষে আলিখাঁর প্রতি চাহিয়া স্থির ও দৃঢ় স্বরে বলিল—"দুরাত্মা! সামান্য স্ত্রীলোক ভাবিয়া আমার অবমাননা করিও না। আমি।"—ওমরা কথায় বাধা দিয়া বলিল "তুমি রমেন্দ্র রায়ের পত্নী। সুন্দরী তুমি আমাকে ভজনা কর। তোমার স্বামীর আরও পদ বৃদ্ধি হইবে।"

রমণী ঘৃণা ব্যঞ্জক স্বরে বলিল—ছি! পাপিষ্ঠ! আর এক পদও অগ্রসর হইও না।

রমণীর মূর্ত্তির গাম্ভীর্য্যে ও বাক্যের দার্ঢ্যে আলি খাঁ স্তম্ভিত হইল। কিন্তু সম্মুখে যে রূপের উজ্জ্বল শিখা জ্বলিতেছে তাহা দেখিয়া কি রূপোন্মাদ পতঙ্গ স্থির থাকিতে পারে! আলি খাঁ ক্রোধে আরক্তাভা রমণীর নূতন সৌন্দর্য্য বিকাশ দেখিতে দেখিতে বিহ্বল হইয়া গেল। এবং অবশচিত্তে তাহাকে ধৃত করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল।

তড়িত গতির ন্যায় রমণী ক্ষিপ্র হস্তে বস্ত্রের অঞ্চল ভাগ নিজ গলদেশে পরিবেষ্টন করিয়া জোরে টানিবার উপক্রম করিয়া বলিল—"ওমরা সাহেব দেখ হিন্দু রমণী কেমন সতীত্ব রক্ষা করিতে জানে; প্রাণকে তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করে।" রমণীর এই অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব দেখিয়া আলি খাঁ নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রসারিত হস্ত প্রসারিতই রহিল।

ঝন্ ঝন্ শব্দে অতি বেগে দ্বার সহসা উদ্ঘাটিত হইল এবং তীরবৎ আসিয়া মধ্যে দাঁড়াইল ভীমমূর্ত্তি রমেন্দ্র রায়, হস্তে নিষ্কোষিত অসি।

এই অচিন্তনীয় ঘটনায় পাপীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ধমনী দিয়া যে শোণিত এতাবৎ কাল উষ্ণ বহিতেছিল, তাহা ঘর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া আলিখাঁর কম্পিত কলেবরকে সিক্ত করিল। মনুষ্য পশু-প্রকৃতি হইলেও সর্ব্ব সময়ে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না। চক্ষু লজ্জায় ওমরা অত্যন্ত অপ্রতিভ এবং ম্রিয়মাণ হইল।

রমেন্দ্রের সর্ব্ব শরীর ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল। আরক্ত লোচন বিস্ফারিত করিয়া আলিখাঁর মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি করিতেছিল—যেন রোষের শিখা অন্তঃস্থল ভেদ করিতে প্রয়াস পাইতেছে! মুহূর্ত্তকালমাত্র এইরূপ ভাবে অতিবাহিত হইল। রমেন্দ্রের হৃদয় মধ্যে যে দারুণ ক্রোধ তরঙ্গায়িত হইতেছিল, সহসা বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া উৎস ছাপাইয়া উঠিল। রমেন্দ্র ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া অসি ঘূর্ণিত করিয়া আলি খাঁর মস্তক চ্ছেদনে উদ্যত হইল। অমনি চকিতের ন্যায় রমণী আসিয়া বাহুলতার দ্বারা স্বামীকে দৃঢ় বেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল, এবং স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া অতি কোমল স্বরে বলিল—"মহারাজ, স্বামিন্! ক্ষাক্ষ হও, ক্ষান্ত হও। নর শোণিতে হস্ত কলুষিত করিও না"।

বক্ষে পতিতা করুণাময়ী পত্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া রমেন্দ্র কর্কশ স্বরে বলিল—বাসন্তী বাসন্তী, বাধা দিও না; মরমের বেদনা, সতীর অপমান,

হিন্দুর কলঙ্ক, দাও—আজ একেবারে সকলই ঘুচাই। পাপী বধে পুণ্য হয়, পাপ হয় না।

বাসন্তী—বলা বাহুল্য রমণীর নাম বাসন্তী—স্বামীকে আরও দৃঢ় করিয়া বাহুলতার দ্বারা আবদ্ধ করিল, বলিল মহারাজ সে চিন্তায়কাজ নাই। পাপের বিধান যিনি করিবার তিনিই করিবেন। তারপর ঈষদ্ অব্যক্ত স্বরে বলিল—ছি ছি ক্রোধে মানুষ এমন আত্মহারা হয় কেন? রমেন্দ্রের হৃদয়ে রমণীর করুণার স্বর প্রতিঘাত হইল। ঈষদ্ অপ্রতিভ হইয়া বক্ষাশ্রিতা পত্নীর প্রতি চাহিলেন—দেখিলেন সেই লাবণ্য হারে সেই কুসুম সুষমা আনন, করুণার ও বিষাদের ছায়ায় এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে—দেখিবা মাত্র হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। ক্রোধ প্রশান্ত হইল। রমণীর মুখ সর্ব্বজয়ী।

আলি খাঁ ইতি মধ্যে পালঙ্কে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। রমেন্দ্র তৎপ্রতি সরোষে কটাক্ষপাত করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

ক্রমশঃ।

সাহেবি বাঙ্গালি।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনিও আন্তরিক দুঃখের সহিত পত্রখানি লিখিয়াছেন। তবে আপনি হতাশ হইয়াছেন—আমি এখনো আশ্বস্ত। আপনি দেশের অবস্থার কথা যেরূপ বলিয়াছেন উহা অনেকাংশে তদ্রূপ হইলেও, এখন যে আর আমাদের জাতিত্ব রক্ষা করিবার উপায় নাই, সে কথা আমি বলিতে পারি না। সে সম্বন্ধে আমি যাহা ভাবিয়াছি তাহার গোটা কতক কথা নিবেদন করিতেছি, ভুল ভ্রান্তি দেখেন বুঝাইয়া দিবেন। আপনার ও আমার পত্র প্রকাশ করিলাম—তাহার কারণ, আলোচ্য বিষয়টি বড় গুরুতর, দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এ সম্বন্ধে কে কি ভাবিয়াছেন তাহাও জানিতে ইচ্ছা করে। আমাদের এ পত্র পড়িয়া যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের মতামত আমাদের লেখেন, তাহাতেও আমরা উপকৃত হইব।

আপনার প্রথম কথা—আজ কাল সাহেবি বাঙ্গালী ও খাঁটি বাঙ্গালী পৃথক করা দুষ্কর। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষায় মজিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করা দুষ্কর বৈ কি! কিন্তু এমন কথা কি বলিতে পারি যে বাঙ্গালা দেশে খাঁটি বাঙ্গালী নাই। বাঙ্গালীর দেশে বাঙ্গালী নাই এ কথা কি করিয়া বলিব? পল্লিগ্রামে গৃহস্থের রীতি নীতির দিকে দৃষ্টি করিলেও কি বাঙ্গালীর বাঙ্গালিত্ব দেখিতে পাই না। আমাদেরও মতি গতি ইংরাজী শিক্ষায় পরিবর্ত্তিত হইলেও, পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, আত্ম-পরিজনের প্রতি এখনও যে ভাব (feelings) আছে, তাহাও পর্য্যালোচনা করিলে কি বাঙ্গালীর আভাস পাই না? সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে কেমন করিয়া বুঝিব, আমরা কি ছিলাম আর কি হইতেছি। সে সকল কথা বুঝিয়া সুজিয়া সাধ্যমত সাহেবী ও বাঙ্গালীর একটা সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইবে বৈ কি—না করিলে, আমরা হইব কি? আমরা সাহেব হইতে পারি না, সে কথা আপনিও বলিয়াছেন। যখন সাহেব হইতে পারিব না বুঝিয়াছি, তখন বাঙ্গালীর স্বরূপ অবস্থা কি তাহা বুঝিয়া তাহাই অনুসরণ করা বিধেয় নহে কি?

আপনার দ্বিতীয় কথা—এক সময়ে এই সাহেবিই Young Bengal এর গর্ব্বস্থল ছিল। আমার পূজ্যপাদ ব্যক্তিগণ তখন কি বুঝিয়াছিলেন জানি না, তাঁহারা কেহ আমায় সে কথা বুঝাইয়া দেন নাই। কেশব বাবু যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভাল কথাগুলি হিন্দুর পক্ষে নূতন বলিয়া মনে হয় না। কেশব বাবুর সম্প্রদায়ের লোকেরা "বিনাশিনী প্রথা" (Destructive principle) অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়—আমি এরূপ প্রথার পক্ষপাতী নহি। পূর্ব্বে যে Young Begal ছিল, এখনও সেরূপ দল আছে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার গর্ব্ব তাঁদেরও বিলক্ষণ আছে। তখনকার গর্ব্ব যদি আধুনিক গর্ব্বের মত হয়, তাহা হইলে, আমার মনে হয়, যে Young Bengalএর সেই গর্ব্ব হইতেই এদেশের অধঃপতনের সূত্রপাত। কোন একটি জাতি আর একটি জাতির জাতিয়ানা লইয়া গর্ব্ব করিলেই সে জাতি যে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়, তাহা আপনি অবশ্যই জানেন।

আপনার তৃতীয় কথা—সাহেবি এখন দেশ জুড়িয়াছে। জুড়িয়াছিল

বটে, কিন্তু সাহেবিয়ান্নার প্রসর ক্রমেই কমিতেছে। প্রথমে মদ কমিতে থাকে, তাহার পর মুর্গী কমিতেছে, ক্রমে প্যাঁজ রুস্থনও কমিতেছে। আর বোধ হয় মেজাজও তত বাঁকা নাই, একটু একটু সোজা হইতেছে।* এবং হ্যাট কোটের পরিবর্ত্তে, চোগা ও চাপকানের আদরও একটু একটু দেখা যাইতেছে। চোগা চাপকানও আমাদের দেশীয় পোষাক না হইলেও, এ পোষাক যে প্রাচীন হিন্দুর পোষাকের কতকটা কাছাকাছি তাহার প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়।

আপনার চতুর্থ কথা—হিন্দুয়ানীর ভণ্ডামী। ভান খুবই চলিতেছে বৈ কি। হিন্দুয়ানী কি তাহা আমরা অনেকেই বুঝি না অথচ টিকি রাখিতেছি। শাস্ত্রের কথা কিছুই জানি না অথচ গোঁড়া হিন্দু না বলিলে রুষ্ট হই। এ সকল এক প্রকার ভান নয় ত কি। ভণ্ডামী অতি ঘৃণিত জিনীস তাহাতে সন্দেহ নাই, বিশেষ হিন্দুর পক্ষে। এ ভণ্ডামী হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু সাহেবের অনুকরণে কি এ ভণ্ডামী সারিবে? যাঁহারা সাহেবের অনুকরণ করেন তাঁহাদের মধ্যেও যে বিষম ভণ্ডামী দেখিতে পাই। হিন্দুয়ানীর ভণ্ডামী অপেক্ষা সাহেবীর ভণ্ডামী বরং অধিক বলিয়া মনে হয়। যাঁহাদের হৃদয় আছে তাঁহারা যেদিন বুঝিবেন যে ভণ্ডামী হইতেছে, সেই দিনই তাঁরা ভণ্ডামী ত্যাগ করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। খাঁটি লোক অবশ্যই সকল দেশেই কম। আমাদের মধ্যেও যে হৃদয়বান লোক নাই—এবং তাঁদের যে চক্ষু ফুটিবে না সে কথা কি বলিতে পারি? কেহ কেহ বলেন প্রথমে ধর্ম্মের প্রলেপ গায়ে গায়ে দিতে হয়, সে প্রলেপ গায়ে দিতে দিতে ধর্ম্মের রস পুলটিসের মত শরীরে সঞ্চারিত হয়, আমারও মনে হয় এ কথা কতক সত্য।*

আপনার পঞ্চম কথা—আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য। আপনি বলিয়াছেন আমরা যাঁহাদের জন্য লিখিতেছি তাঁহারা আমাদের ভাষা বোঝেন না। আমরা কাহাদের জন্য লিখিতেছি? আমরা ত দেশের স্ত্রীলোক বা ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণদের জন্য লিখিতেছি না। আমরা লিখিতেছি ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা স্ত্রীলোকেরা আমাদের কথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে শুনিতে পারেন, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য তাঁহারা নহেন। আমাদের লক্ষ্য—আমাদের ঘরের ছেলে মেয়েরা—যাঁরা আমাদের ছাড়িয়া—আমাদের পর করিয়া—from the frying pan to the fireএ গিয়া পড়িতেছেন—তাঁদের কাছে কাঁদিব, তাঁদের ডাকিব, তাঁদের গলা জড়াইয়া বলিব—“ভাই সোণার ভারত সোণারই আছে—একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ, ছাড়িয়া যাইও না—তোমরা একে একে ছাড়িয়া গেলে সত্য সত্যই সোণার ভারত শ্মশান হইবে। তোমরাই আমাদের আশা ভরসা, তোমাদের ছেলে মেয়েরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ, তাহাদেরও পর করিয়া দিতেছ। ভারতের স্বাধীনতা অন্য জাতি নষ্ট করিয়াছে বটে কিন্তু তাহারা ভারতের জাতিত্ব ও ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে নাই, তোমরাই সে কাজ করিতেছ, সে কথা একবার ভাবিয়া দেখ।”

---

*কেহ কেহ বলিতে পারেন যে প্যাঁজ রুস্থন ঠিক সাহেবি নহে। আমারো সে সন্দেহ আছে। কেন না দেখা গিয়াছে, কোন কোন জেলায় এমন লোক আছেন যাঁহারা ইংরাজীতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এমন কি হিন্দু আচার ব্যবহারে অন্যান্য বিষয়ে পরম শ্রদ্ধাবান, কিন্তু প্যাঁজ রুস্থন যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন। অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা অনেক জেলায় প্যাঁজ রুস্থন বহুল পরিমাণে আহার করিয়া থাকে। সেই জন্য বোধ হয় মুসলমানদের কর্ত্তৃক প্যাঁজ রুস্থন এ দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। যাহাদেরই কর্ত্তৃক উহা প্রচলিত হউক, উহা যে হিন্দু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আজ কাল তাহার আলোচনা হইতেছে।

*পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার টিকি দেখিয়া এবং আমি সন্ধ্যা আহ্নিক করি শুনিয়া বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে “তুমি যে টেড়ির মায়া কাটাইয়াছ—সাহেবি ছাঁদের কুহক কাটাইয়া উঠিয়াছ—ইহাই আজিকার দিনে অনেক আনন্দের কথা।” তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন—সে সকল কথা এখানে বলিবার আবশ্যকতা নাই।

আপনার ষষ্ঠ কথা—পাশ্চাত্য শিক্ষা। এ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য যে সকল শিক্ষারই একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? অনেকেই বলিবেন অর্থোপার্জ্জন, জ্ঞানোপার্জ্জন ও চরিত্র গঠন এ সকলি আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে লাভ করিতেছি। অর্থোপার্জ্জন হইতেছে বটে—কিন্তু জ্ঞানোপার্জ্জন ও চরিত্র গঠন কতদূর হইতেছে, তাহা আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আর যদিই কিছু কিছু হইয়া থাকে, তাহা যে ভাবে হইতেছে তাহায় দেশের উপকারিতা কতদূর আছে তাহাও আমি বুঝিতে পারি না। সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের চক্ষু খুলিতেছে। চক্ষু খুলিতেছে বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা ভাল মানুষ ছিলাম—পাশ্চাত্য শিক্ষায় দুষ্ট হইতেছি, আমরা সরল ছিলাম, এখন সেয়ানা বা জোচ্চোর হইতেছি। আমরা পরার্থপর ছিলাম, এখন স্বার্থপর হইতেছি।

এ সম্বন্ধে আমার তৃতীয় প্রস্তাব। আমরা ইংরাজি পড়িব বটে কিন্তু শিখিব কি? সাহেব হইতে শিখিব, না মানুষ হইতে শিখিব? যাঁহারা জ্ঞানের জন্য ইংরাজি পড়েন তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন যে, "মানুষ হইতে শিক্ষা কর"। সে মনুষ্যত্বের আদর্শ কোথা হইতে লইব, ইউরোপ হইতে লইব, না স্বদেশ হইতে লইব? ইউরোপে যে মহত্ব নাই তাহা বলি না, বলি এই কথা, ইউরোপীয় মহৎ চরিত্র যে উপাদানে গঠিত, সে উপাদান ও সে চরিত্রের বিকাশ ক্ষেত্রের উপযোগী ক্ষেত্র এ দেশে নাই, আরও বলি, কোন্ দেশের মহত্ব শ্রেষ্ঠ, তাহার বিচার করিতে হইলে আগে স্বদেশের মহত্ব কিরূপ ছিল বা আছে তাহা দেখিলে ভাল হয় না কি?

পাশ্চাত্য শিক্ষায় যে আমাদের অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত আর কোন উপকারই নাই তাহা বলিলে বোধ হয় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অবিচার করা হয়। যাহা আছে, তাহা হিন্দুর জ্ঞান শিক্ষার পক্ষে অতি আদি শিক্ষা (preliminary) হইলেও, আজ কাল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা সহায়তা করিতেছে তাহা অবশ্যই বলিব। পাশ্চাত্য শিক্ষার নাম—জগতের খবর (information) রাখা। জ্ঞানপিপাসু হিন্দুর পক্ষে ঈশ্বরতত্ত্ব ও শান্তিতত্ত্বই প্রকৃত জ্ঞান। হিন্দুর জ্ঞান তৃষ্ণার তৃপ্তি পাশ্চাত্য শিক্ষায় (knowledge)এ মিটিবে না। তবে বলিতে পারেন যে বিজ্ঞানের (science) এর আলোচনায় কি ঈশ্বরতত্ত্ব শিক্ষার সহায়তা করে না? আজ কাল করিতে পারে, কেন না এখন এদেশের লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়াছে। এখন কাজেই তাহাকে চাক্ষুষ পরীক্ষা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভাবিতে হয়। সুতরাং আজ কাল ভগবানে বিশ্বাসহীন অথচ ভগবানতত্ত্ব অনুসন্ধানে উৎসুক লোকের পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার (knowledge এর) প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য (comforts) ভোগ বিলাস। হিন্দু বুঝিয়াছিলেন ভোগ বিলাস তাঁহার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। ভোগ বিলাসের অন্ত নাই, উহার উপাদান যত বৃদ্ধি করিবে,—উহার লালসা ততই বৃদ্ধি হইবে; এবং পরিণামে উহার কামনায় জীব অস্থির হইয়া উঠিবে, শেষে মানব জীব—ধর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য যে শান্তি তাহার অভাবে, অস্থির হইয়া উঠিবে এবং কালক্রমে জীব আত্মসুখে অন্ধ হইয়া জীবের সংসারকে হিংসা দ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত্যা প্রভৃতি নরকাগ্নিতে পর্য্যবসিত করিবে। হিন্দু এ কথা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া তাই সে লালসা পরিহার করিতে বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন। যদি শাস্ত্র মানিতে হয় তবে এ কথা মান্য করিতে হইবে বৈ কি। কেহ কেহ বলিবেন হিন্দু শাস্ত্রের উপযুক্ত উপদেষ্টা কোথায় পাইব? সমগ্র ভারতে কি সেরূপ উপযুক্ত লোক নাই? হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে পারেন,—এরূপ পণ্ডিত ভারতে, ভারতে কেন বলি, বঙ্গ দেশেই কি নাই? আছে কি না তাহার সমুচিত অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে কি? শাস্ত্রে যে সকল ব্যাখ্যা আছে তাহাও অধ্যয়ন করা হয় কি? সে সকলে শ্রদ্ধা আছে কি? যে উপায়ে শ্রদ্ধা স্থাপন হইতে পারে তাহারও চেষ্টা করা হয় কি? আমি যতদূর দেখিতেছি তাহাতে আমার বিশ্বাস যে সে সকল কিছুই করা হয় না, অথচ লোকে আক্ষেপ করেন যে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু শাস্ত্র কি তাহাই বুঝিবার উপায় নাই। আপনিই বলুন না যে এরূপ কথা সঙ্গত কি না। আনুসঙ্গিক না হইলেও নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া আরও দুই একটি কথা এস্থানে বলিতেছি।

বাঙ্গালী নির্জীব ও দুর্ব্বল, সে তাহার নিজের দোষে নহে। বাঙ্গালার জল হাওয়া অস্বাস্থ্যকর, বাঙ্গালার ভূমি উর্ব্বরা, অল্প পরিশ্রমে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, বাঙ্গালার প্রাকৃতিক দৃশ্যে বৈচিত্রতা নাই, যাহাতে লোকে

ক্লেশ সহিষ্ণু, সবল, দৃঢ়, নিষ্ঠুর, দর্পী, অধ্যবসায়শালী হইয়া থাকে, তাহার উপযোগী কোন কিছুই বাঙ্গালার প্রকৃতিতে নাই, সুতরাং বাঙ্গালীর এ সকল গুণের অভাব তাহার কলঙ্ক বলিতে পারি না। লোকের অন্তঃপ্রকৃতির গঠন স্বদেশের বাহ্য প্রকৃতির অনুযায়ীই হইয়া থাকে, সে জন্য মনুষ্য দোষী নহে। যাহা নাই, যাহা ছিল কি না সন্দেহের স্থল, যাহা পাইবার কোন উপায়ও আছে বলিয়া মনে হয় না, তাহার জন্য লালায়িত হওয়া কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহার বিবেচনা করা উচিত। দেখিতে পাই শৌর্য্য বীর্য্যের জন্য বাঙ্গালী আজ কাল বড়ই ব্যস্ত, বাঙ্গালী দেখিতেছে যে বলবান ইংরাজ আসিয়া তাহাকে নিত্য পদদলিত করিতেছে। ইংরাজ বাঙ্গালীর এতই আতঙ্ক হইয়াছে যে ইংরাজ না হইলেও কেহ ইংরাজের খোলষ পরিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তাহার হৃৎকম্প হয়। বাঙ্গালী ভাবিতেছে যে ইংরাজের ওই বল বীর্য্য সঞ্চয় করিলেই তাহার জীবন সার্থক হয়। সে যদি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজকে পদাঘাতে প্রতিহত করিতে পারে তবেই তাহার জীবন সফল জ্ঞান করে। বল সঞ্চয়ে আমার আপত্তি নাই, বাঙ্গালীর বলবীর্য্য হয়, বাঙ্গালী বাহুবলে পৃথিবী জয় করিতে পারেন, সে ত সুখের বিষয়। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না যে যাহারা আপন প্রকৃতিগত গুণ রক্ষা করিতে পারে না, তাহারা পর প্রকৃতিগত গুণ কিরূপে সঞ্চয় করিবে? বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত গুণ,—সে ধর্ম্মশীল, সে বিনয়ী, সে নিষ্ঠাপরায়ণ, সে কোমল প্রকৃতি, সে স্নেহ প্রেম ও ভক্তি পরায়ণ, সে করুণাশীল। আজ কালের ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর এ সকলের কয়টি গুণ আছে? আছে বলিলেই হইবে না—একজন পল্লীগ্রামের প্রাচীন বাঙ্গালীর চরিত্রের সহিত একজন সহুরে নব্য ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর চরিত্রের তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, প্রাচীন চরিত্র অপেক্ষা নবীন চরিত্র কত নিকৃষ্ট! প্রাচীনের সে ধর্ম্মভীরুতা, সে সত্যপ্রিয়তা, সে স্নেহশীলতা, সে দয়া দাক্ষিণ্য, সে আতিথ্য, নিস্বার্থতা, সে দশ জনকে আপনার করিবার ইচ্ছা, সে বিনয়, সে সকল গুণ, নবীনের চরিত্রে কোথায়? * একটু ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, বাঙ্গালী তাহার স্বজাতিগত গুণ সকলই হারাইয়াছে, বাঙ্গালী অপহৃত গুণ উদ্ধারে চেষ্টা করিতেছে না, বাঙ্গালী ইংরাজি পড়িয়া ইংরাজকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, বাঙ্গালী নিজের খোলষ ছাড়িয়া ইংরাজের খোলষ পরিতে উদ্যত হইতেছেন। বাঙ্গালী "বাঙ্গালী" বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত, সে আপন জীবনকে ধিক্কার দিতেছে যে কি কুগ্রহে সে বাঙ্গালী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ফল কথা বাঙ্গালী সাহেব হইতেছে, কিন্তু বাহ্যিক তুলনায় বলিতে হইলে বলিতে হয়, মেষের আকৃতিতে সিংহের খোলষ, কাকের দেহে ময়ূরের পুচ্ছ যেরূপ হাস্যকর, বাঙ্গালীর শরীরে ও মনে ইংরাজের বল বীর্য্য ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুরতা, ইংরাজের ভোগ লালসার উদ্যম অধ্যবসায় ও স্বার্থপরতাও তদ্রূপ হাস্যজনক। অনুকরণে কখন কোন জাতি বড় হইতে পারে নাই, অনুকরণ বুদ্ধিমানের নিকট চিরদিনই হাস্যজনক হয়। বাঙ্গালী বুঝে না যে সে মণির সহিত কাচের বিনিময়ের জন্য লালায়িত, প্রকৃত স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে দাসত্বের জন্য লালায়িত, মহত্ত্বের পরিবর্ত্তে নীচত্বের জন্য উৎসুক, স্বর্গ বিনিময়ে পৃথিবীর জন্য উন্মত্ত, হায়! বাঙ্গালী কি কখন বুঝিবে না যে সাহেবি তাহার গুণ নহে, সাহেবি তাহার কলঙ্ক।

আপনার শেষ কথা—শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপকদিগের নিকট আমাদের অন্তরের কথা নিবেদন করা। আর কমটীর মত তাঁহাদের জ্ঞাপন করা। কমটীর মত আমি ভাল জানি না; আপনার মুখে যৎকিঞ্চিৎ শুনিয়াছি, আরও দুই চারিজন বন্ধুর মুখেও একটু আধটু শুনিয়াছি। সুতরাং কমটীর মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকট জ্ঞাপন করিবার আবশ্যকতা কতদূর আছে তাহা অনুধাবন করিবার সাধ্য আমার নাই। তবে আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচাইবার জন্য আন্তরিক দুরবস্থার কথা তাঁদের কাছে নিবেদন করিবার যে আবশ্যকতা আছে, তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। সাহেবিয়ানা বিষে আমরা জর্জ্জরিত, শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপকেরাই চেষ্টা করিলে যে সেই বিষের চিকিৎসা করিতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যে

---

*লোকে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের ইংরাজ বণিকের সহবাসে ভ্রষ্ট বাঙ্গালী চরিত্র দেখিয়া ও মেকলের "বাঙ্গালী চরিত্র" পড়িয়া প্রাচীন বাঙ্গালী চরিত্রের কল্পনা করেন। সে কল্পনা ঠিক নহে। অতি প্রাচীন লোকের কাছে তাঁদের পক্ষে প্রাচীন লোকের গল্প শুনিলে বাঙ্গালীর চরিত্রের মধুরত্বে মন প্রাণ ভরিয়া যায়।

শিক্ষিতাভিমানী—আমাদের রোগ যে আমরা আপনাকে চিকিৎসক ও চিকিৎসককে রোগী মনে করি। তবে আমার কথা এই যে, রোগী আপনাকে চিকিৎসক মনে করুক, আর ধর্ম্মযাজকই মনে করুক, আর নীতির উপদেষ্টাই মনে করুক, আর চিকিৎসককে রোগী মনে করুক আর শিষ্যই বোধ করুক, চিকিৎসকের সহিত রোগীর যেন তেন প্রকারেণ সম্মিলন হওয়াটা চাই। তাহার উপায় নাই কি? শ্রদ্ধাবান হইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গ অভিলাষী হইলে ত সে সম্মিলন হইতে পারে। তবে অবশ্য শ্রদ্ধাবান হইয়া বিনীত ভাবে তাঁদের নিকট আত্মনিবেদন করিতে হইবে। এক্ষণে আমাদের পক্ষে এ বিষয়ের বড় অভাব বটে। ইংরাজি শিক্ষায় আমরা যত বিষ পান করিয়াছি, আত্মম্ভরিতারূপ বিষের মত তীব্র বিষ আর কিছুই পান করি নাই, এ বিষটা প্রথমে নষ্ট না করিলে আমাদের চিকিৎসার উপায় নাই। আমি বিবেচনা করি, প্রথমে আমাদের আত্মম্ভরিতা রূপ বিষটা যাহাতে নষ্ট হয় তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বোধ হয় আপনিও এ বিষয়ে আমার সহিত ঐক্যমত হইবেন।

আপনার স্নেহের
ঈশান

গান।

রাগিণী লুম খাম্বাজ, তাল কাওয়ালি।

রাসে নাচত নন্দ দুলালা।
সাথ মিলিত যত গোপ বালা॥
শারদ পূর্ণিমা নিশি, বাজিছে শ্যামের বাঁশী,
নাচে যমুনা ধরি তরঙ্গ ছলা॥
মোহন মুরলি তানে, মিলিছে শারিকা গানে,
মল্লিকা যূথিকা ঘ্রাণে, বন উতলা॥
হাতে হাতে ধরি, নন্দ কুমারে ঘেরি,
রাস বিলাসে গোপিকা বিহ্বলা॥

অনুতাপ।

মরুভূমির ভীষণ দৃশ্য দর্শনে পথিকের মনে হয় যদি এই স্থানে মেঘ বর্ষণ হইত তবে এ দুর্দ্দশা দেখিতে হইত না। প্রবল ঝটিকা যখন পৃথিবী বিপর্য্যস্ত করিতে উদ্যত হয়, তখন অনেকে মনে করেন মেঘগর্জ্জন হইলে এ বায়ুবেগের প্রচণ্ডতা এতদূর থাকিত না। গ্রীষ্মের দারুণ তাপে যখন শরীর একান্ত ক্লান্ত ও অস্থির হইয়া পড়ে, তখন মনে হয় এই সময়ে যদি মলয় মারুত বহিত তবে মুহূর্ত্ত মধ্যে এ যন্ত্রণা প্রশমিত হইত। যে কারণে বাহিরের এই ভয়াবহ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হইতেছে না, ঠিক সেই কারণে, মনুষ্য জীবনও শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এ জীবন মরুভূমিতে পরিণত হইল কেন?—কেন না অশ্রুবর্ষণ করিতে শিখি নাই। এ হৃদয়ে পাপের এ ভীষণপ্রবাহ কমিতেছে না কেন?—কেননা রোদন করিতে জানি না। এ অশান্তির বিরাম নাই কেন?—কেননা হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া শ্বাস বায়ু বহিতেছে না। এক কথায়—আমি অনুতাপ করিতে শিখি নাই, তাই আমার এ দুরবস্থা।

অনুতাপের মূলে পাপবোধ। প্রকৃত পাপবোধ জন্মিলে, অনুতাপ উপস্থিত হয়। আমরা পদে পদে যে কত দোষ করিতেছি তাহা বুঝিতে পারি না, এ কারণ তজ্জন্য মনে কিছু মাত্র ক্ষোভ উপস্থিত হয় না। অভ্যাস ও কুসংস্কার দোষে এবং অবিবেচনা বশতঃ অনেক সময়ে প্রকৃত যাহা দোষ বা পাপ তাহাকে দোষ বা পাপ বলিয়াই বোধ হয় না। চোর চুরি করিয়া ও প্রবঞ্চক প্রবঞ্চনা করিয়া সুখী হইয়া থাকে। যাহার যে দোষটী প্রবল হইয়া উঠে তাহার নিকট তাহা আর দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, সুতরাং তজ্জনিত বিন্দু মাত্রও অনুতাপ হয় না।

আমি শারীরিক অনিয়ম অত্যাচার করিয়া স্বাস্থ্যকে চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি দিয়াছি। মদিরাসক্ত হইয়া ও কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া নানা প্রকার পীড়াগ্রস্ত হইয়াছি। এখন সে সকল আমোদ আর সম্ভোগ করিতে পারি না, সে ক্ষমতা আর নাই, সেই জন্য কত ক্ষোভ করিতেছি, কিন্তু

সেই আমোদই যে আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে তাহা একবারও ভাবি না এবং অনুতাপও করি না। আমি বাসনানলে দগ্ধ হইতেছি। আমি তৃষ্ণায় আকুল হইয়া মোহ মরীচিকার অনুসরণ করিতেছি—এ তৃষ্ণা আর নিবারিত হইল না। আমি ক্ষুধায় কাতর, অন্ন আর জুটিল না। আমি শরীরের সন্তাপ নিবারণের জন্য অবগাহন করিতে নামিলাম—অগাধ সলিলে পড়িয়া এখন হাবুডুবু খাইতেছি। প্রতি মুহূর্ত্তে এত যে ক্লেশ ও শাস্তি ভোগ করিতেছি, তবুও শিক্ষা পাইলাম না।

এ জগতে আসিয়া অর্থের জন্য লোকে কি না করিতেছে। অর্থের জন্য কত শত নরনারী আপনাদের জীবন বিক্রয় করিতেছে। যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই বা কি দুর্দ্দশা। যাঁহারা ধনী তাঁহারা কত প্রকারেই নির্ধনকে উৎপীড়ন করিতেছেন। দীন দুঃখী তাঁহাদের নিকট মনুষ্য বলিয়া গণ্য নহে। আমি বিচিত্র অশ্বযানে আরোহণ করিয়া রাজবর্ত্ম বিকম্পিত করিয়া চলিয়া যাইতেছি, আর পথপার্শ্বে ঐ দুঃখিনী অনাহারে রোগশয্যায় পড়িয়া রোদন করিতেছে—সে দৃশ্যে প্রাণ আকুল হয় না। কত দীন দুঃখী আমার দ্বারে আসিয়া লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সুখে শয়ান রহিয়াছি। আমি চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া যশস্বী হইয়াছি, অর্থ না পাইলে চিকিৎসা করা আমার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। আমার বাড়ীর নিকটে ঐ যে দুঃখী রোগী ঔষধাভাবে রোগযন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, আমি মনে করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে উহার যন্ত্রণার উপশম করিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহা ত হইতে পারে না আমি যে এত ক্লেশ সহ্য করিয়া ও অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষালাভ করিলাম তাহার কি পরিণাম এই হইবে? বিশ্বসংসার ডুবিয়া যাউক, উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ না পাইলে আমি এক পদও অগ্রসর হইব না। ওকালতী ব্যবসায়ী শিক্ষিতগণ ভাবিতেছেন কিসে পশার হয়। মিথ্যা প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দিয়া, কৌশল চতুরতা করিয়া, নিজে যাহা মিথ্যা বুঝিয়াছেন তাহাকে প্রকৃত ভাবে সজ্জিত করিয়া কতই আনন্দ। দুঃখী নিতান্ত উৎপীড়িত ও অত্যাচরিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল, তিনি কি তাহার পক্ষ অবলম্বন করিবেন? না—তাহার যে টাকা দিবার ক্ষমতা নাই। তিনি তাহাকে পদাঘাতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার বিরুদ্ধ পক্ষে উকিল হইয়া তাহার সর্ব্বনাশে উদ্যত। এ ত বাহিরের একটা দৃশ্য মাত্র। ভিতরে কত গরল—কত হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা। বাহিরের শোভা সমৃদ্ধির মধ্যে কত যে কি আছে তাহার সীমা নাই। অতি সুন্দর কুসুমের অভ্যন্তরেও কীট রহিয়াছে, তাহা কে না জানে?

জগতের লোক কেমন প্রফুল্লভাবে উৎসাহ মনে বিচরণ করিতেছে। বোধ হয় যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত বহিয়া যাইতেছে, আর তাহাতে অসংখ্য অসংখ্য প্রাণী উল্লাসভরে সন্তরণ করিতেছে।

মানুষ এত পাপরাশি বুকে করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত আছে ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। আমিও একদিন ঐরূপ প্রমত্ত ছিলাম। একদিন প্রশান্তভাবে শয়ন করিতে শয্যায় গমন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে দেখিলাম আমার এ শরীর অসংখ্য বিষধরের আবাসভূমি। প্রত্যেক লোমকূপের ভিতর হইতে শত শত সর্প বাহির হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, আবার সেই লোমকূপ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। ভয়ে ব্যাকুল হইয়া জাগিলাম। দেখিলাম—জাগ্রতাবস্থায় দেখিলাম—প্রত্যেক লোমকূপের ভিতর অসংখ্য অসংখ্য সর্প মুখ লুকাইয়া রহিয়াছে। আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িতে লাগিলাম। সেই দিন হইতে আকুলভাবে রোদন করিয়া বেড়াইতেছি—সুখ শান্তি আর পাইলাম না।

নিশীথ রজনী। জগৎ নীরব। প্রাণিগণ কেমন প্রশান্ত ভাবে নিদ্রা যাইতেছে। চন্দ্রালোকে প্রকৃতিরাজ্য কেমন উদ্ভাসিত হইয়াছে। জগতে শান্তি ও সুধা বহিয়া যাইতেছে, আর হতভাগ্য আমি এই আনন্দধামে বসিয়া আকুল ভাবে রোদন করিতেছি। আমার এ দুর্দ্দশার কারণ কি? আমি পাপভারে অবনত হইয়াছি। সেই পাপের তীব্র দংশনে প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত। আমি আলস্যের গরল হৃদয়ের স্তরে স্তরে ঢালিয়াছি। আমি যাহা লইয়া গৌরব করিব তাহা স্বীয় কর্ম্মদোষে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, আমি কি লইয়া আনন্দ করিব? আমি যে দিন যাহাকে হিংসা করিয়াছি, যে দিন যাহাকে বিদ্বেষনয়নে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে সেই হিংসা বিদ্বেষ সর্পে পরিণত হইয়াছে। যে দিন স্বার্থপরতায় ডুবিয়াছি সেই দিন শত শত সর্প জন্মিয়াছে। যে দিন লালসাস্রোতে প্রবৃত্তি ডুবিয়াছে, সেই দিন কত

সর্পই এ দেহ অধিকার করিয়াছে। যে দিন অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি, সে দিন এ হৃদয় সর্পের আবাসভূমি হইয়াছে। এইরূপে এক একটী পাপ হইতে এক একটী সর্পের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই সর্পের তীব্র দংশনে আমি ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছি ও ঘুরিতেছি। আমার ভাগ্যে সুখশান্তি ঘটিবে কেন ?

এ রোগের কি ঔষধ নাই ? এ যন্ত্রণার কি বিরাম নাই ? এত যে হাহাকার করিতেছি, রোদন করিতেছি, শরসংবিদ্ধ মৃগের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছি, তথাপি তিলার্দ্ধ মাত্র শান্তি পাইলাম না। জীবনে যে পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত এখনও হয় নাই, তাই এখনও শান্তিলাভ হইল না। দুই এক দিনের অশ্রুবিন্দুতে এ পাপরাশি বিধৌত হইয়া যাইবার নহে। যে দিন মনে হইবে আমার সম্যক প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, যে পাপ করিয়াছি ও যাহার জন্য অনুতাপ করিতেছি, ইহজীবনে আর তাহা পুনরায় অনুষ্ঠিত হইবার নহে, সেই দিন অনুতাপের শুভ ফল ফলিবে, সেই দিন চিত্ত শান্ত সমাহিত হইবে। অনুতাপের প্রবল স্রোত আসিয়া যখন সকল পাপ প্রক্ষালিত করিয়া হৃদয়কে পরিশোধিত করে, তখন পাপী নবজীবন প্রাপ্ত হয়। সেই মুহূর্ত্ত হইতে হৃদয়ের বেদনা শান্তির প্রলেপে তিরোহিত হয়।

পাপবোধ হইল, অনুতাপ করিতে শিখিয়াছি—ইহাই পাপীর পক্ষে যথেষ্ট নহে। অরণ্যে রোদন করিলে কোন ফল নাই। যাঁহার চরণপ্রান্ত বিধৌত করিয়া পুণ্যধারা ধরাধামে বহিতেছে, সেই পবিত্র পুরুষের শরণাপন্ন হইয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতে না পারিলে কিছুতেই মুক্তি নাই। দস্যু রত্নাকর স্বীয় জীবনের দুষ্কৃতির বিষয় ভাবিয়া যখন অনুতাপের অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া পুণ্যের দেবতার চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন, তখন তিনি বল্মীকের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া মহাতেজস্বী তপস্বীরূপে অবতীর্ণ হইয়া রামায়ণের সুমধুর সঙ্গীতে জগৎকে বিমুগ্ধ করিলেন। পাপ প্রলোভনের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি জগাই মাধাই যখন গৌরাঙ্গের অলৌকিক প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, জ্ঞানচক্ষু প্রভাবে নিজ জীবনের অসারত্ব বুঝিতে পারিয়া আকুল প্রাণে হরিনাম করিতে করিতে ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত সাধু হইলেন। জগতে পদস্খলন হয় নাই এমন লোক নাই এবং অনুতাপের পবিত্র বারিতে অভিষিঞ্চিত না হইয়া কেহই কখনও সাধু হইতে পারেন নাই। যিনি মনে করেন আমি কখনও কোন পাপ করি নাই, তিনি পাপ কাহাকে বলে তাহা জানেন না, তিনি পাপরাশি বুকে করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যান ও মনে করেন তিনিই প্রকৃত সাধু। আমিও একদিন মনে করিতাম আমি খুব সাধু পুরুষ, কিন্তু এখন সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে। এখন চাই রত্নাকর ও জগাই মাধাইয়ের অনুতাপ। এ স্বল্প বর্ষণে এ মরুভূমির কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। আমি চাই প্লাবন। আমি চাই হৃদয়-ভেদী হাহাকার রোদন। আমি পথের ধূলা হইতে চাই—আমার বুকের উপর পদাঘাত করিয়া সকলে চলিয়া যাউক। আমি চাই মত্ততা ও ব্যাকুলতা। আমি আলোকে বিচরণ করিতে চাহি না—আমি চাই সূচিভেদ্য অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে। আমি বিলাস শয্যায় শয়ন করিতে চাহি না, আমি শ্মশানের পাদমূলে পড়িয়া থাকিতে চাহি। আমি অপ্সরাসঙ্গীত শুনিতে চাহি না, আমি পাতকীজনের মর্ম্মপীড়িত বিষাদ সঙ্গীত শুনিতে চাহি। আমার কলুষময় হৃদয় মন্থন করিয়া শুধুই গরল পাইতেছি—অমৃত কি পাইব না ? হে অমৃতময় পুরুষ আমাকে কি এক বিন্দু অমৃত দান করিবে না ?

ভার্য্যার বিপদ।

চুপ্ কর—চুপ্ কর তুমি, ঐ কথাটী আর বোল না।
এখনি কে শুন্‌তে পাবে—মুখ দেখান আর যাবেনা।
সাহেব্ সেজে বেড়াও তুমি, আমার তাহে নাহি ক্ষতি।
গড়ের মাঠে, ঘোম্‌টা এঁটে, যেতে হবে—কি দুর্গতি !
মেম্ সাজাবে, হ্যাট পরাবে, এ যে বড় বিষম কথা।
বোলো না ভাই, তোমার দোহাই, খাবে তুমি আমার মাথা।
তোমার সনে, একাসনে, বসে আমায় খেতে হবে !
ওমা ! ওমা ! একি কথা ! দশ জনেতে কিবা কবে !
থিয়াটারে, নিশির ঘোরে, যেতে হবে তোমার সাথে !
কুলের বালা, তায়্ অবলা, তাও কি কভু পারে যেতে ?
(তুমি) নাচ শিখাবে, গাইতে হবে, সাহেবদলের সঙ্গে মিশে।

(ওমা) কোথায়্ যাব! কি করিব! একি কথা সর্ব্বনেশে!
বিলাত ফেরত, কি কেরামত জাহির তুমি কল্লে সখা।
(তোমায়) দেখলে পরে, ঘুমের ঘোরে, লাগে আমার ভেবাচাকা।
আর কেন ভাই, বাড়াও বালাই, চুপ্ কর না পায়ে ধরি।
তোমার কথা শুনে, আকুল প্রাণে, আমি বড় ভেবে মরি।

আমি তোর এত কি সুন্দর?

১

এত কাছে কাছে থাকি, এত বুকে বুকে রাখি, তবু যেন দেখা নাই কত!
পলক পড়ে না চোখে, কি যেন অপূর্ব্ব দেখে, চেয়ে থাক কাঙালের মত!
অধরে আনন্দ মাখা, ললাটে সন্তোষ লেখা, তবু যেন কত সাধ বুকে!
দিন রাত কথা ক'য়ে, ঠোঁট গেছে শ্রান্ত হ'য়ে, তবু যেন কত কথা মুখে!
হৃদয়ের কথা যত, বলিতেছি অবিরত, তবু বুকে কান পেতে রাখ!
সতত রয়েছি কাছে, তবুও হারাও পাছে, গলাটি জড়া'য়ে ধরে থাক!
সেই আমি চিরকাল, তবু এত লাগে ভাল? পুরাতন মনে নাহি হয়!
সুধাও যে রসনায়, দুদিনে নিরস হয়, তা হ'তে কি আমি সুধাময়?

২

শুনিতে শুনিতে কথা, ভিজে গেল আঁখিপাতা, অশ্রু জলে ভাসে দুটি তারা!
সুশীতল সরোবরে, ভ্রমর হৃদয়ে করে, কমল যুগল বৃন্ত-হারা!
রাঙা রাঙা দুটি ঠোঁটে, ধীরে ধীরে কথা ফোটে, হাসি কান্না দুয়ে একাকার!
"দেখিয়াছ এত করে, তুমি নাথ এ দাসীরে? তবে বুঝি বাঁচিবনা আর!
চরণে পড়িয়ে থাকি, লুকা'য়ে লুকা'য়ে দেখি, তুমি কেন দেখ অত ক'রে?
আমি কি দেখি নাদেখি, তুমি কেন দেও আঁখি, আমি যে লজ্জায় যাই মরে!
এত কি দেখেছি আমি? দেখিতে কি জানি স্বামী, দেখিয়া যে ভরিল না বুক!
তোমারে দেখিয়া নাথ, মিটাতে নারিনু সাধ, মরিলেও যাবে না সে দুঃখ।"

৩

"এ আক্ষেপ কেন প্রিয়ে? আখি ভরে দেখা দিয়ে, মিটাইব বাসনা তোমার!
প্রিয়ার এসাধ যদি, নাহি মিটাইল পতি, রমণীর সে পতি মিছার।

সুখ কি কেবলি তোর, নাহি তাহে সুখ মোর? পতিসুখ বুঝ না প্রেয়সী!
সুধা, ভোক্তা,—দুজনার, বল সুখ বেসি কার? বেসি সুখী চাতক না শশী?
তৃষাতুর আঁখি ল'য়ে, থাকে পতি মুখ চেয়ে,—সে নারীর সাধ কি সুধার!
বুঝিসনা যেই জন, পুরুষ সে অকারণ, অকারণ মন প্রাণ তার!
যা কিছু সুখের তোর, আছে দেহে প্রাণে মোর, ঢেলে দিব তোরে নিরন্তর!
কিন্তু প্রিয়ে বল খুলে, কিসে এত আছ ভুলে, আমি তোর এত কি সুন্দর?"

৪

অধরে অধর রাখি, আঁখিতে জড়া'য়ে আঁখি, কহে প্রিয়া কাতর ভাষায়।
"জানি না যে কথা নাথ, কেমনে মিটাব সাধ? কেন লজ্জা দেও অবলায়!
রমণী জনম ল'য়ে, জন্মেছি কাঙাল হ'য়ে, জানি সুধু কাঙালের আশা!
রূপ গুণ দেও ঢেলে, ভাষা ত দেওনা ব'লে, কেমনে জানিব আমি ভাষা!
ধরার ঐশ্বর্য্য সব, হেরি অঙ্গে অঙ্গে তব, কাঙালের সুখে ডুবে থাকি!
রমণী কি এত সুখে, প্রকাশিতে পারে মুখে, দিবা নিশি কি যে দেখে আঁখি?
দেখিতে যদিই সাধ, এ নয়নে তুমি নাথ, হইয়াছ কতই সুন্দর!
আমার এ আঁখি লয়ে, আপনার পানে চেয়ে, একবার দেখ প্রাণেশ্বর!"

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

মালা। খণ্ড কবিতা। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় প্রণীত। মূল্য ৵০। এ মালার ফুলগুলি সুন্দরও নহে, সুগন্ধও নহে। গাঁথাও কলার বাস্‌নায়। আমাদের আনন্দকর হইল না।

দারোগার দপ্তর। মাসিক গল্প পুস্তক। ১৩। ১৪। ১৫ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৵০। লেখক নিজে পুলিষ ইনেস্পেক্টর। কার্য্যোপলক্ষে যে সকল ঘটনা ও চরিত্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহাই গল্পে রচিত। বঙ্গ ভাষায় এরূপ গ্রন্থের নূতনত্ব আছে। নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিতে পারিলে এরূপ গল্পে যথেষ্ট মানব চরিত্র শিক্ষা হইতে পারে। সমালোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্র ভাষার ছটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঘটনাগুলি প্রকৃত হইলেও উপন্যাসের আকার ধারণ করিয়াছে। এরূপ গ্রন্থ এত অলঙ্কারময় ভাষায় লিখিত না

হইয়া "হুতুমি" ভাষায় লিখিত হইলে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। আমরা গ্রন্থকারকে সেই প্রথা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

অমলা। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। লেখকের হৃদয়ে কবিতা আছে, চক্ষেও সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে কিন্তু অনুশীলন অভাবে তুইই অপরিপক্ক। স্থানে স্থানে পড়িয়া বোধ হইল লেখক কালে সুলেখক হইতে পারেন।

সহজ শ্রীমদ্ভাগবত। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০। হুগলীর উকীল শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ধর কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। গ্রন্থকার আমাদের বিশেষ পরিচিত সুতরাং এ পুস্তকের অধিক সুখ্যাতি করিলে আত্মশ্লাঘা করা হইবে। সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইলাম—এরূপ গ্রন্থের যতই বহুল প্রচার হয়, দেশের ততই মঙ্গল। শ্রীমদ্ভাগবত হিন্দুর সর্ব্ব প্রধান ভক্তিগ্রন্থ, অথচ আজ কাল অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি সে গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। সূর্য্য বাবু সহজ ভাষায় স্বল্প মূল্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার অনুবাদ প্রচার করিয়া যে মহৎ অভাব দূর করিতেছেন তাহা বলা বাহুল্য। এ গ্রন্থ স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর অতি উপাদেয় পাঠ্য পুস্তক হইবার উপযুক্ত। স্কুল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমরা অনুরোধ করি, যেন তাঁহারা যত্ন করিয়া এ গ্রন্থ স্কুল সমূহের পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন, যদি না করেন, তবে দেশের দুর্ভাগ্য।

বি, কে, দাস কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্রের সচিত্র আদর্শ পুস্তক। মূল্য ।৵০ আনা ডাক মাসুল ৵০ আনা। ইংরাজী বাঙ্গালা ছাপার অতি উত্তম অক্ষর, বর্ডার, ব্লক প্রভৃতির নমুনা এবং পশু, পক্ষী, বাড়ী, ঘর, প্রভৃতির মুদ্রাঙ্কনের অতি উত্তম ছবি ও রবার ষ্ট্যাম্পের অতি সুন্দর আদর্শ এই পুস্তকে আছে। আমরা অনেকগুলি নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, মনে হইল, এরূপ ছাপা সচরাচর বাঙ্গালা ছাপাখানায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহাদের সৌখীন ছাপার প্রয়োজন তাঁহারা বি, কে, দাস কোম্পানীর প্রেসে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবেন। এরূপ মুদ্রাযন্ত্র দেশের গৌরব স্থল।

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

১ম ভাগ— ৬ষ্ঠ সংখ্যা। আশ্বিন—১৩০০।

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ঃ—

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার; শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল্; শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল; শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্; শ্রীদাশরথি ঘোষ এম্, এ, বি, এল্; শ্রীরামগোপাল ঘোষ, বি, এল; শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, এম, এ; শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, বি, এ।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিষয়। ... পৃষ্ঠা।
১। প্রাণের দেবতা ১৬১
২। ইচ্ছাচার ১৬৯
৩। এক রজনী (উপন্যাস) ১৭৫
৪। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ ১৭৯
৫। বাঁশী (পদ্য) ১৮৫
৬। গান (কোরক গীতি) ১৮৭
৭। শারদীয়া দুর্গোৎসব ১৮৮
৮। সংসার-চক্র ১৮৯
৯। নলিনী বসন্ত (পদ্য) ১৯২

হুগলী,
সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আশ্বিন—১৩০০।

এই সংখ্যার মূল্য /১০ দেড় আনা।

নিবেদন।

পূজোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকিবে, এজন্য কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন পূর্ণিমা বাহির করা অসুবিধাজনক হইবে। বিশেষ পূজার ছুটীতে অনেক গ্রাহকই অন্য স্থানে যাইবেন, সুতরাং কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা যথা সময়ে তাঁহাদের হস্তগত হওয়া সম্ভবপর হইবে না। এই সকল কারণ বিবেচনা করিয়া আমরা কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণের পূর্ণিমা অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এক সঙ্গে বাহির করিব মনস্থ করিয়াছি। আশা করি গ্রাহকগণ ইহাতে অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
ম্যানেজার,
হুগলী।

সীতাচরিত।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত।

মূল্য ॥০ আনা

ডাকমাসুল——৴১০

১৮৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে পাঠ্য পুস্তকের তালিকা বাহির হইয়াছে তাহাতে এই পুস্তক মধ্যবৃত্ত বালিকা বিদ্যালয় সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সংবাদ পত্র সমূহ কর্ত্তৃক বিশেষ প্রশংসিত।

অতি সরল ও পরিশুদ্ধ ভাষায় এই অপূর্ব্ব জীবন ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পুস্তক খানি স্কুলের তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে এ পুস্তকের ন্যায় পাঠ্য পুস্তক বাঙ্গালায় বিরল।
নব্যভারত।

এরূপ পুস্তক আমাদের দেশে অতীব বিরল।——সোমপ্রকাশ।

এই পুক হুগলীতে গ্রন্থকারের নিকট ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ। | আশ্বিন, সন ১৩০০ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রাণের দেবতা।

আমি তাহাকে বড় ভালবাসি। বোধ হয় পৃথিবীর আর কাহাকেও
এত ভালবাসি না। ভালবাসার অনেক রূপ আছে। মা বাপকে একরূপ
ভালবাসি, স্ত্রী পুত্র কন্যাকে একরূপ ভালবাসি, ভাই ভগ্নীকে একরূপ
ভালবাসি ও প্রাণের বন্ধুকে একরূপ ভালবাসি। কিন্তু এই বিভিন্নরূপ ভাল-
বাসার মধ্যে একটা কিছু সাধারণ আছে বলিয়া বোধ হয়। এই সাধারণত্ব-
টুকু মুখে বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু অনুভব করা যায়। একটু
অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় এই বিভিন্ন প্রকারের ভালবাসাগুলিকে
তুলনাও করা যায়। আমি এইরূপ ভালবাসাগুলিকে তুলনা করিয়া দেখি-
য়াছি। তুলনায় বুঝিয়াছি তাহার প্রতি আমার ভালবাসা আমার স্ত্রীর
প্রতি ভালবাসার সমশ্রেণীক। আমার এই দুই ভালবাসা সমশ্রেণীক
হইলেও, ইহাদের মধ্যে প্রভেদও বিস্তর। আমার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা
কতকটা Shakespear এর Benedick ও Beatriceএর ভালবাসার মত।
Benedick ও Beatrice বোধ হয় শৈশব হইতেই পরস্পরকে এক রকম
ভালবাসিত। পরে পাঁচ জনে জুটিয়া বিবাহের ফাঁদ পাতিলে বিবাহ
শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পরস্পরকে ভালবাসিতে লাগিল। আমার সম্বন্ধেও
তাই। আমিও ছেলেবেলা হইতেই মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছি,
যে আমার স্ত্রী হইবে তাহাকে ভালবাসিব। সকলকেই দেখিলাম বিবাহ

হইলে স্ত্রীকে ভালবাসে। তার পর পাঁচ জনে জুটিয়া ঘটকালী করিয়া আমার জন্য একটি Beatrice জুটাইলেন। আমিও সেই অবধি শ্রীমতীকে সাধ্যমত ভালবাসিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহার প্রতি আমার ভালবাসা আপনা আপনি হইয়াছে। কেন হইয়াছে তাহার স্পষ্ট কোন কারণ দেখিতে পাই না। আমি যাহা কিছু কারণ দেখিতে পাই তাহা ক্রমশঃ পাঠক মহাশয়ের নিকট প্রদর্শন করিতেছি কিন্তু সেইগুলি যে প্রকৃত কারণ তাহা অদ্যাপিও আমার বিশ্বাস হয় না। আমার "স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা" ও "তাহার প্রতি ভালবাসা" এই দুয়ের মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদ আছে তাহা পরে বলিতেছি।

এক্ষণে আমার ভালবাসার একটু ইতিহাস দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। তাহার জন্মাবধি তাহার সহিত আমার পরিচয় ও ভালবাসার সূত্রপাত। ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে পুরাকালের তপোবনের ন্যায় শান্তি ধাম একটি মনোরম শস্যশ্যামল গ্রাম আমাদের উভয়ের জন্মভূমি। আমি তার চেয়ে চারি বৎসরের বড়। সে যখন ভূমিষ্ঠ হয় আমি তখন তাহার সূতিকাগৃহের দ্বারে নারীমণ্ডলীর মধ্যে মায়ের কোলে। অতি শৈশবে আমি বড় দুরন্ত ছিলাম। ৩।৪ বৎসরের শিশু হইলেও আমি অনেক প্রতিবেশীর অনেক অপকার করিয়াছি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে জন্ম পরিগ্রহ করিল আমি যেন সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রভাব অনুভব করিলাম এবং মুগ্ধ হইলাম। আমি দুষ্টপনা ছাড়িলাম। সেই দৃশ্য আজও আমার মনে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। সেও জন্মিয়াই যেন সকলের আগে আমার দিকে চাহিল ও তাহার কান্না থামিল। বুঝি সেই অপূর্ব্ব শুভ মূহূর্ত্তে তাহার সহিত আমার প্রথম দেখা হইয়াছিল বলিয়া তাহার প্রতি আমার এত ভালবাসা। সে যাহা হউক উপন্যাসবর্ণিত নায়িকার ন্যায় সে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। আমি তাহাকে সদাসর্ব্বদাই কোলে পীঠে করিতাম। তার পর সে আমার খেলার সঙ্গিনী হইল। আমরা উভয়ে সেই পুণ্যসলিলা জাহ্নবীরতীরবর্ত্তি ক্ষেত্রপার্শ্বে একত্রে খেলিতাম, একত্রে নদীতে ঢিল ফেলিতাম ও ঢেউ গুনিতাম। তাহাদের বাড়ী ও আমাদের বাড়ী পাশাপাশি—মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। বাড়ীতেও প্রায় একত্র থাকিতাম। তাহার সহিত আমার একটু সম্পর্কও ছিল। কিন্তু সে সম্পর্ক চল্লিশ

অন্তরের। প্রতাপ শৈবলিনীর ন্যায় জ্ঞাতি সম্পর্ক নয়; বিবাহ হইলে হইতে পারিত। উপন্যাসবর্ণিত বালক বালিকার ন্যায় আমরা খেলিয়া বেড়াইতাম। তবে প্রভেদ এই—আমাকে স্কুলে যাইতে হইত, সে নিতান্ত বালিকা, তাহাকে স্কুলে যাইতে হইত না। আমি স্কুলে যেটুকু থাকিতাম সেই টুকুই তাহাকে সঙ্গিনী পাইতাম না। কিন্তু স্কুলের ছুটি হইলেই তাহার সহিত আসিয়া মিশিতাম। সন্ধ্যার সময়ে আমাকে স্কুলের পড়া করিতে হইত। কিন্তু সে তথায় কাছে বসিয়া থাকিত। পড়া সাঙ্গ হইলেই উভয়ে আমরা আরও ২।৩ জন সমবয়স্কের সহিত কোন বর্ষীয়সীর উপন্যাসে যোগ দিতাম। তখনকার ভালবাসায় এই বিশেষত্ব ছিল যে সর্ব্বদা তাহাকে কাছে দেখিতে ভালবাসিতাম। তাহাকে না দেখিতে পাইলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতাম এবং আমাকে না পাইলে সেও আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিত। বাগানে ফল পাড়িতে যাব, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। আমি গাছে উঠিয়া ফল পাড়িতাম সে তলায় দাঁড়াইয়া কুড়াইত। পুকুরে মাছ ধরিতে যাইব, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। সে পুকুরের পাড়ে বসিত আমি মাছ ধরিতাম। যখন সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত খেলিতে যাইব, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম অথবা সে নিজ ইচ্ছায় সঙ্গে আসিত এবং দূরে দাঁড়াইয়া আমাদিগের খেলা দেখিত। তাহাকে দেখিলে আমার দ্বিগুণ উৎসাহ হইত; আমি সর্ব্ব কার্য্যে জয়ী হইতাম। তাহার সম্মুখে চেষ্টা করিয়া আপনার গুণপনা এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতাম। নিজের প্রাধান্য দেখাইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতাম এবং কৃতকার্য্য হইলে আপনাকে অত্যন্ত সুখী মনে করিতাম। এখন মনে হয় তাহাকে যেন বুঝাইতাম, উপন্যাসবর্ণিত নায়কের গুণ সমস্তই আমাতে বর্ত্তমান ছিল। যখন স্কুলে মাষ্টার মহাশয় আমার বিশেষ সুখ্যাতি করিতেন অথবা প্রথম স্থান অধিকার করিতাম তখন মনে করিতাম সে যদি একবার আমার সম্মান দেখিয়া যাইতে পারিত! তার পর সেই পারিতোষিকবিতরণের মহতী সভা। চারি দিকে জাঁকাল আসবাব। কত বড় বড় লোক সভায় আসীন। স্বয়ং ছোটলাট সাহেব স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিবেন। তাঁহার হস্ত হইতে প্রথম পারিতোষিক লইয়া আসিলাম। তখন মনে করিলাম আমার কত গৌরব কত সম্মান। তখন

মনে করিতাম আহা সে যদি আমার, সভায় আসিয়া আমার গৌরব দেখিয়া যাইতে পারিত! আমি তাহার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করিতাম। সে ক্রমে বালিকাবিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে বাড়িতে পড়াইতাম। সে যখন "বোধোদয়" পড়ে আমি তাহাকে নিজের ক্লাসের বইয়ের কত কথা কত গল্প বলিতাম। বালিকা হাঁ করিয়া শুনিত। আমি তাহার ক্ষুদ্র মনকে আমার কিঞ্চিদধিক বিকসিত মনের দ্বারা আয়ত্ত করিতাম, আচ্ছন্ন করিতাম। আমি তাহাকে আমি-ময় করিয়া তুলিতাম। কেন এত করিতাম? তাহার অশেষ গুণ ছিল। সে সুন্দরী ছিল বটে, তাহার মুখশ্রী সুন্দর ছিল কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী মেয়ে আরও আমাদের পাড়ায় ছিল। তাহার প্রধান গুণ এই যে প্রাণান্তেও সে মিথ্যা কথা বলিত না। পাড়ায় তাহার মতন এত সত্যপ্রিয়া আর কেহ ছিল না। তাহার আর এক গুণ তাহার মন অতি সরল। খল কপটতা কাহাকে বলে তাহা জানে না। একদিন তাহাকে কথা প্রসঙ্গে তাহার মা প্রভৃতি অনেকের সমক্ষে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল "তুমি কাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাস।" বালিকা আমার নাম করিয়াছিল। তাহাতে সকলে হাসিয়াছিল। তাহার সরল উত্তর পাইয়া অনেক সময় অনেকে তাহাকে "বোকা মেয়ে" বলিত। তাহার আর এক গুণ সে কখনও পরের নিন্দা করিত না অথবা যেখানে পরের নিন্দার কথা হইত সেখানে যাইত না। আমি এই জন্য তাহাকে বড় ভালবাসিতাম। ইহা ছাড়া তাহার আরও অনেক গুণ ছিল। তাহার পড়া শুনায় খুব মন ছিল, অত্যন্ত স্মরণশক্তি ছিল, সে অনলসা ও কর্ম্মিষ্ঠা ছিল। এবং পিতা মাতা প্রভৃতির অতি অনুগত ছিল; আমি যখন তাহার নিকটে থাকিতাম না তখন সে তাহার মাতার নিকট গৃহকর্ম্ম শিখিত এবং শিখিয়া তাঁহার সাহায্য করিত। এইরূপে সুখের শৈশব কিছু দিন চলিল। তার পর সঙ্কট দিন, জীবন মরণের দিন আসিল। সেই দিন হইতেই দিব্য জ্ঞান হইল। এত দিন যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। সেই দিন স্বপ্ন ভাঙ্গিল, দিব্য চক্ষে সব দেখিতে লাগিলাম। সে তখন দ্বাদশবর্ষ বয়সে, আমি তখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে। সে একাদশে পা দিতেই তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। তার পর দ্বাদশে পা দিবার পর তাহার সম্বন্ধের ঠিক হইয়া গেল, বিবাহের দিন স্থির হইল। এতদিন এ বিষয়ে ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখি নাই। তাহার যে বিবাহ হইবে—তাহাকে দেশান্তরে যাইতে হইবে এ কথা কোন দিন চিন্তা করিয়া দেখি নাই। তার পর তাহার বিবাহের দিন আসিল। সেই দিন কিয়ৎক্ষণের জন্য মনে মনে কষ্ট পাইয়াছিলাম। সেই দিন আমার ক্ষণকালের জন্য অধঃপতন হইয়াছিল। সে আমাকে ছাড়িয়া যাইবে এই ভাবনায় ক্ষণকাল নির্জ্জনে গিয়া কাঁদিয়াছিলাম। মনে মনে ভাবিলাম আমি ইহাকে এত ভালবাসি, আমাকে ফেলিয়া এ কোথায় যাইবে? আমি ইহাকে আর দেখিতে পাইব না? মানুষের বিবাহ কেন হয়? আমি কেমন করিয়া একলা থাকিব? আমার ত আর কিছুই ভাল লাগিবে না। এইরূপ ক্ষণকাল মনোবিকার জনিত চিন্তায় অভিভূত রহিলাম। তার পর অকস্মাৎ ভগবানের কৃপা হইল। কে যেন আমার কাণে কাণে সুমন্ত্র দিয়া গেল! অকস্মাৎ মনোমধ্যে বিদ্যুৎবেগে নূতন চিন্তাবেগ স্ফুরিত হইল। কে যেন আমায় বলিয়া দিল তুমি এখানে একাকী কি করিতেছ? আজ এমন আনন্দের দিনে তুমি কেন একাকী অশ্রুপাত করিয়া অমঙ্গল ঘটাইতেছ? অমনি চিন্তার গতি ফিরিল। ভাবিলাম আমি কি স্বার্থপর; একজন সুখী হইবে আমি তাহার অসুখ কামনা করিতেছি; যাহাকে সুখী করিতে আজীবন চেষ্টা করিতেছি, তাহার অসুখ অন্বেষণ করিতেছি। ছি! ছি! ছি! আমি যে মহাপাপে লিপ্ত হইলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আজ হইতে তাহার যাহাতে সুখের বৃদ্ধি হয় তাহারই চেষ্টা করিব এবং নিজেও যাহাতে অসুখী না হই তাহারও চেষ্টা করিব। অমনি দ্বিগুণিত উৎসাহে সেই নির্জ্জন স্থান পরিত্যাগ করিলাম। মনে ভাবিলাম শীঘ্রই তাহাকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী এবং আমাকেও অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। আজ তাহারই কষ্ট বেশী। তাহাকে সান্ত্বনা করিতে হইবে। তাহাই করিলাম। ঘটনাসূত্রে শুনিলাম, আমাদের সকলকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। সে শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেণ, আমিও বুক বাঁধিলাম। কত চিন্তা করিলাম। ভাবিলাম আমার ভগিনীর বিবাহ হইয়াছে সে শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হইয়াছে সেও শ্বশুর বাড়ীতে আছে। এইরূপ

সকলেরই বিবাহ হয়, সকলেই শ্বশুর বাড়ী যায়। কেহই অবিবাহিতা থাকে না। তবে ভাবনা কিসের? আমি তাহাকে ভালবাসি আরও বেশী করিয়া ভালবাসিব। সেও আমাকে ভালবাসিবে। আমি তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আজও তাহার প্রভাব জীবন্তভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। সে আমাকে উন্নত চিন্তা করিতে শিখাইয়াছে। সে আমাকে উন্নত চরিত্র বলিয়া জানে। পরমেশ্বর করুন এক্ষণে আমি যেন এমন কোন কাজ না করিয়া ফেলি, যাহাতে আমাকে সে হেয় জ্ঞান করিতে পারে। আমি যেন তাহার চক্ষে হীনগৌরব না হই। আমিও তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি যে শৈশবে তাহাকে যেরূপ গুণশালিনী দেখিয়াছিলাম সে যেন ততোধিক গুণশালিনী হইয়া সংসারক্ষেত্রে কীর্ত্তিমতী হয় এবং যন্ত্রণাময় পৃথিবীর যথাসাধ্য যন্ত্রণামোচনে যত্নবতী হয়। ইহাই ভগবানের নিকট আমার প্রাণের প্রার্থনা।

বিবাহের পর সে শ্বশুরবাড়ী গেল, আমিও সম্মানের সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় গেলাম। মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত পূজার সময় আমার দেখা হইত। অনেক দিনের পর তাহার সহিত দেখা হইত বলিয়া তাহার প্রতি আমার ভালবাসা বাড়িতে লাগিল এবং কেমন এক কবিত্বময় হইতে লাগিল। তাহারও ভালবাসার ত্রুটি দেখিতে পাইতাম না। সেই সরলতা, সেই পবিত্রতা, সেই লাবণ্য, তাহার মুখশ্রীতে যেন চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান। তাহার পর আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা ফুরাইল। বিবাহ করিলাম, সংসার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। আমার বিবাহের সময় সে উপস্থিত ছিল। আমার বিবাহে তাহার আনন্দের সীমা ছিল না।

আজ প্রায় ৪ বৎসর ধরিয়া আমি জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত। এই চারি বৎসর ধরিয়া তাহাকে দেখি নাই। কিন্তু এই চারি বৎসরে আমি তাহাকে দেবতা করিয়া তুলিয়াছি। এই চারি বৎসরে তাহাব প্রভাব দেবতার প্রভাব বলিয়া অনুভব করিতেছি। এই কয় বৎসরে আমার ভালবাসা আশাতীতরূপে বাড়িয়াছে এবং রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমার ভালবাসার উন্নত ভাব ঘটিয়াছে, ক্রমবিকাশ হইয়াছে। তাহাকে চক্ষে এতদিন দেখি নাই কিন্তু তাহার আত্মার প্রভাব অনুক্ষণ

অনুভব করিতেছি। এখন আর শৈশবের ভালবাসা নাই। এখন সেই ভালবাসার চরম উন্নতি। কিন্তু সে শৈশবের ভালবাসা ভুলিবার নয়, সে শৈশবের ঘটনাগুলি হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে। যখন শৈশবের লীলাভূমি সেই জন্মভূমি দর্শন করি, তখন প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। উঃ সে দিন আর কি পাওয়া যাবে না। প্রাণে যেন তড়িদ্বেগ ছুটে। চক্ষে দরদর ধারে অশ্রু ঝরে। তখনই কবির অপূর্ব্ব সঙ্গীত হৃদয়ঙ্গম করি।

“Tears, idle tears, I know not what they mean,
Tears from the depth of some divine despair
Rise in the heart, and gather to the eyes,
In looking on the happy Autumn fields,
And thinking of the days that are no more.”

TENNYSON.

শৈশবের ভালবাসার বড় মোহিনী শক্তি। মনুষ্য ত জীবন্ত ভালবাসার পাত্র। মানুষের কথা দূরে থাকুক। শৈশবে যে তরু লতা অথবা মনোরম স্থানকে ভালবাসিয়াছি, বহুদিন পরে আবার তাহাদের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হইলে মনে কত অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়; প্রাণ যেন পুলকে পরিপূরিত হয়। কিন্তু এই অপূর্ব্ব পুলকের সহিত যেন একটু উৎকণ্ঠার উদয় হয়। বাস্তবিকই কোন অভাব লক্ষিত না হইলেও যেন মনে হয় “কি ষেন ছিল, কি যেন নাই”; মনে এক অপূর্ব্বরূপ বিরহের উদয় হয়। কবি দুষ্যন্তের বিরহ বর্ণন কালে এই অপূর্ব্ব মনোভাবের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎসুখিতোঽপিজন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি॥”

কালিদাস।

এই ত গেল তরু লতার প্রতি ভালবাসা। কিন্তু যেখানে এই তরু লতাগুলির সহিত একটি জীবন্ত প্রতিমার সম্বন্ধ থাকে সেখানে মনের ভাব কত মধুর, কত অপূর্ব্ব, কত উৎকণ্ঠাপূর্ণ; সেখানে মনে হয় সেই

জীবন্ত প্রতিমা যেন দেবতা হইয়া তরু কিসলয় ও লতা ও ফুলগুলির সহিত অদৃশ্য হইয়া হাসিতেছে; মনে হয় সেই মধুরমূর্ত্তি বুঝি সে স্থানের বনদেবতা। এরূপ মনোভাব শুধু হৃদয়েই অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

কিন্তু যাক সে শৈশবের কথা। এখনকার ভালবাসার কথা বলিতেছি। আজ কয় বৎসর ধরিয়া তাহার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তাহাকে দেবতার শ্রেণীতে আসন দিয়াছি। যে আমার জীবনকে উন্নত করিয়াছে, যাহার কথা মনে হইলে জীবনের উন্নত লক্ষ্যের কথা, নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞান ও জীবনের মহোদ্দেশ্যের কথা মনে হয়, তাহাকে দেবতা বলিব না ত কি বলিব। আমি যেমন অভীষ্ট 'দেবতার ধ্যান করি তাহাকেও যেন সেই রূপ মনে মনে ধ্যান করি। তাহার সহিত যেন আমার আত্মায় আত্মায় এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধ আছে। যেমন কবিরা কল্পনা করিয়া থাকেন যে (Good angels) দেবদূতেরা অশরীরী হইয়া আমাদের সন্নিকটে থাকিয়া আমাদিগের মনোভাব ভাল করিয়া দেয়, আমাদিগকে সৎপ্রবৃত্তি দেয় এবং অসৎ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে, আমারও সেইরূপ মনে হয় যে তাহার আত্মা যেন প্রতিনিয়তই আমার নিকট অলক্ষিত ভাবে আসিয়া আমাকে সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। জীবন সংগ্রামের আর একটি বিষম সমস্যার সময়ে তাহার প্রভাব অনুভব করি। এই পৃথিবীতে থাকিলে কত সময়ে কত দুশ্চিন্তা হৃদয়কে দগ্ধ করে, কত সময়ে কতরূপ মানসিক বেদনা পাইতে হয়, কতরূপ শোকতাপে অভিভূত হইতে হয়। আমার এই অতিশয় মনের ব্যথা এবং শোক তাপের সময়ে আমি তাহার কথা ভাবিয়া সব ভুলিয়া যাই। আমার শোক তাপ যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়।

(ক্রমশঃ)

ইচ্ছাচার।

ভূমণ্ডলের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে যথেচ্ছাচারিতাই শাসন প্রণালীর প্রথম অঙ্কুর। উপপত্তি অবস্থায় ইহার পর্য্যবসান নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত ইহা ক্রমভাবে কিন্তু বিকার ব্যতিক্রমে চলিয়া আসিতেছে। রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সাধারণ তন্ত্র প্রভৃতি অনেক উপপাদ্যই উপস্থাপিত হইয়াছে এবং অধুনাও হইতেছে কিন্তু যথেচ্ছাচারিতার লয় হয় নাই ও ভবিষ্যতে হইবে বলিয়াও বিশ্বাস হয় না। পক্ষান্তরে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি সুধীগণের মধ্যে অনেকে ইহাও বলিয়া থাকেন যে ভূমণ্ডলে আবার যথেচ্ছাচারিতার দিন প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কার্য্যাকার্য্যের ঘাত প্রতিঘাত আছে।

"বল বল বাহুবল, জল জল ইন্দ্রের জল"—ইহা ত প্রবচন। দুই বাহু বিশিষ্ট একটি মানব নহে—শত, সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী, অক্ষৌহিণীর উপর অক্ষৌহিণী মানব যাহার সহায় সে না করিতে পারে কি? অর্জ্জুন, আলেকজন্দার, তৈমুরলঙ্গ, নেপোলিয়ঁ, স্কোবেলফ্ প্রভৃতি সমর বীরগণ দিগ্বিজয় উপলক্ষে ধরণী বক্ষে যে শোণিতময়ী তরঙ্গিনী প্রবাহিত করিয়াছিলেন তাহা কেবল মাত্র পশুবল এই বাহুবলের সাহায্যে। পুরাকালে লোকে এ কথা যেমন বুঝিত অধুনাও সেইরূপ বুঝিয়া থাকে। মানব সংহার জন্য ডিনামাইট প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বিজ্ঞান-সম্মত অস্ত্র শস্ত্র ও যন্ত্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে সত্য কিন্তু তথাপিও এই ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমে জ্ঞান-গরীমায় প্রোদ্দীপ্ত য়ুরোপের প্রত্যেক শাসন-কেন্দ্র সৈন্যবল বৃদ্ধির জন্য এত উদ্যোগী কেন? কি জন্য প্রজার স্কন্ধে করভারের উপর করভার চাপিতেছে, কি কারণে কঠোর আইন-শাসনের সৃষ্টি হইতেছে, কি জন্য বর্ত্তমান শর্ম্মণ সম্রাট পুরাতন মন্ত্রী বিসমার্ককে ত্যাগ করিয়া তৎপদে ক্যাপরিভীকে বসাইলেন আর পুন পুন মহাসভা রেষ্ট্যাগ ভাঙ্গিয়া গড়িতেছেন? কি কারণেই বা রুষজার কুরুপাতকিন, কর্ণেল য়ানফ্ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত সেনাপতিগণের শত দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত সেনাবলবৃদ্ধি পন্থানুসরণ করিতেছেন? য়ুরোপে, ইংলণ্ডে, ফরাশিভূমে,

ইতালী অস্ট্রিয়ায় যাহা হইতেছে, আসিয়াখণ্ডে, আফগান তাতারে, চীন ভারতেও কি তাহা হইতেছে না ? চীনের দশ লক্ষ সেনাবল আজি দ্বাদশ লক্ষে পরিণত। ভারতে যে শাহেন-শাহের ফৌজ (Imperial service troops) সংগঠিত হইতেছে তাহার অর্থ কি ? আর ক্ষীণ প্রাণ সঙ্করঙ্গকে যে জোর করিয়া সখের পল্টনের অঙ্গীভূত করা হইতেছে তাহারও এক অর্থ। তরবারী-ফলক লাঙ্গল-ফলকে পরিণত হইবার কথা, আর বর্ষা ফলক-লৌহ কেবল মাত্র মৎস্য ধরিবার যন্ত্রে ও বৃক্ষচ্ছেদন অস্ত্রে পর্য্যবসিত হইবার কথাও আমরা কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আবহমান কাল শুনিয়া আসিতেছি ; আর চিরকাল শুনিতেও হইবে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। বাহুবলই বল—লোকবলই বল—যথেচ্ছাচারী এই কথা বিলক্ষণ বুঝেন।

ইচ্ছাচার নাই কোথা ?—সংসারে—সমাজে—শাসনে ? জ্ঞান বিজ্ঞানে, নীতি ধর্ম্মে ? ইচ্ছাচার ছিল না কবে, নাই কথন ? সেকালে, একালে,—মনের কথায়, বাহ্যিক ব্যবহারে ?

ইচ্ছাচারের স্ফূর্ত্তির নামই আধুনিক সভ্যতা। পূর্ব্বে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। ব্যক্তিগত বা সমাজগত কোন প্রকার মত প্রকাশেরই স্বাধীনতা ছিল না। গ্যালিলিয় বলিলেন, সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে না, সূর্য্য স্থির, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। এখন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও এ কথায় আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ দেখিবে না বটে, কিন্তু এক সময়ে এই কথা বলিয়াই গ্যালিলিয়কে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী মেরী নিজে রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। যে সকল প্রটেস্‌টাণ্ট রোমান কাথলিক সাম্প্রদায়িক মতের বিরুদ্ধে মত প্রকটিত করিয়াছিলেন, কোমলহৃদয়া রাজসিমন্তিনী মেরী তাহাদিগকে প্রজ্জলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। কঠোর, বীভৎস, নৃশংস, ক্রূর, রক্ত-পিপাসু হিস্পানী-ইনকুইজিসনের পাণ্ডারাও মনে করিতেন ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াই তাঁহারা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। বিজিত পোলিস প্রজাপুঞ্জের রাজনৈতিক মত প্রদমিত ও প্রশমিত করাই রুষজার প্রশস্ত রাজনীতি মনে করেন। প্রেমরাজ্যে অবাধ প্রেম বিলাইবার জন্যই ডাইভোর্স আদালতের পুষ্টি। আমেরিকার অবাধ প্রেমে জলপ্লাবন উপস্থিত।

“পলকে তোমারই রূপ নূতন হেরি” ঘোর স্থিতিশীলার কথা। অবাধ প্রেমপতাকাবাহিনী উন্নতিশীলা বিনোদিনী পাঠ উল্টাইয়া “পলকে বঁধূয়া তুঁহুঁ বদল করি” গাইতেছেন। রোগীর সহিত বিচার করিয়া চিকিৎসক কখন ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করেন না। অধ্যাপনা কালে অনুসন্ধিৎসু ছাত্র এ অক্ষর কেন “ক” এটা কেন “খ” জিজ্ঞাসা করিলেও গুরু কদাচ তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন না। আর শত পুত্র বর্ত্তমান থাকিতেও, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কেহ যদি আপনার প্রভূত ধনরাশি আলিপুরের পশুবাটীকায় উইল সূত্রে দান করিয়া যান তাহা হইলেও ত কাহারও কথা কহিবার যো নাই। জ্যাক্‌সন যদি টমসনের গ্রাস লয়েন তাহা হইলে তাহার নাম হইবে চুরী, পরিণাম হইবে কারাবাস। আর যদি সহস্র জ্যাক্‌সন সহস্র টমসনের সহিত একত্র হইয়া মধ্য আফ্রিকার টিপুটিবের রাজ্য কাড়িয়া লয়েন তাহার নাম হইবে শৌর্য্য-বীর্য্য আর জাঁদরেল জ্যাক্‌সন বোধ হয় সমাজে সম্মানিত হইয়া “স্যর” হইবেন। যথেচ্ছাচারের স্বরূপ বুঝেন কি ?

ইচ্ছাচারের আর একটি প্রকার দেখাইব। এ শক্তি বিশ্বব্যাপিনী। ইহার আদি নাই—অন্ত ভবিষ্যতের তিমির গর্ভে। তন্ন তন্ন করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিলেও ইহার আদি দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু আজি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যুগ যুগান্তর পরেও এই মধ্যাহ্ন ভাস্কর প্রোজ্জ্বল দিধীতি বিকিরণে মহিমা প্রকাশে জগৎ সংসার মোহিত করিয়াছে। ধনী, দীন, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক সভ্য, অসভ্য, জেতা, বিজিত, কাহারও এই শক্তির মোহ নষ্ট করিবার উপায় নাই। এই শক্তির মায়াতেই আজ জগৎ সংসার সমাচ্ছন্ন। এই আদ্যা-শক্তির নাম সংখ্যার দাসত্ব—বা সাদা কথায় “ভোট”। কি বিচারালয়ে, কি ধর্ম্মাধিকরণে, কি শান্তিনিকেতনে, কি সমর প্রাঙ্গণে, কি রাজসভায়, কি সন্ন্যাসীর পর্ণকুটীরে, কি দুষ্ট তস্করের গুপ্ত মন্ত্রণায়, কি শিষ্ট নাগরিকের প্রকাশ নির্ব্বাচনে যথা—তথা—এই ভোট শক্তির বিকাশ। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটকে এই শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে হয় আর জুগুপ্সিত হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বন-বিহারী বর্ব্বর সাঁওতালের পক্ষেও তাহাই।

এই শক্তি ভাল কি মন্দ, পাঠক, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব না। যখন

পার্লমেণ্ট মহাসভা কয়েক ভোটের জোরে ভারত সাম্রাজ্যের অহিফেণ রাজস্ব নয় কোটী টাকায় আঘাত করিবেন তখন আপনি হা হুতাশ করিবেন, এই শক্তির উপর অভিসম্পাৎ করিবেন। আর যখন পার্লেমেণ্ট মহাসভা কয়েক ভোটের জোরে বিলাতে ভারতে যুগপৎ সিবিল সর্ভিস পরীক্ষা প্রচলিত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিবেন তখন আপনি আনন্দে অধীর হইয়া ধন্যবাদের জন্য সভার আয়োজন করিবেন। এ হেন লোককে আমি পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব না। যখন শর্ম্মণ সম্রাটের অতি সাধের সৈন্যবৃদ্ধির আইন রেস্‌চ্যাগ মহাসভা ভোটের জোরে ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন, তখন সম্রাট অবশ্যই সভ্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সংখ্যাধিক্যের কল্পিত ইচ্ছাচার বা অত্যাচার কল্পনা করিয়াই ইংরাজরাজ ভারতে জুরি-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই সংখ্যাধিক্যই ১৮৮৬ সালে বৃটীশ মহামন্ত্রী গ্লাডষ্টোনকে পাগল করিয়াছিল। আর ১৮৯৩ সালে সেই সর্ব্বময়ী ভোট শক্তিই আবার গ্লাডষ্টোনের কীর্ত্তিরথের শীর্ষ চূড়ার শিখর প্রদেশে—বিজয় বৈজয়ন্তী হইয়া পতপত শব্দে জগৎ সংসার নিনাদিত করিয়া উড্ডীয়মান হইতেছে। ভোটের এমনই যথেচ্ছাচার।

কাশ্মীর প্রান্তে হিমাচলের অধিত্যকা প্রদেশে দুইটি বর্ব্বর জনপদ আছে। একটির নাম “হুনজ” অপরটির নাম “নগর”। পার্লমেণ্ট মহাসভার ন্যায় এই জনপদের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য প্রজা প্রতিনিধি সভা আছে। সর্দ্দারকে সেই সভার মতানুযায়ী হইয়া চলিতে হয়। গ্রামে গ্রামে সভা, পাঁচ খানি গ্রাম লইয়া সভা, তাহার আবার প্রতিনিধি লইয়া বড় সভা—এইরূপ। সকল সভার প্রতিনিধি না আসিলে বড় সভা হয় না। বড় সভার আজ্ঞা না পাইলে সর্দ্দারেরা কোন কার্য্য করিতে পারেন না। আর বড় সভার মত ভোটের উপর নির্ভর করে। উক্ত দুই জনপদে বিপদকালে প্রায়ই কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিত—কেননা প্রায় প্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিত না অথবা বাগ্‌বিতণ্ডায় বা ভোটের গোলযোগে আসল কার্য্যের কোন যুক্তিযুক্ত মীমাংসা হইত না। এই হুনজ আর নগর জনপদেই সম্প্রতি ইংরাজরাজ আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন। কনজুত এখন বিজিত।

একজন ভাবুক ইংরাজী লেখক বলিয়াছেন যে রোমানেরা বড় লোক ছিলেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ বড় লোক ছিলেন না; কেননা তাঁহারা আহাম্মকিতার (Stupidity) কোনরূপ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতেন না। লেখকের শ্লেষোক্তির বিশ্লেষণ করিব না। এই রোমানদের সর্ব্ব কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সেনেট সভা ছিল। কিন্তু ঘোরতর বিপদের সময় ইহাঁরা আপনারা একজন করিয়া যথেচ্ছাচারী পুরুষের (Dictator) সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হস্তে অসীম ক্ষমতা প্রদান করিতেন। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেন, বাক্‌বিতণ্ডায় সময় যাইত না। ভোটের ঘূর্ণিতে পড়িয়া ঘূর্ণিপাক খাইতে হইত না।

দক্ষিণাপথের মহীশুর রাজ্য এক্ষণে হিন্দু নরপতির শাসনাধীন হইলেও ইংরাজের করদ ও মিত্র রাজ্য। মহীশুরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। এই মহীশুরে একটি পার্লমেণ্ট সভা আছে। সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে ২,৬১৬ জন লোকে ৩৩৫ জন লোককে পার্লমেণ্ট সভার সভ্য মনোনীত করিয়া থাকেন। এই পার্লমেণ্ট সভার নাম মহীশুর সমিতি (Mysore Assembly)। প্রায় দ্বাদশ বর্ষ হইল এই সভা সংগঠিত হইয়াছে। মেজর এভান্স বেল নামক একজন সহৃদয় ইংরেজ কতিপয় সহৃদয় ও মহানুভব ইংরেজের সাহায্যে এই মহাসভার সৃষ্টি করেন। বিলা’তর লর্ড সভার সভ্য সংখ্যা ৫৭০ জন হইলেও ভোট সংখ্যা ৫৫৩ মাত্র। পৃথিবীর অনেক প্রজাতন্ত্র-সমাজের প্রতিনিধি-সভার সভ্য-সংখ্যা মহীশুর সমিতির (ন্যূনাধিক) সমতুল্য হইবে। এ হেন মহাসভার কার্য্য “ভোট” দ্বারা সম্পাদিত হয় না। অথচ বিগত দ্বাদশ বর্ষ কাল মহাসভার কার্য্য সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খল রূপে চলিয়া আসিতেছে। কোন প্রকারে বিঘ্ন ঘটে নাই ও ভবিষ্যতে ঘটিবে বলিয়াও বোধ হয় না। অথচ সভার সভ্যদিগের মধ্যে খাস ইংরেজ আছেন, উকীল আছেন, কৌন্সলী আছেন, সওদাগর আছেন, জমীদার আছেন, মণি-বণিক আছেন, শিক্ষক আছেন, মিশনরী আছেন ও সংবাদ পত্রের সহিত সংশ্রব রাখেন এমন ব্যক্তিও আছেন। যে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতাবল—ভয়ে (Right of interpellation) আজ ভারতের প্রাদেশিক সুবাদারগণ ও সম্রাট মহা শঙ্কিত হইয়াছেন, আর যে ভয়ে ইংলণ্ডের তৎতৎকালীক শাসন চক্রকে চিরকালই শঙ্কায় মহা শঙ্কিত

থাকিতে হয়, যাহার বলে সভ্য জগৎ এক এক সময় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, সেই শেল সম "প্রশ্ন-প্রথা"ও এই মহা সভায় বিদ্যমান আছে। সভ্যগণ প্রশ্ন করেন আর সভাপতি রাজার দেওয়ান মহাশয় প্রশ্নের সরল সদুত্তর প্রদান করেন। মিথ্যা বাগাড়ম্বর করিয়া অর্থ বিহীন বিরক্তিকর উত্তর প্রদান করেন না। মহীশুরে প্রজার প্রতিনিধি সভা আছে কিন্তু সংখ্যার দাসত্ব নাই, কিন্তু ভোটের ইচ্ছাচার নাই। তবে দেওয়ান মহাশয়কে, পাঠক মহাশয়, চিরস্থায়ী "ডিক্‌টেটর" বলিবেন কি না বিবেচনা করুন।

আর একটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমেরিকার সমবেত সাম্রাজ্যের (ইয়ুনাইটেড ষ্টেটস্, রাজ্যের) বর্জিনিয়া প্রদেশে "লিঞ্চ" (Lynch) নামক একজন কৃষক ছিল। সে অন্যায় সহ্য করিতে পারিত না। যে লোকের ছয় বৎসর দণ্ড হওয়া উচিত যদ্যপি রাজপুরুষগণ তাহার ছয় মাস মাত্র কারাদণ্ড বিধান করিতেন তাহা হইলে লিঞ্চ দল বল লইয়া একত্র হইয়া কারাগার ভগ্ন পূর্ব্বক স্বয়ং দণ্ডার্হ ব্যক্তির দণ্ড বিধান করিতেন। লিঞ্চের নামানুসারে "লিঞ্চ-ল" অর্থাৎ লিঞ্চ আইন বলিয়া একটি কথা সৃষ্টি হইয়াছে। আজি কালি আমেরিকার সর্ব্বত্র লিঞ্চ লয়ের অভিনয় ঘন ঘন হইতেছে। যে আমেরিকা আজি বিংশতি শতাব্দীর ব্রাহ্ম মূহূর্ত্তে, এক হস্তে করণী, এক হস্তে বৈজয়ন্তী ধারণ করিয়া, রাজনৈতিক সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন, যে আমেরিকায় শৃঙ্খলা আপনা হইতে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া চলিতেছে যে আমেরিকার সমবেত সাম্রাজ্য সভ্যতা দেবীর পীঠ-মন্দির, যে আমেরিকায় স্বানুবর্ত্তিতার রামশিঙ্গা ভোঁ ভোঁ শব্দে প্রথমে আরাবিত হইয়াছিল, রাজনৈতিক সাধুগণের মধ্যে সমবেত সাম্রাজ্যের যে কংগ্রেস প্রজাশক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাণ্ডারা, সেই আমেরিকার সেই সমবেত সাম্রাজ্যের সেই পীঠ মন্দিরে, সেই সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়ে, সেই ভাণ্ডারায়—কি না শক্তিময়ী শাক্তরূপিণী ছিন্নমস্তা লিঞ্চ ল ইচ্ছা-সুরা পানে মাতোয়ারা হইয়া তা থৈ তা থৈ নৃত্য করিতেছে?—কাহারও নিবারণ করিবার ক্ষমতা নাই? নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণেও রাজনৈতিক রাজর্ষিগণের মস্তিষ্ক বিকল! সমস্ত জগৎ চিত্রার্পিতের ন্যায় বিহ্বল হইয়া অনিমেষ লোচনে উন্মাদের মত বিকৃত দৃষ্টিতে কেবল লিঞ্চ লয়ের সয়ম্বর

পরিলক্ষ করিতেছে! জগৎ ইহা অপেক্ষা ইচ্ছাচারের আর কি বীভৎস দৃষ্টি দেখাইবে?

পাঠক মহাশয় যথেচ্ছাচার ভাল কি মন্দ আপনি বিচার করুন। ভোট ব্যতিরেকে জগৎ সংসার চালাইবার অন্য কোন উপায় আছে কি না আপনি চিন্তা করুন। সভ্য জগৎ সেটা গ্রহণ করিবেন কি না তাহাও চিন্তা করিবেন। আমি ব্যাধি দেখাইয়া দিলাম বলিয়া আমাকে ঔষধি দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

এক রজনী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সোপানতলে বাসন্তী যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, রমেন্দ্র সেই খানে আসিয়া দাঁড়াইল। কেহ কাহারও সহিত কথা কহিল না। উভয়ের হৃদয় মধ্যে যে বিষম ঝটিকা বহিতে ছিল উহাতেই আচ্ছন্ন রহিল। চাঁদের আভায় সরস্বতীর জল অল্প অল্প ঝিক্ ঝিক্ করিতেছিল, রমেন্দ্র সেই দিক চাহিয়া রহিল। বাসন্তী অঞ্চলের প্রান্তভাগ দ্বারা আপনার সুগঠিত অঙ্গুলি একবার বেষ্টন করিতেছিল, আবার মোচন করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে বাসন্তীর নয়নে অশ্রু দেখা দিল, গণ্ড বহিয়া ক্রমে ক্রমে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। রমেন্দ্র তাহা দেখিতে পাইল। শশব্যস্ত হইয়া বাসন্তীর হস্ত ধরিয়া বলিল—বসন, ওকি! ওকি! কাঁদিতেছ কেন? চল বাটী ফিরিয়া চল।

বাসন্তী অঞ্চল দিয়া অশ্রু মুছিল এবং অতি দীন কৃপাপ্রার্থী নয়নে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল—স্বামিন্! কেন তোমাকে লুকাইয়া এহেন দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম! কেন আপনার বুদ্ধির প্রতি এতাধিক বিশ্বাস করিয়া এমন বিপদ ঘটাইয়াছিলাম। ছি! ছি! স্ত্রীবুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র। আমার এই অপরাধ কি মার্জ্জনা করিবে?" রমেন্দ্র বলিল "তুমি এমন কাজ কেন করিলে? যেখানে দিনে অনেক প্রকার দুষ্ক্রিয়া হয়, সেখানে তুমি রাত্রে আমাকে না বলিয়া, সঙ্গে যথেষ্ট লোক না লইয়া কেন গিয়াছিলে?"

বাসন্তী একটু থামিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া বলিতে লাগিল—স্বামিন! রমণীর হৃদয় সহজেই ভীরু,সহজেই বিপদের আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠে। যে দিন শুনিলাম গুরুদেব ও তুমি ফিরিঙ্গিদের সহিত গোপনে সন্ধি করিতেছ, যে দিন জানিলাম তোমরা প্রভু ও আশ্রিতের ধ্বংসে আত্ম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে বদ্ধপরিকর, সেই দিন হইতেই আমার হৃদয় যেন এক ভাবী বিপদ আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। হৃদয়ের শান্তি গেল, সর্ব্বদাই চিন্তা—তোমাকে কিরূপে বিরত করি। তোমাকে এক দিন অনুনয় করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বলিতে পারি নাই। শেষে স্থির করিলাম সন্ন্যাসী ঠাকুরের দ্বারা এ কার্য্য সিদ্ধি করিব। তাই লুকাইয়া গিয়াছিলাম। স্বামিন্ যাহাতে তোমার বিপদ সম্ভাবনা আছে তাহার প্রতিকারে আপনার বিপদের কথা কি মনে স্থান পায়?

তার পর বাসন্তী একটু থামিয়া একটু চোক্ মেলিয়া আবার বলিল—ফিরিঙ্গিদের সহিত সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেল, আমার মাথা খাও। আমার বড়ই ভয় হইতেছে যেন মনের মধ্যে কি হু হু করিতেছে। ছাই পদে! কাজ কি তোমার রাজা হইয়া।

রমেন্দ্র একটু লজ্জিত হইল, একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল ইহা কি কেবল স্বার্থের জন্য? স্বাধীনতা লাভ কি বাঞ্ছনীয় নয়?

বাসন্তী। ঠিক আমি ঐ কথাটি বুঝিতে পারিলাম না। ফিরিঙ্গিদের উপর এত বিশ্বাস কিসে?

রমেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল—তাহারা ফিরিঙ্গির অধীনে না গেলে তাহাদিগকে আর ভয় কি? কিন্তু সে যাই হউক, এখন ত উপায়ান্তর নাই। আর অদ্যকার ঘটনায়, সকল পথ বন্ধ হইয়াছে। অদ্যকার ঘটনা হইতে ওমরার সহিত আমার চিরশত্রুতা আরম্ভ হইল। একজন থাকিতে অপরের শুভ নাই।”

চারি ধারে গভীর আঁধারে ঘিরিয়া ফেলিল। বাসন্তীর হৃদয় মধ্যে যেটুকু আশার আলোক জ্বলিতেছিল, সেই আঁধারে নিবিয়া গেল। যখন মনে হইল যে নিজ বুদ্ধিতেই এইরূপ ঘটিয়াছে তখন তার মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইল। বাসন্তী কাঁদিয়া ফেলিল। রমেন্দ্র পত্নীর অশ্রু মুছিয়া দিতে দিতে বলিল—বসন! ভবিষ্য তোমার আমার হাত ধরা নয়।

যাহা ঘটিবার তাহা বিধিচক্রে ঘটিবেই ঘটিবে। এখন চল গৃহে যাই। নিশ্চিন্ত থাকিবার এ সময় নয়।

রজনী গম্ভীরা, ম্লান, চন্দ্র কিরণে ঈষৎ উজ্জ্বল। রমেন্দ্র বাসন্তীর হস্ত ধরিয়া, বাসন্তী স্বামীর স্কন্ধে দেহভার দিয়া, উভয়েই ধীরে ধীরে সোপানাবলি একে একে অতিক্রম করিয়া নামিতেছিল। সহসা হুম্ হুম্ করিয়া বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল। শব্দ শুনিয়া উভয়েই চমকিয়া উঠিল, ফিরিয়া সর্ব্বোচ্চ সোপানে আসিয়া যে দিক হইতে শব্দ আসিয়াছে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল,দুর্গের নিম্নে নদীর উপরে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে আবৃত খান কয়েক ছিপ ভাসিতেছে। দেখিবা মাত্র ব্যাপার কি বুঝিতে বাকি রহিল না। ফিরিঙ্গি দস্যু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নগর আক্রমণ করিয়াছে। রমেন্দ্র বাসন্তীর প্রতি চাহিয়া বলিল, চল তোমাকে অগ্রে গৃহে রাখিয়া আসি। মা কালী যা করেন তাই হইবে।

আবার হুম্ হুম্ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। বাসন্তী স্বামীর কণ্ঠ ধরিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি উপায়! নগর রক্ষার কি হইবে? রমেন্দ্র বলিল—দেখি আমি যাইয়া কতদূর কি করিতে পারি।

বাসন্তী। তুমি যাবে? তুমি কেন যাবে? দুর্গসিংহ ত আছে?

রমেন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলিল, বাঙ্গালার চাউল খাইয়া কি রাজপুত রমণীর গৌরব ভুলিলে?

এই মিষ্ট ভর্ৎসনার কঠোরতা বাসন্তীর মর্ম্মস্থল স্পর্শিল। মুহূর্ত্তে রাজপুতকুল-গর্ব্ব, লজ্জায় আরক্তিম বদনে ফিরিয়া আসিল। বাসন্তী স্থির স্বরে কহিল—বাসন্তীর মাতা সহমরণে গিয়াছিল—আমরা মরিতে ভয় করি না, কিন্তু স্বামীর অমঙ্গলের ভয় করি। রমেন্দ্র বাসন্তীকে গৃহে রাখিয়া আসিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বাসন্তী যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় অগত্যা তাহাকে তথায় রাখিয়া দুর্গের দিকে ধাবিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আকাশের চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু নগরের চতুর্দ্দিকে ও সর্ব্ব স্থানে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। মুসলমানের পরাজয় হইয়াছে, ফিরিঙ্গির কামানে রমেন্দ্রের সৈন্য কদলীবৃক্ষবৎ শায়িত হইয়াছে। অবশিষ্ট সৈন্য ছত্রভঙ্গ

হইয়া পলাইয়াছে, পলাইবার সময় যেখানে হিন্দুর আবাস দেখিয়াছে, সেই খানেই অগ্নি প্রদান করিয়াছে। অন্য পক্ষে জয়োল্লাসে মত্ত ফিরিঙ্গিরাও বড় বড় ধনী হিন্দু মুসলমানের কুঠী লুণ্ঠন করিয়া অগ্নি দিয়াছে। কাজেই সমস্ত নগর অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে।

বাসন্তী তখনও সেই সোপানে দাঁড়াইয়া—নিস্তব্ধ নিস্পন্দ। দুর্গে যে অগ্নি শিখা গর্জ্জিতে ছিল, তাহাই দেখিতেছিল। চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ ও কোলাহল। চিন্তায় নিমগ্ন—সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সহসা কর্ণে মনুষ্যস্বর গেল,—"মা এখনও এখানে!"

বাসন্তী ফিরিয়া দেখিল, সেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী বলিল, মা আমার সহিত এস, এস্থান বড় নিরাপদ নয়!

বাসন্তী ব্যগ্র হইয়া বলিল—ঠাকুর, স্বামীর কথা আগে বল।

তোমার স্বামীই আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি মন্দিরে আছেন।

বাসন্তী। ঠাকুর স্বামীর চরণে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন বাসন্তীর দেহ ম্লেচ্ছ দস্যু কর্ত্তৃক স্পর্শিত হইয়া অপবিত্র হইয়াছে, সে সেই কলুষিত দেহ ত্যাগ করিয়াছে।

সন্ন্যাসী। ছি মা! সে কি কথা!—

সন্ন্যাসীর মুখের কথা মুখে রহিল।

'বাসন্তী! বাসন্তী'!—"স্বামিন্ স্বামিন্"! মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ না হইতে হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে পতি পত্নীতে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইল। ঘটনার বৈচিত্রে বাসন্তীর হৃদয় ধৈর্য্য চ্যুত হইয়াছিল, সহসা স্বামী সাক্ষাতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বাসন্তী মূর্চ্ছিত হইল। সময় নাই, শত্রুর কোলাহল অতি নিকটবর্ত্তী। রমেন্দ্র হতচেতন বাসন্তীকে স্কন্ধে লইয়া সন্ন্যাসী প্রদর্শিত পথে চলিল।

* * * * *

সেই সরস্বতী গিয়াছে, সেই কালীগঞ্জ গিয়াছে, ফিরিঙ্গি পর্ত্তুগীজও গিয়াছে। আছে কেবল বাসন্তীর ছায়া। পাঠক! আছে কি?

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ।

শিহ্লন মিশ্র শান্তি শতক লিখিতে বসিয়া বলিয়াছেন।

নমস্যামো দেবাননু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ!
বিধির্বন্দ্যঃ—সোঽপি প্রতি নিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তম্,—কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা,
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি নযেভ্যঃ প্রভবতি॥

অদৃষ্টবাদীর বিশ্বাস স্তম্ভে এ মহা কুঠারাঘাত। মানবই হউন কিম্বা দেবতাই হউন কর্ম্মের বিশাল ক্ষেত্রে যিনি যে বীজ রোপণ করিবেন, সাধনার মহারণ্যে যে ফুল যে ফল চয়ন করিবেন তাহার ফলে তাঁহাকে সুখ বা দুঃখ, মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব অথবা পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু নিবৃত্তির পথাবলম্বীর পথ প্রবৃত্তির পথ হইতে বিভিন্ন; হিন্দুর স্বভাব ও শিক্ষার সমষ্টি কেবল নিবৃত্তি পথে। ইংরাজেরচেষ্টা সংসারক্ষেত্রে মহাসংগ্রাম—কেবল প্রবৃত্তি লইয়া। এ উভয়ের তুলনা অত্যন্ত অযথা, বস্তুতঃ তুলনা করিতে বসিলে লক্ষ্যশূন্য হইতে হয়। এবং লক্ষশূন্য তুলনা কেবল প্রমত্ত প্রলাপ ব্যতীত কিছুই নহে। ইংলণ্ড ও ইংরাজ, রোমান শিক্ষার, ও স্যাক্সন স্বভাবের, যুগান্তরগত ফল মাত্র। রোম যখন দিগ্বিজয়ী, সীজর যখন ভীতি ও বিশ্বাসের কেন্দ্র স্বরূপ, তখন ইংরাজ বীজনিহিত মহা তরুর অঙ্কুর মাত্র। জর্ম্মনির বন্য-পশু সদৃশ জাতিত্রয় যখন রোমের কীর্ত্তি কলাপ চূর্ণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রবেশ করিল, তখন কেবল পশুত্ব ও দেবত্বে সংগ্রাম, বাহুবলের সহিত শিক্ষা বলের বিরোধ হইল। ইংলণ্ড কেন, রোমের অভ্যন্তরেই সে সংগ্রাম চলিয়াছিল। রোম সাম্রাজ্যের প্রতি অঙ্গ তাহাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। রোমে সীজর পরাভূত হইয়া পোপ জয়ী হইলেন, দেহ নষ্ট হইয়া মনের বিকাশ হইল। ফ্রান্সে রোম এবং জর্ম্মণি উভয়েই পরাভূত হইয়া নূতন শক্তির সৃষ্টি হইল, নূতন বল বুদ্ধির বিকাশের পূর্ব্বেই, বিলাসের তরঙ্গ ধীরে ধীরে, সাগর—পথগামিনী তটিনীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে ক্ষুদ্র বীচি সদৃশ হিল্লোল্লে একটু একটু করিয়া প্রবাহিত হইল। জর্ম্মণিতে জর্ম্মণ নূতন শিক্ষা লাভ করিয়া অতীতের পথভ্রষ্ট হইয়া, পুনরায় নব প্রসূত

শিশুর ন্যায় একটু একটু করিয়া চাহিতে লাগিলেন; শীতান্তে মহাদ্রুম একটু একটু করিয়া পল্লবিত হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে উভয়বিধ স্রোতই একত্রিত হইল; গঙ্গা যমুনার সঙ্গম হইল; শ্রীভ্রষ্ট রোমের শ্রী ক্রমশঃ প্রফুল্ল হইতে লাগিল, এবং তাহার সহিত জর্ম্মণ উপাদান মিলিত হইয়া ক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ হইল। আর এদেশে? কত সময়ে কত কি হইয়াছে কি করিয়া নিশ্চয় করিব। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত নূতন কথা, নূতন ইতিহাস আবিষ্কার করিতে বসিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক রহস্য ইংরাজ লিখিত আর্য্য ইতিহাস হইতে অনেক বিভিন্ন, অনেক নূতন। সেই বেদাগ্র সময় হইতে ব্রাহ্মণ বলবান। কিন্তু সে বল কি দৈহিক? সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে কোন মহা বিরোধান্তে, কোন মহা সংগ্রামান্তে ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় স্বীয় রাজকীয় ভার ক্ষত্রিয় হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং কেবল যজন ও যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং তাহার অঙ্গ স্বরূপ মন্ত্রণা ও বিধানের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পরশুরাম বারম্বার ক্ষত্রিয়দিগকে বাহুবলে পরাজয় করেন। এ ইতিহাস নহে, অথচ এ সংস্কার এদেশে এত বদ্ধমূল যে ইহার মূলে কোন না কোন সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। ইহাতে কবিত্বের কণা নাই; ইহাতে অমানুষকীর্ত্তির যে ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে তাহার নিরবধান অন্তরালে সত্যের আলোক লক্ষিত হয়! পৌরাণিক পরশুরাম একজন ব্যক্তি না হইতে পারেন। অথবা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে কলহ একাধিক বারও না হইতে পারে। তবে ব্রাহ্মণ যে মানসিক প্রাধান্য উপভোগ করিতেন এবং যাহাতে অদ্যাবধি তিনি জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জীব, সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ শিখর, সংসারের এক মাত্র কর্ণধার রূপে আদৃত, পূজিত নমস্কৃত হইয়া আসিতেছেন, তাহা কখনই বাহুবল ব্যতীত ক্ষত্রিয় হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। পক্ষান্তরে বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব, শঙ্করাচার্য্যের মহা কৌশল, এ উভয়ই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরে কলহ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ব্রাহ্মণ গৃহস্থ আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ করিলেন অথচ স্বয়ং গৃহত্যাগী হইলেন। শাক্য মুণি সকলকেই গৃহ ত্যাগ করিতে বলিয়া বসিলেন। পুরাতন কথা, যুগ যুগান্তর স্থিত ঘটনা পরিহার পূর্ব্বক দেখ, সেদিন চৈতন্য কি করিলেন। সখ্য, দাস্য ও বাৎসল্যের অন্তর্নিহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে, ত্যাগ ও ভিক্ষাই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গণনা করিলেন। ব্রাহ্মণের বৈদিক ধর্ম্ম, শাক্য মুণির বৌদ্ধ

ধর্ম্ম, শঙ্করাচার্য্যের উভয়বিধ ধর্ম্মের সমন্বয় এবং চৈতন্যের উপত্যকাচ্ছাদন শ্যামল তৃণরাজির সমষ্টি সদৃশ ললিত অথচ ধূলাবলুণ্ঠিত, মধুর অথচ চির বৈরাগ্য মূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম, এক মাত্র নিবৃত্তি পথে প্রধাবিত।

"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহা ফলা।"

এই উক্তি বেদান্ত মতাবলম্বীর। বেদান্ত প্রকারান্তরে নাস্তিক। কিন্তু সেই নাস্তিকের কঠোর ভাবে, সেই নীরস উপল খণ্ডের কঠোর ভাবেও নিবৃত্তির সুশীতল ছায়া পড়িয়াছে, মহা চিত্র একটু মাত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এ দেশে সমস্তই নিবৃত্তি মূলক।

খৃষ্টীয়ানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল বলিলেন;—

Do to others as you would be done by.

তোমারা পরের প্রতি এইরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হও যে পরে তোমার প্রতি সে আচরণ করিলে তুমি তুষ্ট হইবে। আত্ম সুখ, আত্ম বাসনা কেন্দ্রস্থল করিয়া পরের প্রতি আচরণের ইতর বিশেষ করিও। আপনার প্রবৃত্তিই পর প্রবৃত্তির পরিমাণ। যদি ধর্ম্ম গ্রন্থই এই উপদেশ দিল তবে কোথায় যাইব? আপনি কে? আমি কে? অনন্ত ভবিষ্যৎ অনন্ত অতীতের মধ্যস্থলে বর্ত্তমান যেমন অলক্ষণীয় কণা মাত্র, অনন্ত সংসারে আমিও তেমনি। আমি সংসারের নিমিত্ত—সংসার আমার নিমিত্ত নহে।

ইংরাজ এ কথা বুঝেন না; অথবা বুঝিয়াও অর্থ বিকৃত করিবেন। আমরাও ইংরাজীর বুক্নি দিয়া বেড়াই; ইংরাজের দোহাই দিয়া সব কাজ করি, যে কাজ ইংরাজ হইতে বিভিন্ন তাহাতেও ইংরাজি প্রথা অবলম্বন করি, কাজেই এই বস্তুকীর্ত্তি—প্রধান সময়ে—এই Materialism এর মধ্যস্থলে, সনাতন ধর্ম্ম, সনাতন শিক্ষা, সনাতন চেষ্টা, সনাতন স্বভাব বুঝিতে আমাদিগের আয়াস প্রয়োজন। আগে নিজের কথা বুঝ, তবে পরের কথা, এবং নিজ ও পরে তুলনার সমস্যায় প্রবেশ করিও। নিজের কথা কিরূপে বুঝিবে? হিন্দুর মত করিয়া? সে তোমার আমার পক্ষে অসম্ভব। ইংরাজের মতন করিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। আকাশের চাঁদ ধরিতে পারিব না, কাজেই গ্যাসের আলো জ্বালিতে হইবে। ঢাকাই ধুতি কিনিবার অর্থ নাই—কাজেই ছয় সাত আনা দিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ই কিনিতে হইতেছে, উলঙ্গ থাকিলে চলে না। কিন্তু কি বুঝিব, এদেশের কথা এক

কথায় হইবে না। ভাগ করিয়া না লইলে চিন্তার গতিরোধ হয়, কেবল কথার স্রোতে পড়িয়া অবশ হইয়া ক্রমশঃ ডুবিয়া মরিতে হয়, বংশবনে দিগ্‌ভ্রান্ত ডোমের মতন, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া থাকিতে হয়।

প্রকৃতি, বিধান ও উদ্দেশ্য লইয়াই জীবন। পক্ষান্তরে জনসমষ্টির জীবন ও জীবনের প্রকৃতিগত, বিধানগত, উদ্দেশ্যগত সমষ্টির ব্যষ্টিও পর্য্যালোচনা না হইলে জাতীয় ভাব ও জাতীয় প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা নাই। হিন্দু শব্দ যাবনিক, বস্তুতঃ অর্থহীন। যাঁহাদিগকে বিদেশবাসী "হিন্দু" পদবাচ্য করেন তাঁহারা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী। এই সনাতন ধর্ম্ম একটী ধর্ম্ম নহে। ইহা বহু ধর্ম্মের সমন্বয়। আবার ধর্ম্ম শব্দের অর্থও বিকৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয়ান, ধর্ম্ম অর্থে Religion বুঝেন। এই Religion কি বস্তু তাহা ভারতবাসীর জ্ঞানাতীত। নাস্তিকতা Religion নহে। আবার মহা পাষণ্ড জেস্থট্, Religious চূড়ামণি! আমাদের নিকট খৃষ্টীয়ান, মুসলমান বিধর্ম্মী বটে, কিন্তু Religious হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। Religion বিশ্বাসগত। ধর্ম্ম নিষ্ঠাগত। অতএব ভারতবর্ষে "এতগুলি ধর্ম্ম আছে" এরূপ কথা অর্থশূন্য। এই Religion এবং ধর্ম্মের বিভিন্ন অর্থ, বিভিন্ন ভাব হেতু অনেক অনর্থ ঘটিতেছে, অনেক ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে। ইংরাজ বুঝেন Religion অর্থাৎ Faith, হিন্দু বুঝেন—ধর্ম্ম অর্থাৎ নিষ্ঠা।

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন। সনাতন ধর্ম্মের আচার প্রভৃতি পঞ্চ অঙ্গই এদেশের প্রকৃতির মূল ;—ইহাতে realistic, materialistic, idealistic, কিম্বা spiritualistic কিছু মাত্র নাই। ইহা স্বতন্ত্র—প্রকৃতি, বিধান, উদ্দেশ্য তিন দিকেই স্বতন্ত্র—ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক লোকের জীবনে, সমষ্টি ভাবে জাতীয় জীবনে উভয়েই স্বতন্ত্র। জাতীয় জীবনের তিনটি অবস্থা আছে। নরজীবনে যেমন শৈশব হইতে যৌবন এবং যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য, স্থানাৎস্থানং—পদবি হইতে পদবি—জাতি-জীবনেও সেইরূপ কোলাহলময় প্রথম পদবি, বিগ্রহ প্রধান ; দ্বিতীয় পদবি বিগ্রহান্তে রক্ষণ প্রধান ; বিগ্রহ ও রক্ষণ উভয়ই বাহুবলও সংগ্রামাভিমুখ-প্রস্থিত ; কিন্তু বাহুবলের এ লক্ষ্য অধিক দিন থাকা সম্ভব নহে। মানব যেমন প্রৌঢ়াবস্থায় সাম্য অবলম্বন করেন, নরসমষ্টিও সেইরূপ সংগ্রামান্তে শান্তমূর্ত্তি হইয়া সাম্য প্রধান পদবিতে আরোহণ করে ; বিগ্রহ ও শান্তি দুইটী, জীবনের দুই প্রান্তস্থিত। পরের দেখিলে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব এই চেষ্টা ক্রমশঃ স্বকীয় আয়ত্তাধীন উপাদান হইতে, স্বকীয় ও পরকীয় মঙ্গল কামনায় নূতন বস্তু উৎপাদনের চেষ্টারূপে পরিণত হয়। এই উভয়বিধ চেষ্টার মধ্যস্থলে, আর্হিত বস্তুর রক্ষণ চেষ্টা আইসে। চেষ্টার এই ত্রিবিধ অঙ্গ। এদেশে চেষ্টার এই ত্রিবিধ অঙ্গের শেষ অঙ্গই লক্ষিত হয়। প্রথম অঙ্গ, ক্ষত্রিয়ের প্রাদুর্ভাব, ব্রাহ্মণের বাহুবল এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে বিরোধ হইতেই লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় চেষ্টার বিকাশ হইবার পূর্ব্বেই যবন পরাভূত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে তৃতীয় চেষ্টা বিকশিত হইতেছে। বিজীতদেশে জাতীয়জীবনের বিকাশ দুরূহ। এবং বাহুবল সংসৃষ্ট চেষ্টা একেবারে অসম্ভব। এবং অকালার্জ্জিত সাম্যও অবশ্য ধীরগতি হইবে। ফলতঃ আমাদিগের সাম্য আসিয়াছে। বহুকাল হইতে আমরা শান্ত হইয়া কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে নিরত রহিয়াছি। তবুও তাহার সম্যক্ উন্নতি হইল না। যতদূর উন্নতি হইয়াছে তাহাই আশ্চর্য্য। গাঢ় ছায়ার তমসায় তৃণ পর্য্যন্ত মরিয়া যায়। আমরা যে বাঁচিয়া আছি এই আশ্চর্য্য।

চেষ্টা দৈহিক বৃত্তি। চেষ্টার যেরূপ ত্রিবিধ অঙ্গ, মানসিক বৃত্তিরও সেইরূপ। কল্পনা ও সত্যে এবং এই উভয়ের মধ্যস্থিত সত্যাধিকৃত কল্পনা—মনোবৃত্তির তিন রূপান্তর। সত্যই বল, কল্পনাই বল, সকলই আংশিক সত্য। Absolute Truth লইয়া বহুকাল ধরিয়া অনেক কলহ হইয়াছে। পণ্ডিতে পণ্ডিতে কলহ অনেক সময়ে মূর্খের হাস্যদ্দীপক হইয়া থাকে। এ কেবল তৈল এবং পাত্র সম্বন্ধে আধার নির্ণয়রূপ। বস্তুতঃ সাধারণ কার্য্য ও চিন্তার পক্ষে, সত্য মিথ্যা কেবল তুলনা সম্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিলেই কাষ চলিয়া যাইবে। কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু এই সত্যের মূল তথ্য লইয়া মহা বিতণ্ডা উপস্থিত করেন। এরূপ বিতণ্ডায় লোকের বিশেষ জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না, ইহার আবর্ত্তে আবর্ত্তে পাণ্ডিত্যের হরিলুট চলে, কঠিন ধরণী স্পর্শে তাহা চূর্ণ হইয়া যায়, যে তাহার কণা মাত্র খুঁজিয়া লইতে পারে, সেই ধন্য, নতুবা যে "ধরণীর ধূলো নিয়ে আছি" তাহারই সহিত সমস্ত মিশিয়া যায়। "পলে পলে মরি সেও ভাল" তবু এরূপ নিরর্থক তর্কে অবতীর্ণ হইতে রাজি নহি। সকল কল্পনার মূলেই সত্যের ছায়া আছে। আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ভেদে

কল্পনা ও সত্য উপলব্ধি হয়—এ কথা বলিলে বোধ হয় কেহ বিরোধী হইবেন না। সত্যের ও অসত্যের সীমা কেহ দাগ দিয়া দেখাইতে পারেন না। যাহা একান্ত অসত্য তাহা দেখিলেই বলা যায় অসত্য। যে সত্যে বিতণ্ডা নাই, তাহা নির্বিরোধে সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই দুইএর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। আমি লিখিতেছি ইহা সত্য। আমার লেখনী গান করিতেছে—ইহা সত্য না অসত্য ? কবি কহিবেন সত্য সত্যই লেখনী গান করিতেছে। তাঁহার পক্ষে গান শ্রুত নহে—অনুভূত। গানে সুর তাল প্রভৃতির আবশ্যকতা নাই, কোন মনোবৃত্তির উদ্দীপন হইলেই হইল। তুমি বিস্মিত হইও না—লেখনী গাহিতেছে শুনিয়া হাসিও না। আমার লেখনী প্রসূত এই হাবড়হাটি মহা সুখদায়ক সঙ্গীত নহে এ কথা বলিও না, কেননা কবিকুল মহা ক্রুদ্ধ হইবেন। আজ কাল কবিকুলের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী ; তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

দৈহিক ও মানসিক উভয় বৃত্তির কেন্দ্রস্থলে অন্তরের কোমলতা, হৃদয়ের নন্দন কানন, সংসারের সুখগ্রন্থিরূপে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য অবস্থিত। জীবের জন্ম প্রকৃতির এক মহালীলা। এক দেহ এক মন একান্তর হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে দুইটী স্বতন্ত্র জীব উদ্ভূত হইল সেই স্বাতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দুইটী কোমল প্রবৃত্তিও মানব হৃদয়ে যুগপৎ উদ্ভূত হইল। জননী হৃদয়ে বাৎসল্য। শিশু হৃদয়ে একান্ত দাস্য। কোমলতার প্রধান পদবী দাস্য, শেষ প্রান্ত বাৎসল্য। দুর্ব্বল দেহে, শিশুর বুকে—পরমুখ নিরীক্ষণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। পূর্ণাবয়বে পূর্ণ হৃদয়ে মহাদ্রুমবৎ নরনারী বক্ষে কোমলতা ক্ষুদ্র লতিকা সহস্রের অবলম্বন হইল। এই উভয় স্থলে ঊর্দ্ধ অধঃ সম্বন্ধ। সখ্য সমসম্বন্ধ প্রসূত। যে কোমলতা শিশু হৃদয়ে দাস্য ও জননী হৃদয়ে বাৎসল্য, তাহাই স্ত্রী, পুরুষ, ভ্রাতা, জননী, প্রভৃতিতেসম-সম্বন্ধে সখ্যরূপে পরিণত হয়।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এ বৈষ্ণবী বুলি। ইহা ইংরাজির অনুবাদ নহে বলিয়া অনেকের পছন্দ না হইতে পারে। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি যে আগে নিজের কথা, তবে পরের কথা। যখন নিজের অর্থে কুল পাইব না, তখন ভিক্ষা করিব। আমরা যুগান্তর হইতে ভিক্ষাই শিখিয়াছি। ভিক্ষা করিতে আয়াসের প্রয়োজন নাই, সেটা ত ব্রহ্ম অস্ত্র আছেই। তবে সে ভাণ্ডার পূর্ণ রাখিয়া অন্য উপায়ে যতদূর চালাইতে পারি,—তাই বৈষ্ণবী কথা লইয়াছি।

(ক্রমশঃ)

বাঁশী।

যামিনী জাগিয়া,   মেঝেতে পড়িয়া,
    ঘুমে আলু থালু থাকি,
না পোহাতে রাতি——না নিভিতে বাতি,
    বাঁশী করে ডাকাডাকি।
বলে, 'গা মা সা রি,———রাজার ঝিয়ারী,
    গৃহকর্ম্মে অবহেলা ?
গা তোলো গা তোলো,   বাঁধহ কুন্তলো,
    হের দেখি কত বেলা !'
ধড়মড়ি উঠি,   বাহিরেতে ছুটি ;
    ননদী পাইয়া সাড়া—
বলে, 'রজনী থাকিতে,   কি লাগিল চিতে,
    কিসের লাগিয়া তাড়া ?'
বাঁশী, 'আলোলো আলোলো',   হাসে খল খল,
    আমি ত লাজেতে মরি।
বাঁশী করে আরো,   সুরের বিস্তার,
    হরি হরি হরি হরি !

(২)

প্রভাত উজালা,   চৌদিকে আলা,
    আঙিনা মার্জ্জনা করি।
বাঁশী, বলে 'উহু ! উহু !   মারিল রে বহু'
    মার্জ্জনী আঘাতে মরি।'
ফেলিয়া বাঢ়ন,   লই যে তখন,
    গোময়-লেপনী হাতে।
'ছি ছি।' বলে বাঁশী,   করে যে উদাসী,
    ঘিঘনি পড়য়ে তাতে॥
হাত পা ধুইতে,   যমুনা যাইতে,
    বাঁশী দেয় টিটিকারী।
বলে 'কলঙ্কের কালি,   ঘুচাবে কচালি,
    মনেতে করেছ প্যারী ?'
শুনিয়া কলঙ্ক,   হইনু সশঙ্ক,
    ইতি উতি আমি চাই।

সেই সেই বাঁশী,   বলে হাসি হাসি,
'ভয় নাই, ভয় নাই॥'

(৩)

গো-শালা অঙ্গনে,   গো-ধন দোহনে,
ননদীর সনে থাকি,
ছাঁদিয়া গাভীরে,   বসি ধীরে ধীরে ;
বাছুরী সরায়ে রাখি ;
পয়স কলস,   ধরিতে অবশ,
'বাঁশরী করিল মানা ;
'গাভীর সন্ততি   করিয়া বঞ্চতি,
খাবে সর ননী ছানা ?'
শুনিয়া হাসিনু,   কলস চাপিনু,
দুহাতে দোহন করি,
রব—ঘর ঘর,   ফেণ—থর থর,
কলস আসিল ভরি ॥
'পড়িল পড়িল'   বাঁশরী হাঁকিল,
চমকি উঠিনু হাম।
পড়িল কলস,   পড়িল পয়স,
ননদী ভেইল বাম।

(৪)

বাঁশরী আমায়,   কেন যে জ্বলায়,
কিছুই বুঝিতে নারি।
যখন তখন,   করে জ্বলাতন,
হাসি দেয় টিটকারি ॥
জ্বলিয়া জ্বালাতে,   পরাণ জুড়াতে,
কালিন্দী সিনানে যাই—
বাঁশী তানে তানে,   বলে কাণে কাণে,
'সঙ্গে যাব আমি রাই' ॥
ওমা—কে যাবে গো সঙ্গে,   মরি যে আতঙ্গে,
পরাণ-পুতলী দুলে ;
লইয়া কলসী,   ডাকিয়া পড়সী,
যাই যমুনার কূলে ॥
যমুনায় টান,   বহিছে উজান,
তরু হেলে বিনা বায়

জলের উপরি,   স্বরের লহরী,
তর তর ভাসি যায় ॥

(৫)

তীরে, বংশী-বটে,———সেই বংশী বটে,—
উগরে সুধার বিষ্।
'সা রি গা মা পা ধা,   নি সা—রাধা রাধা,
বুঝিয়া পরাণ দিস্॥'
মিলি সহচরী,   করি ধরাধরি,—
জলেতে নামিনু যাই।
আঁধার আধার,   হলো চারি ধার,
শুধু রব 'রাই রাই' ॥
আঁধার মাঝারে,   মাণিক উজারে,
নয়ন ঝলসি যায়।
নাহি দেখি অঙ্গ,   নাহি দেখি রঙ্গ,
ফুকারে বাঁশরী তায়।
বলে,   'আয় আয় আয়,   আয় যমুনায়,
মজিলে, মজিবে মন।
এবার কিশোরী,   বুঝিবে বাঁশরী,
কেন করে জ্বলাতন॥'

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

গান।

(কোরক-গীতি।)

(সুরট মল্লার)

(আমি)   ফুট্‌বো কেমন করে !
(আমার) ছড়িয়ে পড়ে পাপ্‌ড়িগুলো লাজে যাই ম'রে !
যে আলো রয়েচে চেয়ে—যে তরু রয়েচে ছেয়ে
এখনি কে দেখবে চেয়ে অমনি যা'ব ঝরে !
পরাগ্ গুলো গড়িয়ে পড়ে, শরীর আমার কেমন করে,
পাতা লো তোর পায়ে পড়ি, দেনালো ঝেরে !
ভ্রমর গুলো বেড়ায় টলে, এখনি কে পড়্‌বে ঢলে,
ভয়ে মলাম কেউ তোরা গো, বুজিয়া দেনা মোরে !
আমি চিরদিন থাক্‌বো কলি, মর্‌বো না এ জ্বালায় জ্বলি,
ফুট্‌তে গিয়ে গেল্যাম যে গো ভয়ে আমি ম'রে !

শারদীয়া দুর্গোৎসব।

শারদীয়া দুর্গোৎসব আগত প্রায়। এই মহোৎসব একটি মহাজাগ। শ্রীমদ্ভাগতোক্ত পুরঞ্জন উপাখ্যান, ভবাটবী প্রভৃতি যাহারা নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে পৌরাণিক অনেক ব্যাপারের অবস্থান ভূমি রূপক। দুর্গাপ্রতিমাকে আমার চক্ষু একটি সুন্দর রূপক রূপে পরিগ্রহ করে। এই রূপক ভাঙ্গিয়া তদন্তর্গত গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বটি বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

দুর্গা প্রতিমা দেবী ভগবতী সিংহারূঢ়া, মহিষাসুরকে বধ করিতেছেন। দক্ষিণে ধনদাত্রী লক্ষ্মী দেবী এবং তাঁহার দক্ষিণে বেদাদির আধার গণপতি। বামে বাগ্দেবী সরস্বতী এবং তাঁহার বামে সৌন্দর্য্যের প্রতিকৃতি ময়ূরাসন কার্ত্তিকেয়। দেবীর ঠিক মাথার উপর “চালে” সদানন্দ মহেশ্বর শিব।

সিংহ পশুরাজ এবং শারীরিক বলে প্রাণী মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবী ভগবতী আদ্যাশক্তি জগতীয় সকল শক্তির মূল এবং আধার। দেবী ভগবতী সিংহ পৃষ্ঠে পদদ্বয় রক্ষা করিয়া তাহাকে আপন বশে রাখিয়াছেন। মানসিক শক্তি পশু শক্তিকে জয় করিয়া স্বীয় দাসত্বে নিয়োগ করিতে পারে প্রতিমার এই ভাগে ইহাই প্রকাশ করিতেছে। মানসিক শক্তি দ্বারা জ্ঞান এবং শাস্ত্রানুশীলন হইয়া থাকে। সরস্বতী এবং গণপতির মূর্ত্তিতে তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। মানসিক শক্তি এবং বিদ্যাবলে ধনলাভ হয়। লক্ষ্মী মূর্ত্তিতেই ইহাই প্রকাশ। দেবী ভগবতী গৌরী কাঞ্চনবর্ণা। সেই শক্তি স্বরূপা স্বর্ণ বর্ণা দেবী পাশব শক্তি দমন করত প্রসব করিলে সন্তান বীরপুরুষ এবং মূর্ত্তিমান সৌন্দর্য্য স্বরূপ হইয়া থাকে। শিখী বাহন কার্ত্তিক মূর্ত্তিতে এই ভাবের অভিব্যক্তি। দেবী ভগবতীর মহিষাসুর বধে বুঝায় যে শক্তি স্বরূপা। মহাদেবী পাশব প্রবৃত্তি এবং অসুররূপী দুর্ব্বৃত্ত কামাদি রিপুর দমন করিতেছেন। এই সকলের শেষ ফল যে পরম মঙ্গল, নিয়ত আনন্দানুভব দেবীর শিরোপর চালস্থিত সদানন্দ শিব মূর্ত্তির দ্বারা প্রকাশ হইতেছে।

আজ কালের দুর্গা প্রতিমা পূর্ব্বের সেই জীবন্ত প্রতিমা নহে। ভারতে আজি সরস্বতী বিলুপ্তা, রসাতলগতা। ভারত রোগে জীর্ণ, শোকে শীর্ণ। ভারতবাসী প্রতিভা, প্রকৃত শক্তি শূন্য। অর্থ এবং উপযুক্ত আহারাভাবে এবং অবসাদ জন্য তাহার সন্তানগণ কুরূপ, সৌন্দর্য্য শূন্য। আজ কালের দুর্গা প্রতিমা অনুদ্দীপ্ত চিতাস্থিত শবদেহ, এবং ভারত ক্রন্দন পূর্ণ শ্মশান ভূমি।

একান্ত অশক্ত ভারতবাসী শক্তিস্বরূপা হৈমবতী দুর্গা পূজার অনধিকারী। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, বিদ্যা, বল এবং ধনাভাবে তিনি এ পরম পূজার অধিকারী হইতে অক্ষম। কিন্তু সন্ধ্যাকালে একান্ত শক্তিহীন হইয়া সূর্য্যদেব অস্ত গমন করত প্রাতে নব দেহ এবং অভিনব শক্তি লইয়া আবার সমুদিত হন। ভারতবাসি! হৃদয়ে আশা ধর, যত্ন কর, সংযত, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। আবার মহাদেবী মূর্ত্তি দুর্গা প্রতিমা, জীবন্ত হইবে—তুমি মঙ্গল,, আনন্দ লাভ করিবে।

সংসার-চক্র।

“পূর্ণিমা”তে একটি প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করায় আমার এক বন্ধু বলিলেন “সংসার-চক্র” সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখ। আমি তাহাই স্বীকার করিয়া “সংসার-চক্র” নাম দিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি।

আমার বাসাতে একটি কদম্ব গাছ আছে; কি লিখিব তাই ভাবিতে ভাবিতে ঐ কদম্ব গাছটির দিকে চাহিয়া কিছু ক্ষণ স্থির হইয়া থাকায় আমার মন তিনটি কথা লইয়া কল্পনার রাজ্যে চলিয়া গেল। ১ম কথা পূর্ণিমা, ২য় কথা সংসারচক্র, ৩য় কথা কদম্ব বৃক্ষ।

শঞ্চ শত শতাব্দী গত হইয়াছে, এক দিন পূর্ণিমার নিশিতে কদম্ব তরু মূলে সংসারের বীজপ্রদ পিতা গোপীগণ সহ রাসচক্রে যে বিহার করিয়াছিলেন সেই কথা মনে আসিল। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকার বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া অবলম্বন করিয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন; হিন্দু দর্শন শাস্ত্রকারগণ এই কথা বলেন যে ভগবান যোগমায়া অবলম্বন করিয়া এই সংসার-চক্র ঘুরাইতেছেন—অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, ও সংহার কার্য্য করিতেছেন। যোগমায়া সংসার চক্রের মূলশক্তি এবং এই যোগ মায়াই রাসলীলার মূল

শক্তি, এই কথাটি ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইয়াছে যে রাসলীলার গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিলেই সংসার চক্রের রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু সেই রহস্য যে কি তাহা আমি সম্যক্ বুঝিতে পারি নাই, সুতরাং পাঠকগণকেও বুঝাইতে পারিব না; তবে রাসলীলা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া যে গুটিকত কথা আমার মনে আসিয়াছে তাহাই বলিতে ইচ্ছা করিতেছি।

ফুল্ল জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমার নিশিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া আশ্রয় করিয়া কামবীজ পূরিত মধুর গীতি ধ্বনি করিলেন, ঐ গীতি ধ্বনি ব্রজবাসিনী গোপীগণের মন হরণ করিল। সেই স্বর—

কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিয়া গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

গোপীগণ সেই স্বরের মোহিণী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, অশ্রান্ত-যৌবন নন্দনন্দনের সমীপে রতি প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ দিলেন, পতি সেবাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ইহা বুঝাইলেন, গোপীগণ কিন্তু তাহা বুঝিলেন না। লৌহ যেমন অয়স্কান্ত মণির আকর্ষণ ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ যোগমায়া অবলম্বনে নন্দনন্দনের শরীর এমন এক বৈদ্যুতী শক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার আকর্ষণ ছাড়াইয়া যাইতে গোপীগণের সাধ্য নাই; তাঁহারা সকাম দৃষ্টিতে মুহুর্মুহুঃ সেই কিশোর কুমারের বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের হৃদয়ে চন্দ্রপ্রভরয়ি, সেই গোপাল বালকের হৃদয়স্থ সূর্য্যপ্রভ প্রাণের সহিত মিশাইবার জন্য বার বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন; এই দুই হৃদয়ের প্রেমের তরঙ্গ একত্র মিলিয়া, যমুনার চন্দ্রকিরণ সিক্ত বারির; কল্লোলের মধুর অব্যক্ত ধ্বনি করিতে করিতে, গ্রহ নক্ষত্র খচিত আকাশ ভেদ করিয়া, কোথায় কোথায় কোথায়—কিসের দিকে ধাবিত হইল। তাহার পর গোপীগণ মনে করিলেন যে কৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি অনুরক্ত এবং ইহা হইতেই তাঁহাদের মনে অহঙ্কার জন্মিল, ভগবান অন্তর্ধান হইলেন। গোপীগণ বিরহ-কাতর হইয়া বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন তখন তাঁহারা অন্য এক নায়িকার পদচিহ্ন মাত্র দেখিয়া বুঝিলেন যে সেই সৌভাগ্যশালিনী নায়িকাই কৃষ্ণের পরমাপ্রেয়সী। গোপীগণ বিরহ যাতনা

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

১ম ভাগ—৭ম ও ৮ম সংখ্যা। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ—১৩০০।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই দুই সংখ্যার লেখকগণের নাম :—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্; শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল্; শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল; জনৈক বৈষ্ণব; শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম্, এ, বি, এল্; শ্রীরামগোপাল ঘোষ, বি, এ, বি, এল্; শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	বিজ্ঞান-রহস্য	... ১৯৩
২।	সংকীর্ত্তন ;—মধুর ভাব, পূর্ব্বরাগ ...	... ১৯৮
৩।	জিজ্ঞাসা	... ২০৪
৪।	অদ্ভুতে বিশ্বাস	... ২১২
৫।	যষ্টি	... ২২৮
৬।	ফাঁসী বা প্রাণদণ্ড	... ২৩৬
৭।	কালী প্রতিমা	... ২৪১
৮।	কুরুক্ষেত্র	... ২৪৫

হুগলী,
সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ—১৩০০।

এই দুই সংখ্যার মূল্য ৶০ তিন আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার সম্পাদকতার ভার লইয়াছেন, কোন ব্যক্তি বিশেষ ইহার সম্পাদক নহেন।

সম্পাদক-সমিতির নাম আপাততঃ প্রকাশিত হইল না। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাস্থল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনের জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি ভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ। | কার্ত্তিক, সন ১৩০০ সাল। | ৭ম সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন-রহস্য।

Welcome the beggarliest Truth, so it *be* one, in exchange for the royallest Sham.—CARLYLE.

সামকালিক সাহিত্য সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তিস্বরূপ। এই জন্য সাহিত্যের খুবই গৌরব। পূর্ব্বকালে আমরা কি খাইতাম, কি পরিতাম—সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত কি করিতাম জানিতে হইলে মুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতিরই শরণ লইতে হয়। এমন কি এই সেদিনকার অনেক কথা "আলালের ঘরের দুলাল", "হুতুম পেঁচার নক্‌শা" ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলী বা সংবাদ প্রভাকরের পুরাতন নথি অন্বেষণ করিয়া সাবাস্ত করিতে হয়। কিন্তু সাহিত্যের এই পুরাতন গৌরবে অধুনা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সম্প্রতি কাল মাহাত্ম্যে একটা অভিনব পদার্থ আমাদের সদা সহচর হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে সমাজের রীতি নীতি আচার পদ্ধতি অভাব আকাঙ্ক্ষা দর্পণের ন্যায় নিত্য সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। এটি সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন। পূর্ব্বকালে এখনকার মত এত ব্যবসায় বাণিজ্য ছিল না। চাল, ডাল, তৈল, লবণ প্রভৃতি অসোখীন দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় কতকটা ছিল বটে, এখনও আছে, কিন্তু ঐ অপদ্রব্যগুলা বিজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

আর বিজ্ঞাপনের বাহন সংবাদ পত্রই যখন ছিল না, তখন কাজে কাজেই বিজ্ঞাপনও অচল ছিল।

এই বিজ্ঞাপন যাঁহাদের অনুকরণ, তাঁহাদের বিবেচনায় ইহা সাহিত্যের অঙ্গ-বিশেষ। বিজ্ঞাপন ইংরাজ লেখকদিগের লিপি কুশলতা প্রকাশের একটি প্রকৃষ্ট পথ। কৌশলে প্রবন্ধ বা উপাখ্যানাদি লিখিয়া দ্রব্যবিশেষের উৎকর্ষ ব্যাখ্যা করা হয়। সুতরাং যে সে লোকে ভাল বিজ্ঞাপন লিখিতে পারে না। বলা বাহুল্য লেখক মহাশয়েরা নিষ্কামভাবে এ কাজ করেন না, ইহাতে বিলক্ষণ লাভ আছে। শুধু লেখক কেন? বিজ্ঞাপনে চিত্রকরও প্রচুর চাতুরী দেখাইয়া থাকেন, উপার্জ্জনও করেন। তবেই দেখুন বিজ্ঞাপনটা বড় তুচ্ছ জিনীস নয়।

ইংরাজি বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অদ্য অধিক কথা বলিব না। অনুকরণটা কি ভাবে চলিতেছে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বঙ্গ ভাষায় প্রধানতঃ ত্রিবিধ দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই; যথা পুস্তক, ঔষধ ও বিলাস দ্রব্য।

পুস্তকের মধ্যে অধিকাংশ নবেল জাতীয়; তন্নিম্নেই স্কুলপাঠ্য; অবশিষ্ট "অদ্ভুত ইন্দ্রজাল" "জ্যোতিষ সাগর", "জ্ঞান ভাণ্ডার" "নারীদেহ তত্ত্ব" "যৌবন সুহৃদ" প্রভৃতির ধরণের। এই পুস্তকের তালিকা দেখিলেই আমাদের সুরুচি ও মাতৃভাষায় পারদর্শিতার পরিমাণ অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ আমরা প্রথম জীবনে স্কুলের তাড়নায় কতকগুলা বই কিনিয়া পড়ি; তাহার পর নবেল ধরি, অবশেষে "নারীদেহ তত্ত্ব" "যৌবন সুহৃদ" ইন্দ্রজালাদি অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যার পরিসমাপ্তি করি।

ঔষধের মধ্যে প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও পুরুষত্ব হানির অব্যর্থ মহৌষধের এবং উপদংশ বিষ ও পারদদোষ নাশক সঞ্জীবনী সালসা প্রভৃতিরই অধিকতম আড়ম্বর। এ সম্বন্ধে বেশ একটু রহস্য আছে। মাথা গণিয়া দেখিতে গেলে বোধ হয় যেন দেশে ঐ সকল পীড়া কাহারও নাই। অথচ এই লম্বা চৌড়া বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে বিলক্ষণ পয়সা খরচ আছে—(সম্পাদকগণ সকলেই কিছু মাতৃস্বস্রেয় নন)—আর আবিষ্কারক মহাশয়গণও উপবাস ব্রতধারী নন—ইহাঁদের সংখ্যাও

সাগর বংশবৎ; এ হিসাবে রোগীর সংখ্যা কত, ভাবিলে কি অবাক হইতে হয় না? দেখুন দেখি, দেশের কি শোচনীয় অবস্থা!

অব্যর্থ মহৌষধের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে কয়েক খানি সংবাদ পত্রে "অব্যর্থ ছারপোকা বিনাশকের" একটা বেশ জাঁকালো বিজ্ঞাপন বাহির হইত। ব্যবহারের নিয়মাদি পার্শেলের সহিত প্রেরিত হইবে আশা দেওয়া ছিল। মূল্য মাশুল সহ ৷৷০ আনা কি ১৲ টাকা ঠিক স্মরণ নাই। আমার পরিচিত এক ব্যক্তি মূল্য পাঠাইয়া যথা সময়ে পার্শেল পাইলেন; ভিতরে আর কিছুই নয়, খুব পাতলা ছোট ছোট দুই টুক্‌রা আম কাঠের তক্তা। উহার এক খানিতে ছোট একখানি কাগজ লাগান, তাহাতে লেখা—"ছার পোকাটি ধরিয়া ইহার একখানি তক্তার উপরে রাখিয়া দ্বিতীয় খানি দ্বারা একটু জোরে চাপিয়া ধরিলে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে।" অব্যর্থ নয় কি?

এই বার বিলাস দ্রব্যের বিপণি শ্রেণী। প্রথম স্তরেই অতি চাক্‌চিক্যশালী কেমিক্যাল স্বর্ণের অলঙ্কার রাশি। প্রত্যেক দোকানের মালিকই ভারতের এক মাত্র খাঁটি (?) কেমিক্যাল স্বর্ণের আবিষ্কারক ও অলঙ্কার নির্ম্মাতা। কলিকাতার কোন কোন ষ্ট্রীটে এইরূপ পাঁচ সাত জন করিয়া "ভারতের এক মাত্র" কারিকর আছেন। তাহার পরই মন্দার কুসুমসুবাসিত বা তদ্বৎ অন্য একটা জাঁকাল নামের বিলাস তৈল। বর্ণ, গন্ধ ও শিশি সকলেরই প্রায় এক নাম ও যতদূর সম্ভব এক, শুধু কলুই স্বতন্ত্র। ইহা আসল-নকলের সংগ্রামের ফল। এইরূপ সংগ্রাম ব্যবসায়ি সমাজে চিরকালই চলিতেছে। বঙ্গবাসীর খুব পশার হইল, ক্রমে দেখিলাম "বঙ্গবাসিনী" "ব্যঙ্গভাষী" "বঙ্গ নিবাসী" ইত্যাদি। "ডিঃ গুপ্তের" খুব কাট্‌তি হইলে, "জি গুপ্ত" "বি গুপ্ত" প্রভৃতি কত বোতলই বাজারে উঠিয়াছিল। গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকার অনুকরণে ঠিক তদাকারে "হিন্দু প্রেশ" প্রভৃতি অনেক পঞ্জিকাই আজ কাল দেখিতেছি। আমাদের পূর্ণিমা অদ্যাপি বালিকা মাত্র। যেরূপ গতিক দেখিতেছি, দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতেই "পৌর্ণমাসী" "পূর্ণাতিথি" প্রভৃতি সপত্নীগণ জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুখের বিষয়, এরূপ সংগ্রামে আসলের বড় একটা অনিষ্ট হয় না। এখন যাহা বলিতেছিলাম—গিল্টির

পশারে ও সুগন্ধি তৈলের কাট্তিতে আমাদের জাতীয় সারবত্তার পরিমাণ অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ইহার পরই সাজ সজ্জা পোষাক পরিচ্ছদাদির বিরাট-স্তূপ। এ দিকেও খুব নকলের আদর। নকল বারাণসী সাড়ী, নকল বোম্বাই সাড়ী, নকল হীরা, নকল পান্না, নকল ঘড়ী, নকল আংটী ইত্যাদি সকলই নকল, আসল নাই বলিলেই হয়। হায়! হায়! আমরা কি এতই নকলময় জীবন হইয়া পড়িয়াছি।

ইহার উপরে আবার উপসর্গ। 'উপ'টা সকলকেই বিগড়াইয়া কারে পড়িয়াছিল 'কারে', আর হার মানিয়াছিল 'হারে'। কিন্তু কুটিলের 'কু'-ত্ব কোথাও যাইবার নয়। ওটা এখন বিজ্ঞাপনে ভর করিয়া 'হার'কে হয়রাণ করিয়া তুলিয়াছে। আজ কাল সংবাদ পত্র স্তম্ভে 'উপহার' শব্দটি দেখিলেই গা শিহরিয়া উঠে। ভাল মন্দ অনেক জিনীসের জন্যই আমরা কলুটোলার কাশ্যপাশ্রমের নিকটে ঋণী; যতদূর স্মরণ হয়, উপহারের উৎপত্তিও ঐ মহাপীঠ স্থানে। উৎপত্তি যেখানেই হউক ব্যাপ্তি ও বিপত্তি আজকাল সর্ব্বত্রই; নূতন সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে হইবে—দেও উপহার। কি? না, কর্ত্তার জন্য ফরাসডাঙ্গার ধুতি, কল্মের চাদর, আর গৃহিণীর জন্য বোম্বাই শাড়ী। বই বেচিতে হইবে, তাহার জন্য উপহার আরসী, চিরুণী, সাবান, পোমেটম্ ও অডিকলোন্। ফলতঃ এমন বিজ্ঞাপন আজ কাল খুবই কম যাহাতে উপহারের প্রলোভন নাই। ১০।১২ বৎসর যাবৎ এই অতি স্থূল চতুরতাটা অবাধে চলিয়া আসিতেছে, ইহা আমাদের বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক নয়।

একটা গল্প মনে পড়িল। একটি লোক হাটে গিয়া প্রত্যহ চিৎকার করিত "আমি এই ঘোড়াটা অমনি দিব, কে নিবে গো"। কেহ লইতে আসিলে বলিত "দেখ আমার ঘোড়ার সহিত এই বানরটির অতিশয় প্রণয়, একের বিরহে অপরের প্রাণ সংশয়; ঘোড়াটা বিনা মূল্যে দিব বটে, কিন্তু গ্রাহককে বানরের মূল্য হাজার টাকা দিতে হইবে।" গল্পটি বিদেশীয়, সেখানে হাজার টাকা দিয়া কেহ বানর কিনিয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু বিক্রেতা আমাদের দেশে আসিলে প্রথম হাটেই বানরের গ্রাহক জুটিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আরও একটা অতি লজ্জাজনক নিতান্ত ঘৃণাস্কর ব্যাপার আছে। এটি বিজ্ঞাপকদিগের স্বীয় স্বীয় নামকরণ প্রণালী। দ্বারিকানাথ সেনের দোকানী নাম Dwarkins & Son; হীরালাল দত্তের নাম D. Harwell & Co.; দক্ষিণেশ্বর ঘোষের নাম G. Ducksinsore & Co.; হরকুমারের নাম Herr. O'Comer. কোনও দোকানের চক্রবর্ত্তী মহাশয় নাম সহি করেন Cha. Kerr. Buttie অর্থাৎ কি না অপরিচিত লোকে মনে করিবে 'বাট্টি' সাহেব। কতকগুলা উপাধি আছে যাহাদের রূপান্তরীকরণ ইহা অপেক্ষা সহজেই নির্ব্বাহিত হয়; যথা, পাল (Paul), দে (Day), শা (Shawe), কর (Kerr), হড় (Herr), পালিত (Paulette), রক্ষিত (Rockett), মোদক (Muddock), ইত্যাদি। কতকগুলা নামেরও এ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর স্বাভাবিক উপযোগিতা আছে; যথা হরিষ (Harris), কালীবর (Calibre), বরদা (Bar. Rhoda), মদন (Madden), গোবিন্দ (Gavin), জ্যোতীন্দ্র (Jattin), দ্বিজেন্দ্র (D. J. Andrew), দেবেন্দ্র (D. B. Andrew), ইত্যাদি। ইহাঁরা তবু অনেক ভাল, কেননা নিজ নিজ নামের অনেকটা ইসারা বজায় রাখিয়াছেন। আর একদল আছেন যাঁহারা নিজত্বকে একেবারে অতল জলে ডুবাইয়া সম্পূর্ণ নূতন নাম গ্রহণ করেন। এই ধরণের একজন সরকার মহাশয় অনেক দিন যাবৎ ছিলেন Youngman & Co., এক মুখোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক বৎসর ধরিয়া Dan. Etten নামে বিখ্যাত হইয়া ব্যবসায় করিয়াছিলেন। এই ধরণের Goodman & Co., Honestman & Co., Friend & Co. প্রভৃতি অনেকই দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। বলা বাহুল্য এই সকল ইংরাজী নামধারী দোকানে ইংরাজের গন্ধও নাই। এই অন্তঃসার শূন্য আত্মাভিমান বর্জ্জিত নিতান্ত নির্লজ্জ লোকগুলা কি সমাজের কলঙ্ক নয়? ইহাদের এই আত্মবিক্রয়, এই নীচতা, এই প্রবঞ্চনা, এই ময়ূরপুচ্ছধারিতা কি নীতি ও ধর্ম্মের নিতান্ত বিরোধী নয়? ইহাদের মুখস খুলিয়া দিয়া স্বরূপে দর্শন করা আমাদের কর্ত্তব্য নয় কি? অথচ আমরা ত বেশ প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছি, নতুবা এ অতি কুৎসিত প্রথা কি বহুপূর্ব্বে উঠিয়া যাইত না?

ইংরাজের বিজ্ঞাপনে প্রবঞ্চনা না চলে এমন নয়; কিন্তু গিল্টির গরিমা, উপহারের উৎপাৎ ও নাম পরিবর্ত্তনের নাম গন্ধও নাই; এইগুলি আমাদের নিজস্ব। য়ুরোপীয়দিগের বৈজ্ঞানিক দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপনের দুই একটা নমুনা শুনিয়া আমাদের অনেকে হয় ত হাসিয়াই অজ্ঞান হইবেন। য়ুরোপে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা নানাবিধ আপাত তুচ্ছ দ্রব্য সংগ্রহ করণার্থে সমগ্র পৃথিবীটা পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। এরূপ কার্য্যে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য অধ্যবসায় ও অপরিসীম অর্থ ব্যয়, কৃতিত্ব ও পুরুষকারও তদনুরূপ; লাভও না আছে এমন নয়। ইহাদের কেহ বিজ্ঞাপন দেন "আমার নিকটে জগতের যাবতীয় পিপীলিকার নমুনা সংগৃহীত আছে।" দেখিবার দর্শনী ও মূল্যের অবশ্য উল্লেখ থাকে। কেহ বা শুদ্ধ শামুকই সংগ্রহ করেন। ফর্ণ (Fern) অর্কিড্ (orchid) ও অন্যান্য বৃক্ষলতাদির এবং প্রজাপতি প্রভৃতি সুশ্রী জীবের সংগ্রাহক যে কত আছেন সংখ্যা করা যায় না। তাহার পর ধরুন কল কারখানার এবং কলজাত নানাবিধ অত্যদ্ভুত দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপন। এদিকেও অতুল কৃতিত্ব। এইরূপে পদে পদে পার্থক্য দেখাইতে পারা যায়। এই পার্থক্যটুকু একবার সকলে কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আর কিছু না হউক ফাঁকা আওজটা একটু মন্দা পড়িলেও, অনেক লাভ।

সংকীর্ত্তন ;—মধূর ভাব, পূর্ব্বরাগ।

এক দিন কোন আত্মীয়ের বাটীতে মহাজন পদাবলী গীত হইতেছিল, এমন সময় একজন ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন "গানগুলি বেশ মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী বটে, কিন্তু ইহাকে লোকে ধর্ম্মসঙ্গীত বা "ঠাকুরদের গান" বলে কেমন করিয়া; ইহাতে ত স্বতঃই মনে "অন্যভাব" উপস্থিত হয়। আর এক দিন হাবড়ার এক বারোয়ারি পূজায় সংকীর্ত্তন হইতেছিল। গান হইতেছিল পূর্ব্বরাগের পালা। গায়কগণ অতি সুন্দর গান করিতেছিল। অনেক ভক্ত বৈষ্ণবের হৃদয়ে বিশেষ সুখানুভূতি হইতেছিল। এমন সময় কতিপয় নব্য যুবক চীৎকার করিয়া উঠিলেন "শ্রাদ্ধ বাড়ীতে যাওনা বাবা, এখানে কেন চেঁচাইতেছ।" তাঁহারা বারংবার এইরূপ নানা প্রকার গোলমাল করিয়া গায়ক ও ভাবুকগণের হৃদয়ে ব্যথা দিয়া গান থামাইয়া দিলেন। তাহার পর বাইজী উঠিলে বাবুরা একেবারে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন।

কীর্ত্তন গানের উপর লোকের এত দ্বেষ কেন? যে কীর্ত্তন গান বাঙ্গালার খাস সম্পত্তি, বঙ্গ ভাষার মূলভিত্তি, বঙ্গ কবিত্বের চরম উৎকর্ষ, বৈষ্ণবের উপাসনার সহায়, ভক্তের ভক্তির নৈবিদ্য, পতিত পাপীর হৃদয়ের উচ্ছাস তাহার উপর লোকে এত বীতরাগ কেন? যে কীর্ত্তনের সুরের একটু মাত্র আভাস প্রবেশ করাইয়া দিয়া থিয়েটারের এত প্রতিপত্তি, কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর গাইবা মাত্র যখন Bravo, Excellentএর ছড়াছড়ি, Encore এর ধূমে অস্থির, তখন আসল কীর্ত্তনের বেলায় লোকের অনাস্থা কেন? ইহাতে বোধ হয় লোকের অপরাধ নাই। বোধ হয় তাঁহারা কীর্ত্তন গানের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝেন না। 'বঁধুহে' "সখী গো" কীর্ত্তনের এইরূপ আহ্বানগুলি শুনিয়া বোধ হয় তাঁহারা মনে ভাবেন কীর্ত্তনের সমস্তই অশ্লীল। তাঁহারা যদি বুঝিতে পারেন যে কীর্ত্তন গানে অশ্লীলতা নাই, ইহা ঈশ্বর সমীপে বৈষ্ণব ভক্তের হৃদয়ের আবেগপূর্ণ নিবেদন মাত্র, তবে হয় ত তাঁহাদের ইহার প্রতি অনাস্থা ঘুচিতে পারে।

বৈষ্ণবের ভজনের পঞ্চ প্রকার ভাবের অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য ভাবের প্রথম চারি প্রকারের প্রতি লোকের বিশেষ আক্রোশ নাই। কেন না তাহাতে অশ্লীলতা, অরুচি নাই। যত আপত্তি ঐ মাধুর্য্য ভাব লইয়া। ইহাতে ঈশ্বরকে প্রাণেশ্বর ভাবিতে হইবে। আপনাকে নারী হইতে হইবে। তাঁহাকে 'প্রাণবঁধু' বলিয়া ডাকিতে হইবে। ইহাই চণ্ডীদাসের সহজ ভজন। একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। তুমি আমি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বুঝিব কেমন করিয়া ভাই? সকলেই কিছু বেদ বেদাঙ্গ পড়ে না, উপনিষদ্ বুঝিতে পারে না। সকলেই কিছু চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করিয়া যোগ সমাধি করিতে সক্ষম হয় না। তবে সকলেই ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ ধারণা করিবে কি করিয়া? অসীম মহিমাবান্ পরমেশ্বরের স্বরূপ আমি অসীম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া যে বুঝিতেই পারি না। তাই বৈষ্ণব সাধকের জন্য এক সহজ

পথ বাহির করিয়াছেন; "সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহা ছাড়া কিছু নয়।" "ছাড়ি জপ তপ, করহ আরোপ", ইত্যাদি। ইহাতে নারী স্বরূপ হইয়া প্রাণপতিভাবে প্রভুর ভজনা করিতে হইবে। ইহাই ব্রজ গোপীর ভাব। পাঠক যদি এভাব বুঝিতে চাহেন তবে আপনাকেও গোপী হইতে হইবে। গোয়ালিনী না হইতেও পারেন, দধি, দুগ্ধ বেচিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই; তবে আপনাকে আপনার পুরুষত্ব ভুলিয়া নারীভাবগ্রহণ করিয়া ভাবিতে হইবে—বিশ্ব বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র নন্দন ব্যতীত আর কেহ পুরুষ নাই। আর সকলেই প্রকৃতি। আর ভাবিতে হইবে মুনিমানসমোহন আপনারও মনোমোহন। নতুবা এ ভাবে আপনার অধিকার নাই। আপনার পুরুষত্ব, পরুষত্ব ও পুরুষকার থাকিলে আপনার বৃন্দাবন প্রবেশেরও অধিকার নাই। আপনার ব্রজের বাহিরে পুরুষ হইয়া "অহং, মমেতি" লইয়া থাকাই ভাল। বৃন্দাবনের ভিতরে ঢুকিয়া "আমার প্রাণেশ্বরেরই সব, আমরাও আমার প্রাণবল্লভের সেবার জন্যই জীবন ধারণ করি" একথা বলিবার আপনার অধিকার হয় নাই। বৃন্দাবনে ব্রজগোপী অপর পুরুষ প্রবেশ করিতে দেন না। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "এই সে রস মিগূঢ় ধর্ম্ম; ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য।"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণের সময় রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। রামানন্দ রায় উৎকলাধিপতি স্বাধীন রাজা প্রতাপ রুদ্রের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। বিষয়ের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়া কিরূপে বিষয়াসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ ভজন করিতে হয় রামানন্দ রায় তাহার চরম দৃষ্টান্ত। মহাপ্রভু পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তীর নিকট রামানন্দের নাম শুনিয়াছিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় হইলে, নবীন সন্ন্যাসী রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামানন্দ, সাধ্য বস্তুর কি রূপে সাধনা করিতে হয় বলিতে পার?" রামানন্দ প্রভুকে সামান্য সন্ন্যাসী জ্ঞানে বেদ বেদান্ত বিহিত জ্ঞান মার্গানুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা হরি পাওয়া যায় বলিলেন। তাহাতে প্রভু উত্তর করিলেন "রামানন্দ! এ সকল ত বাহিরের কথা, ইহাতে সাধকের হৃদয়ের পিপাসা মিটে কই? কোথায় ঈশ্বর পূর্ণব্রহ্ম, আর কোথায় আমি ক্ষুদ্র জীব; কোথায় তাঁহার অসীম মহিমা, কোথায় আমার ক্ষুদ্র ধারণাশক্তি, কোথায় তিনি অচিন্ত্য, আর কোথায় আমার লঘিয়সী চিন্তাশক্তি," সাধকের মনে এইরূপ চিন্তা হইয়া ঈশ্বরে জীবে বিশেষ দূরত্ব দেখাইয়া দিয়া তাহাকে নীরাশা সাগরে ডুবাইয়া দিবে। বিশেষতঃ ঐ সকল ক্রিয়া কাণ্ড করা কিছু সকলের সাধ্য নয়। এমন কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতে পার যাহাতে ভজন করিয়া জীব ঈশ্বরকে বহুদূর মনে না করিয়া তাঁহাকে অতি অন্তরঙ্গ, অতি প্রিয়, অতি প্রেমময়, অতি নিকট, ভাবিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে।" রামানন্দ প্রভুকে চিনিলেন। বলিলেন "প্রভো! বুঝিয়াছি, অনেক লোক দেখিয়াছি, এ প্রশ্ন কাহারও মুখে শুনি নাই। আমাকে উপলক্ষ করিয়া, আমার মুখ দিয়া আপনার হৃদয়ের কথা বলাইবেন বুঝিয়াছি। প্রভো! ভজনের চরম সীমা প্রভুকে প্রাণপতি ভাবিয়া আপনা ভুলিয়া তাঁহার সেবায়, তাঁহার কার্য্যে, ব্যাপৃত থাকা, 'বিশ্ব মাঝারে তিনি বই আর পুরুষ নাই, জীব আমরা সকলেই প্রকৃতি' এই ভাবিয়া তাঁহার আরাধনা করা।" পাঠক দেখিবেন এখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত সাংখ্যাদি মতের বিরোধ নাই। "ঈশ্বর একমাত্র পুরুষ, আমরা সকলেই প্রকৃতি" তবে বৈষ্ণব ইহাকে আরও কিছু মোলায়েম করিয়াছে। 'তিনি পুরুষ, আমরা প্রকৃতি, তিনি পতি, আমরা কিঙ্করী, তিমি প্রাণ, আমরা দেহ, তিনি দেহ আমরা সেবা, তিনি মুর্ত্তি আমরা ধ্যান। তাঁহাতে লয় চাহি না, তাঁহার সামীপ্য, সাযুজ্য, সালোক্য সাষ্ঠি চাহি না। তাঁহাতে লয় হইলে আমার লাভ কি? যদি ব্রহ্ম হইলাম তবে ব্রহ্মত্বের আস্বাদন করিব কি করিয়া? চিনি হইয়া লাভ কি, চিনি খাওয়াতেই সুখ। মুক্তি পাইলে লাভ কি? সকল কর্ম্ম পাশ যদি ঘুচিয়া গেল, আমিও যদি একটী ছোট খাট "কেষ্ট বেষ্ট" হইলাম, তবে ত প্রভুর সেবা করিতে পাইলাম না। আমি যে সে সব চাহি না; চাহি কেবল প্রভুর পায়ে বিকাইতে, আর গৌরব করিয়া বলিতে তিনি আমাদের প্রাণ বল্লভ। চাহি কেবল মনে মনে তাঁহার মধুর নবকিশোর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া তাঁহার চরণে প্রেমের মালা পরাইতে। চাহি কেবল বিরলে বসিয়া তাঁহার গুণ স্মরণ করিয়া দুই বিন্দু অশ্রুজল ফেলিতে আর বলিতে হে বল্লভ! এমনি ঘরে বাস করি যে কৃষ্ণ বলিয়া আমি কাঁদিতেও পাই না।

কি সংসারে ফেলিয়াছ প্রাণেশ্বর ! যে তোমার নাম করিয়া ডাকিব তাহারও অনেক বিরোধী।”

পাঠক মাধুর্য্য ভাব বা মধুর ভাব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সকল কথা বলিতে পারিলাম না। আপনি নিজেই একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন ইহাতে অশ্লীলতা নাই, ইহা হরি ভজনের বিশেষ দুরূহ পথ নয়। ইহার নিন্দাও কিছু নাই।

এখন একটী মধুর ভাবের গান লইয়া বুঝিয়া দেখা যাউক। মনে করুন, আপনি সংসার জালে বদ্ধ ; আপনি পুত্র পরিজন বিষয় বিত্ত লইয়া এত ব্যতিব্যস্ত যে আপনার ঈশ্বর চিন্তার সময় নাই। সহসা একজন সাধু সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার কার্য্য পরম্পরা কিছু দেখিলেন, তাঁহার মুখে হরিনাম শুনিলেন। হয়ত আপনার প্রতি তাঁহার অনুকম্পা বিশেষ হইল ত তিনি আপনাকে কিছু উপদেশও দিলেন। আপনার চক্ষু ফুটিল ; আপনি বুঝিলেন যাহা লইয়া এতদিন ব্যস্ত ছিলেন তাহা অনিত্য, আপনি যাঁহার তাঁহাকে ভুলিয়া পরকে আপন বলিয়া কোলে লইয়া ভুলিয়াছিলেন। বুঝিলেন ‘সময় বিফলে কাটাইয়াছি’। আপনার সংসারের বৈষয়িক ব্যাপারে অণুমাত্রও অনাস্থা জন্মিল। পূর্ব্বে মুখে একবার কৃষ্ণ নাম লইতেন না, এখন হয় ত তাহার মধ্য হইতেই একটু সময় করিয়া লইয়া দুই এক বার ‘শ্যাম নাম’ জপিতে লাগিলেন। হয় ত নাম জপিতে নাম মহাত্ম্যে, আপনার চিত্তের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল। অনুতাপ হয় ত সেই মাহাত্ম্যের সাহায্য করিতে লাগিল। তখন আপনার নামে “রতি” হইল। আপনি নাম না জপিয়া দিন যাইতে দেন না। নাম জপিতে জপিতে হয় ত আপনার চিত্তের এতাদৃশ উৎকর্ষ জন্মিল যে আপনি আর বিষয় বৈভবে বিশেষ আসক্ত হইতে চান না। ইহার এমনি মধুর্য্য আপনি পাইলেন যে আপনার মনে হয় যদি কেহ আপনার বিষয়ের ভার লয় ত আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া হরির মধুমাখা নাম লইতে লইতে কাল কাটান। এখন বৈষ্ণব কবির মুখে আপনার এই অবস্থা শুনুন।

‘সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম ?
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর্ প্রাণ।

নাজানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।’

এত দিনে হরির নাম জপিতে জপিতে আপনার হরি চরণে প্রীতি (যাহাকে বৈষ্ণবেরা “পিরিতি” বলে) হইল। তখন আপনার হৃদয় হরির স্বরূপ অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল হইল। আপনি বুঝিলেন যাঁহার নাম এমন না জানি তিনি কেমন। তাঁহার তত্ত্ব জানিবার জন্য আপনি এখন বড়ই সমুৎসুক, বড়ই কাতর। এমন সময় আপনার গুরু পূর্ব্বোক্ত সাধু হয়ত আবার কৃপা করিয়া আপনাকে দর্শন দিয়া হরির স্বরূপ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু উপদেশ দিলেন। তাঁহার চরাচর ব্যাপী ভুবন মোহন মূর্ত্তি, তাঁহার অশেষ প্রীতি, ভক্তের প্রতি তাঁহার সদা সস্নেহ স্মিত দৃষ্টি এই সব সম্বন্ধে হয় ত তিনি আপনাকে কিছু উপদেশ দিয়া আপনার কৃষ্ণ চরণে অনুরাগ বাড়াইয়া দিলেন। আপনার ব্যাকুল চিত্ত আরও ব্যাকুল হইল। আপনি গাইয়া উঠিলেন

“কেমনে পাইব সই তারে।
নাম পরতাপে যদি, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে হেরিয়া গো,
কুলের ধরম কৈছে রয়।”

বৈষ্ণবের ভাষায় বলিতে গেলে আপনার “পূর্ব্বরাগ” হইল। আপনার গুরু কর্ত্তৃক ঐ উপদেশ মধুর ভাবের বিশাথার চিত্রপট প্রদর্শন। আপনি অজ্ঞাতসারে আপন পুরুষত্ব ভুলিয়া মনোমোহনে মজিয়াছেন তাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন ? আপনার তখন আর কিছুই ভাল লাগে না। কোথায় একটী ব্যথার ব্যথিত পাইবেন, কেমন করিয়া প্রাণবল্লভের গুণের কথা শুনিবেন দিবা নিশি এই চিন্তা। হয় ত আপনার সমদশাপন্ন একটী মনের মানুষ পাইলেন, অমনি আবার তাহার গলা ধরিয়া গাইয়া উঠিলেন ;—

“ম’লাম ম’লাম শ্যাম অনুরাগে।”

আবার সেই বিশাখা প্রদর্শিত চিত্রপট স্মরণ করিয়া গাইলেন ;—

“মনোহর মধুর, মূরতি নব কৈশোর,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে।
বল না কি বুদ্ধি করি, জীতে পাশরিতে নারি,
কি শেল পশিল মোর বুকে।
টানিলে না টানা যায়, যতনে না বাহিরায়,
অন্তরে জ্বলয়ে ধিকে ধিকে।”

আবার গাহিলেন,

“সখি, পহিলে শুননু হাম, শ্যাম দুটী আঁখর,
তৈখনে মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কো ঐছে, মুরলী আলাপই,
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥
না জানিয়ে কো অছু, পটে দরশায়নি,
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম, যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে,
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি॥”

(ক্রমশঃ)

জিজ্ঞাসা।

সম্পাদক মহাশয়——

অনেক দিন ধরিয়া পূর্ণিমায় প্রবন্ধ লিখিব মনস্থ করিয়াছি। কিন্তু প্রবন্ধ লেখা আর হইয়া উঠিল না, লিখিবার আশে অনেকবার “জিজ্ঞাসা” আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম জিজ্ঞাসা প্রবন্ধ যেন লিখিলাম পড়িবে কে? আজ কাল মাসিক পত্রের যাঁহারা গ্রাহক, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অনুগ্রাহক। অর্থাৎ খাতিরে পড়িয়া পত্রিকা লইয়া থাকেন বটে কিন্তু পত্রিকা পড়া তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে না। ইহাঁদের শতকরা দশ জন মাসিক পত্র পড়েন কি না সন্দেহ, সেগুলা পড়ার ভার প্রায়ই জেনানার উপর দেওয়া থাকে। আজ কাল বাঙ্গালার উপর অনেকের নজর

পড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে বাঙ্গালা কাগজে পড়িবার কিছু থাকে না। সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গালা কাগজ পড়েন না। যাহাদের অভিমান নাই, তাহাদের সময় নাই।

সময় নাই কেন? বাঙ্গালির সারা জীবন আহারান্বেষণেই কাটিয়া যায়। দেহটা টেনে টুনে বজায় রাখার জন্য, পেটের দায় হইতে অব্যাহতি পাবার জন্য প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টা ষোল আনা মন দিয়া খাটনি চাই। যে পেট ভরিয়া আপনি ও পরিবারদের খাওয়াইতে পারে, সেও যেমন খাটে, যে পেট ভরাইতে না পারে সেও তেমনি খাটে। তবে ইহাদের খাটনিতে পেট ভরান কুলায় না এই পর্য্যন্ত। ইংরাজিতে যাহাকে Struggle for existence বলে—তাহা বাঙ্গালীর ক্রমে পূরা মাত্রায় উপস্থিত হইতে চলিল। তবে পাশ্চাত্য সভ্য দেশে এই struggle ব্যক্তিগত, সেখানে অনেক লোক আছে যাহাদের পেটের ভাবনা ভাবিতে হয় না। আর আমাদের এই দেশে এই struggle জাতিগত। আমাদের মধ্যে দুই একজন লক্ষ্মীর বরপুত্র থাকিতে পারেন, যাহাদের হয় ত এই struggle করিতে হয় না, কিন্তু একজনও সেরূপ সরস্বতীর বরপুত্র নাই।

কাজেই যাঁহারা মাসিক পত্র পড়িবেন, তাঁহাদের সময় নাই। দুই শ্রেণীর লোক সংবাদ পত্র পড়িবে আশা করা যায়। এক হাকিম, কেরাণী বা মাষ্টার যাহারা ১০টা হতে ৫টা বা ৭টা পর্য্যন্ত চাকরি করে। আর এক দল ব্যবসাদার, উকীল মোক্তার ইত্যাদি যাহাদের খাটনির কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই। ইহার মধ্যে হাকিম, কেরাণীর কথা আর বলিব কি, তাঁহাদের খাটিতে খাটিতে পীঠের বাঁধন ছিড়িয়া যায়, সমস্ত দিনের খাটনির পর যখন অবসর পান তখন আর পড়া করার ক্ষমতা থাকে না। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন হইয়া সন্ধ্যার পর আড় হইয়া পড়িয়া তামাকু টানিতে টানিতে অন্ততঃ ১০টা পর্য্যন্ত ঝিমাইতে হয়। তবে প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন, তা পড়িবেন কি? প্রাতে যে সময় তাহা ত চাকরি বজায় রাখিবার ভাবনাতেই কাটিয়া যায়। চাকরি সমুদ্রে কিরূপে তাহার সেই দেহ জাহাজকে সাহেবি প্রভুর লাথি, জুতা, কৈফিয়ত

প্রভৃতি ঝড় তুফান কাটাইয়া চালাইতে পারিবেন তাহার ভাবনা ভাবিতে বেশী সময় কাটিয়া যায়। তা ছাড়া সংসারের ভাবনা ত আছেই। ইহার উপর যিনি সময় করিতে পারেন, তিনি বড় জোর খবরের কাগজটা উল্টাইয়া দিনের খবরটা দেখিয়া লয়েন।

উকীল প্রভৃতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রায় ঐ কথা। তাঁহাদের সময় অবসর নাই। বার মাস ত্রিশ দিন খাটনি ত আছেই। যাঁহার না থাকে, তিনি এই খাটনির প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকেন। মন কখন সুস্থির হয় না, তা মাসিক পত্র পড়িবেন কি ?

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম—প্রবন্ধ যেন লিখিলাম, যেন পূর্ণিমাতে আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার স্থান দিলেন, কিন্তু পড়িবে কে ? খালি বেঞ্চের দিকে তাকাইয়া বক্তৃতা করা চলে না। বক্তৃতা করিলেও তাহাতে মন থাকে না, সার থাকে না।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা—কোন বিষয়ের প্রবন্ধ লিখিব ? লিখিবার অবশ্য অনেক জিনীস আছে, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতি অনেক বিষয় আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটীতে বাঙ্গালী পাঠকেরা সুখী হইবেন বলুন দেখি। দুষ্পাচ্য ইংরাজী ভাব পেটে পড়িয়া ত বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে ‘উদরাময়’ হইয়াছে, তাহার ফলে দুষ্পাচ্য অনেক জিনীস আমরা পাইয়াছি। পলিটিক্সে—কঙ্গ্রেস (মাপ করিবেন) ; সমাজনীতিতে—স্ত্রী-স্বাধীনতা ; গৃহে—যৌথ পরিবারের বিশ্লেষণ ; ধর্ম্মে—সাকার উপাসনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ; যৌথ সম্বন্ধে ম্যাল থাসের আইন জারি করিয়া ভদ্র বাঙ্গালী বংশ লোপের বন্দোবস্ত, জ্ঞানে—আত্মসম্প্রসারণ ভাবনা ; কর্ম্মে—বাক্‌পটুতা বা আত্মসুখ চেষ্টা ; হৃদয়ে অপ্রীতি, আর কত বলিব, এই সব অসার পাইয়াছি।

উপরের এরূপ অবস্থায় সুতরাং বাঙ্গালী পাঠককে পোলাও কালিয়া খাওয়ান চলে না। ইহার উপর আবার মুখে অরুচি ! বড় জোর চুট্‌কি উপন্যাস বা রহস্য প্রভৃতি অম্লরস তাহার উপাদেয় হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা আর মাসিক পত্রে চলে না। লিখিলে তাহার ফল হাতে হাতে। পত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হয়। দৃষ্টান্ত ‘নবজীবন’ ‘প্রচার’ প্রভৃতি।

সে কালের বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বা বান্ধবের কথা আর বলিয়া কাজ নাই।

এই জন্য সম্পাদক মহাশয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি এই সব উচ্চ বিষয়ের প্রবন্ধ ছাপাইয়া আপনার পূর্ণিমাকে রাহুগ্রস্ত করিবেন ? অপাতঃ দৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া এরূপ করিবেন না, আমার বিশ্বাস আছে। যদি না করেন তবে অবশ্য আপনি চুটকি গল্প বা ক্ষুদ্র কবিতা বা অম্ল কি অম্লমধুররস যুক্ত হালকা প্রবন্ধ চাহেন। তাহা আমার দ্বারা হইবে না। এরূপ প্রবন্ধ লেখায় আমার ক্ষমতা নাই, ক্ষমতা থাকিলেও ইচ্ছা নাই। ইচ্ছা নাই তাহার কারণ আমার লাইসেন্স নাই। আমি আপনার পাঠককে মাতাইবার জন্য মদের দোকান খুলিতে অপারক।

অবশ্য আপনি বলিতে পারেন যে অক্ষমতা জন্য এরূপ চুট্‌কি প্রবন্ধ নাই লিখি, বাঙ্গালি পাঠকের উদরাময় নিবারক প্রবন্ধ কেন লিখি না।

সেই জন্য আমার তৃতীয় জিজ্ঞাসা যে পাঠকে পড়িয়া কিছু লাভ করিতে পারে এমন প্রবন্ধ আমি কি লিখিতে পারি ? দু কথা লিখিতে অবশ্য সকলেই পারে। যখন এণ্ট্রান্স স্কুলের নাবালক ছেলেরা পরীক্ষা দিতে বসে, তখনও তাহাকে দশ মিনিটের মধ্যে একটা ‘এসে’ লিখিয়া দিতে হয়। সুতরাং আমি কি একটা প্রবন্ধ লিখিতে পারি না ? তা পারি। কিন্তু তাহাতে আর থাকিবে কি ? আমি বাঙ্গালি মানুষ। দু দশ খানা ইংরাজী বা বাঙ্গালা বই পড়িয়া দুই দশটা ভাব মাথার মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছি। সে ভাব গুলাও হেলাগোছা হইয়া আছে, কার্য্যকালে পাই না। মিউজিয়ামের মত মাথার মধ্যে প্রত্যেক ভাবটী নম্বর করিয়া যথা স্থানে রাখিয়া ক্যাটলগ্ করিয়া থুই নাই। সুতরাং প্রয়োজন হইলে সেগুলি খুঁজিয়া পাই না। তাহার পর সেগুলিকে উপকরণ করিয়া নিজে ভাবিতে কখন চেষ্টা করি নাই। চেষ্টা করিবার অবসরও পাই নাই। বলিয়াছি ত আমরা বাঙ্গালী মানুষ, পেটের দায়ে সারা জীবন কাটাই। তা সময় পাব কখন। যাহাদের এ সব পড়িবার সময় নাই, তাহাদের আবার ভাবিবার সময় হইবে কোথা হইতে ? আজ কাল অনেকে বলিতেছেন যে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী ভাল নহে।

"In these German provinces in which murders were committed in 1849 and 1850 the class to which the murderers belonged was entirely unaware of the penalty having been abolished by the fundamental rights."

পৃথিবীর অনেক স্থানে (Tuscany, Oldenburgh, Nassan, Rhode Island, Miclayan, &c.) প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ড-বিধান হওনের পর অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই ; বরং হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু নরহত্যা সম্বন্ধে প্রাণদণ্ড বিধান উক্ত স্থানগুলি হইতে উঠাইয়া দেওনের অনেক আপত্তি হওয়াতে, সেই বিধান অদ্যাপি প্রচলিত আছে। যদিও Tuscanyতে ১৮৪৭ খৃঃ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ড আইন রহিত ছিল, তথাপি হত্যাকারীর সংখ্যা আদৌ বাড়ে নাই। কিন্তু কতকগুলি কল্পনাশক্তি-সম্পন্ন সমাজ-সংস্কারক আপন কল্পনা বলে নানা দোষ দেখাইয়া প্রাণদণ্ড আইন পুনঃ প্রচলিত করাইয়াছিল। বিখ্যাত ব্যবস্থাপক Boniani প্রাণদণ্ড রহিত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সুবিখ্যাত জিরোম বেন্থাম প্রাণদণ্ড আইনের অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন এবং রসেল্ (Russel) উক্ত আইনের বিপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি এমন সুন্দর যে আমরা পাঠকবর্গকে তাহা না দিয়া থাকিতে পারিলাম না—

"When I consider how difficult it is for any judge to separate the case which requires inflexible justice from that which admits the force of mitigating circumstances; how invidious the task of the Secretary of State in dispensing the Mercy of the Crown; how critical the comments made by the public; how soon the object of general horror becomes the theme of sympathy and pity; how narrow and how limited the examples given by this condign and awful punishment; how brutal the scene of execution, I come to the conclusion that nothing would be lost to justice, nothing lost in the preservation of innocent life, if the punishment of death were altogether abolished. The guilty, unpitied, would have time and opportunity to turn repentant to the Throne of Mercy."

বাস্তবিক দেখা গিয়াছে যে অনেক সময়ে বিচারপতির ভ্রমে নির্দ্দোষী ব্যক্তির ফাঁশি হইয়া গিয়াছে ; অনেক স্থলে ফাঁশি হইবার ইতিপূর্ব্বেই অপরাধী নির্দ্দোষী সাব্যস্থ হইয়াছে। কখন কখন আদালতে পুলিশ নিরপরাধী ব্যক্তিকে অপরাধীর স্থলে দাঁড় করাইয়াছে ও নানাবিধ প্রমাণ সাজাইয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্থ করাইয়াছে। নির্দ্দোষী ব্যক্তির ফাঁশি হইয়াছে শুনিলে কাহার না হৃৎকম্প হয়? সচরাচর অবস্থাগত (Circumstantial Evidence) প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আদালত ফাঁশির হুকুম দিয়া থাকেন, কিন্তু এ প্রকার প্রমাণ যে কতদূর ভ্রমপ্রবণ তাহা যিনি ওয়ারেণের (S. Warren) "Now and Then" নামক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন। আরব্য উপন্যাসের কুঁজা ব্যক্তির গল্পটী (The story of the Hunchback) আর একটী উত্তম উদাহরণ।

অতএব ফাঁশি বা প্রাণদণ্ড অসভ্যতার অবশিষ্টাংশ মাত্র। সভ্য জগতে ইহা ক্ষণকাল জন্য থাকা উচিত নহে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে এমন "বিচার বিভ্রাট" উপস্থিত হয় যে ফাঁশিকে এক প্রকার "Judicial murder" বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁশি ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বর্ক (Burke) সাহেব কহিয়াছেন যে ইহাকে বিচারের দ্বারা হত্যা করা হইয়াছে।

কালী প্রতিমা।

দুর্গা প্রতিমার ন্যায় কালী প্রতিমাও একটী রূপক। কালী মূর্ত্তি কয়েকটী অতি গভীর আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সেই ভাবগুলি ব্যাখ্যা করিবার যত্ন করা যাইতেছে।

"ধ্যানে" দেখা যায় কালিকা দেবী শ্যামবর্ণা, মহা মেঘপ্রভা, ঘোরা।

মোকদ্দমা নিয়া নাড়া চাড়া করিয়াছ, তুমি স্বপ্ন দেখিলেও ঐ মোকদ্দমার স্বপ্ন দেখিবে—সংস্কার এমনি জিনীস। সুতরাং তুমি যতক্ষণ জাগ্রত থাকিবে, ততক্ষণ ভাবনা সে মাথা হইতে সহজে দূর করিতে পারিবে না, এ আর বেশী কথা কি? আপনি বোধ হয় দেখিয়াছেন যে, হাকিম বা উকিল যখন গল্প করে, তখন মোকদ্দমার 'রায়' আর বেঞ্চের কথাই কহে, কেরাণী তাহার আফিসের কথাই কহে। সুতরাং অসম্পর্কীয় ব্যক্তি সে গল্পে মহা বিরক্তই হয়। সেইরূপ যে যেরূপ কার্য্য করে, তৎ সংসৃষ্ট বিষয়ের গল্প ভিন্ন তাহার নিকট আর কিছু বড় ভাল লাগে না।

সুতরাং এরূপ লোককে যদি আপনি নিতান্তই মাসিক পত্র পড়াইতে চান, তবে এমন প্রবন্ধ চাই যে মাথা আদৌ যেন ঘামাইতে না হয়, যেন অধিকক্ষণ সে প্রবন্ধে মনঃসংযোগ করিতে না হয়, যেন প্রবন্ধ এরূপ পাঠকের জানাশুনা একটা বিষয় লইয়া হয়। আর এরূপ প্রবন্ধ আমায় লিখিতে হইলে, তাহার ওজন ও পরিমাণ কাজেই আগে ঠিক করিয়া লইতে হয়। বিষয়ের কথা ত আছেই।

আমার পঞ্চম জিজ্ঞাসা—প্রবন্ধ কোন ভাষায় লিখিব? আপনি যদি প্রবন্ধটা বড় সোজা মনে করিয়া না ভাবিয়া চিন্তিয়া বলেন বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে, তবে আমি আপনার বুদ্ধির পরিধি বড় বেশী মনে করিব না। লিখিব, অনভিমানী বাঙ্গালী পাঠকের জন্য, প্রবন্ধ ছাপাইতে চাই বাঙ্গালা মাসিক পত্রে। সুতরাং প্রবন্ধ যে বাঙ্গালায় লিখিতে চেষ্টা করিব, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সে কিরূপ বাঙ্গালা ভাষা। উহার নমুনা ত অনেকরূপ দেখিতে পাই। বিলাতী সভ্যতা বেজায় জোরে আমাদের টানিয়া লইতেছে আমাদের ভাষাও সেই টানে বড় জোরে অগ্রসর হইতেছে। বিলাতী সভ্য বুটপরা, আধুনিক ভাবগুলিকে পুরাণ, সেকেলে ভাষারূপ গরুর গাড়িতে চড়াইয়া লইয়া যাইতে আর ইচ্ছা করি না। অথবা সে ভাবগুলিকে আর সেকেলে দেশী সাড়ী পরাইয়া মন তুষ্ট হয় না, হোক না কেন সে সাড়ীগুলি ঢাকাই কি শান্তিপুরে। তাহাদের 'গৌণ' পরাইতে হইবেই।

আমাদের পোষাকে যেমন অর্দ্ধেক দেশী অর্দ্ধেক বিলাতী দাঁড়াইয়াছে, আমাদের ভাষায়ও সেইরূপ অর্দ্ধেক ইংরাজী কথা প্রবেশ করিতেছে। সে

কালে ইংরাজী শিক্ষিত পাঁচ ইয়ারে বসিয়া কথাবার্ত্তা কবার সময় বাঙ্গালার মধ্যে ইংরাজীর বুকনি চলিত। এখন লেখার মধ্যে তাহা চলিতেছে, দৃষ্টান্ত আমার এই পত্র! পূর্ব্বে ছিল সংস্কৃত ভাঙ্গা খাঁটি বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা। তখন 'লেখার' ভাষা আর 'বলার' ভাষা ভিন্ন ছিল। হুতুমের অনুগ্রহে দুয়ে মিলিয়া এক হইয়াছিল। শেষে তাহাতেও আর কুলাইল না। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের বা কমলাকান্তের ততোধিক রংদার অথচ প্রীতিকর ভাষাতেও আর কুলাইল না। এখন দেখি ইংরাজী ভাবের আর বাঙ্গলা প্রতিশব্দ নাই। এখন ইংরাজী ভাব সমেত ভাষা বাঙ্গালায় প্রবেশ করাইতে হইবে। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় গত শ্রাবণের ভারতীর ভাষা-বিভ্রাটটা দেখিয়া লইবেন। লেখক প্রস্তাব করিয়াছেন, "একবার ইংরাজী কথা বাঙ্গালা লেখায় চালাইতে আরম্ভ করিলে অতি সহজেই আমাদের ভাষায় অনেক নূতন কথা প্রচলিত হইয়া পড়িবে।" হরি হরি! কি (Grand idea) হায় হায়! আমাদের পুরাতন ঋষিগণ যদি এই সব ইংরাজি কথা পাইতেন তবে তাঁহাদের দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে কত নূতন ভাবই আসিত! তাহা হইলে সংস্কৃত ছাড়িয়া অন্যত্র 'কথা' ভিক্ষা করিতে যাইতে হইত না। বাঙ্গালি নাকি বড় বাক্যবিশারদ, তাই ইহারই মধ্যে তাহার এত "কথার" টানাটানি হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক সম্পাদক মহাশয়! জিজ্ঞাসা করি, আমি কি এইরূপ আইডিয়া বাঙ্গালা ক্যারেক্টারে লিখিত ইংলিস ওয়ার্ড দ্বারা এক্স প্রেস্ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া আপনার পাঠকগণকে উপহার দিব?

যাউক আর 'জিজ্ঞাসা' বাড়াইয়া প্রয়োজন নাই। আশা করি আমাকে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অনুজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে আমার এই কয়টী গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিবেন। "অথাতো প্রবন্ধ জিজ্ঞাসা।"

অদ্ভুতে বিশ্বাস।

অদ্ভুতে বিশ্বাস করা মানবের একরূপ স্বভাব-ধর্ম্ম। দিক ভেদ নাই দেশ ভেদ নাই, জাতি ভেদ নাই; সমাজ ভেদ নাই, কালাকাল ভেদ নাই—এই বিশ্বাস সর্ব্বথা অক্ষুণ্ণ। আমি অতি সাধারণ ভাবে এই কথার উল্লেখ করিতেছি। হইতে পারে আপনি প্রেত যোনীর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন অথচ হিপনটিক নিদ্রায় আপনার অবিশ্বাস নাই। হইতে পারে আপনি প্রেতিনী মানেন না অথচ প্লানচেট মানেন। অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক বিগনাম ইয়ং সাহেবের শিষ্যত্ব করিতে লজ্জা বোধ করেন না। সত্য যুগে পর্ব্বতের পাখা ছিল উড়িয়া বেড়াইত, প্রাচীন হিন্দুর একথা শুনিয়া লণ্ডনবাসী ইংরেজ হাস্য করিবেন অথচ খৃষ্টীয় মিরাকেল (miracle) বিশ্বাস করিতে তাহার আপত্তি হইবে না। একজন জিন খোবিশের অস্তিত্ব অনায়াসেই বিশ্বাস করিবেন অথচ শ্রীমৎ হনুমান সূর্য্য দেবকে কুক্ষিতে ধারণ করিয়াছিলেন শুনিয়া আনন্দে অধীর হইবেন। এই সকল বৈষম্য, তারতম্য ও ব্যতিক্রম থাকিতে পারে, তাহাতে আমার মূল কথার কোন খণ্ডন হইতেছে না। আমি একরূপ প্রকারের অদ্ভুতে বিশ্বাস করি অন্য একজন অপর প্রকারের অদ্ভুতে বিশ্বাস করেন। করুন; কিন্তু মানব মনে কথিত ধর্ম্ম বা উপধর্ম্মের একরূপ অস্তিত্বের কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিতেছে না। বরং আমার কথাই বিশদরূপে বুঝা যাইতেছে।

প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে পুরাকালের লোকের অদ্ভুতে বিশ্বাস ছিল। খৃষ্টান, মুসলমান, য়িহুদী; আবার, গ্রীক্, রোমক, পারসিক, মূর, চীন, ইংরেজ, আফরিক কাহারও এড়াইবার যো নাই। আমি ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, নহিলে গ্রীক্ দেব দেবীর লীলা, প্রাচীন মিশরের দেবতাদিগের কথা, সূর্য্য উপাসকদিগের বৃত্তান্ত; ড্রুইডদিগের ব্যাপার প্রভৃতি লিখিতে পারিতাম। তাহা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার কথা বুঝাইবার জন্য অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। লোহিত সমুদ্র শুখাইয়া গিয়াছিল। অনুর্ব্বর শৈলখণ্ডে মূসা যষ্টিক্ষেপে শীতল-বিমল-সলিল উৎস সৃজিত হইয়াছিল; একজনের উপযোগী খাদ্যে সহস্র সহস্র জনের উদর পূর্ত্তি হইয়াছিল; গুরুতর পীড়া হস্ত স্পর্শ মাত্রে মানব দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল; অস্থিখণ্ড মাত্র ভূমিতে প্রোথিত হইবামাত্র অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত সহস্র সহস্র যোদ্ধা কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবন পাইয়াছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার দেখুন। ভাগ্যবান রাজার একেবারে ষাইট হাজার সন্তান জন্মিয়াছিল; কেবল মাত্র আর্ত্তব শোণিত পুত্র সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল; ছিন্ন মুণ্ড ভূমি হইতে স্বত উঠিয়া ছিন্ন স্কন্ধে যুক্ত হইত; সন্তান উৎপাদনের জন্য জরায়ূর কিম্বা মনুষ্য জরায়ূর আবশ্যকতা ছিল না; মানব বিমান-বিহারী ছিল; মৃত ব্যক্তি পুন পুন প্রাণ পাইত। পুরুষের গর্ভ হইয়াছিল। আবার প্রাচীন বীরের যুদ্ধ দেখুন—

এক গোটা বাণ বীর তুণ হইতে আনে
দশ গোটা বাণ হয় ধনুকের গুণে
গমনে শতেক হয় সহস্র পতনে॥

এ হেন বাণের বাণ—

আমর্থ সামর্থ বাণ বাণ কর্ণ রেখা।
দুই জনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা॥
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ অগ্নি অবতার।
তরণী বরুণ বাণে করিল সংহার॥
পাশুপাত বাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বৈষ্ণব বাণেতে বীর করে নিবারণ॥
হানিল পর্ব্বত বাণ অতি ভয়ঙ্কর।
পবন বাণেতে নিবারিল নিশাচর॥
সর্প বাণ মারিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তাহা দেখি তরণীর ভীত হইল মন॥
কি কব বাণের গুণ অতি ভয়ঙ্কর।
গরুড় বাণেতে নিবারিল নিশাচর॥
কুহ বাণে লক্ষ্মণ করিল কুহময়।
দশদিক অন্ধকার দৃষ্টি নাহি হয়॥
অন্ধকারে দেখিতে না পায় নিশাচর।
আপনা আপনি কাটাকাটি পরস্পর॥

তরণীর সৈন্যেতে হইল মার মার।
চিকুর বাণেতে নিবারিল অন্ধকার ॥
কোপেতে গন্ধর্ব্ব বাণ মারিল লক্ষ্মণ।
ত্রিশ কোটী গন্ধর্ব্ব হইল ততক্ষণ ॥

* * *

আর কুম্ভকর্ণ—

যায় অর্দ্ধ লঙ্কাপুরী কুম্ভকর্ণ ভোগে।
ছয় মাস নিদ্রা যায় এক দিন জাগে ॥

* * *

সোণার নির্ম্মিত গৃহ অতি মনোহর।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বিচিত্র বহুতর ॥
ত্রিশ যোজন ঘর খান দীর্ঘে নিরূপণ।
আড়ে দশ যোজন দেখিতে সুগঠন ॥
চারি ক্রোশ যুড়ি দ্বার আড়েতে নির্ণয়।
দীর্ঘেতে যোজন অষ্ট দৃষ্টি নাহি হয় ॥

* * *

রত্ন খাটে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন।
নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় পবন ॥
দুয়ারের নিকটে যে রাক্ষস আসে।
উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিশ্বাসে ॥
টানিয়া নিশ্বাস যখন তুলে নিশাচর।
রাক্ষস যতেক ঢোকে নাকের ভিতর ॥

* * *

জাগাইবার জন্য—

বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ ঢাক।
দ্বিগুণ বাড়িল আর নাসিকার ডাক ॥

আহার—

হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে।
পালে পালে ধরি ধরি খায় একেবারে ॥

বহু দিন অনাহারে খায় বাড়াবাড়ি।
মদ খেয়ে উজারিল সাত শত হাঁড়ি ॥
নহে সে সামান্য হাঁড়ি কি কব বাখান।
পশ্চিমের বন্দ যেন ঘর এক খান ॥

মধ্য যুগের শেষাংশেও এই বিশ্বাসের পরিণতির ব্যত্যয় হয় নাই। আমাদের কথা কহিব না। যখন বেকন নবম্ অরগেণম্ ভাবিতে ছিলেন যখন ড্রেক কুক জলপথে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, যখন হাক্‌লুইটের প্রবন্ধ লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিতেছিল, যখন হিস্পানী আর্ম্মেদা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইতেছিল, তখন ম্যাকবেথ্ লীয়র ওথেলোর সৃষ্টি কর্ত্তা হামলেটে প্রেতযোণীর অবতারণ করিতেছিলেন; তখন লোকে পরশমণির অন্বেষণে আকাশ পাতাল এক করিতেছিল; তখন অমৃত আস্বাদনে স্থির যৌবন ও অমর হইবার জন্য দলে দলে সুবুদ্ধি মানব জীবন বিসর্জ্জন করিতেছিল। তখন কি লোকে আলা উদ্দীনের প্রদীপ কে কল্পনা মনে করিত? তখন জিপ্‌সী ডাইন নাই বলিলে কি য়ুরোপের লোকে কর্ণপাত করিত—না তাহাদিগকে হুতাশন দগ্ধ করিতে ক্ষান্ত থাকিত? তখন যদি য়ুরোপের লোকে জানিত যে সাধনায় তাল, বেতাল, পিশাচ ও দেবী সিদ্ধ হইতে পারা যায়, তখন যদি মরণ, মারণ, উচাটন, জাদুকরণ, বশীকরণ, পশু পক্ষীর কথা হৃদয়ঙ্গম, প্রেত আহ্বান ও পরদেহে আত্মা পরিচালনের কথা তাহারা শুনিত, তাহা হইলে, ঘরের কোণে পবিত্র বাইবল গুঁজিয়া রাখিয়া তাহারা করণ কারণ ও ক্রিয়া কাণ্ডের উদ্যোগে সংসারের কার্য্য ত্যাগ করিয়া এক মনে এক ধ্যানে বসিয়া যাইত। এই যে দলে দলে য়ুরোপী মিশনরি যাইয়া অযুত অযুত অসভ্য কাফরিকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া শিক্ষিত করিয়াছিলেন কই তাহাদের হৃদয় হইতে মুহূর্ত্ত কাল জন্য কি তখন ওবিয়া-ভীতি দূরীভূত করিতে পারিয়াছিলেন,—না আজি এখনও এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও সেই প্রাণ-সঞ্চারিণী ওবিয়া-প্রীতি নিরাকৃত করিতে পারিয়াছেন?

বর্ত্তমান কালের কথা আর সবিস্তারে কি কহিব? গুটি কত কথা স্মরণ করাইয়া দিলেই চলিবে। ভূত, প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য, শঙ্কচূর্ণী, প্রেতিনী, মাম্‌দো, জিন, খোবিশ, পরী, গোষ্ট, নোম, যক্ষ, ডুক প্রভৃতির দিন

আজিও গত হয় নাই। টেলিফোন, আরিথোমিটর, ফনোগ্রাফ, হাইড্রোগ্রাফ্, ডিনামাইট, টর্পিডো, ইলেক্‌ট্রোকিউসনের দিনেও উপদেবতাগণের অধিকার সমানই বিস্তৃত। জিজ্ঞাসা করিলে বাক্যবীর কোন ব্যক্তি অনায়াসেই বলিবেন "ভুক্ত আবার কি, ভূত ত আমরাই? তবে, হাঁ রাত বিরেত সাপ খোপের ভয়টা আছে বটে।" অথচ বন্ধুদের বাটীতে দিন দুপুরে কোথা হইতে ইট, গোহাড়, মড়ার মাথা পড়িতেছে শুনিলে স্তব্ধ হইয়া থাকিবেন। এক দিন "মাঁচ দেঁ" শুনিলেই ইহাদের প্লীহা চমকাইয়া থাকে। রুষ-জার পল নিকোলাসের মাতা রাজ্ঞী ক্যাথারীণ মৃত্যুর পর রাজ পরিচ্ছদে পরিশোভিতা হইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আসিয়া উপবনে স্বীয় সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। সকলেই দেখিত। জার পল ইহাতে বিরক্ত হইয়া এক দিন আপন শরীর রক্ষক ছয় জন সৈনিককে রাজ্ঞীর প্রেতাত্মার উপর গুলি চালাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সশব্দে বন্দুকের গুলি ছুটিল—মূর্ত্তি শূন্যে লীন হইয়া গেল। তদবধি মূর্ত্তি আর আসিত না। কথা মিথ্যা নহে। প্রত্যক্ষকারীর লিখিত বৃত্তান্ত বর্ত্তমান আছে। পোষক প্রমাণ আছে। এখনকার দিন কিন্তু মুক্তাত্মার দিন স্পিরিচুয়ালিস্‌ম্, মেস্‌মেরিজ্‌ম্, হিপনটিসম্, ক্লারোভোয়েন্স ও থিওজফির "মহাত্মা" দের দিন। কয়েক বৎসর মাত্র হইল মান্দ্রাজের আদিয়র আশ্রমে রুষ নারী মাডাম ব্লাভেটস্‌কী (পঞ্চানন্দের বলবৎ সখী) কতই না অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য বা মিরাকেল দেখাইলেন? আমাদের ভানুমতীর বাজীর কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। ভু-কৈলাসের রাজ বাড়ীর সাধুর কথা না হয় ধরিলাম না। হুগলীর উকীল ৺ শিবনাথ রায়ের বাসায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সোণামুখী নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ তারাপদ চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছিলেন। তিনি দিনের বেলায় সকলের সম্মুখে বড় বড় পাথর গিলিয়া ফেলিতেন ও উগারিয়া ফেলিতেন। কোঁছড়ের ভিতর হইতে মুড়ি ছানাবড়া ফুল যাহা ইচ্ছা বাহির করিয়া দিতেন। গৃহমধ্যে রজ্জুবদ্ধ করিয়া কুলুপ দিলেও কেমন করিয়া তিনি তখনই বাহিরে আসিতেন। আর একজন মহাপুরুষ হোসেন খাঁ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তিনি যে দ্রব্য স্পর্শ করিয়া আপনার বাসায় আসিতেন সেই দ্রব্য আর সেই স্থানে থাকিত না তাঁহার বাসায় আসিত। ৺বারাণসী ধামের শ্রীমৎ তৈলঙ্গ স্বামীর কথাও অনেকের অবগতির মধ্যে। ভাল এ সব কথাও যেন ধরিলাম না। কিন্তু সুযোগ্য, সদ্বিদ্বান, বহুদর্শী, জ্ঞানী, ইংরেজ, সিনেট সাহেবকে অদ্ভুতে বিশ্বাস করার জন্য যে ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান দৈনিক সংবাদ পত্র পাইওনিয়রের সম্পাদকতা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহা ত অনেকে জানেন। এক লক্ষ টাকার প্লানচেট যে দেশে এক মাসে বিক্রয় হয় সে দেশের লোকের কম্বারলণ্ড সাহেব মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন ইহা ত জানা উচিৎ। জলপড়া, ধূলাপড়া, নলচালা, হাতচালা, সরিষা পড়া, বাণমারা,, ঝাড়ন-ঝোড়ন যে দেশের অধিকাংশ লোকে প্রকাশ্যে মানে, অঘোরীপন্থীরা যে দেশে জাদু শিখিবার জন্য শব দেহ ভক্ষণ করে, যে দেশে গঙ্গা মন্বরার অন্ন-সংস্থানের চিন্তা নাই, সে দেশের লোকের মনে রাখা ত উচিৎ যে বিলাতে কয়েক জন পাদরী কেবল মাত্র অঙ্গ স্পর্শ করিয়া রোগীর ব্যাধি বিনাশ করিয়া থাকেন ও তাহারা জন সমাজে Faith healer বলিয়া পরিচিত। বিলাতের পেলমেল বজেটের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ষ্টীড সাহেব একজন ঘোর অদ্ভুত বিশ্বাসী। উপদেবতা ও মুক্তাত্মাদের সহিত ইহাঁর রীতিমত কথা বার্ত্তা চলিয়া থাকে। ফরাশি দেশের একদল বৈজ্ঞানিক হিপনটিসম্ লইয়া মাতিয়া আছেন। নাস্তিক ব্রাডলার প্রিয় সখী মিস্ বেসান্ত থিওজফিষ্ট হইয়া অধুনা আমেরিকায় অদ্ভুত বিষায়ণী বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। আর চিকাগো সহরের মহামেলায় ধর্ম্ম-পার্লমেণ্টে বড় বড় বিখ্যাত পাদরী হিন্দু ধর্ম্মের কথা শুনিয়া পরলোক ও পুনর্জন্ম বিশ্বাস করিয়াছেন। মান্দ্রাজের কাইটলী সাহেব "ইণ্ডিয়ান মিরর" সংবাদ পত্রে এ কথা ঘোষণা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের কথা বিশেষ করিয়া আর কি স্মরণ করাইয়া দিব? আর্য্যের যোগশাস্ত্র এক অপূর্ব্ব রত্ন ভাণ্ডার। যোগ-সিদ্ধ পুরুষও দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের কথা আর সংক্ষেপে কি লিখিব?

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কথা বলিতে হইলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে হয়। মৃত্যুর পর মানুষের কি হইবে এ সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ বা অনুমান ভেদ আছে। হইবারই কথা, কেন না——

That undiscovered country
From whose bourne no traveller returns.

অনেকে বলেন ইহ জীবনই সব শেষ মৃত্যুর পর কিছু নাই। আবার

অনেকে মৃত্যুর পর স্বর্গ নরক ভোগ মানিয়া থাকেন। সৎকার্য্য ভেদে স্বর্গ ভেদ, পাপ কার্য্যের প্রকার ভেদে নরকের প্রকার ভেদ। তিব্বৎ, সিংহল, যব, ব্রহ্ম, চীন, জাপান ইহাদের এই বিশ্বাস যে হিন্দুদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা একরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুদিগের স্বর্গ নরকের সবিস্তার বর্ণনা শাস্ত্র গ্রন্থে আছে। স্থূল কথায়, একজন হিন্দু কি বলেন শুনুন—(যমের তিন দ্বারে বিস্তর ধার্ম্মিক লোক দেখিয়া দশানন দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত।)

দক্ষিণ দ্বারেতে যায় দেখে অন্ধকার
রাত্র দিন নাহি তথা সব অন্ধকার
যত যত পাপী লোক সেই দ্বারে থাকে
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে
চৌরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ দুয়ারে
নরকে ডুবায়ে সবে যমদূতে মারে
যেই জন পরদার করেছে কৌতুকে
সেই জন কুম্ভী পাকে ডুবিছে নরকে
সুতপ্ত তৈলেতে কুম্ভ অগ্নির উথাল
তাহাতে ধরিয়া ফেলে যায় গার ছাল
অগম্য গমন করে যে হরে ব্রাহ্মণী
তার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী
লোহার ডাঙ্গস দূত মারে গোটা গোটা
বসিয়া ডাঙ্গস মারে বিন্ধে লোহ কাটা
সর্ব্বাঙ্গ সেচনেতে তাহার পচে মাংস
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পোকা খুলে খায় অংশ
হাতে গলে বান্ধে তার দিয়া চর্ম্ম দড়ি
মাথার উপরে তুলি মারে লোহার বাড়ি
মস্তক ফাটিয়া যায় রক্ত পড়ে ধারে
পরিত্রাহি ডাকে তারা বিষম প্রহারে
গদা ঘাতে মাথে তার রক্ত পড়ে স্রোতে
বিষম প্রহার তারে করে যমদূতে

নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী কলেবরে
বিষ্ঠা মাঝে পাপীলোক ফাফরিয়া মরে
গৃধিনী শকুনি মাংস টানে চারি ভিতে
উপাড়ে সাড়াসি দিয়া মারে যমদূতে
হস্ত পদ নাসা কর্ণ নয়ন জিহ্বায়
লোহার বাড়ীতে মারে অসহ্য সে দায়
পাপ পুণ্য ভাগী হয় যে ইন্দ্রিয়গণ
বিষম প্রহার ভুঞ্জে যমের তাড়ন
পরস্ত্রীকে যে জন দিয়াছে আলিঙ্গন
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন
লৌহময় স্ত্রী তথায় আনে যমদূতে
অগ্নি মধ্যে তাহাকে তাতায় ভাল মতে
অগ্নি লৌহা জ্বলে যেন জ্বলন্ত অনল
পাপী সব তাহাতে ধরিয়া দেয় কোল
পরস্ত্রী দর্শন যেই করে এক চিতে
দুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে
পরস্ত্রী লইয়া যেবা করেছে রমণ
চির কালাবধি ভোগে নরকে সেজন
তাহাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার
কোটী কল্প না হয় সে নরকে উদ্ধার
মরম হইতে তার হরয়ে পরাণ
করাতে চিরিয়া তারে করে দুই খান
বিপরীত রক্তেতে জালুকা তার শোষে
পাণীয় চাহিতে যমদূতে মারে রোষে
ব্রাহ্মণ দেবের স্ত্রী হরে যেই জন
তার প্রহারের কথা শুন দিয়া মন
হস্ত পদ বান্ধে তার দিয়া চর্ম্ম দড়ি
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি
বুকে শেল মারে কেহ চক্ষু টানি ধরে

পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে
দেবতা স্থাপিয়া যেবা না করে পূজন
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন
হস্ত পদ বান্ধি ফেলে দিয়া চর্ম্ম দড়ি
তাহার উপর মারে দুহাতিয়া বাড়ি
ঘাড়ে মুড়ে বান্ধি ফেলে অগ্নির উপর
বিষম প্রহার ভুঞ্জে সহস্র বৎসর
পরধন যে জন করিল ডাকা চুরি
ক্ষুর ধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি
মিথ্যা সাক্ষী দেয় পরে বলে মিথ্যা বাণী
তার প্রহারের কথা কি কব কাহিনী
উত্তপ্ত সাড়াসি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি
যে হরে গচ্ছিত আর হরে স্থাপ্যধন
নরকে ডুবায় তারে যমদূতগণ
ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে মারে জ্যেষ্ঠ ভাই
মুষল তাহারে মারে তায় রক্ষা নাই
পর হিংসা করে কহে অসত্য বচন
বিষম তাহার হয় যমের তাড়ন
অপাত্রকে কন্যা দেয় আর লয় কড়ি
তাহার মাথায় দেয় মাংসের চুপড়ি
মাংস লহ লহ বলি সদা ডাক ছাড়ে
মাংসের রসানি তার বুক বয়ে পড়ে
অতিথি পাইয়া যেই না করে জিজ্ঞাসা
অপার দুর্গতি তার নরকেতে বাসা
একজন দান করে অন্যে দেয় হাতা
তার বুকে দেয় যম জগদ্দল জাতা
সীমা হরে যেই জন পোড়ায় পর ঘর
বিষম প্রহারে তায় যমের কিঙ্কর

উভয়ের ন্যায় এক পক্ষে পক্ষপাতী
কুম্ভপাকে ফেলে তারে করিয়ে আঘাতি
লোকে পীড়া দিয়া যে তুষিয়াছে ঈশ্বর
পায় সে কুকুর জন্ম সহস্র বৎসর
লোক রক্ষা করিয়া যে রাজ্য করে নাশ
হইয়া শৃগাল জাতি খায় মৃত মাস
না চিন্তায় রাজহিত চিন্তে প্রজাহিত
বিষম প্রহার তার কার্য্যের উচিৎ
ব্রহ্ম হত্যা সুরাপান করে যেই জন
বিষম যাতনা ভোগ করে অনুক্ষণ
গুরুপত্নী গমনেতে যত পাপ হয়
তাহার উচিৎ দণ্ড শরীরে না সয়
মরণে মরণ নাহি দুঃখ মাত্র সার
কর্ম্মভোগ ভুঞ্জে লোকে না দেখি নিস্তার
ব্রাহ্মণ শূদ্রানী গমনে যে প্রমাদী
সে সবার পাপ কর্ম্মে সধর্ম্ম হয় বাদী
চণ্ডাল জনম হয় শূদ্রাণী গমনে
সর্ব্ব কম্ম নষ্ট হয় তার দরশনে

রাজা হয়ে প্রজা না করে পালন
পরলোকে নরক তার হয় না খণ্ডন।

যেই জন শূদ্র হইয়া হরয়ে ব্রাহ্মণী
তাহার বিষম রোল বড় ডাক শুনি

লক্ষ লক্ষ সাড়াসিতে গায়ের মাংস টানে
খুলে খায় গায়ের মাংস সহস্র সঞ্চানে

ডাঙ্গসের বাড়ী মারে হয় থান থান
কোটি কল্প ব্রাহ্মণের নাহিক এড়ান

যে জন করিয়া কর্ম্ম না করে শোধন
তার পিতৃ লোকের সে যমের তাড়ন

বিঘত প্রমাণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে
তথির উপরে ফেলে ধরি তার মুণ্ডে
প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির উত্তাল
তথির উপরে ফেলে উঠে গায়ের ছাল
অগ্নি মধ্যে সাড়াসি তাতায় ভাল মতে
তাহা দিয়া গাত্রের মাংস কাটে যমদূতে
ইত্যাদি নরক ভোগ করে বহুবার
ব্রাহ্মণের শাপে কার নাহিক নিস্তার
পর হিংসা করে যেবা স্বজনেরে নিন্দে
চামদড়ি দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে
গলায় সাড়াশি দিয়া করে টানাটানি
খাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় হানাহানি
দারুণ যন্ত্রণা তাহা কহিবার নয়
গলায় গরগণ্ড তার বড়ই সংশয়
দেখিল রাবণ পুরুষের যে যন্ত্রণা
ইহা হইতে বাইস গুণ নারীর ঘটনা
বড় ছোট করিয়া করুক যত পাপ
পাপানুসারেতে ভুঞ্জে শমনের তাপ।

এ পিনাল কোড বড় সোজা কাণ্ড নহে। ভূমণ্ডলের অর্দ্ধেক মানব এই পিনাল কোড বা ইহারই রূপান্তর মানিয়া থাকে। খৃষ্টানী নরকেও যাতনা আছে। তবে প্রস্তর গন্ধক ও অগ্নির কিছু বাড়াবাড়ি।

মৃত্যুর পর মানবের গতি কি হইবে তাহা যদিও অনুমান মাত্র, তথাপি মানব মৃতের আত্মার সদ্গতির জন্য ও আত্মার প্রীত্যর্থে অনেক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা পুনর্জ্জন্ম মানেন না, পরলোকের কথাও একটু অস্পষ্ট, তথাপি ইহাঁরা ৪০ দিনে একরূপ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। আমাদের আদ্য শ্রাদ্ধ ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ত আছেই, তদ্ব্যতীত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ আছে, তীর্থ শ্রাদ্ধ আছে। ৺গয়ায় প্রেতশীলায় পিণ্ড দান আছে। মৃতের সাক্ষাৎ অগতি হইলে কুশ-পুত্তল দাহ আছে। মৃত ত্রিপাদ বা পুষ্করা দোষ প্রাপ্ত হইলে মৃতের সদ্গতির ও দোষ শান্তির জন্য নির্জ্জন প্রদেশে বা নদীর চরে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া মদ্গুর মৎস্য অথবা কৃষ্ণ ছাগ শিশুকে হরিদ্রাভিষিক্ত ও মন্ত্রপূত করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিবার জন্য পাশমুক্ত করিবার ক্রিয়া আছে। অগুস্ত কোম্‌তের শিষ্যগণ শ্রাদ্ধ মানিয়া থাকেন। পৃথিবীর অনেক বড় বড় লোক কোম্‌তের শিষ্য। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ অসামান্য অলৌকিক প্রতিভাশালী মৃত মহাত্মা দ্বারকানাথ মিত্র কোম্‌তের শিষ্য ছিলেন। অধুনাও বঙ্গদেশে কয়েক জন বিশিষ্ট কৃতবিদ্য ব্যক্তি কোম্‌তের শিষ্য আছেন। সম্প্রদায় বিশেষের সমাধি মন্দিরে জীবিতের ন্যায় মৃতের পরিচর্য্যা হইয়া থাকে। জীবিতের অবশ্য কর্ত্তব্য দৈনন্দিন কার্য্যের জন্য সমস্তই প্রস্তুত থাকে। আছে সবই, থাকে সবই—কেবল মাত্র মানুষ নাই। রোমান কাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত খৃষ্টানেরা মৃতের আত্মার সদ্গতির জন্য বহুকাল ধরিয়া ও বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া একটি বা তদধিক গির্জায় দিনে দিনে ও বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে “মাস্” মন্ত্র (mass) পাঠ করিয়া থাকেন। খৃষ্টানেরা আত্মার কার্য্যাকার্য্যের শেষ বিচারের দিন মানিয়া থাকেন। আত্মা প্রতি গমন করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব দেহে অধিষ্ঠান হইবে এই বিশ্বাসে প্রাচীন মিশরবাসীরা ওষধি অভিষিক্ত মৃতদেহ সুরক্ষিত করিবার জন্য পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখনও মিসরে স্থানে স্থানে ঘোর নির্জ্জনে “মমী” প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার পীরু দেশে হিস্পানী আক্রমণের পূর্ব্বে ইঙ্কা উপাধিধেয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। ইহারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ গত হইল গভীর মৃত্তিকা খননের পর এই দেশে এক বৌদ্ধ মন্দির ও এক বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। মৃতের আত্মা বিষয়িণী রীতি নীতি সম্বন্ধে ইঙ্কাদের আচার ব্যবহার অনেকটা প্রাচীন হিন্দুদিগের মত ছিল। চীনদিগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রসঙ্গে, অনেকে বলিয়া থাকেন যে কংফুচী নরকে আছেন এই মর্ম্মে অদূরদর্শী উষ্ণ-শোণিত মিশনরী বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়াই চীন দেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের বহুল বিঘ্ন ঘটিয়াছে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে। বাস্তবিক এ সম্বন্ধে লিখিবার এত কথা আছে, যে লিখিলে এক খানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া যায়। পুস্তক লিখিতে বসি নাই। এক্ষণে একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক অদ্ভুতে বিশ্বাস

মানব মনে কোথা হইতে আসিল? অনুমান ব্যতীত এস্থলে সকলই মানব মনের সাধ্যাতীত। কিন্তু বিজ্ঞানেও ত অনুমান উপপত্তি গ্রাহ্য হইয়া কার্য্য হইতেছে। বিখ্যাত শর্ম্মণ জ্যোতির্ব্বিদ হর্ ষ্ট্রুম্মার এক মাত্র উপপত্তির উপর নির্ভর করিয়াই ত গগনমণ্ডলের হার্কিউলিস্ নক্ষত্র পুঞ্জের নক্ষত্র বিশেষের (কেহ কেহ বলেন "ভেগা" নক্ষত্র) দিকে সৌর জগতের সূর্য্য, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ ও তাহার উপগ্রহ নিচয় লইয়া দলবলে প্রধাবিত হইতেছে, স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আর সেই উপপত্তি ধরিয়াই ত আমেরিকার ল্যাং সাহেব ও সর্ রবার্ট বল সূর্য্যের গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সৌর জগতের সূর্য্য স্থির নহে প্রমাণ করিয়াছেন। ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদও ত অনুমান। সর্ জন লবকের পীপীলিকা গবেষণা অর্থাৎ স্থূলত, পীপীলিকারা মনুষ্যের ন্যায় ঠিক সকল কার্য্য করিয়া থাকে এই কথা—আজিও অনুমান দেশের সীমা অতিক্রম করে নাই। আচার্য্য গার্ণার বানরের যে ভাষা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাকে অনুমান ভিন্ন আপনি কি বলিবেন? দশ লক্ষ বৎসর পরে সৌরজগতের সূর্য্য শীতল হইয়া যাইবেন, তখন পৃথিবী বাসযোগ্যা থাকিবে না, কোন প্রাণী বাঁচিবে না—সর্ রবার্ট বলের এই গণনা, গণিতের গণনা হইলেও কার্য্যত কি? মাধ্যাকর্ষণ কেহ দেখিয়াছেন কি? জগতে নাস্তিকের সৃষ্টি হইল কেন? ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে নিত্যই নূতন উপপত্তি উপস্থাপিত হইতেছে। অনুমান বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে জ্ঞান বিজ্ঞানের পনর আনা এখনই উড়িয়া যাইবে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

রীণ, শোণ প্রভৃতি কতকগুলি নদীতে কাষ্ঠখণ্ড বহুদিন জলমগ্ন থাকিলে প্রস্তরে পরিণত হয়। মানবের কল্পনা বহুদিন মানস ক্ষেত্রে থাকিয়াই কি বদ্ধমূল বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ডাক্তারেরা বলিয়া থাকেন যে মানুষের হস্ত দ্বারা যে কার্য্য হইয়া থাকে চেষ্টা করিলে মনুষ্যের পদ দ্বারাও সেই কার্য্য হইতে পারে—আলেখ্য লিখন ও সূচী কার্য্য পর্য্যন্ত হইতে পারে। তাঁহারা পদের উপর অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া মানুষকে দোষ দেন। অধিকাংশ য়ুরোপীয় জাতি মুখ সরু জুতা ব্যবহার করেন। বৈজ্ঞানিক বলেন যে ঐরূপ বিনামা ব্যবহারে তাহাদের পায়ের দুই একটি শিরা ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া লয় পাইতেছে

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ। অগ্রহায়ণ, সন ১৩০০ সাল। ৮ম সংখ্যা।

অদ্ভুতে বিশ্বাস।

ও ক্রমে লয় পাইয়া একেবারে বিলুপ্ত হইবে। বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে তাহাদের সন্তান সন্ততি যখন জন্মগ্রহণ করিবে তখন তাহাদের লুপ্ত-শিরা পদ একেবারে পরিলক্ষ হইবে। কেবল মাত্র বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে এই কথা বর্ত্তে এমন নহে।

বাপ্‌কা বেটা সিপাহি কা ঘোড়া,
কুচ্ না হয় ত থোড়া থোড়া।

মানসিক বৃত্তি নিচয় সম্বন্ধেও অনেক স্থলে সন্তানকে পূর্ব্ব পুরুষ পন্থানুসারী হইতে দেখা যায়। গণিত বেত্তার পুত্র গণিত বেত্তা, গায়কের পুত্র গায়ক, কবির পুত্র কবি, মূকের পুত্র মূক, পাগলের পুত্রকে পাগল হইতে দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক ইহাকে Heredity বলেন। কল্পনা পিতা পিতামহের মনে বিশ্বাসে পরিণত হইয়া Heredity অনুসারে কি সন্তান সন্ততির মনে আসিয়া বর্ত্তিয়াছে? তার্কিক হাসিয়া বলিবেন যে এখনও দুইটা কথার সামঞ্জস্য চাহি। প্রথম কল্পনা যে বিশ্বাসে পরিণত হইতে পারে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, আর দ্বিতীয়, সৃষ্টির পর প্রথম মনুষ্যের মনে সর্ব্ব প্রথমে এ কল্পনা কোথা হইতে এবং কেনই বা আসিল? প্রথম কথার উত্তর দেওয়া সহজ বিবেচনা করি। সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ারই মূলে কল্পনা আছে। আর সেই কল্পনার বিশ্বাসে পরিণতি না হইলে কোম বৈজ্ঞানিক গবেষণাও হইত না আর শেষে আবিষ্ক্রিয়াও হইত না। মস্তিষ্কের

অবস্থা বিশেষেও কল্পনাকে বিশ্বাসে লইয়া যায়। চিকিৎসকেরা তাহাকে সাধারণত বায়ু রোগ বলিয়া বর্ণনা করেন। তেলাপোকা কাচপোকা ভাবিয়া ভাবিয়া কাচপোকা হইয়া যায় আর গুব্‌রেপোকা প্রজাপতি ভাবিয়া ভাবিয়া প্রজাপতি হয়—এই কথা প্রবাদ নহে। আর্য্য ঋষিগণ, ব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে মানব তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ দিয়াছেন। “যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” এই বাক্যের নৈতিক বল সামান্য নহে। দ্বিতীয় কথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। মন সৃষ্টির সহিত মনের ধর্ম্মের সৃষ্টি অথবা মতান্তরে মস্তিষ্ক সৃষ্টির সহিত মস্তিষ্কের ধর্ম্মের সৃষ্টি বলিলে, সৃষ্টি বা সৃষ্টি কর্ত্তার উপর সব দোহাই পড়িয়া গেল। সৃষ্টি বা সৃষ্টি কর্ত্তাই মূল হইলেন। সৃষ্টিকে স্বভাব বা প্রকৃতি নাস্তিকেরা বলেন বলুন, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।

আর একটি কথা এই স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। যাহার অস্তিত্ব আছে তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস হইতে পারে আর যাহার অস্তিত্ব নাই তাহারও অস্তিত্বে বিশ্বাস হইতে পারে। অশ্বের ডিম্ব হয় না কিন্তু কোথা হইতে কথার চলন হইল? বিশ্বাস-বিষয়ীভূতের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব বিচার বিতর্ক লইয়া কল্পনা বিপন্না হয় না। কল্পনা কুজ্‌ঝটিকার ন্যায় গোচরীভূত বিষয়টিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। বিশ্বাসকে আমরা স্থায়ী কুজ্‌ঝটিকা মনে করিতে পারি। বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া অনুমানকে এই প্রকার সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে মানব মনের কৌতূহল নিবারণ হয় না। অনুসন্ধিৎসু মানব মন সহজে বলিবে, আচ্ছা মানিলাম অদ্ভুতে বিশ্বাস সাধারণ, কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে সত্ত্বা আছে, না কিছুই নাই, আমরা অশ্ব ডিম্বের অস্তিত্বের ন্যায় ইহা মানিয়া আসিতেছি? অদ্ভুতের মধ্যে অনেক ব্যাপারই ধরা হইয়াছে। একটু সঙ্কীর্ণ করিয়া—ভূত, প্রেত, যক্ষ, পিশাচ প্রভৃতি কথা লইয়াই—দেখা যাউক। প্রথমত ভূমণ্ডলের সমস্ত লোককে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাঁহারা ভূত, প্রেত, মুক্তাত্মা (spirit) নাই, মানুষ ভাক্ত বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া অন্ধ হইয়া চলিয়াছে বলেন, তাঁহারা একদল। আর যাঁহারা বলেন, যে যখন জগৎ ব্যাপিয়া এই বিশ্বাস চিরকাল রহিয়াছে, জ্ঞান বিজ্ঞানে তাহার

ধ্বংস হয় নাই তখন একটা কিছু অবশ্য আছে, তাঁহারা এক দল। বিশ্বাস গোচরীভূত বিষয়ের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব লইয়া এই প্রকারে দুইটি দল। এক দল বিশ্বাস উড়াইতে চাহেন, অন্য দল বিশ্বাস সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিতে চাহেন। প্রমাণ দুই দলেই চাহেন। একদল বলেন প্রমাণ না দিলে কি করিয়া বিশ্বাস করিব? অন্য দল বলেন প্রমাণ পাইলে মনের তৃপ্তি হয়, অন্ধকারে আর ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। এক শ্রেণীর জন্মান্তর বাদীর অনুমান—অদ্ভুতে বিশ্বাস, অবিনশ্বর আত্মার বিস্মৃত স্বপ্নের ন্যায় প্রাক্তন জন্মের পূর্ব্বস্মৃতি, আর মৃত্যুর পর অব্যবহিত ভবিষ্যতের ছায়া সম্পাত—অথবা একটির বা উভয়টির বিকার—প্রথম দল বিশ্বাস করেন না। আর দ্বিতীয় দলও একটি বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অপর একটি অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয় লইতে হয় বলিয়া উৎকণ্ঠিত হন। ইহাঁরা সোজা ভাবে বাঁকা কথা বুঝিতে চাহেন, অনুমান উপপত্তির ধার দিয়াও যাইতে চাহেন না। যাহা হউক একটি ঘটনা বিবৃত করিতেছি, পাঠক মহাশয়, শিরাঙ্কিত প্রসঙ্গ বিচারে কথঞ্চিৎ সাহায্য প্যাইলেও পাইতে পারেন।

জনেক উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারীর দ্বাদশবর্ষীয় পুত্রের সহসা একদিন ফিট্ হইতে লাগিল। পুত্রটি বুদ্ধিমান, শান্ত, বলিষ্ঠ, নীরোগ, স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর, গুণে সর্ব্ব প্রধান—সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি সর্ব্ব শাখাতেই প্রধান। ডাক্তার বাবু কয়েক দিন ধরিয়া চিকিৎসা করিলেন, ফিট্ নিবারণ হইল না। ফিটের সময় অজ্ঞান হইত। এক দিন সন্ধ্যার পর একজন উকীল, অপর একজন উকীল ও ভদ্র লোকের সমক্ষে বালককে মেস্‌মেরাইজ করিয়া নিদ্রিত করিলেন। সেখানে বালকের পিতা ছিলেন ও কালীবাটীর একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া এক জলপড়া দেন, বালক তাহাতে দৃষ্টি করিতে পারে নাই। বোধ হয় উপদেবতার দৃষ্টি হইয়াছে এই মনে করিয়া, বাটীর স্ত্রীলোকদিগের পীড়াপীড়িতে কালী বাটীর ব্রাহ্মণকে আনা হইয়াছিল। বালকের পিতা আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক, স্থূলত প্রাগুক্ত প্রকার অদ্ভুতে অবিশ্বাসী অথচ হরিপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। মেস্‌মেরাইজ নিদ্রাভিভূত হইলে পর বালক ও মেস্‌মেরাইজকারী উকীল বাবুতে এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল।

(বারান্তর)

যষ্টি।

এ সংসারে যত প্রকার পদার্থ আছে, যষ্টির তুল্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্ব্বোত্তম পদার্থ আর নাই; উহা সর্ব্বরত্নোত্তমোত্তম। দুষ্কৃতি, অসৎ, আলস্য, ও অকর্ম্মাগিরি নষ্ট করিতে এমন ঔষধ আর নাই; এমন কি, তত্ত্বাবতের যে আদর্শ পুরুষ ভূত, সেও তাহার দ্বারা সংশোধিত হইয়া যায়; মারের আগায় ভূত পালায়!

দক্ষিণ আমেরিকায় ছিল পারেগুয়া সাধারণতন্ত্র। সাধারণতন্ত্রভুক্ত রাজ্যের মধ্যে এমন ওঁছাটে আর ছিল না। কি কৃষি শিল্প, কি ব্যবসায় বাণিজ্য, কি শৌর্য্য বীর্য্য, সকল বিষয়েতেই পারেগুয়া কাঙ্গালের একশেষ। লোক আলস্যপরায়ণ এত যে কেহ নড়িয়া প্রস্রাব করিতে চাহে না; সুতরাং কি শিক্ষা কি দীক্ষা, কি সেই তাবৎ বিষয় যাহা সাংসারিক উন্নতি নামে খ্যাত, সে সমস্তেই অধিবাসীরা যৎপরোনাস্তি হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন সময়ে পারেগুয়া সাধারণ তন্ত্রের ডিক্টেটর বা অধিপতি নিযুক্ত হইল ডাক্তার ফ্রান্সিয়া।

পারেগুয়া আমেরিক ভূমের অন্তর্গত, সুতরাং বহিঃশত্রু হইতে কাড়াকাড়ীর ভয় ছিল না; এজন্য পারেগুয়া, সর্ব্ব বিষয়ে হীন হইলেও, সাধারণ তন্ত্র রাজনীতিযোগে শাসিত হইত। কিন্তু নামে সাধারণ তন্ত্র হইলেও, কার্য্যে রাজশক্তিতে যথেচ্ছাচার যথেষ্ট। প্রজাসকল হীনতা হেতু রাজকার্য্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিয়া উঠিতে পারিত না, এজন্য যখন যে ডিক্টেটর হইত, সেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইত এবং ক্ষমতা সংগ্রহে আজীবনের ডিক্টেটরগিরী হাত করিয়া, যদৃচ্ছা ক্ষমতা চালনা করিত। ফ্রান্সিয়াও সেইরূপ আজীবন সত্ত্বের ডিক্টেটর। ফ্রান্সিয়া মূলে একজন রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের পাদরী এবং বাইবেল বিদ্যার পাণ্ডিত্য হেতু ফ্রান্সিয়ার উপাধি ডাক্তর।

ফ্রান্সিয়াকে সাধারণ ঐতিহাসিকগণ বড়ই নিন্দা করিয়া থাকে; ফ্রান্সিয়া বড় দুর্দ্ধর্ষ, বড় অত্যাচারী, বড় খুনে ইত্যাদি। তাহার সময়টাকে "রেইন অব টেরর" অর্থাৎ 'ভয়ঙ্কর রাজাধিপত্য' বলিয়া বর্ণিত হয়। কিন্তু

সে যাহাই হউক, এটা নিশ্চয় বটে যে, পারেগুয়া সর্ব্ব বিষয়েতে ফ্রান্সিয়ার সময়ে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এরূপ পূর্ব্বে কখনও করে নাই; অথবা এত অল্প সময়ে যে এরূপ অতি উন্নতি হইতে পারে, ইহা স্বপ্নেও কেহ কখনও ভাবে নাই। কিন্তু তবু দেখ যে ফ্রান্সিয়া হইতে পারেগুয়ার এত উপকার, সামান্যবুদ্ধি সাধারণ ঐতিহাসিকরা তাহারই কিনা এতটা নিন্দাবাদ রটনায় অগ্রসর হয়! সে যাহা হউক, ফ্রান্সিয়া যে এতটা উন্নতি, এতটা উপকার পারেগুয়ার করিতে পারিয়াছিল, তাহার প্রধান উপায় ও প্রধান অস্ত্র কি?—মার!

ফ্রান্সিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই যে ফাঁসিকাট লট্‌কাইয়াছিল, ফ্রান্সিয়ার রাজত্ব ও জীবন উভয় শেষের পূর্ব্বে আর তাহা নামান হয় নাই। একদা ফ্রান্সিয়া এক চর্ম্মকার ব্যবসায়ীকে আদেশ করিল, ঘোড়ার জীন ও দুই একটা কি চামের জিনিস তৈয়ার হইয়া আসিল, কিন্তু নিয়মিত সময় অতিক্রম করিয়া, অথচ জিনিসগুলা পছন্দসহি হইল না। সেবার ফ্রান্সিয়া ভৎর্সনা পূর্ব্বক দ্রব্যগুলা সহ চামার পুত্রকে ফেরত দিল। দ্বিতীয় বার তৈয়ার হইয়া আসিল, সেবারও কড়ারের অতিক্রম বিলম্বে এবং সেবারও অপছন্দ; এবার ফ্রান্সিরা চামার পুত্রকে একটু তাড়না কয়িয়া বিদায় দিল। তৃতীয় বারেও আবার সেই বিলম্ব, আবার সেই অপছন্দ; অথচ চামার নানরূপ দিব্য করিয়া বলিতে লাগিল যে তাহার যতদূর সাধ্য সে তাহা করিয়াছে, তাহাতে কিছু মাত্র ত্রুটী হয় নাই এবং বিশেষতঃ কাজটা বড়ই গুরুতর হয় কি না, তাই রাত দিন শ্রম করিয়াও কোন ক্রমে নিয়মিত সময়ের মধ্যে শেষ করিতে পারে নাই। ফ্রান্সিয়ারও মুখ ফুটিয়া বাক্য বাহির হইল।—"কোই হায়, লে যাও ইস্কো ফাঁসি কাঠ্‌মে।" অবশ্যই ফ্রান্সিয়া ও চামারের যে কথা বার্ত্তা বা মোটের উপর বাক্‌ যোজনা যাহা কিছু তথায় হইয়াছিল, তাহা তাহাদের উভয়েরই মাতৃ ভাষা সেই স্পানিয়ার্ড ভাষায়।

চামার আর নাই; ফাঁসি ত পরের কথা, হুতাসেই তাহার প্রাণ আগে ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। হায় হায়, বাপ! পোড়া এক জীন করিতে গিয়া ঠক্কর খাইয়া এমন ঠায় ফাঁসিকাঠে প্রাণটা যায় গা। চামার চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া একেবারে সটান ফ্রান্সিয়ার

পায় পড়িয়া কান্নাকাটী। কিন্তু ফ্রান্সিয়ার কঠিন হৃদয় গলিল না। আবার সেই সর্ব্বনেশে হুকুম,—লে যাও ফাঁসিকাঠমে।” এইরূপে একবার দুবার চারিবার, অনেক কান্নাকাটী, অনেক কাকুতি মিনতি, অনেক প্রাণ ভিক্ষা চাওয়া চায়ি; কিন্তু হায় তবু সেই একই হুকুম,—“লে যাও ফাঁসি কাঠ মে।”

শেষ চামার নিরুপায় হইয়া তখন বলিতে লাগিল,—“হজুর, এ যাত্রা আমায় প্রাণ ভিক্ষা দিন, আপনি যে সময়ে বলিবেন সেই সময়ের মধ্যেই ও আপনার পছন্দ সহি করিয়া তৈয়ার করিয়া আনিব।”

“বিনা সাহায্যে স্বহস্তে অথচ নিরূপিত সময়ের মধ্যে করিবে?”

“তাহাই করিব।”

“ভাল, তাহাই হউক, কিন্তু তথাপি হুকুম একেবারে বৃথা হইতে পারে না।” উপস্থিত শাস্ত্রির প্রতি হুকুম হইল যে চামারকে তিনবার ফাঁসিকাঠ প্রদক্ষিণ করাইয়া ছাড়িয়া দেয়। তাহাই হইল।

কিন্তু হুকুম কি সর্ব্বনেশে। অন্যের বিনা সাহায্যে, বিনা উপদেশে, স্বহস্তে কড়াড়ের মধ্যে অথচ করিতে হইবে—যাহা এত চেষ্টাতেও কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারে নাই।

কিন্তু তাহাই হইল। ফাঁসিকাঠ প্রদক্ষিণ! সুতরাং এবার আর কোন বাধা বিপত্তিই চামার পুত্রকে আট্‌কাইতে পারিল না। চামার এবার কড়ারের আগেও হাজির, অথচ জিনিসটা এমনই উত্তম হইয়াছে যে ফ্রান্সিয়ার পছন্দ সহি অপেক্ষাও কিছু বেশী বেশী। এমনই হয় বটে, মারেই এমনই গুণ! সেই হইতে এই সময়ের এমনই ক্ষিপ্রহস্ততা ও সেই হস্তে এমনই সকল উত্তম উত্তম জিনিস প্রস্তুত হইতে লাগিল যে শেষে সাধারণ তন্ত্রের Cobler General to the Republic চামার মহারাজের পদে পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল। রাজ্যেরও দ্রব্য ও কৃতি কারিকর উভয় বিষয়ক অভাব মিটিল এবং দেশের অর্থও বিদেশে না গিয়া দেশে থাকিল, আর চামারের ধনলক্ষ্মী উথলিয়া পড়িতে লাগিল।

যেমন চামারের দৃষ্টান্ত, সেইরূপ দৃষ্টান্তও তাহার দেখাদেখি এই উভয়বিধ উপায়, পারেগুয়া ফ্রান্সিয়ার আমলে অসীম উন্নতি সোপানে উন্নীত হইয়াছিল। ফ্রান্সিয়ার জীবনকালে ফাঁসিকাঠ কখনও নামে নাই বটে, কিন্তু ফাঁসিও তাহার সমগ্র সুদীর্ঘ রাজত্বে সর্ব্বসমেত ১৮টির বেশী হয় নাই। অন্যান্য

ডিক্টেটরের আমলে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ফাঁসি হইয়াছে; কিন্তু উদ্দেশ্য ও ফল তাহার অন্যতর, অথচ ঐতিহাসিকের মুখে তাহাদের নিন্দাবাদ ততটা শুনা যায় না। পৃথিবীর এমনই গতিক বটে। কড়া লোকের হাতে প্রকৃত শাস্তির ভাগ প্রায়ই মোটের উপর কম হয়; অথচ কাজের ভাগ বেশী! ফলতঃ ফ্রান্সিয়ার কঠোরতার প্রতি যেই যত নিন্দা করুক, ফ্রান্সিয়ার দ্বারা যে পারেগুয়ার অসীম উন্নতি হইয়াছিল এবং তদ্রূপ উন্নতি আর কাহারও আমলে যে কখনও হয় নাই, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে নাই। কিন্তু ফ্রান্সিয়া কঠোরতার পরিবর্ত্তে কোমলতা অবলম্বন করিলে কি সেই উন্নাত হইতে পারিত, অথবা চামারের পুত্র ফাঁসিকাঠ প্রদক্ষিণ না করিলে কি কখনও সে চামার মহারাজ হইতে পারিত? তাহা যদি না পারে, তবে কঠোরতা বা মারের নিন্দা যে করে সে বাতুল অথবা সে নিজেই মারের যোগ্য। কেহ কেহ হয় ত এখনও বলিতে পারে যে, নাই বা হইল উন্নতি, তা বলিয়া মার কেন? আমার বিবেচনায় এ কথা যাহারা বলে তাহারা একবার নয়, ডবল মারের যোগ্য।

আমার নিজের সম্বন্ধেও একটা ঘটনা বলি। একটা ঘোড়ার গাড়ীতে আমি বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া যাইতেছি। কিছুদূর যাওয়ার পর আর ঘোড়া চলে না, পথ খারাপ ইত্যাদি নানা ওজর আপত্তি, এমন সময় আমি একটু ঘুমাইয়া পড়ায়, গাড়ি চলিল ৩৷৷০ ঘণ্টায় ৬ মাইল। নিদ্রা ভঙ্গে দেখিয়াই অবাক! কোচম্যানকে অনেক কাকুতি মিনতি করা গেল, অনেক বখ্‌সিসের প্রলোভন দেখান গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাহার পর আমার অনুচর একজন, কোচম্যানকে দুই চারি ঘা উত্তম মধ্যম লাগাইল; অবশ্য আমি তাহাতে কোন মতামত প্রকাশ না করিলেও, ভিতরে ভিতরে যে তাহাতে আমার অসম্মতি ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। যেমন এই মার খাওয়া, অমনি গাড়ি চলিল এরূপ বেগে যে ১ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গেল। তাই বলি, মারের কি গুণ! এইরূপে একাল ধরিয়া কার্য্যক্ষেত্রে এমন অনেকই অবস্থা ঘটিয়াছে, যেখানে আমি বলি সম্ভব আর আমার আজ্ঞাবাহকেরা বলে অসম্ভব; কিন্তু শেষ যৎকিঞ্চিৎ শাসন ও শাস্তিতে অসম্ভব

মূহূর্ত্ত মাত্রে সম্ভবতায় পরিণত হইয়া বরং তাঁহার উপরেও আরও কিছু হইবার পথ উন্মুক্ত হইতে ক্রটী হয় নাই। উহার ফলে এখনও অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, অন্য অন্য মহারথীরা যেখানে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, আমার সেখানে অতি সহজে ও অতি অল্পেই কার্য্যসাধন হইয়া গিয়াছে। বয়সকালে যখন ভাল মানুষ ছিলাম না, তখন এইরূপ ঘটিত এবং এইরূপে নিতান্ত অসম্ভব কার্য্যও অতি সহজে সম্ভবে পরিণত হইয়া যাইত। আর এমন বয়সে ভাল মানুষ হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু হায়! এখন আর সেরূপ বা তাহার অর্দ্ধ পরিমাণেও কর্ম্মস্থলে কার্য্য উদ্ধার হয় না।

ফলতঃ আজীবন ধরিয়া নানারূপে অথবা সকল প্রকারেই দেখিলাম, কেবল ভাল কথা, ভাল মানুষী, বা বক্‌সিসের প্রলোভন, এ সকলের কিছুতেই কিছু হয় না। মার অর্থাৎ শাসন ও শাস্তি ব্যতীত প্রায়ই কোন কার্য্য যথার্থতঃ উদ্ধার হয় না; যাহা কিছু হয়, তাহা কার্য্য নহে, কার্য্যের ছায়া মাত্র; প্রকৃত কার্য্যসারত্ব তাহাতে অতি অল্পই থাকিয়া থাকে। সুতরাং এখন স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, কর্ম্মই যদি জগতের সার পদার্থ ও জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে আমার আজীবনের স্থির অভিজ্ঞতার ফল এই যে, এ জগতে তাহার একমাত্রও সর্ব্বোত্তম উপায়—মার! সকল সময়েতেই যে মারিতে হয় এমন নয়। আবশ্যক হইলে মারের অভাব হয় না, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মকারকের এ জ্ঞানটুকু থাকিলেও যথেষ্ট পরিমাণে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

সমস্ত ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালার কথাই এখন বলি। আমার বহুবর্ষব্যাপি অভিজ্ঞতায় যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে এ সংসারক্ষেত্রে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের যেরূপ দুর্দ্দশা, জগতে এমন আর কাহারও নাই। যাহাদের অনেক অর্থ আছে, এক জনের কাজ পাঁচ জন লোক রাখিয়া যাহারা করাইতে পারে, তাহাদের দিন কোন একরূপে চলিরা যায় সত্য; কিন্তু তদ্ভিন্ন আর সমস্ত ভদ্রলোকের জীবনে কষ্টের সীমা পরিসীমা নাই। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের আহারে সুখ নাই, যেহেতু পাচক ব্রাহ্মণ যে, সে রাঁধিতে জানে না, বাড়ার ভাগ সমকক্ষ;—পাচকের বিশ্বাস, উননে আগুন দিয়া হাঁড়ি চড়াইতে পারিলেই রন্ধনের কার্য্য হইল এবং আহার কারকের বিশ্বাস, অচ্ছেদ্য কেনা দাসী পরিবার হইতে বিচ্যুত হইলেই (অথবা আজি কালিকার পরিবার নামেই) এইরূপে গোছে গাছে কোন প্রকারে দিনপাত করিতে হয়; ফলতঃ এমন রুচিবিরুদ্ধ একঘেয়ে অখাদ্য অন্নজল আহারে আর কোন জাতীয় কেহই বোধ হয় দিনপাত করে না ও করিতে পারে না। তদ্রূপ বিহারেও বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সুখ নাই; যেহেতু ঘরের বাহির হইলেই প্রতি পদে আশঙ্কা কে কি বলিবে, কে কি বাধা দিবে,—অপমানের ভয় পদে পদে। চাকরে সুখ নাই, যেহেতু মূরত মাত্র গাড়া। জলখাবার আনিতে যাও, সর্ব্বত্রই ভাজালের একশেষ। মজুর খাটাইতে চাও, পয়সা দিয়াও কাজের অঙ্কে অর্দ্ধেক ফাঁকি। আস্তাবলে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিতে যাও, দেড়া ভাড়া দিয়াও মরা ঘোড়া ও ভাঙ্গা গাড়ী ব্যতীত পাইবে না।

তাই বলি, বাঙ্গালি ভদ্রসন্তানের কোন দিকেই সুখ নাই, অর্থ খরচ করিয়াও সুখ নাই। আর সেই সেই স্থলে একজন ইংবেজের অবস্থা, অভাবে মুসলমানের অবস্থাও দেখ। সকল বিষয়েতেই তোমার অপেক্ষা অনেক কম ব্যয়, অথচ অমৃতবৎ রন্ধনক্ষম ভাল রসুয়ে পায়; চাকরে ভাল কাজ করে; মজুরে ফাঁকি দেয় না; কেহ কোন বিষয়ে বাধা দিতে সাহস করে না এবং যে গাড়ীওয়ালার কাছে অনেক পয়সা দিয়াও ভাল গাড়ী ঘোড়া তুমি পাও না; সেই গাড়ীওয়ালা কবে একজন ইংরেজ উদয় হইয়া কম ভাড়া দিবে এবং মার ও গালিগালাজ করিবে, সেই প্রত্যাশায় ভাল গাড়ী ঘোড়া আস্তাবলে উঠাইয়া রাখিয়া দেয়। ইংরেজ কম খরচ করিয়াও এইরূপ ভাল কাজ পায়, অধিকন্তু মারি ও গালির ঘটা কত! আর বাঙ্গালী ভদ্রলোক বেশী পয়সা দিয়াও ভাল কাজ পায় না; অধিকন্তু কাহাকে যদি একটা চড়া কথা বলিল, অমনি সে ঘাড় বাঁকাইয়া ও আঠার আনায় জবাব চালাইয়া তোমার কাজ তোমার ঘাড়ে উলটিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সেই ত একই স্থান ও একই লোক, অথচ বলিতে পার, কেন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও অন্য ভেদে এতটা তারতম্য ঘটনা হয়? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ইংরেজ মারিতে জানে, আর বাঙ্গালী ভদ্রলোক মারিতে জানে না। বাঙ্গালী ভদ্রলোক ভাল মানুষ, নিরীহ, ঔদ্ধত্য প্রকাশে ইহার গাম্ভীর্য্য ও ভদ্রতার হানি হয়। কিন্তু হায়, ঔদ্ধত্য ও গাম্ভীর্য্য রক্ষার জন্য প্রায়শ্চিত্ত তাহার কি গুরুতর!

সে অনেক দিনের কথা এবং হাসির কথা বটে। একটি ভদ্রলোক কোন একটি বিশেষ কাজ করাইতে দুইটি মজুর লইয়াছিলেন। এখন তাহারা কাজ যত করুক না করুক, তামাক ঢালিতেছে ও সাজিতেছে এবং দুই বন্ধুতে মুখোমুখী হইয়া দিব্য গল্পগুজবে সময়টা কাটাইয়া দিতেছে। ইহা দেখিয়া ভদ্রলোকটির গায়ে জ্বালা ধরায়, দুই একটি ভাল কথায় তাহাদিগকে কাজ করিবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতিতে না পারিয়া ভদ্রলোকটি শেষে দাঁতখামাটি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারাও অমনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল। শেষে নিতান্ত অসহ্য হওয়ায়, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সম্বল যে দুই একটা গালি আছে, তাহাও প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু হায়, তাহারাও দুই একটা সমান উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফয়সালা করিতে লাগিল। এদিকে ভদ্রলোকটির পুঁজি ফুরাইল, কাজেই তিনি নির্ব্বাক; তখন তাহাদের ছাড়িয়া দিয়া আপন অদৃষ্টের দোষ ও সময়ের দোষ দিতে লাগিলেন; শেষে দোষ গড়াইয়া তাহার ঢেউ ইংরেজ রাজত্ব, আইন, আদালত, ইংরেজী শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা বিষয়েরই গায়ে গিয়া লাগিতে লাগিল এবং সে সকলেরই মোটের উপর মূল মর্ম্ম ও সুক্ষ্ম তত্ত্ব এইটুকু যে, একালে ভদ্রলোকের মান থাকে না, এবং ছোট লোকের বৃদ্ধি অতিশয়। আর একটি লোকও সেখানে বসিয়াছিল এবং বসিয়া বসিয়া এই অভিনয় আদ্যোপান্ত সকলই দেখিতেছিল। শেষে তাহার আর সহ্য না হওয়ায়, সে তৎক্ষণাৎ এক গাছি বেত লইয়া মজুর দুইটার পিঠে বিলক্ষণ দুই দুই ঘা বসাইয়া দিল। মজুর দুইটা প্রথমে ঘাড় তুলিয়াছিল, বোধ হয় এই মতলবে যে এ মারের কিছু সক্রোধ প্রতিবাদ করে; কিন্তু লোকটির মুখের দিকে তাকাইবা মাত্র, তাহার মুখের ভঙ্গী দেখিয়া অমনি বিনা বাক্যব্যয়ে ঘাড় অবনত করিল। তাহার পর সেই মারের কল্যাণে মজুর দুইটির এমনই ক্ষিপ্রহস্ততা প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তখন এক ঘণ্টার মধ্যে এত কাজ হইয়া গেল যে, সকাল হইতে তিন চারি ঘণ্টাতেও তাহার সমান হইতে পারে নাই।

ফলতঃ বাঙ্গালী জাতীর বর্ত্তমানে যে এতটা দুর্দ্দশা ও এতটা অধঃপতন, তাহার একটা প্রধান কারণ এই যে, বাঙ্গালী ভদ্রলোক মারিতে জানে না, শাসন করিতে জানে না। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের ইতর লোক এখনও ততটা অধঃপাতে যায় নাই, গিয়াছে যতটা ভদ্রলোক। ইতর লোকে এখনও বলবীর্য্য তেজ সাহস ও কর্ম্মশক্তি যথেষ্ট আছে; কিন্তু সেই সকল চালনা করিয়া কার্য্য আদায় করিবার ভার যাহাদের উপর, সেই তদ্রসন্তানেরা সর্ব্ব বিষয়েই হীন ও অধঃপাতগত হইয়াছে। কার্য্যশক্তি লোক পরিচালকতা শক্তি ও শাসক শক্তি, তাহাদিগকে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এ কথা যে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে, সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষেই উহা প্রযুক্ত হইতে পারে। নতুবা যে ইতর লোক তাহার নিজ গৃহস্থলীতে হয় তোমার প্রজা নতুবা নানা প্রকারে দাসবৎ; সে তোমার জন্য কিছুমাত্র ত্যাগস্বীকারে রাজী নয়, কিন্তু অন্যত্র ও বাহিরে সেই ব্যক্তি ৫ কি ৭ টাকা বেতন লইয়া অন্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ স্বীকারে পশ্চাৎপদ হয় না! তাই আবার বলি, যেখানে এরূপ দৃশ্য, সেখানকার ভদ্রলোককেই অপদার্থ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

আর একটা কথা। নিজে যে স্বেচ্ছায় অথবা মারের অপেক্ষা না রাখিয়া মারের সীমা সহি খাটুনি নিজের জন্য খাটিতে না পারে, সে অন্যকেও খাটাইতে পারে না; সুতরাং অন্যকে মারিতে হয় কেমন করিয়া, তাহাও সে জানে না। তোমার বাঙ্গালী ভদ্রলোক, মুনিবের শাসন থাকিলেই গাধা খাটুনি খাটিতে পারেন; নতুবা অন্য সময়ে এক পাও নড়িয়া মুতিতে তাহার কষ্ট হয় এবং তাস দাবা পাশা অথবা সংগীত আখ্যায় গর্দ্দভস্বরে চিৎকার, ইহাই তাহার সময় উত্তীর্ণ করিবার একমাত্র সম্বল। এরূপ অপদার্থের পক্ষে বর্ত্তমান দুর্দ্দশাই উপযুক্ত শাস্তি। ফলতঃ নিজে যে খাটিতে না জানে, সে অন্যকে খাটাইতে পারে না এবং অন্যকে মারিবারও তাহার অধিকার নাই। যদি মারে, তবে সে অপরাধী ও শাস্তির যোগ্য! পুনশ্চ এ শাস্তি স্বভাবে আনিয়াই প্রবর্ত্তিত করে; নতুবা দেখ যে ইতর একজন বিজাতির হাতে শত মারেও কথা কহে না, স্বজাতীর নিকট একটা রূঢ় কথা শুনিলেই সে অমনি ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিতে উদ্যত হয়। এ অপদার্থ দেশের মধ্যেও অপদার্থতম, দুই একটি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ বাদে ধনী ও জমিদারগণ; আলস্যপরায়ণতা অপদার্থতা ও অকর্ম্মাগিরির এমন আদর্শ পুরুষ আর নাই। তাই লোক শাসনার্থে

তাহাদের অস্ত্রও তদনুরূপ,—অর্থব্যয়ে মোকদ্দমাদির দ্বারা লোক হয়রাণী, ঘরজ্বালানি, ফেরার করা, ইত্যাদি। ইহাতে লোক বশ না হইয়া আরও বিগড়াইয়া যায়। নতুবা যে অসংখ্য অধীন বা প্রজাগণ তুর্দ্দমনীয় পৃষ্ঠবলে পরিণত হইবার কথা, তাহারাই হইয়া থাকে তাহার ততগুলি প্রধান শত্রু। সুতরাং এ সকল লোকের নিকট হইতে উপাধি সংগ্রহে অসদুপার্জ্জিত অর্থব্যয় ভিন্ন আর কি জাতীয় কার্য্যের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ?

ফলতঃ যতদিন এদেশীয় ভদ্রগণ আলস্যত্যাগে স্বভাব ও স্বেচ্ছায় কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত না হইবে, ততদিন ইতর শ্রেণীর নিকটও কর্ম্মগ্রহণে তাহাদের সামর্থ্য জন্মিবে না এবং তাহা না জন্মিলেও ইতর শ্রেণী কখনও ভদ্রের অনুগত হইবে না। সুতরাং কর্ম্ম এবং একতা উভয় অভাবে, বর্ত্তমান অধঃপতন হইতে উদ্ধারের আশা অতি অল্পই বলিয়া জানিবে।

ফাঁসী বা প্রাণদণ্ড।

"Temporal Power doth shew like God's
when Mercy seasons Justice."

ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান হইতেই আইনের উৎপত্তি। তুমি একটী অধর্ম্মের কার্য্য কর, তোমাকে অবশ্য তাহার ফলভোগ করিতে হইবে, যতক্ষণ তুমি সমাজে থাকিবে, সমাজ তোমায় কখন ছাড়িবে না তোমার সেই অন্যায় কার্য্যের জন্য তোমাকে শাস্তি দিবে, ভবিষ্যতে সেরূপ কার্য্য আর যাহাতে না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। ব্যবস্থাপকেরা সেই কারণ, প্রত্যেক অন্যায় কার্য্যের জন্য এক একটী দণ্ড নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ কার্য্যগুলি অন্যায় বা দণ্ডের যোগ্য তাহাও এক একটী করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। তুমি যতক্ষণ সেই ব্যবস্থার আদেশানুসারে চলিবে ততক্ষণ তোমাকে কোন রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে না। তুমি যদ্যপি বল কোন্ কার্য্যটী ন্যায় ও কোন্ কার্য্যটী অন্যায়, তাহা জানিবার উপায় কি ? তদুত্তরে এই বলা যাইবে, যে ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, কোন্ কার্য্যটী ভাল, কোন্ কার্য্যটী মন্দ, তাহা মনুষ্যকে

শিখাইয়া দিতে হয় না। তাহা যে না জানে সে সমাজ ভুক্ত হইবার যোগ্য নহে। সে বনে থাকিলে ভাল হয়।

প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি সকল সভ্য জাতির মধ্যে নরহত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। সমাজের মধ্যে যদ্যপি এক ব্যক্তি অপর এক জনের ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রাণ নাশ করে তাহা হইলে দেখা যায় যে সেই অপরাধীর প্রাণদণ্ড অর্থাৎ তাহার "ফাঁসী" হয়। যে যে হেতুবাদে বর্ত্তমান কালে সভ্য জগতে নরহন্তার প্রাণদণ্ড হয় সেইগুলি আমরা একে একে পর্য্যালোচনা করিব এবং সেই হেতুগুলি কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহা বিবেচনা কারিব। নিম্ন লিখিত তিনটী কারণের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান কালে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড বা "ফাঁসী" হইয়া থাকে যথা—

(১) এরূপ গুরুতর অপরাধে ফাঁসী বা প্রাণদণ্ড না দিলে অপর ব্যক্তিগণ তদ্রূপ কার্য্য হইতে বিরত হইবে না। বরঞ্চ এরূপ অপরাধের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

(২) অপরাধীকে প্রাণদণ্ড না দিলে প্রাণদাতা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করা হইবে।

(৩) অপরাধানুযায়ী দণ্ড হওয়া আবশ্যক।

উপরোক্ত তিনটী কারণের মধ্যে প্রথম কারণটী বিশেষ বিবেচ্য যে হেতুক উহাই লোকের মুখে সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় এবং ঐ যুক্তি অকাট্য বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু অপর অপরাধ সম্বন্ধে ঐ কারণ যুক্তিযুক্ত বোধ হইলেও নরহত্যা সম্বন্ধে উহা প্রয়োগ হইতে পারে না। হত্যাকারী রিপুর পরবশ হইয়া হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করে, তখন তাহার কার্যাকার্য্য বিচার কয়িবার তিলার্দ্ধ ক্ষমতা থাকে না। ঘৃণা, হিংসা অথবা লোভ সম্পূর্ণরূপে তাহার মনকে অধিকার করে, জ্ঞানের আলোক সে ঝটিকায় নিবিয়া যায়। সে তখন এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ভাবে না যে হত্যা করিলে তাহারও জীবনদণ্ড পরে হইবে। আর অবস্থা বিশেষে সে আশঙ্কা ক্ষণকালের জন্য মানসে উদয় হইলেও সে ব্যক্তি সে ভয়ঙ্কর কার্য্য হইতে বিরত হয় না। বরঞ্চ কার্য্য সমাধা করিয়া কখন কখন সেই নৃশংস কার্য্য সকলের সম্মুখে ব্যক্ত করে। বোধ হয় যে ব্যক্তি হত্যা করিব বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, তাহাকে ফাঁসী কাষ্ঠের নিকটে ছাড়িয়া

দিলেও সে ব্যক্তি আপন নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয় না। সে প্রাণদণ্ডকে তখন কেন ভয় করিবে? সে কি জানে না যে এক দিন ত তাহাকে মরিতে হইবে—সকলকেই মরিতে হইবে—কি রাজা, কি কৃষক কেহই তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবে না, "a debt common to humanity." তবে দুই দিন অগ্র পশ্চাৎ মাত্র। জল্লাদের হাত দিয়া অসংখ্য লোকের সম্মুখে মরিতে হইবে এই একটী কথা; কিন্তু সে সামান্য কথা, যখন রিপুর তুমুল বাত্যা জীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতেছে, যখন আপন দুরভিসন্ধির পাত্র ব্যতীত তাহার মনে পৃথিবীর অন্য কোন পদার্থ স্থান পাইতেছে না, তখন জল্লাদের হস্তে প্রাণত্যাগ করা তাহার পক্ষে কিছুই নহে। সে মনে করিবে, মৃত্যুর পর সে কিছু দেখিতে আসিবে না, যে তাহার সম্মান নষ্ট হইয়াছে বা জল্লাদের হস্তে মৃত্যু হওয়ায় তাহার পরিবারবর্গ অবমানিত হইয়াছে। তাহাই যদ্যপি হইল তবে ফাঁসী দিয়া ফল কি? যে প্রাণ ঈশ্বর ব্যতীত কেহ দিতে পারে না সে প্রাণ বিচারের দ্বারা তোমার লইবার অধিকার কি? ফাঁসী ব্যতীত আর কি কোন গুরুতর দণ্ড নাই? তুমি তাহাকে দ্বীপান্তরে পাঠাও, অরণ্যে পাঠাও, পৃথিবীর কেন্দ্রে পাঠাও, সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও, তাহাকে যে প্রকারে পার অবমানিত কর কিন্তু তাহার প্রাণদণ্ড করিও না, তাহাকে ফাঁসী দিও না। যে অপরাধের জন্য তাহাকে ফাঁসী দিতেছ, ফাঁসী দিয়া নিজে সৃষ্টি কর্ত্তার নিকট সেই অপরাধের দায়ী হইতেছ।

অতএব দেখা যাইতেছে ফাঁসী দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত লোকে নরহত্যা হইতে বিরত থাকিতে পারে না। হিংসা, লোভ প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তি প্রবল হইলে মানব চিত্তে কোন্ ভয় থাকে না, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আপন জিঘাংসা চরিতার্থ করে। এ প্রকার স্থলে জীবন দণ্ডে কোন ফল দর্শে না।

দ্বিতীয় কারণটীতে প্রাণদণ্ডের সাপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহা অতীব ক্ষীণ ও অমূলক। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে তুমি আমি কে? যে ব্যক্তিকে অপরাধী বলিয়া তুমি আজি প্রাণদণ্ড দিতেছ সে ব্যক্তি হয়ত সেই কার্য্য সম্পাদনার্থে ঈশ্বর প্রেরিত লোক। পাপ কার্য্যের

ঈশ্বর দত্ত শাস্তি অনুতাপ, সেই অনুতাপে হত্যাকারীর চিত্ত অহোরাত্র দগ্ধ হইয়া পুনশ্চ বিশুদ্ধ হইতে পারে। প্রাণ দণ্ড দিয়া সে নিষ্কৃতির উপায় হইতে তাহাকে কেন বঞ্চিত করিতেছ?

প্রাণদণ্ডের পক্ষে তৃতীয় যুক্তি অত্যন্ত হিংসামূলক অতএব সভ্যজগতে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। যে সকল আইন এই প্রকার যুক্তির উপর নির্ভর করে তাহাকে রোমীয়গণ পূরাকালে Lex Talionis কহিত। আদিম অবস্থায় সকল জাতির মধ্যে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি হইতে আইনের উৎপত্তি। তুমি আমার চক্ষু কাণা করিয়া দাও, আমি তোমার চক্ষু কাণা করিয়া দিব; তুমি আমার দাঁত ভাঙ্গিয়া দাও, আমি তোমার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিব; "Tooth for tooth", "Eye for Eye" এবং "Life for life" ইত্যাদি। ইহা মোজেক (Mosaic Law) আইনের কথা। (Draco) ড্রেকোর এবং মনুর ব্যবস্থা তদ্রূপ কঠিন। আজি এই উনবিংশতি শতাব্দীতে প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা Penal Codeএ রাখা কি কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের উচিত? যদি নরহত্যা করিলে প্রাণদণ্ড হয় তাহা হইলে দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে অপরাধীর কেন দাঁত ভাঙ্গিবার বিধান হয় না? কিম্বা চক্ষু কাণা করিলে তাহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া দিবার ব্যবস্থা হয় না? যদি অপর সকল অপরাধ সম্বন্ধে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করা হইয়া থাকে, তবে নরহত্যা সম্বন্ধে কেন তাহা পরিত্যক্ত হইবেক না? যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম "এক গালে চড় মারিলে অপর গাল দেখাইয়া দাও" এই উচ্চ নীতি শিক্ষা দেয় যে ধর্ম্মে "Vengeance is mine" Saith the Lord এই বচন কথিত আছে, সেই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কানুন কেন এই জঘন্য প্রতি-হিংসা কলঙ্কিত রহিয়াছে? ইহা কি বাস্তবিক শোচনীয় নহে? আর সে ব্যক্তি যখন ফাঁসীর দ্বারা ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল তখন তোমার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ হইল কোথায়? জীবিত না থাকিলে সে দণ্ডের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে কি প্রকারে?

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মানিতে প্রাণদণ্ড উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে পুনর্ব্বার সাবেক আইন বাহাল হইল। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে অধিকাংশ হত্যাকারী প্রাণদণ্ড আইন উঠিয়া যাওয়ার বিষয় অবগত ছিল না। একজন লেখক এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন

"In these German provinces in which murders were committed in 1849 and 1850 the class to which the murderers belonged was entirely unaware of the penalty having been abolished by the fundamental rights."

পৃথিবীর অনেক স্থানে (Tuscany, Oldenburgh, Nassan, Rhode Island, Miclayan, &c.) প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ড-বিধান হওনের পর অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই ; বরং হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু নরহত্যা সম্বন্ধে প্রাণদণ্ড বিধান উক্ত স্থানগুলি হইতে উঠাইয়া দেওনের অনেক আপত্তি হওয়াতে, সেই বিধান অদ্যাপি প্রচলিত আছে। যদিও Tuscanyতে ১৮৪৭ খৃঃ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ড আইন রহিত ছিল, তথাপি হত্যাকারীর সংখ্যা আদৌ বাড়ে নাই। কিন্তু কতকগুলি কল্পনাশক্তি-সম্পন্ন সমাজ-সংস্কারক আপন কল্পনা বলে নানা দোষ দেখাইয়া প্রাণদণ্ড আইন পুনঃ প্রচলিত করাইয়াছিল। বিখ্যাত ব্যবস্থাপক Boniani প্রাণদণ্ড রহিত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সুবিখ্যাত জিরোম বেন্থাম প্রাণদণ্ড আইনের অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন এবং রসেল্ (Russel) উক্ত আইনের বিপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি এমন সুন্দর যে আমরা পাঠকবর্গকে তাহা না দিয়া থাকিতে পারিলাম না—

"When I consider how difficult it is for any judge to separate the case which requires inflexible justice from that which admits the force of mitigating circumstances; how invidious the task of the Secretary of State in dispensing the Mercy of the Crown; how critical the comments made by the public; how soon the object of general horror becomes the theme of sympathy and pity; how narrow and how limited the examples given by this condign and awful punishment; how brutal the scene of execution, I come to the conclusion that nothing would be lost to justice, nothing lost in the preservation of innocent life, if the punishment of death were altogether abolished. The guilty, unpitied, would have time and opportunity to turn repentant to the Throne of Mercy."

বাস্তবিক দেখা গিয়াছে যে অনেক সময়ে বিচারপতির ভ্রমে নির্দ্দোষী ব্যক্তির ফাঁশি হইয়া গিয়াছে ; অনেক স্থলে ফাঁশি হইবার ইতিপূর্ব্বেই অপরাধী নির্দ্দোষী সাব্যস্থ হইয়াছে। কখন কখন আদালতে পুলিশ নিরপরাধী ব্যক্তিকে অপরাধীর স্থলে দাঁড় করাইয়াছে ও নানাবিধ প্রমাণ সাজাইয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্থ করাইয়াছে। নির্দ্দোষী ব্যক্তির ফাঁশি হইয়াছে শুনিলে কাহার না হৃৎকম্প হয় ? সচরাচর অবস্থাগত (Circumstantial Evidence) প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আদালত ফাঁশির হুকুম দিয়া থাকেন, কিন্তু এ প্রকার প্রমাণ যে কতদূর ভ্রমপ্রবণ তাহা যিনি ওয়ারেণের (S. Warren) "Now and Then" নামক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন। আরব্য উপন্যাসের কুঁজা ব্যক্তির গল্পটী (The story of the Hunchback) আর একটী উত্তম উদাহরণ।

অতএব ফাঁশি বা প্রাণদণ্ড অসভ্যতার অবশিষ্টাংশ মাত্র। সভ্য জগতে ইহা ক্ষণকাল জন্য থাকা উচিত নহে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে এমন "বিচার বিভ্রাট" উপস্থিত হয় যে ফাঁশিকে এক প্রকার "Judicial murder" বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁশি ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বর্ক (Burke) সাহেব কহিয়াছেন যে ইহাকে বিচারের দ্বারা হত্যা করা হইয়াছে।

কালী প্রতিমা।

দুর্গা প্রতিমার ন্যায় কালী প্রতিমাও একটী রূপক। কালী মূর্ত্তি কয়েকটী অতি গভীর আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সেই ভাবগুলি ব্যাখ্যা করিবার যত্ন করা যাইতেছে।

"ধ্যানে" দেখা যায় কালিকা দেবী শ্যামবর্ণা, মহা মেঘপ্রভা, ঘোরা।

তাঁহার গলে ছিন্ন নরমুণ্ড মালা এবং হস্তে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড। কালিকা দেবী বরাভয় দাত্রী, দিগম্বরী এবং মুক্তকেশী। দেবী নরমুণ্ডমালার রক্তে বিভূষিতা, নর-কর সংঘাতে বিনির্ম্মিতা কাঞ্চী ধারিণী, শ্মশানালয় বাসিনী এবং সুখপ্রসন্নবদনা। তিনি শিবাগণ বেষ্টিতা, লোল জিহ্বা, ঘোর দংষ্ট্রা এবং শবরূপ মহাদেব হৃদয়স্থিতা।

কালীপ্রতিমা যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহা ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলিব। কালিকা দেবী আর্য্য শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সৃষ্টির প্রতিরূপ। সৃষ্টির পূর্ব্বে কাল থাকে না; তাই কালী কাল স্বরূপিণী।

তমোগুণ অন্ধকারময় এবং ধ্বংসকারক। কালিকা দেবী কাল স্বরূপিণী এবং ঘোর কাল মেঘবর্ণা। কাল সর্ব্ব ধ্বংসকারী এবং কালিকা দেবী অসুরনাশিনী এবং মহাদেব শিব মহাপুরুষের বক্ষোদলনী। কালী তমোগুণ রূপিণী।

কালিকা দেবী শবাসনা এবং শিবরূপ শববক্ষে পদস্থাপন করত অতি ভয়ঙ্কর ভাবে দণ্ডায়মানা। কালিকা দেবী প্রকৃতি, সৃষ্টি, জীবন। Death is the condition of life. সৃষ্টি বিনাশমূলা। নাশে, অপচয়ে, ধ্বংসে, জীবন, জীবোৎপত্তি। এই জন্যই জন্মাশৌচ। কোন কিছুর বিধ্বংস, বিনাশ, অপচয় না হইয়া কোন কিছুর জন্ম, উৎপত্তি হয় না। তাই সৃষ্টি স্বরূপিণী কালিকা দেবী শব-হৃদয়-সংস্থিতা। শব ধ্বংসের, বিনাশের প্রতিকৃতি।

শাস্ত্রানুসারে কালী দেবী প্রকৃতি এবং মহাদেব পুরুষ। কোন কোন তন্ত্রমতে কথিত শব দেবাদিদেব মহাদেব শিব এবং কালিকা দেবী শিবের বক্ষোদলনকারিণী। প্রকৃতির অন্যতর নাম মায়া, অবিদ্যা। কালী মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হয়, শিব কিনা পুরুষ, অভিভূত এবং কালিকা দেবী অর্থাৎ প্রকৃতি প্রবলা। ইহাতেই সৃষ্টি।

প্রকৃতি কিনা Nature অর্থাৎ জগতে সৃষ্টি এবং নাশ, উৎপত্তি এবং বিধ্বংস পরম্পরা ভাবে অথবা একি কালে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কালী মূর্ত্তিতেও তাহাই লক্ষিত হয়। কালী দেবীর বামে ভয়, দক্ষিণে অভয়, অর্থাৎ এক দিকে ধ্বংস, অপর দিকে সৃষ্টি, অনুভব হয়। দেবী অসুরমুণ্ড ছেদন করত তাহা ধারণ করিতেছেন। ভাবী শস্যের জন্য কৃষকও এইরূপ করে।

প্রকৃতিকে উভয় শৃঙ্খলাময়ী এবং বিশৃঙ্খলা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কালী মূর্ত্তিও তদ্রূপ। কালী দিগম্বরী, নৃত্যশালিনী এবং আলুলায়িত কেশা। এগুলি যেন উন্মত্ততা, ঘোর বিশৃঙ্খলতার চিহ্ন। দেবীর কটিতটে করকাঞ্চী; দেবী আবার লজ্জাশালিনী। শূন্যে দেবগণ, দেবীর স্তব করিতেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে দেবী বরাভয় দিতেছেন। দেবী পরম মঙ্গল, জ্ঞানদাত্রী। দেবী বিকৃতিময়ী নন।

বাহ্য জগতে প্রকৃতিতে (Natureএ) ঊর্দ্ধে গগনমার্গে আলোকাধার সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধ গগন হইতেই উল্কাপাত হওয়া নয়নগোচর হয়। কালিকা দেবীও প্রকৃতি। কালিকা দেবীতেও তদ্রূপ দেখা যায়। দেবীর ললাট হইতে বিষম জ্যোতি, রশ্মিরেখা বাহির হইতেছে।

কালী অর্থাৎ শ্যামা পূজা দীপান্বিতা বলিয়া উল্লেখিত হয়। কালী পূজার দিন লোকে পাকাটির এবং অন্যান্য আলোক জ্বালিয়া থাকে। এইরূপ করিবার বিশেষ কারণ থাকা অনুভব হয়। হিম বর্ষণ সহ এদেশে জ্বরাদি পীড়ার প্রকাশ দেখা যায়। হেমন্তে পীড়াধিক্যের কথা কোন কোন বেদে দৃষ্ট হয়। পীড়া লক্ষ্য করিয়া আদিতে এইরূপ অগ্নি জ্বালা প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এ অনুমান একান্ত অসঙ্গত নহে। বোধ হয় এই জন্যই সমস্ত কার্ত্তিক মাস ধরিয়া আকাশ প্রদীপ এবং অন্যান্য আলোকও দেওয়া হইয়া থাকে।

কালী পূজার সময় এ দেশে ধান্য পুষ্ট এবং পাকিতে আরম্ভ হয়। তাই কালী পূজার দিন ধন ধান্যের দেবী লক্ষ্মী দেবীরও পূজা হওয়া দৃষ্ট হয়। আর লক্ষ্মী দেবীর পূজা করত কুলার বাতাস দিয়া লোকে অলক্ষ্মীকে বাটীর বাহির করিয়া থাকে। কুলার দ্বারা তুষ ঝাড়িয়া ফেলা হয় এবং সেই কারণে অলক্ষ্মীকেও কুলার বাতাস দিয়া তাড়ানো হইয়া থাকে।

শ্যামা পূজার তৃতীয় দিবসে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। এই দিন ভ্রাতাদের কপালে ভগিনীরা ফোঁটা দেন এবং তাহাদের ভাল করিয়া আহারাদি করান। এই দিনে ভ্রাতৃ-গণের শুভার্থে ভগিনীরা অন্ন দানে দেবতাদের

পূজাও করেন। আর ভগিনীগণ ভাইদের কপালে এই কথা বলিয়া ফোঁটা দিয়া থাকেন “ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা। যমের দোয়ারে পড়্‌লো কাঁটা॥” প্রবাদ আছে কার্ত্তিক মাসে যমের সকল দ্বারগুলি মুক্ত হয়। সম্ভবতঃ তাই “ফোঁটার” প্রথা।

এই স্থানে একটি কথা বলা আবশ্যক। অগ্রহায়ণের অষ্টম দিবসকে “যমাষ্টকা” বলে। ইহা যমের প্রধান কার্য্যের যেন শেষ দিন। ইহার পর যমের একটি দ্বার মাত্র মুক্ত থাকে। শরদন্তে কার্ত্তিক মাসে পীড়ার প্রাতুর্ভাব ও এই কথায় প্রকাশ পায়।

কালী ঘোরা ; মূর্ত্তিটি অতি ভয়ঙ্করী। আর্য্য ভিন্ন অন্য কোন জাতির ললাট হইতে এরূপ মূর্ত্তি প্রসূত হওয়া দৃষ্ট হয় না। কালিকা দেবী শিবাকুল এবং পিশাচিনী বেষ্টিতা। ঘোর অমাবস্যা, দেবীর পূজার দিন এবং নিশীথ কাল, তাঁহার পূজার সময়। দেবী মহা-মেঘ-প্রভা, শ্যামা, ঘোর দংষ্ট্রা এবং শবারূঢ়া। কালী পূজায়, কালীরূপ ধ্যানে, সেবক কালী ভক্ত, নির্ভীক চিত্ত, যম ভয় বর্জ্জিত হয়েন। মৃত্যুরূপ শবও সেই জন্য কালিকা দেবীর পদ দলিত।

কালীর পদতলে দেবাদিদেব মহাদেব পতিত। মহাদেব পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মারও জ্যেষ্ঠ। তাই কবিবর ভারতচন্দ্র দক্ষের মুখে বলিয়াছেন, শিব “বয়সে বাপের বড়।” মহাদেবাপেক্ষা বয়সে কেহই বড় নহেন। শিব সর্ব্বাপেক্ষা বড়, অতি বৃদ্ধ। সকলই বার্দ্ধক্যে কালদলিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, কালী মূর্ত্তির এই ভাগে ইহাই সূচিত।

একটি একান্ত অসার কথার উল্লেখ করত প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অনেক দিন হইল, এক ফিরাঙ্গী কালী প্রতিমা দৃষ্টে বলেন “শ্বেতকায়রা কৃষ্ণকায় দ্বারা পরাজিত হইবে, ইহাই ব্যক্ত করিবার জন্য ইংরাজ আগমনে কোন দুষ্টবুদ্ধি হিন্দু এই মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে।” কালী তন্ত্রোক্ত সনাতনী দেবী। ইহা স্মরণ করিলেই ফিরাঙ্গীর কথাটির অসারতা উপলব্ধি হইবে।

কুরুক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্র কাব্য, মূল্য ১৷০, সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত! এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমরা যে সুখলাভ করিলাম, ইতিপূর্ব্বে বঙ্গ ভাষায় আর কোন কাব্যপাঠে সেরূপ সুখ পাইয়াছি কি না তাহা সহসা বলিতে পারি না। যদিও অরুচিকর ভাব ও ভাষার প্রয়োগে কাব্যখানির সৌন্দর্য্য স্থানে স্থানে কলঙ্কিত হইয়াছে, তথাপি ইহাতে এত রত্নরাশি বিকীর্ণ রহিয়াছে যে তাহাদের উজ্জ্বল প্রভায় ইহার সে কলঙ্ক অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুত কুরুক্ষেত্র কাব্য সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি অপূর্ব্ব রত্ন। মেঘনাদ বধ ও বৃত্র সংহার পাঠ করিতে করিতে আমরা শৌর্য্য ও বীর্য্যে প্রদীপ্ত, ত্রাসে শঙ্কিত, শোকে সন্তপ্ত, প্রেমে মুগ্ধ, স্নেহে বিগলিত, বিস্ময়ে অভিভূত ও মহত্ত্বে স্তম্ভিত হইয়াছিলাম ; কিন্তু কুরুক্ষেত্র কাব্যে যেরূপ সুমধুর কবিত্বের সহিত ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব ও দর্শনের জটিল কথার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আছে, তাহা আমরা কি মেঘনাদ বধ, কি বৃত্র সংহার ; কোন কাব্যেই দেখি নাই। তবে অবশ্য বলিব যে, এ পর্য্যন্ত যে কয়জন কবি বঙ্গভাষায় খণ্ড বা মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য কুরুক্ষেত্রের কবির উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহারা কেবল মাত্র পৌরাণিক চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকটন করিবার জন্য কাব্য লিখিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের কবি, পুরাণের মূলে যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে তাহারি ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশে এ কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন ; তাঁহারা কবিত্বে প্রণোদিত হইয়া কাব্য লিখিয়াছেন, এ কবি ধর্ম্মে উচ্ছ্বসিত হইয়া কবিত্ব ও ধর্ম্মের সাগর-সঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা “কুরুক্ষেত্রকে” কাব্য বলিব কি ধর্ম্ম-গ্রন্থ বলিব, তাহা সহসা স্থির করিতে পারি না। ইহাকে ধর্ম্ম প্রধান কাব্য বলিলাম বলিয়া কেহ এরূপ মনে না করেন, যে ইহা নিরস, জটিল বা “আষাঢ়ে” কথায় পরিপূর্ণ। অথবা “কুরুক্ষেত্র” নাম শুনিয়া কেহ না ভাবেন, যে কেবল যুদ্ধবর্ণনা বা হত্যাকাণ্ডে কাব্যখানি বিরচিত। এ কাব্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও নীতি সুললিত কবিতায় ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে গীতোক্ত ধর্ম্মের মর্ম্ম, কবি

যেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহারো অতি সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা এ কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া পাঠকগণকে ইহার পরিচয় দিব।

সপ্তদশ সর্গে কাব্যখানি সম্পূর্ণ। প্রথম সর্গের নাম "ধর্ম্মক্ষেত্র"। মহাকবি ভগবদ্গীতাকারের পদানুসরণ করিয়া, সেন কবি ভক্তি প্রণোদিত হৃদয়ে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্রের নাম রাখিয়াছেন "ধর্ম্মক্ষেত্র"। এই সর্গে যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য বর্ণনা, ও কুরুপাণ্ডবের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে মহর্ষি বেদব্যাস ও তাঁহার শিষ্যের কথোপকথন আছে। আমরা কবির নিজের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া এই সর্গের মর্ম্ম ব্যাখ্যা কবিব। তাহাতে পাঠক ইহার কবিত্বের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

কয়েকটি মাত্র ছত্রে কবি কুরু পাণ্ডবের রণক্ষেত্রের কিরূপ উজ্জ্বল চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, অত বড় মহান্, অত বড় ভীষণ দৃশ্য তিনি কিরূপ তেজস্বিনী কল্পনায় ধারণা করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাঠক নিম্নোদ্ধৃত কয় ছত্রে পাইবেন।

নীরেন্দ্রপ্রতিম নীল নির্ম্মল আকাশ,
শরতের শেষ মেঘে ঊর্দ্ধে তরঙ্গিত—
নীরব, নিস্পন্দ, ভীত। নিম্নে তরঙ্গিত
চতুরঙ্গে রণরঙ্গে ভীম উদ্বেলিত,
গর্জ্জিতেছে রক্তসিন্ধু মহাভারতের
মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র! সান্ধ্য রবিকরে
দেখাইছে রক্তমেঘে প্রতিবিম্ব তার,
নীরব নিস্পন্দ ভীত বিশ্ব চরাচরে।
দুইপ্রান্তে সংখ্যাতীত সজ্জিত শিবির,
তরঙ্গিত বেলা যেন রণ-পয়োধির!

এরূপ দৃশ্য বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত। পলাশির যুদ্ধের পাঠকের নিকট তাঁহার এ শক্তির পরিচয় আবশ্যক করেনা। কতকাল হইল পলাশির যুদ্ধ পড়িয়াছি এখনও আমাদের চিত্তপটে কাটোয়ায় সসজ্জ ইংরাজ সৈন্যের নৌকারোহণে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার দৃশ্য জাগরুক রহিয়াছে। "রৈবতক" কাব্যের কোন পাঠক, সমুদ্রের দৃশ্য বর্ণনা ভুলিতে পারিয়াছেন কি না—কখন ভুলিতে পারিবেন কি না, তাহা আমরা সন্দেহ করি।

যুদ্ধক্ষেত্রের অনতিদূরে বট-বিটপী ছায়ায় দাঁড়াইয়া সশিষ্য মহর্ষি বেদব্যাস। কুরুক্ষেত্র যেমন মহান্ দৃশ্য, তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তেমনি মহাকবি নতুবা সে দৃশ্যের মহত্ব কে বুঝিবে, কে বুঝাইবে? মহর্ষি শিষ্যকে বলিলেন—

* * দেখ বৎস! পৃথিবী আবার
হইতেছে সিক্ত জীব-শোণিত ধারায়!
কতরূপ মৃত্যু-জিহ্ব অস্ত্র ভয়ঙ্কর
উঠিতেছে পড়িতেছে ছাইয়া গগন,
অসংখ্য বিদ্যুৎগতি তীব্র বিষধর,
হইতেছে সমনের কি ক্রীড়া ভীষণ!

* * *

* * নিম্নে হাহাকর
মিশি সিংহনাদ সহ, অশনি সম্পাত
কোদণ্ড টঙ্কার ঘোর, শ্রবণে আমার
প্রবেশিছে যেন দূর সমুদ্র-হুঙ্কার
বাতক্ষুব্ধ, সহ ঘন অশনিঝঙ্কার।

শিষ্য বলিলেন—

কি ভীষণ দৃশ্য; প্রাণ কাঁপে থর থর,
নরকের দৃশ্য যেন সম্মুখে বিস্তৃত!

"নরক" কথা শুনিয়া মহর্ষি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জগতের নীতি,
বড়ই দুরূহ তত্ত্ব, সেই রত্নচয়
অনন্ত তিমির গর্ভে। হিংসা আর প্রীতি
ঘটনার চক্রে করে স্থান বিনিময়।
নির্ম্মম নিষ্ঠুর এই পাপ অভিনয়ে,
শীর্ষ অভিনেতা যিনি নিষ্ঠুর হৃদয়,
দয়ারসাগর তিনি, পুণ্যপারাবার।
নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে
সাধিছেন স্থির চিত্তে ক্ষত্রিয় বিনাশ,

নাশিছেন প্রিয়জন দেখ কত মতে,
হাহাকারে পূর্ণ করি আপন আবাস।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম, সেইখানে জয়,
সতী গান্ধারীর কথা সত্য নিঃসংশয়।

শিষ্য বিস্ময়ে কহিলেন—

* * হায় যদি প্রভু!
এই হত্যাকাণ্ড ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কি আর?

* * *

না পারি বুঝিতে কিছু, নর-নারায়ণ
কেশব করুণাসিন্ধু বিষ্ণুঅবতার
জীবে দয়া, বিশ্বহিত, ধর্ম্মসংরক্ষণ—
যাঁর মহাধর্ম্ম নীতি, এই কার্য্য তাঁর?

মহর্ষি বলিলেন—

সংহার স্রষ্ঠার নীতি, সৃষ্টির কারণ,
জড়ে ও অজড়ে বৎস! সর্ব্বত্র সমান।
সৃষ্টি স্থিতি লয় দেখ চক্রের মতন
ঘুরিতেছে বিশ্বে, নাহি তিলার্দ্ধ বিশ্রাম
ধ্বং বিনা সৃষ্টি স্থিতি, বৎস, অসম্ভব।

শিষ্য বলিলেন, ধ্বংশ ও একটি নীতি বলিয়া স্বীকার করিলাম। সৃজন পালন যাঁর মায়া, মানিলাম ধ্বংশও তাঁহার নীতি। কিন্তু তিনিত নিজেই ধ্বংশ করিতে পারেন। আমরা কেন ধ্বংশ করি? আমরা মনুষ্য, আমরা এক কণা বালুকা সৃজন করিতে পারি না, আমাদের ধ্বংশ করিবার অধিকার কি? "আমি" কে?

মহর্ষি উত্তর করিলেন, তুমি

তাঁহার অস্ত্র! সৃষ্টি স্থিতি লয়
যেই নীতি চক্রে নিত্য হতেছে সাধিত,
তুমি পরমাণু তার—সেই নীতিচক্রে
সকলের কর্ম্মক্ষেত্র আছে নিয়োজিত;
স্বয়ং নির্লিপ্ত তিনি। * * *

মহর্ষি আরো বলিলেন।

মহাকাব্য বিশ্বগ্রন্থ—তত্ত্ব-রত্নাকর!
ভাসি এই অনন্তের মহাসিন্ধু নীরে,
মহাধ্যানে লভিতেছে মহাজনগণ
এই মহা অনন্তের যেই ক্ষুদ্র জ্ঞান,
ধর্ম্মশাস্ত্র নাম তার। শাস্ত্র অধ্যয়ন,
যোগবল মানবের শিক্ষার সোপান।
বিপ্লব-ঝটিকা-গর্ভে জন্মি অবতার
করেন জগতে ধর্ম্ম-যুগের সঞ্চার।

আরো বলিলেন

এই ধ্বংশ-যজ্ঞ, ধর্ম্ম। কর দরশন
সর্ব্বত্র ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্ম প্রবল,
সাধুদের হাহাকার, দুষ্কৃত দুর্জ্জন
বর্ষিতেছে নিরন্তর পাপ হলাহল।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, এই পাপভার
করিতে মোচন, বৎস! করিতে প্রচার
মহারাজ্য ধর্ম্মরাজ্য, করিতে প্রচার
ভারতে মহাভারত; কৃষ্ণ অবতার।

তাহার পর মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ চরিতের আদ্যলীলার কয়েকটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিলেন, আর বলিলেন।

সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত কৃষ্ণ সর্ব্বত্র নিষ্কাম,
সর্ব্বত্রই দয়াধর্ম্ম আদর্শ মহান্।

ইত্যাদি আরো অনেক কথায় মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ জীবনের নিষ্কাম কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে "যোগেশ্বর হরি, কাতর অর্জ্জুনকে যে ধর্ম্মগীতামৃত পান করাইয়াছেন আমি তাহাই সঙ্কলন করিয়া "গীতা" রচনা করিয়াছি। তুমি পাণ্ডব-শিবিরে গিয়া সুভদ্রাকে আমার আশীর্ব্বাদ সহ এই গ্রন্থ সমর্পণ করিবে। আর তাঁহাকে এই কথা বলিবে।

* * "যেই ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্—
সুভদ্রে! তোমাতে নিত্য, যে ধর্ম্মে দীক্ষিত

তব পতি বীরবর পার্থ মহারথী,
এই গ্রন্থে সেই ধর্ম্ম ভাষায় চিত্রিত।
তব চন্দ্র মুখ দেবি! সুধার আধার
যে আলোকে, এই গীতা জ্যোৎস্না তাহার।”

এইরূপে কবি আমাদিগকে মহর্ষি বেদব্যাস ও তাঁহার শিষ্যের কথোপকথন ছলে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের হেতু ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ চরিতের মহত্ত্বের আভাস মাত্র দিয়া, গ্রন্থ আরম্ভ করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি গীতোক্ত ধর্ম্মের মর্ম্ম নিজে যেরূপ বুঝিয়াছেন তাহাই এ কাব্যে বিবৃত করিয়াছেন। গীতার মর্ম্ম যথাযথ হইল কি না, অথবা পৌরাণিক চরিত্র তৎকালোচিত হইল কি না, তাহার বিচার করিতে গেলে প্রবন্ধ না লিখিয়া এক খানি গ্রন্থ লিখিতে হয়। আমাদের পত্রিকা ক্ষুদ্র, সকল কথার বিস্তারিত আলোচনা একটি প্রবন্ধে করিবার স্থান ও সুবিধাও আমাদের নাই। আমরা সে বিষয়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

পাঠক উদ্ধৃত স্থানগুলি লক্ষ্য করিলে দেখিবেন, যে কিরূপ জটিল কথা, কবি কেমন সুললিত ও প্রাঞ্জল ভাষায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এ সর্গ কাব্যের সূচনা মাত্র। সূচনার যাহা উদ্দেশ্য তাহা অতি সুন্দররূপে সাধিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সর্গ।

এই সর্গের নাম, “জীবন-সঙ্গীত”। কবি কি অর্থে এ সর্গের এরূপ নামকরণ করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। অনুমান করি, যে এই সর্গের নায়ক নায়িকার জীবন—প্রেমময়, সুখময়, ক্রীড়াময়, স্বপ্নময় বলিয়া, কবি এ সর্গের ভাবার্থকে সঙ্গীতস্বরূপ অনুভব করিয়া, ইহার নাম রাখিয়াছেন—জীবন-সঙ্গীত। অপরিস্ফুট ভাষা আমাদের অতৃপ্তিকর। আজকাল ইংলণ্ডের কবিদের দেখাদেখি এ দেশেও “আবছায়া” ভাবে কবিতা রচনার প্রথা বড়ই প্রবল। দোষ ধরিলে তাঁহারা বলেন, পাতার আড়ালে থাকিয়া ফুটন্ত ফুলটি দেখা দিলে যেমন সুন্দর দেখায়, একেবারে অনাবৃত ফুল্‌টি কি তত সুন্দর দেখায়? আমরা এরূপ অর্দ্ধবিকশিত সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী নহি। বরং আমরা এরূপ প্রথার বিরোধী। ভাবুক মাত্রেরই মনে ভাবোদয় হইয়া থাকে। যিনি প্রকৃত কবি তিনি সেই ভাবকে সৌন্দর্য্য ও সৌরভে বিভূষিত করিয়া পরিস্ফুট করিয়া থাকেন। যিনি অকবি তাঁর আঁকু পাঁকুই সার—তাঁর না ফোটে ভাব—না ফোটে ভাষা। আমরা অকবির কবিত্বে জ্বালাতন হইয়াছি, সুতরাং সুকবির লেখায় অকবির ‘ছটফটানি’ দেখিলে বড়ই দুঃখিত হই,। কবি হইলেই যে হৃদয়ের সকল ভাবগুলি পরিস্ফুট করিতে পারিবেন, আমরা সে কথা বলি না। যদি কোন ভাব কবি ভাল করিয়া ফুটাইতে না পারেন, তবে সে ভাব সময়ান্তরের চেষ্টার অপেক্ষায় রাখিয়া, ভাবান্তর গ্রহণ করা উচিত। অপরিস্ফুট ফুল দেখিয়া নয়নের আনন্দ হয় না, ভোজ্য বস্তু সুপ্রকরণে প্রস্তুত না হইলে রসনার তৃপ্তি হয় না। আলোচ্য গ্রন্থ আমাদের উপলক্ষ্যমাত্র;—এ গ্রন্থে এরূপ দুষ্যভাষা বিরল। তরুণ কবিদিগকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম।

জীবহত্যার ভীষণ প্রাঙ্গণ কুরুক্ষেত্রের মধ্যস্থলে শান্তিময় অভিমন্যু-শিবির। সেই শিবিরে বসিয়া অভিমন্যু ভীষ্মের শরশয্যার চিত্র আঁকিতেছেন। উত্তরা অজ্ঞাতে তাঁহার আসন-পশ্চাতে আসিয়া বলিলেন “কি হে বীরবর! আজ যে সকাল সকাল রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে? জীবহত্যায় অরুচি হইল নাকি?

কবি উত্তরার যে সুন্দর মূর্ত্তিখানি আঁকিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গকে না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

আনন্দ নির্ঝর উছলে হৃদয়ে
আনন্দ নির্ঝর নয়ন তারা
আনন্দ নির্ঝর ক্ষুদ্র রক্তাধর;
ঢালে অবিরল আনন্দধারা,
সে হাসি আনন্দ, আনন্দ সে ভাষা,
কাঁদিতেও হাসি অশ্রুতে ভাসে;
অভিমান ভরে থাকে যদি বালা,
কোথা হাসি যেন লুকাইয়া হাসে।
যথায় উত্তরা তথা উচ্চ হাসি,
তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁশরী ঝঙ্কার।

যথায় উত্তরা তথা উচ্চ ভাষা
কিশোরীর? না না, স্বর্গীয় বীণার।

অভিমন্যু উত্তরার কথার উত্তরে বলিলেন, "যথার্থই উত্তরে! যুদ্ধ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি, যুদ্ধ- করিতে করিতে, কার হাসি টুকু, কার মুখ খানি মনে পড়িল, আর থাকিতে পারিলাম না।" উত্তরার মুখ খানি আদরে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন "দেখি, দেখি, এই মুখ খানিই বটে, এই হাসি টুকুই বটে।" অমনি

অধরে অধর হইল মিলিত
অধরে অধর রহিল গাঁথা
অধরে অধর কি সুধা ঢালিল
নিমিলিত চারি নয়ন পাতা।

তখন উত্তরা বলিলেন

নরহত্যা করি মিটেনি কি সাধ?
নারীহত্যা কেন এরূপে আবার?

অভিমন্যু বলিলেন

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে করে নরহত্যা
যে জন, এ কথা সাজে কি তার?
তবে নরহত্যা মানি শ্রেষ্ঠতব,
মারিয়া বাঁচাও দিনে শত বার।

শেষে উত্তরা অভিমন্যুর চিত্র তুলিকা লইয়া পলায়ন করিলে, অভিমন্যু তাঁহাকে ধরিতে ছুটিলেন। সে ছুটাছুটির দৃশ্য বড়ই সুন্দর। একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

ক্রীড়ারত বন কুরঙ্গিনী মত
ঘুরিছে ফিরিছে বিরাট বালা;
হাসিয়া হাসিয়া ছুটিছে বালিকা,
হাসির ঝলকে শিবির আলা।
ক্রীড়ারত বন কুরঙ্গের মত,
পশ্চাতে পশ্চাতে কিশোর ধায়
মুখ ভরা হাসি, প্রেম ভরা আঁখি,

দুইটি বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়!

* * *

শ্রমে পদ্মবর্ণ, কপোল যুগলে
ভাসিছে গোলাপ সদ্য বিকসিত
শোভিছে দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে যুবার
ক্ষীণ কটিতট কুসুম দাম;
জ্যোৎস্নার লতা উত্তরীরা মত
শোভিতেছে বক্ষে মোহিত প্রাণ।
চুম্বিছে যুবক আবার আবার
ফুলে ফুলে সেই পুষ্পিতা লতা
আবার আবার হাসির তরঙ্গ
কি ভাষা হাসির! মরি কি কথা!

ক্রীড়া কৌতুক সাঙ্গ হইল, অভিমন্যু উত্তরাকে ভীষ্মের শরশয্যায় অঙ্কিত চিত্র দেখাইলেন। সে চিত্র এমন মহান, এমন বিস্ময়কর, যে আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বামপার্শ্ববিদ্ধ শায়কে শায়িত;
ঘন অস্ত্রাঘাতে উরস-অম্বর,
আচ্ছন্ন কিংশুকে, বীরত্ব আধার;—
নাহি পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র একটি আঁচড়
বিস্মিত পাণ্ডব বিস্মিত কৌরব,
বিস্মিত ধরার বীরেন্দ্র মণ্ডল,
দাঁড়ায়ে নীরবে শ্লথধনু করে
দেখিছে এ দৃশ্য আঁখি ছল্ ছল্।
ধান্য ক্ষেত্রে ছিন্ন তৃণরাশি মত,
চারিদিকে অস্ত্র পড়ি স্তরে স্তরে;
চারি দিকে হত চতুরঙ্গ দল,
দ্বীপমালা যেন শোণিত সাগরে।

এ করুণ দৃশ্য দেখিয়া উত্তরার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, বলিলেন "বীরত্বের কি এই পরিণাম! কুসুম শয্যার পরিবর্ত্তে শরশয্যায় শয়ান।

অভাগি এরূপে কিলো, অনিদ্রায় অনাহারে,
খোয়াইবি দেহ আপনার?

* * *

শিবিরে শিবিরে ঘুরি, আহতের সুশ্রূষায়,
হইয়াছে কি দশা তোমার!

সুলোচনাকে সুভদ্রার "অভাগি" বলিয়া সম্বোধন করা হয় ত অনেকের অপ্রীতিকর হইবে, কিন্তু পাঠক! পরে যখন সুলোচনার কদরের পরিচয় পাইবেন তখন আপনার এ বিরক্তির কারণ সম্ভবত থাকিবে না।

সুভদ্রা উত্তর করিলেন—

* * *

রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া,
দিদি! এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ?

সুলোচনা বলিলেন—

* * *

মানিলাম নারীধর্ম্ম, আর্ত্ত আহতের সেবা,
কিন্তু শত্রুদের সেবা কেন?
তাহাদের মড়া নিয়া, তাহারা মরুক গিয়া,
তোর কেন মাতা ব্যথা হেন?

উত্তরে সুভদ্রা যাহা বলিলেন তাহা একজন কোন দার্শনিক চূড়ামণীর মুখেই শোভা পায়। সুভদ্রা বলিলেন—

শত্রু কি মানুষ নহে, লো আমার মত,
রক্ত মাংস নাহি কি তাহার;
তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ?
এক জল ভিন্ন জলাধার।

* * *

ক্রমশঃ।

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

১ম ভাগ—৯ম সংখ্যা। পৌষ—১৩০০।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম :—

শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল্; শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীরসময় মিত্র, এম্, এ; শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্; পণ্ডিত শ্রীরামচরণ শর্ম্মা; শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিষয়। পৃষ্ঠা।
১। অদৃষ্টবাদ ২৫৭
২। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত এবং গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ২৬১
৩। সতীত্ব ২৬৮
৪। সংকীর্ত্তন—মধুর ভাব, পূর্ব্বরাগ ২৭৫
৫। চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ ২৮০
৬। শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী ২৮১
৭। কুরুক্ষেত্র ২৮৪

হুগলী,
সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পৌষ—১৩০০।

এই সংখ্যার মূল্য ৴১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার সম্পাদকতার ভার লইয়াছেন, কোন ব্যক্তি বিশেষ ইহার সম্পাদক নহেন।

সম্পাদক-সমিতির নাম আপাততঃ প্রকাশিত হইল না। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনের জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ। } পৌষ, সন ১৩০০ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

অদৃষ্টবাদ।

অদৃষ্টবাদ ভারত ভূমির অতীব অধঃপাতের একটি প্রবল হেতু ও ভাবি অভ্যুদয়ের অন্যতম অন্তরায়। যদি এদেশে অদৃষ্টের নাম গন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে আলেক্‌জ্যাণ্ডার, ঘোরী প্রভৃতি বীরকেশরিগণ আসিতে পারিত না; ভারতের স্বাতন্ত্র্য সূর্য্য একবারে অস্তমিত হইত না। প্রত্যুত হিন্দুগণ সাগর মন্থন বিদ্দুদ্দাম ধারণ প্রভৃতি কোনও গুরুতর ব্যাপার সম্পাদন করিতে পারেন না, কারণ অদৃষ্টবাদেই হস্ত অবরোধ করে। ইহাই অধুনাতন কতকগুলি বাক্যবীরের কল্পনা।

তাঁহাদিগের মতে অদৃষ্ট, ভাগ্য বা নিয়তি আর্য্যগণের প্রধান অবলম্বন, প্রতি পদে তাহা এক মাত্র লক্ষ্য হওয়ায় পুরুষকার অপরিচালিত ও হীনপ্রভ হইয়া আমাদিগকে নিরুদ্যম করিয়া তুলিয়াছে। নিরুদ্যমতাই মানবীয় অভ্যুদয়ের অর্গল।

পুরুষকারের অধিকার প্রসার থাকিলে মনুষ্য সূচ্যগ্রকে সুমেরু শৃঙ্গকার এবং শিশির বিন্দুকে সাগর তরঙ্গে পরিণত করিতে পারে। অদৃষ্টবাদেই এহেন বহুর্লভ পুরুষ শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়াছে। তাহাই ভারতের সর্ব্বনাশের মূল।

আমরা সম্প্রদায় বিশেষের এই সিদ্ধান্তকে ভ্রমের বিজৃম্ভণ বলি। আর্য্যগণের অদৃষ্টবাদই পুরুষশক্তির পোষক; শোষক নহে। তাহাই ভারতের

উন্নতির উপকরণ। সম্প্রদায় বিশেষের ব্যাখ্যা ও অদৃষ্টবাদ সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। শাস্ত্রে বলে—

প্রাগ্ জন্মনি কৃতং কর্ম্ম   শুভং বা যদি বাশুভম্।
দৈব শব্দেন নির্দ্দিষ্ট   মিহ জন্মনি তদ্‌বুধৈঃ॥
দৈবং পুরুষকারশ্চ   কালশ্চ পুরুষোত্তম।
ত্রয় মেতন্মনুষ্যাণাং   পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহম্।
কৃষের্বৃষ্টিসমাযোগাৎ   দৃশ্যন্তে ফল সিদ্ধয়ঃ।
তেতু কালে প্রদৃশ্যন্তে   নৈবাকালে কথঞ্চন॥

মৎস্য পুরাণ।

জন্মান্তরীণ পুরুষকার নিষ্পাদিত কর্ম্ম যখন পর জন্মে ফল প্রদানে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে দৈব বলে। সেই দৈব ও ঐহিক পুরুষকার মিলিত যথা সময়ে ফল সম্পাদন করে। যেমন কৃষি বৃষ্টি সংযোগে সময়েই হয়, অকালে হয় না, তদ্রূপ দৈব ও পুরুষকার সময়কে সহায় লইয়া কর্ম্ম সমুদায় সম্পাদন করে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্র অনুসারে দৈব আর কিছু নহে, কেবল জন্মান্তরীণ পুরুষকারের ফল মাত্র। ইহার ভাগ্য প্রভৃতি কতকগুলি নাম আছে। যথা,

দৈবং দিষ্টং ভাগধেয়ং ভাগ্যং স্ত্রী নিয়তির্বিধিঃ।

অমর কোষ।

এই দৈব বা ভাগ্য আবার অদৃষ্ট নামে আখ্যাত। তাহার কারণ ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাৎ। ন্যায় দর্শন।

কর্ম্ম জন্য পুণ্যে ও পাপ বা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে অদৃষ্ট বলে।

পুণ্যের নাম শুভাদৃষ্ট ও পাপের নাম দুরদৃষ্ট। কর্ম্ম শুভাশুভ ফলের সাক্ষাৎকারণ হইতে পারে না, কারণ কর্ম্ম তৎকালে নাশ প্রাপ্ত হয়, সাক্ষাৎ কারণ হইলে ফলের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া চাই। এজন্য তৎকাল নশ্বর কর্ম্ম পুণ্য পাপ নামক পদার্থে পরিণত হইয়া বহু বিদূরবর্ত্তী রাজ্যলাভ বা স্বর্গসুখ এবং ধন নাশ বা নরক বাস প্রভৃতি শুভাশুভ ফল সম্পাদন করে।

দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ) কর্ম্মের এই পরিণাম অপ্রত্যক্ষ, এই কারণ ইহা অদৃষ্ট নামে অভিহিত। দার্শনিকগণ বলেন—

চিরধ্বস্তং ফলায়াত্তং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা।

বহু পূর্ব্বে বা জন্মান্তরে ধ্বংস প্রাপ্ত কর্ম্ম অদৃষ্ট ব্যতীত ফল কখনও জন্মাইতে পারে না।

যদি কর্ম্ম মাত্র অদৃষ্ট আকারে পরিণত হইল, তবে কর্ম্মরূপী দৈবকে অদৃষ্ট কেন না বলিব ?

এই বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বচন পূর্ব্বাচর্য্য সম্মত তদ্দীয় ব্যাখ্যা এই—

দৈবে পুরুষকারেচ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্রদৈব মভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্॥

ব্যাখ্যা। কর্ম্মসিদ্ধি—শুভাশুভ কর্ম্মসিদ্ধিঃ, পূর্ব্বকালীন দেহেন পুরুষ নিষ্পন্নং সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চ ফলোন্মুখী ভূতং সুদৈবং দুর্দ্দৈবঞ্চেতি।

জন্মান্তরীণ শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট পর জন্মে ফল প্রদান কালে সুদৈব ও দুর্দ্দৈব নামে বিশেষিত হয়। অতএব শাস্ত্রীয় শাসন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দৈবকে অদৃষ্ট বলা যাইতে পারে। ইহার অন্তস্তলে অদৃষ্ট শব্দের উক্তরূপে যৌগিক অর্থ বিরাজমান আছে। যখন আমরা ঐহিক পুরুষকারকে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে প্রয়োগ করি, কিন্তু অকস্মাৎ শত সহস্র উদ্যমেও ফলবিপ্লব বা অনর্থ উপস্থিত হয়, তখন বলি "দুরদৃষ্টই এই অনিষ্টের নিদান।" পক্ষান্তরে যখন হঠাৎ বা অল্পায়াসে অর্থ প্রাপ্তি প্রভৃতি অচিন্তনীয় ইষ্ট ফল লাভ করি, তখন বলি "শুভাদৃষ্টই ইহার হেতু"। উভয় স্থলে কারণ লোকের দর্শনাতীত বলিয়াই সচরাচর অদৃষ্ট শব্দ প্রয়োগ অর্থযুক্ত হইয়া থাকে। ভাগ্য প্রভৃতি শব্দ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত অদৃষ্ট পদার্থ বটে ; কিন্তু তাদৃশ যৌগিক অর্থশূন্য।

এইত গেল শাস্ত্রীয় অদৃষ্টবাদের রহস্য। সম্প্রদায় বিশেষের ব্যাখ্যা ত অদৃষ্ট নামক অন্য জিনিষ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত শাস্ত্রের সামঞ্জস্য নাই। আমাদিগের অদৃষ্ট কি জন্মান্তরীণ পুরুষ শক্তির ফল নহে ? এই অদৃষ্টবাদে যাঁহার ভক্তি ; তাঁহার ঐহিক কর্ম্মে আসক্তি জন্মিবেই, বিরক্তি নহে। কোন মনস্বী ব্যক্তি শাস্ত্রীয় অদৃষ্টের কথা শুনিয়া বর্ত্তমান ও ভাবি জন্মের জন্য কর্ম্ম করিতে ব্যগ্র না হইবেন ? কর্ম্মের জন্য পুরুষকার

চাই। শাস্ত্রীয় অদৃষ্ট জ্ঞান থাকিলে পুরুষশক্তি অপরিচালিত ও হীনপ্রভ হইবার কোন কারণ নাই। ইহা ভারতের কার্য্যাসক্তি প্রবৃত্তির অনুকূল, প্রতিকূল নহে। এই কার্য্য প্রবৃত্তি কেবল এই জন্মের জন্য নহে, ভাবি জন্মের জন্যও বটে। এই রূপই অদৃষ্ট কল্পনার মহিমা!

আবার বর্ত্তমান জন্মে পূর্ব্ব জন্মীয় অদৃষ্টের প্রতিকূলতা বোধ করিয়া হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। শাস্ত্রে বলে, ঐহিক অত্যধিক পুরুষকার দ্বারা দুরদৃষ্ট খণ্ডন করা যাইতে পারে। যথা—

প্রতিকূলং যদাদৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে।
মঙ্গলাচার যুক্তানাং নিত্যমুত্থানশালিনাম্॥

মৎস্য পুরাণ।

সদাচার ও উদ্যমশীল ব্যক্তির পুরুকার দ্বারা দুর্দ্দৈবের গতি রোধ হইয়া থাকে।

এষ মানুষ্যকো যত্নো মনুষ্যৈরেব সাধ্যতে।
শ্রূয়তাং যেন দৈবংহি মদ্বিধৈঃ প্রতিহন্যতে॥
মন্ত্রগ্রামৈঃ সুবিহিতৈ রৌষধৈ শ্চৈব যোজিতৈঃ।
যত্নেন চানুকূল্যেন দৈবমপ্যনুরুধ্যতে॥

হরিবংশ।

কংস রাজের উক্তির সার এই—মনুষ্যকৃত কার্য্যের প্রতীঘাত মানুষেই করিতে পারে, কিন্তু মাদৃশ লোক মন্ত্র ঔষধ ও উপযুক্ত যত্ন দ্বারা দৈবকে আয়ত্ত করিয়া থাকি।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে,ভারতবাসীর পুরুষকার সর্ব্বস্ব অদৃষ্ট পুরুষকারের মূর্ত্তিভেদ মাত্র। এহেন অদৃষ্টবাদ ভারতের ভিত্তি ভঙ্গের কারণ নহে। তাহা অন্য কারণে ঘটিয়াছে। অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন—পূর্ণিমার অবসানেই অন্ধকারের আবির্ভাব ও পূর্ণ জলোচ্ছ্বাসই বারি হ্রাসের পূর্ব্ব সূচনা—প্রকৃতির এই গতি।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত এবং গ্রন্থাবলীর সমালোচনা।

কথিত গ্রন্থ বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, প্রণয়ন করিয়াছেন। এরূপ সুন্দর সুলিখিত জীবন চরিত অদ্যাবধি বঙ্গ ভাষায় প্রণীত হওয়া দৃষ্ট হয় না। কেশবচন্দ্র সেনের এবং বিদ্যাসাগর মহশয়ের জীবন চরিতাপেক্ষা ইহা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ এবং সুরচিত। পুস্তক খানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য যোগীন্দ্র বাবু অর্থ ব্যয়, পরিশ্রম ও যত্নের ত্রুটি মাত্র করেন নাই। গুণ গৌরবে ইহা টমাস মুর কৃত লর্ড বায়রানের জীবন চরিতের সমতুল্য। তবে ইহা বঙ্গ ভাষায় রচিত।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই যে ইয়ং বেঙ্গলের দল অভ্যুত্থিত হইয়া ছিল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাহার একজন অতি প্রধান ব্যক্তি। মধুসূদন উচ্চ দরের শিক্ষিত প্রতিভাশালী এবং একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। কবিবর লর্ড বায়রাণ্ এবং কাপ্তেন রিচার্ডসান সাহেবকে আদর্শ করত তিনি জীবন-মার্গে বিচরণ করিতেন। কবিত্বে বায়রাণের সমকক্ষ হইবার জন্য মধুসূদন একান্ত সমুৎসুক এবং আকুল চিত্ত ছিলেন। ধর্ম্মে কর্ম্মে এবং মর্ম্মে মধুসূদন বায়রাণের অনুরূপই ছিলেন। প্রেমানুরাগ বশতঃ বায়রাণের ন্যায় মধুসূদন ও প্রথমা বনিতাকে বর্জ্জন করত দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন।

যাহা কিছু ইংরাজী কেবল তাহাই মধুসূদনের চক্ষে সৌন্দর্য্য ধারণ করিত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড সম্বন্ধে তিনি এইরূপ উক্তি করেনঃ—"ইংলণ্ড স্বাধীন সমুজ্জ্বল ধর্ম্মের আবাসভূমি। ইহার সন্তানগণ প্রকৃত গৌরব ভূষিত এবং নীচ স্বার্থপরতা রত নহে। কবে আমি এই দেব দুর্ল্লভ স্থানে গমন করিব!" তাঁহার পরম স্নেহময়ী জননী পরমা-সুন্দরী স্বজাতীয়া একটি কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলে, মধুসূদন বলেন "মা তুমি যতই বল, বাঙ্গালীর মেয়ে রূপে গুণে কখন ইংরাজের শতাংশের একাংশ হইতে পারে না। পীড়িতাবস্থায় যখন

উত্তরপাড়ায় অবস্থিতি করেন তখন বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে মধুসূদন বলেন "বাঙ্গালী কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে সম্মত হইলে আমি বারিষ্টার মণ্ডলীর নিকট অপদস্থ এবং ঘৃণিত হইব।" এই দারুণ দোষের উপর মধুসূদন যারপর নাই অসংযত চিত্ত উদ্ধত এবং বিলাসী ছিলেন। নিত্য নূতন পোযাক এবং সুগন্ধ দ্রব্য না পাইলে, তাঁহার তৃপ্তি হইত না। হিন্দুর ছেলে ঘোর সাহেব, অসংযতেন্দ্রিয়, বিলাসী এবং স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে কি ভয়াবহ পরিণাম এবং উৎসন্নতা প্রাপ্ত হয়, তাহা অবগত হইহার জন্য ইয়ং বেঙ্গল আখ্যাত যুবক বৃন্দের নিবিষ্ট মনে এই জীবন চরিত পাঠ করা উচিত।

মধুসূদনের জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্তের চরিত্র যোগীন্দ্র বাবু উত্তমরূপ চিত্রিত করিরাছেন। সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের ন্যায় তাঁহার ১৭।১৮ বৎসর বয়সের একখানি প্রতিকৃতি গ্রন্থ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার ৪৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অল্প পুর্ব্বের একখানি প্রতিকৃতি গ্রন্থ মধ্যে দেওয়া হইলে, পাঠক কথঞ্চিৎ দেখিতে এবং বুঝিতে পারিতেন যে যথেচ্ছাচারিতা, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা এবং ঘোর বিলাসিতা দোষে তাঁহার সেই সুন্দর সুগঠিত এবং বলিষ্ঠ দেহে কি ভয়ঙ্কর বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল। যোগীন্দ্র বাবু তাহা করেন নাই এবং কোন কঠোর রোগে তাঁহার প্রাণ বায়ু শেষ হয় তাহারও উল্লেখ গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পত্রে এই মাত্র প্রকাশ যে তাঁহার chronic laryngitas হইয়াছিল। বিষম পান দোষে এবং দারুণ অসংযম হেতু যে যে অতি উৎকট পীড়ার উদ্ভব হইয়া থাকে তাহার কোন একটিতে অবশ্য মধুসূদন অকালে কাল-কর-কবলিত হন। যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার রোগের নির্দ্দেশ করিলে মধুসূদনের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট লোকের কতক পরিমাণ উপকার করিতেন। আমাদের চক্ষে আরও একটি অভাব লক্ষিত হয়। মৃত্যু সময়ে সামান্য দোকানদার হইতে অন্যান্য অনেক ব্যক্তি তাঁহার উত্তমর্ণ যোগীন্দ্র বাবু ইহাই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল দোকানদার কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রেতা ছিল, মধুসূদনকে কে কি দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিল এবং কোন্ কোন্ কাজে তাঁহার ঋণ হইয়াছিল; ঋণ সংসার খরচ অথবা স্বীয় কিম্বা বনিতার চিকিৎসার্থ হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলে, নিদান কালেও তিনি পূর্ব্বমত অসংযত ছিলেন কি সংযত হইয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত হইবার আমাদের সুযোগ ঘটিত।

মধুসূদন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—"রাম এবং তাঁহার অনুগামিদের আমি ঘৃণা করি।" মাত্র এই একটি কথা দ্বারা মধুসূদন কি চরিত্রের, কি স্বভাবের এবং কি প্রকারের লোক ছিলেন তাহা স্পষ্ট সূচিত হয়। যে সময় তিনি এই বিষম কথার উল্লেখ করেন তখন তাঁহার প্রায় ৩৮ বৎসর বয়স এবং রামায়ণ উত্তমরূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীরাম চরিত, "চরিত পঞ্জিকা" এটি যার তার কথা নয়, মহাকবি ভবভূতির কথা। শ্রীরামচন্দ্রের তুল্য, ধর্ম্মজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, সুচরিত্র, সত্যবাদী, সর্ব্বভূতহিতৈষী প্রজারঞ্জনাদিসামর্থ্যশালী গুণবান বীর্য্যবান পুরুষ ইহলোকে অবতীর্ণ হন নাই। এই মহান চরিতের বিপরীত গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিই কেবল এইরূপ চরিত্রশালী মহাপুরুষের ঘৃণা করিয়া থাকে। যোগীন্দ্র বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এবং স্বয়ং মধুসূদন বলিয়াছেন যে তিনি "মধু" পায়ী এবং "মধু" প্রিয়া ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম বিরহিত, ঘোর ইন্দ্রিয় পরায়ণ এবং দারুণ বিলাসী বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক পরম স্নেহময় পিতা এবং স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে তিনি দারুণ ব্যথা দিয়া তাহাদের উভয়কে মরণ মুখে নিপতিত করেন। এ হেন চরিত্রের মধুসূদনের শ্রীরামচন্দ্রকে ঘৃণা করা বিচিত্র নহে। এই ঘৃণা প্রকাশ দ্বারা মধুসূদন রাঘবারি রাক্ষস বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন "আমি প্রচলিত রীতির বিপক্ষ। আমি জগতকে নূতন বিষয় শিখাইবো।" যৎকালে তিনি এই দম্ভ বাক্য প্রয়োগ করেন তখন তাঁহায় ১৭ বৎসর বয়স। ফলতঃ তিনি অনেক নূতন জিনিস আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমিত্র ছন্দ বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে নূতন জিনিস। তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মিত্র ত্রিপদ্যাদি ছন্দও নূতন। কবি গুরু বাল্মীকির রামায়ণাপেক্ষা অতি নিকৃষ্ট হইলে ও তাঁহার মেঘনাদ বধের রাম লক্ষ্মণ এবং রাবণ নূতন জিনিস। আহারে ব্যবহারে, কথা বার্ত্তায়, পরিচ্ছদে হৃদয় মন গঠনে হাড়ে হাড়ে ইংরাজ হইয়াও তিনি যে গাইয়াছিলেনঃ—

সুশ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা—বৎসরের পরে
মহিষমর্দ্দিনী-রূপে ভকতের ঘরে ;

* * *

কি আনন্দ ! * *
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি

ইহাও নূতন বটে। মেঘনাদের প্রমীলা নূতন পদার্থ না হইলেও রণবেশে এবং রণসজ্জায় প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ নূতন বলিতে হইবে। বীরাঙ্গনা কাব্যে কতকগুলি ভারতীয় বীর নারীকে স্বীয় ভর্ত্তা এবং প্রিয়তমকে তিনি পত্র লেখাইয়াছেন। ইহাও নূতন। এইরূপ ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র অনেক নূতন জিনিস তিনি আমাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন। তাঁহার সেই সদন্তবাণী সফল হইয়াছে।

সকলেই যশঃ প্রয়াস করিয়া থাকে। কিন্তু মধুসূদনের যশোলিপ্সা সবিশেষ প্রবলা ছিল। বিলাত যাইবার সময় কেবল মাত্র তাঁহার সুখ্যাতির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য স্বীয় পরম বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে তিনি অনুরোধ করেন। ১৮৫৯ সালের ১৯শে মার্চ্চ তিনি গৌরদাস বসাক বাবুকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে বলেন "বাঙ্গালা লিখিয়া যদি যশোলাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার বাঙ্গালা লেখাই উচিত।" মধুসূদন বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডার বেশ সুসজ্জিত করিয়াছেন এবং সকল বঙ্গ সন্তান তজ্জন্য তাঁহার নিকট সবিশেষ ঋণী। কিন্তু প্রবল যশোলিপ্সাই যে বিলাতী লাইয়র (lyre) পরিত্যাগে বাগ্দেবী সরস্বতীর পদতলস্থিত বীণাযন্ত্রে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিল ইহা বলায় দোষ নাই।

মধুসূদন কেবল যশোলিপ্সু ছিলেন না, ঘোর দাম্ভিক তমোগুণান্বিত ছিলেন। তিনি মেঘনাদ বধ সম্বন্ধে স্বীয় বন্ধু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন "লোকে এই কাব্যের অতীব আদর করিতেছে। অনেকে বলে আমি কালিদাসকে পরাস্ত করিয়াছি। ভারজিল, টাকো এবং কালিদাসের তুল্য হওয়া দুঃসাধ্য নহে।" অন্য এক সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন "ভারতচন্দ্র অতি নীচ, মন্দ কবিতা সমূহের জনক।" আর তিনি মেঘনাদ বধের প্রারম্ভে বলিয়াছেন"—

রচিব চক্র, গৌড়জন যাহে,
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

এই সকল উক্তি মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তিদের চরিত্রসুলভ বটে।

মধুসূদন বঙ্গের বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, যোগীন্দ্র বাবুর এই কথায় আমরা সায় দিতে পারি। কিন্তু তিনি মেঘনাদবধের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন তাঁহার সেই প্রশংসাবাদে আমরা যোগ দিতে পারি না। (শ্রীরাম লক্ষ্মণকে দুইটি যৎসামান্য ব্যক্তির ন্যায় বর্ণন করা হইয়াছে। এই কাব্যে রাবণের, রাক্ষসদের প্রতি সমানুভূতি উদ্রেকের বিশেষ চেষ্টা লক্ষিত হয়। কিন্তু এই চেষ্টা যার পর নাই দুষ্ট। দশানন ঘোর দুরাচারী পরম পাপী ছিলেন। তাঁহার প্রতি সমানুভূতি করিতে হইলে পাপ কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এইরূপ করিবার জন্য যদি মেঘনাদবধ পাঠ করিতে হয় তবে তাহা পাঠ না করাই ভাল। পাঠককে ধর্ম্মে অনুরক্ত এবং পাপাচারে বিরক্ত বিদ্বিষ্ট করিবার জন্য এবং পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় সর্ব্বথা হইয়া থাকে ইহাই প্রদর্শন এবং সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। এই হেতুই রামায়ণ অতি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। মধুসূদনের উদ্দেশ্য কিন্তু ভিন্ন প্রকার! রাবণের কিনা পাপ কর্ম্মের অনুরাগী হইবার জন্য তিনি পাঠককে অনুরোধ করিয়াছেন। মেঘনাদবধের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে এই কথাই যথেষ্ট।)

মেঘনাদবধের সীতা সম্পর্কে যোগীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, "বাল্মীকির সীতায় যে একটু অপূর্ণতা ছিল মধুসূদন তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।" এই একটি নূতন আবিষ্কার বটে! ত্রিকালজ্ঞ এবং মহর্ষি বাল্মীকি যাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং সৌষ্ঠবপূর্ণ করিতে পারেন নাই, মাইকেল দ্বারা তাহার পূর্ণতা সম্পন্ন হইয়াছে। স্বীয় কথা সমর্থন করিবার জন্য যোগীন্দ্র বাবু মেঘনাদবধের ৪র্থ সর্গ হইতে নিম্ন লিখিত কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাবণ তাঁহার অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছে বিভীষণপত্নী সরমা এইরূপ উক্তি করিলে সীতা দেবী বলেনঃ—

বৃথা গঞ্জ দশাননে * * *
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে আভরণ ;

সীতা দেবীর মুখে এই কথা শ্রবণে যোগীন্দ্র বাবু কহিয়াছেন, যে দেবী আততায়ীরও অকারণ দোষ দিতে চেষ্টা করেন নাই। যোগীন্দ্র বাবুর এই ব্যাখ্যাটি ভ্রমাত্মক। এই কথায় সীতা দেবীর সত্যাদর প্রকাশ পায় মাত্র। সীতা দেবী যে অনৃতাচারিণী ছিলেন তাহার আভাস মাত্র রামায়ণে নাই। তিনি সাধ্বী নারীর আদর্শ এবং সাধ্বী আদর্শ নারী করিয়াই মহাকবি তাঁহাকে বিরচিত করিয়াছেন। সাধু পুরুষ এবং সাধ্বী নারীতে সত্য এবং সর্ব্বভূত হিতৈষিতা পুর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান থাকে।

সীতা দেবীর চরিত্রের অসম্পূর্ণতা দর্শাইবার জন্য যোগীন্দ্র বাবু আবার কহিয়াছেন। সীতা দেবী সরমাকে বলিতেছেনঃ—

"সুখের প্রদীপ সখি! নিবাইলো সদা,
প্রবেশি যে গৃহে হায়! অমঙ্গলরূপী আমি।
মরিল বাসবজিত অভাগীর দোষে।"

বলা হইয়াছে সীতা চরিত্রে এটি অনুপম দেব ভাব। আরও বলা হইয়াছে যে আর্য্য রামায়ণে সীতা প্রকৃতিতে এ অপূর্ব্ব ভাবটি লক্ষিত হয় না। আমি একান্ত অভাগী, আমি অমঙ্গল ঘট স্বরূপ, আমার ভাগ্য পোড়া, এই সকল উক্তিতে যে কি দেব ভাবের বিকাশ পায় আমরা বুঝিতে অক্ষম। আর সীতা দেবীর দোষে ইন্দ্রজিত বিনাশ প্রাপ্ত হন, এ কথা মধুসূদনকে কে বলিল? রাবণ এবং তৎপুত্রগণ আপন দোষেই বিনষ্ট হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ প্রভৃতি শ্রীরামচন্দ্রকে বনগমনে নিষেধ করেন। কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকির সীতা তাহা করেন নাই। নির্ব্বাসিতা হইয়াও সেই সীতা আর্য্যপুত্রের কুশল সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, আমি বনে বিসর্জ্জিতা হইলেও তাঁহার রাজ্য এবং হৃদয় হইতে অন্তরিত হই নাই। এ সকলেতে কি দেব ভাব প্রকাশ পায় নাই? বাল্মীকির সীতাপেক্ষা মহামনা দেবমনা নারী কল্পনা কি ধারণা, কি সৃজন করিতে সক্ষম? আর নির্ব্বাসিতা হইয়া বাল্মীকির সীতা দেবীও স্বীয় ভাগ্যের তিরস্কার করিয়াছেন। সীতার গঠনে মধুসূদন মহর্ষি বাল্মীকির পদ চিহ্নের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র।

"প্রমীলা চরিত্র মেঘনাদবধের মধ্যে নূতন" যোগীন্দ্র বাবুর এ কথাও ঠিক নহে। মধুসূদনের অতি প্রিয় পুঁথি কাশীদাসী মহাভারতের

নারী পর্ব্বে আমরা প্রমীলাকে দেখিতে পাই। কাশী দাসের প্রমীলা ও বীরাঙ্গনা এবং তাঁহার সঙ্গিনীরা ও বীর রমণী। তবে তাঁহার প্রিয় মহাভারতরূপ খনি হইতে প্রমীলাকে উত্তোলন করত কাটিয়া কুটিয়া মাজিয়া ঘসিয়া মধুসূদন মণিটিকে বিশেষ উজ্জ্বলতা এবং সৌন্দর্য্য সম্পন্ন করিয়া মেঘনাদবধ কাব্য দেহে সংযোজিত করিয়াছেন মাত্র।

মেঘনাদবধের ৮ম সর্গের কবির স্বর্গ এবং নরক বর্ণনারও যোগীন্দ্র বাবু যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, কবির সেই প্রিয় মহাভারতের সঞ্জীবনী পুরবর্ণন পাঠের ফল তাঁহার কথিত স্বর্গ নরক বর্ণনা। মধুসূদন একাধারে বণিক এবং স্বর্ণকার স্বরূপ ছিলেন। নানা রকমের সোণা পোড়াইয়া এবং গলাইয়া তিনি নিজ ইচ্ছা মত অতি সুন্দর সুন্দর গহনা গড়িতে পারিতেন। মালিনীর মত নানা মালঞ্চ হইতে ফুল সংগ্রহ করত অতি মনোহর মালা গাঁথিতে পারিতেন। অপরের জিনিস চোরাপবাদের ভাগী না হইয়া নিজের করিয়া লইতে সক্ষম ছিলেন। একজন চীন সামান্য একটি বাঁশে কত রকম সুন্দর জিনিস না করিতে পারে? মধুসূদনও তদ্রূপ করিতে পারিতেন। মধু মক্ষিকার ন্যায় সকল প্রকার ফুল হইতে মধু বাহির করত মধুচক্র রচনা করিতেন।

মধুসূদনের প্রধানতম গুণের কথা এ পর্য্যন্ত কহা হয় নাই। তাঁহার অমিত্র ছন্দ বঙ্গভাষার শক্তি সম্প্রসারণ পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের এবং ঈশ্বর গুপ্তের "ছন্দ বন্দ" বাগ্দেবীর পদে একরূপ নিগড় দিয়া রাখিয়াছিল। মধুসূদনই সেই নিগড় ভগ্ন করেন। কোন ভাবের উদর হইলে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য এখন কবিকে আর বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। বঙ্গ কবির কবিতার স্রোতঃ মধুসূদন প্রদত্ত সাহায্যে এখন আর কোন বাধা প্রাপ্ত হয় না। অমিত্রাক্ষরের ত কথাই নাই মিত্রাক্ষর ছন্দেও সেই স্রোতঃ আজ কাল অনেক সহজেই বাহির হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম লোকে ভাবিয়াছিলেন যে মধুসূদনের অমিত্র ছন্দ কেবল গভীর উচ্চ ভাব প্রকাশের উপযোগী। উক্ত ছন্দে কেবল মহাকাব্যাদিই রচিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যের মধুর অমিত্র ছন্দে লোকের সে ভ্রম বিদূরিত করিয়া দিয়াছে। এই কাব্য

অমিত্র ছন্দে রচিত হইলেও ছন্দের লালিত্য গুণে অতি শ্রেষ্ঠ। মধুসূদন এই নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তন এবং তাহার উৎকর্ষ সাধন না করিলে আমরা হয়তো হেমচন্দ্রের "বৃত্র সংহার" এবং নবীনচন্দ্রের "পলাসীর যুদ্ধ" এবং "কুরুক্ষেত্র" কাব্য লাভ করিতাম না। হেমচন্দ্রের সুমধুর কোমল ক্ষুদ্র কবিতাগুলিও মধুসূদন রোপিত তরুর ফল পুষ্প। কেবল পদ্য নয় বাঙ্গালা গদ্য ও তাঁহা হইতে একটি অভিনব শক্তি লাভ করিয়াছে।

"রতনেই রতন চেনে।" মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ইহাঁরা মধুসূদনের শক্তি বুঝিয়া তাঁহার প্রতিভারূপ প্রদীপে প্রথমতঃ উৎসাহরূপ তৈলাদি অর্পণ করেন। ইহাঁরা এইরূপ না করিলে হয়তো মেঘনাদবধাদি কাব্যের আমরা অধিকারী হইতাম না। এই কারণে প্রধানতঃ এই দুই ব্যক্তির নিকটও আমরা বিশিষ্টরূপে ঋণী।

সতীত্ব।

সতীত্ব নারীজাতির একটী প্রধান ধর্ম্ম। সকল দেশেই ইহার মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু উহার লক্ষণ সকল দেশে সমান ভাবে নির্দ্দেশিত হয় না। পাশ্চাত্য দেশে যাঁহারা সতী বলিয়া সমাদৃত তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আমাদের দেশের বিচারে তদ্রূপ পরিগণিত হয়েন না। যদি সকল দেশে সতীত্বের একরূপ ব্যাখ্যা হইত ও একই অর্থ পরিগৃহীত হইত তবে উহার আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হইত। আমাদের দেশেই এখন অনেকের মুখে অনেক প্রকার ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সতীত্বের প্রকৃত মাহাত্ম্য অনেকেই অনুধাবন করিতে অক্ষম।

পাশ্চাত্য দেশে স্বামী ভিন্ন অপর কাহারও দ্বারা ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তি না করিলে তাহাকে সতী বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেন "কাহারও কোন প্রকার ক্ষতি না হইয়া যে পরিমিত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হয় তাহাই সতীত্বের পরিচায়ক।" রবার্ট ওয়েন সাহেব বলেন "প্রেমপূর্ণ ইন্দ্রিয় সম্ভোগই" সতীত্বের লক্ষণ। ফল কথা যে রমণী

কুমারী বা বৈধব্য অবস্থায় কোন পুরুষের সহবাস না করে এবং বিবাহ হইলে স্বামীর প্রতি অনুরাগিনী থাকিয়া তিনি ভিন্ন অপর কাহারও দ্বারা ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ না করে তাহাকে সতী বলিয়া সকলেই সমাদৃত করিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও আজ কাল অনেকে সতীত্বের উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। তবে সকল গুণের যেমন তারতম্যতা আছে, সতীত্বের ও সেই প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে, সতীত্বের উচ্চ সোপান হইতে নিম্ন সোপান পর্য্যন্ত কতই বিভিন্ন অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়।

এই সকল অবস্থারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকল ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্য ঋষিগণ অতি উদার ভাবে এই সতীত্বের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা শুদ্ধ আদর্শ সতীর কথা বলিয়া নিরস্ত হয়েন নাই। যিনি স্বীয় জীবনে যতটুকু মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহারা সমাদর ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। (আদর্শ সতী হইতে না পারিলে সে নারী অপদার্থ এরূপ মনে করিলে প্রকৃতই অবিচার করা হয়।) শুদ্ধ আমাদের দেশেই সতী ছিলেন বা আছেন, অন্য কোন দেশে সতী নাই এইরূপ ভাবা অনুচিত। সকল দেশেই সতী আছেন, তবে আদর্শ সতীর সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের ন্যায় অপর কোন দেশে যে নাই তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে এখন দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক মনে করেন যে আদর্শ সতী সেই সতী, অপর যাহারা তাহাদিগকে সতী বলা যাইতে পারে না। অপর শ্রেণীর লোক মনে করেন তোমার ভারতের আদর্শসতী কাল্পনিক ব্যক্তি মাত্র, প্রকৃত জীবনে তাদৃশ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই উভয় ধারণাই দূষণীয়। এইরূপ ধারণা পরিহার পূর্ব্বক উদার ভাবে নারী জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সতীত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে পারা যায়।

১। আদর্শ সতী। যিনি কখনও জীবনে কোন পুরুষের সহিত সম্মিলিত হয়েন নাই, চির কুমারী ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, অথবা যিনি পুরুষের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাকে ব্রহ্মচারিণী, ধর্ম্মশীলা, সাধুশীলা ইত্যাদি বিবিধ বিশেষণে

বিশেষিত করিব, এমন কি স্থল বিশেষে আদর্শ রমণী বলিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাঁহাকে আদর্শ সতী বলিতে পারি না। পতির প্রতি স্ত্রীর যে বন্ধুত্ব যে অনুরাগ বা প্রেম তাহাই সতীত্বের লক্ষণ। আদর্শ সতীতে সেই প্রণয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সাবিত্রী রাজকুমারী স্বাধীন ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকেন। এপর্য্যন্ত কোন পুরুষই তাঁহার প্রণয় ভাগী হইতে পারেন নাই। একদিন ঘটনা ক্রমে এক বনে প্রবেশ করিয়া একজন যুবককে অন্ধ পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করিতে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। ধীরে ধীরে সেই যুবকের মূর্ত্তিখানি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইল। জানিলেন যে তাঁহাকে বিবাহ করিলে সম্বৎসরেই বিধবা হইতে হইবে তথাপি সে মূর্ত্তি আর ভুলিতে পারিলেন না। সমুদয় প্রাণ মন, শরীর সত্যবানে অর্পণ করিয়া তাঁহার পত্নী হইয়া পিতার রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত বনচারিণী হইয়া অন্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই কাল রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল, সত্যবান ভীষণ অরণ্য মধ্যে পত্নীর অঙ্কে বিচেতন হইয়া পরলোক গমন করিলেন। পতি যাহার ক্রোড়ে তাহার আবার ভয় কি? স্বামী মৃত তাহাতে আবার রোদন কেন? তাঁহার সাধ্য কি যে তিনি সাবিত্রীকে ফেলিয়া যান? সে বন্ধন ইহজীবনে কি কোন জীবনে ছিন্ন হইবার নহে। হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সাধ্বী শোক তাপ ভয় পদদলিত করিয়া অনন্তের প্রতীক্ষা করিতেছে। সম্মুখে মহাকাল উপস্থিত। সত্যবানের দেহ রাখিবার অধিকার সাবিত্রীর নাই। তাহাতে ক্ষতি কি? সে জীবন্ত মূর্ত্তি ত আর বাহিরের বস্তু নহে—মহাকাল তুমি বাহিরের সত্যবানকে লইয়া যাও কিন্তু সাবিত্রীর হৃদয় মন্দিরের প্রত্যক্ষ সত্যবানকে স্পর্শ করিবারও তোমার ক্ষমতা নাই। ধর্ম্মরাজ পরাভূত হইলেন দেখিলেন, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করা তাঁহার সাধ্য নহে, তিনি প্রীত হইয়া সত্যবানের জীবন দান দিলেন। যে প্রণয় মৃত্যুকে পরাভূত করিয়া পরলোকগত আত্মাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে, যাহার বন্ধন ছিন্ন করিতে যাইয়া মহাকাল অপদস্থ হইয়া পড়েন, সেই প্রণয় যে নারী চরিত্রে বিকশিত তাঁহাকেই আদর্শসতী বলিতে পারি। আদর্শসতী একবার যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার চরণে জীবন যৌবন অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে আর কোন মতেই ভুলিতে পারেন না, সে হৃদয়ে অপর কাহারও স্থান নাই, সে প্রাণ অপর কেহই কাড়িয়া লইতে পারে না সে শরীর অপর কেহই স্পর্শ করিতে পারে না। বিবাহ ভিন্ন এইরূপ সম্বন্ধ প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। বিবাহ ভিন্ন পুরুষের সহিত নারীর সম্যক্ মিলন সম্ভবপর নহে। এই জন্য আদর্শ সতীর দৃষ্টান্ত বিবাহিত স্ত্রীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিবাহ সামাজিক ধর্ম্ম মাত্র। কোন বিবাহ স্থল বিশেষে শাস্ত্র মতে অসিদ্ধ হইলেও অথবা বিনা বিবাহে যদি কোন রমণী আজীবন একটী মাত্র পুরুষের সহিত প্রণয় পাশে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহাকেই পতি ভাবে গ্রহণ করে এবং তাঁহাকে ভিন্ন অপর কাহাকেও স্বীয় দেহ বা প্রাণ সমর্পণ না করে এবং সে প্রণয় ও সম্বন্ধ অনন্ত কালেও বিলুপ্ত হইবেনা এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাসে প্রগাঢ় অনুরাগে তৎপ্রতি অনুরক্তা হয় তবে তাহার তাদৃশ আচরণ সমাজের অনুমোদনীয় না হইলেও, তাহাকে আদর্শ সতী বলিয়া সম্মান করিতে প্রস্তুত আছি। যদি কোন রমণী দুর্ব্বিপাকবশতঃ সগোত্রে বা অসবর্ণে বিবাহিত হয় অথবা শকুন্তলার ন্যায় গান্ধর্ব্ব বিবাহে সম্বন্ধ হয় তবে প্রচলিত মতে তাদৃশ বিবাহ অসিদ্ধ হইলেও সেই রমণী যদি স্বীয় জীবনে প্রণয়ের মধুরতা ও পবিত্রতা প্রদর্শন করেন তবে তিনি কেন সতী বলিয়া সমাদৃত হইবেন না? অকৃত্রিম প্রণয় মাহাত্ম্যের অপলাপ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। তোমার সামাজিক নিয়মদোষে অথবা ঘটনাসূত্রে আমি আমার প্রণয়ীজনের পত্নী বলিয়া অভিহিত হইতে পারিলাম না, কিন্তু আমার ত পতি কেহই নাই, কোন পুরুষই এ পর্য্যন্ত আমার শরীর মন বা প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, অমি ঐ যে পুরুষের সহিত মিলিয়াছি—সম্যক্ মিলিয়াছি সে মিলনের আর বিলোপ হইবার নহে, সেই পুরুষ রত্নই আমার হৃদয়েশ্বর তিনি ভিন্ন আমার পতি কেহ ছিলনা, নাই এবং কখনও হইবে না এই যে মানসিক ভাব ইহাও সতীত্বের অতি উৎকৃষ্ট লক্ষণ। আদর্শ সতীর প্রণয় শিথিল হইবার নহে। তিনি প্রণয়ের প্রতিদান না পাইলে অভিমান করিতে জানেন না। তিনি প্রণয়ীজন কর্ত্তৃক অপমানিত, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইলেও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন না। পতি কর্ত্তৃক পরিতক্ত হইয়া জানকী বাল্মীকির তপোবনে রাম চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পতিকে হারাইয়া দময়ন্তী একদিনও সুস্থির হইতে পারেন নাই, পরিশেষে অনেক

কৌশলে তাঁহার অনুসন্ধান পাইয়া আনন্দভরে তাঁহার সহিত মিশিয়াছিলেন। আদর্শ সতীর অভাব এদেশে ছিলনা এবং এখনও নাই।

২। অনেক নারী আছেন, যাঁহারা পুরুষ বিশেষের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত তাঁহাতে অনুরক্তা থাকেন। যতদিন হৃদয় বল্লভ জীবিত থাকেন, ততদিন, তাঁহাকেই প্রাণ মন সমর্পণ করেন, প্রাণান্তেও অপর পুরুষের বিষয় ভাবেন না, সে প্রবৃত্তি আদৌ হয় না। প্রণয়ে এতদূর মুগ্ধ থাকেন যে সহস্র প্রলোভনেও তাঁহারা স্খলিতপদ হয়েন না, কিন্তু প্রণয়ী জনের মৃত্যুর পর তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যান, তখন হয়ত পত্যন্তর গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় আজীবন তাঁহাতেই আকৃষ্ট থাকেন। ইহারাও সতী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য দেশে এরূপ সতী অনেক আছেন। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা এই জন্য তারা ও মন্দোদরীকে সতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৩। যে দেশে বিবাহ প্রথা রহিত করিবার ব্যবস্থা আছে, সে দেশে এমন স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা দুর্ভাগ্য ক্রমে পাপাসক্ত অযোগ্য স্বামীর হস্তে পড়িয়া তৎপ্রতি অনুরাগিণী হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া তাদৃশ ব্যক্তিকে দেহ সমপণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বিবাহ বন্ধন রহিত পূর্ব্বক অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির পত্নী হইয়া অনুরাগ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পবিত্র ভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। এরূপ রমণীও সতীপদবাচ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৪। সমাজের নিয়ম ও দেশাচারবশতঃ এরূপ ঘটিতে পারে যে এক রমণী দুই বা ততোধিক পতি গ্রহণ পূর্ব্বক সকলকেই প্রাণপণে ভাল বাসিয়া থাকেন, সকলেরই প্রতি সমান ভাবে কর্ত্তব্য পালন করেন, অপর পুরুষের বিষর কখনও ভাবেন না। আপন স্বামিগণকে সেবা করাই জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া মনে করেন। তাদৃশ স্ত্রীলোকেরাও সতী। এই জন্য হিন্দুরা দ্রৌপদীকে সতী বলিয়া সম্মান করেন। স্বামী পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার হইবেন, এই জন্য স্বামীর আদেশ মতে ও তদানীন্তন প্রথানুসারে কুন্তী অপর পুরুষের দ্বারা সন্তানাদি উৎপাদন করিয়াও সতী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

ফলতঃ দেশীয় প্রথা ও সমাজের নিয়মানুসারে নির্ব্বিকার চিত্তে ও অনুরাগ ভরে নর নারীর যে মিলন হয়, যে মিলনে কাহারও মনে কোন প্রকার বেদনা পাইবার সম্ভাবনা থাকে না, যাহা প্রকাশ হইলে, কাহারও মনে কোন সঙ্কোচভাব জনিত হীনতা উপস্থিত হয় না—তাদৃশ মিলন দূষণীয় হইতে পারে না এবং তজ্জন্য সেই রমণীকে কখনই অসতী বলা যাইতে পারে না। যিনি বলেন তিনি শুদ্ধ অনুদরতার পরিচয় দেন মাত্র। গুপ্ত প্রণয়ের দ্বারা অর্থাৎ সমাজের নিয়মানুসারে যাহার সহিত মিলন হওয়া অনুচিত তাহার সহিত গোপনে প্রণয় করিয়া কেহ সতী হইতে পারেন না। সে স্থলে প্রণয় অপেক্ষা ভয় ও সঙ্কোচের ভাব সমধিক প্রবল, সুতরাং সে প্রণয় নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। প্রণয় সর্ব্বজয়ী না হইলে তাহার মধুরতা থাকে না।

৫। কোন পতিপরায়ণা রমণীকে কেহ শঠতা পূর্ব্বক ভ্রম জন্মাইয়া সম্ভোগ করিলে অথবা বলপূর্ব্বক তাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিলে—তাদৃশ রমণীকে কখনই অসতী বলা যাইতে পারে না। এই জন্য আমাদের দেশের অহল্যা ও রোম দেশেয় লিউক্রিসিয়া সতী বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছেন।

৬। বুদ্ধি পরিপক্ক ও কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে কোন বালিকা কোন অসৎলোকের কুহকে পড়িয়া শরীর অপবিত্র করিলেও শেষে যদি পবিত্র ভাবে পতির প্রতি ভক্তিমতী হইয়া জীবন অতিবাহিত করে তবে তাহাকে কখনও অসতী বলা যাইতে পারে না। অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, জ্ঞানকৃত পাপের কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি পাইবার সম্ভাবনা নাই।

৭। এরূপ রমণী অনেক আছেন, যাঁহারা পতিকে ভালবাসেন না অথচ স্বামীকে দেহ অর্পণ করিয়াছেন, সে শরীর স্পর্শ করিবার সাধ্য অপর কাহারও নাই। তাঁহারা বলেন স্বামী মন পাইলেন না, তাঁহার চরিত্রদোষে ভাল বাসিতে পারিলাম না, তবে এ শরীর তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছি উহাতে আমার আর কোন অধিকার নাই। এরূপ রমণীরা কর্ত্তব্য বোধে স্বামীর সেবা করিয়া থাকেন। ইহাঁরাও যে সতী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যে নারী দেহ মন প্রাণ—নিজের সর্ব্বস্ব স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত অভেদাত্মা হইয়া যান, তিনি আদর্শ সতী। যিনি সম্পূর্ণ রূপে

প্রাণ মন স্বামীকে অর্পণ করিয়াছেন, তিনি দেহ অপরকে দিতে পারেন না, তবে দেশাচার বা সমাজের নিয়ম থাকিলে পারেন সত্য কিন্তু সে রূপ স্থলে তাঁহাকে কেহ অসতী বলিতে পারে না। যিনি পতিকে সম্পুর্ণ রূপে দেহ সমর্পণ করিয়াছেন কিন্তু প্রাণ মন পারেন নাই তিনিও সতী। যিনি প্রাণ, মন, দেহ কোনটীই সম্পূর্ণ রূপে স্বামীকে দিতে পারেন নাই, তিনি কখনই সতীপদ বাচ্য হইতে পারেন না। যিনি পত্নী না হইয়াও আজীবন ব্যক্তি বিশেষকে পতিভাবে ভাবিয়া আসিয়াছেন; যাঁহার প্রণয়, সমাজ, নিন্দা, ভয় সব জয় করিয়া উন্নত ভাব ধারণ করত সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে, তিনিও সতী। যিনি, লালসা, নীচতা ও স্বার্থপরতার নিম্নভূমি অতিক্রম করিয়া প্রণয়ের পবিত্র কাননে শোভমানা হইয়া একমাত্র পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন সে পুরুষের জীবদ্দশায় অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিবার কল্পনাও মনে উদিত হয় না তিনি সতী। যিনি প্রণয় ও কর্ত্তব্য বোধ এই দুইয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারেন তিনি ও সতী।

সতী হওয়া নারীর পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়। প্রকৃত সতী হওয়া মহা সাধনা ও তপস্যার ফল। মানসিক ভাব সমুন্নত না হইলে সতী হওয়া যায় না। অবরোধ প্রথার গুণে ও আত্মীয় স্বজনের সতর্কতায় আমি এ দেহ পতি ভিন্ন অপর কাহাকে অর্পণ করি নাই, ইহাতে সতী হওয়া যায় না। বাহিরের আচরণে সতী অসতী নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। জীবনে কখনও প্রলোভনে পড়িতে হয় নাই, নিন্দার ভয় বিলক্ষণ আছে, মন্দ হইবার সুবিধা নাই, এই সকল কারণেও অনেকে সতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। স্বামী খুব ধনী অথবা খুব উন্নত পদবীর লোক, আমি যদি মন্দ কার্য্য করি তবে ধরা পড়িলে আমার এ সুখ সৌভাগ্য থাকিবে না, ইহাতে ও অনেকে সতী থাকিয়া যান। মন বিশুদ্ধ ও পবিত্র না হইলে প্রকৃত রূপে সতী হওয়া যায় না। বিপদে ও দুঃখে সতীত্বের সৌরভ অধিকতর বিকশিত হয়, অসতীর ক্ষুদ্রতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অমি চিররুগ্ন ও দরিদ্র স্বামীর হস্তে পড়িয়াছি, আমার ভাগ্যে কোন সুখই হইলনা, আমি এক খানি গহনাও পরিতে পাইলাম না, অমুকের স্ত্রীর কি সৌভাগ্য তাহার কত গহনা, তাহার স্বামীর কি সুন্দর মুখ খানি—ইহা সতীত্বের চিহ্ন নহে। আমি জন্মান্তরে কত কত পাপ করিয়াছিলাম, তাই আমার স্বামীর এই দশা হইয়াছে, আমি ঘরে আসা অবধি উহাঁর লক্ষ্মী ভাগ্য গিয়াছে। আমার অযত্নে হয়ত উহাঁর এই বিষম রোগ হইয়াছে। আমি কি করিলে উনি সুস্থ হইবেন। হায় আমার যদি টাকা বা অলঙ্কার থাকিত, তবে কি আর বিনা চিকিৎসায় উনি এত কষ্ট পাইতেন। হা ভগবান! আমার স্বামীকে রক্ষা কর, তুমি ভিন্ন আমার আর কে সহায় আছে?—ইহা কি সতীত্বের চিহ্ন নহে? যে গৃহে সতীর অধিষ্ঠান সে গৃহ ধন্য, যে পুরষ সতীর পতি, তিনি পরম সৌভাগ্যশালী। সতী লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি। সতী রোগে শুশ্রূষা, শোকে সান্ত্বনা, তৃষ্ণার সুশীতল বারি, ক্ষুধায় অন্ন, সতীর ক্রোড় স্বর্গের নিকেতন, শান্তির ছায়া। সতীর প্রণয় অমৃত। সতীর আবির্ভাবে মরুভূমি কাননে পরিণত হয়, অন্ধকারে আলোকের সমাবেশ হয়, পাষাণ দ্রব হইয়া যায়। সতীর সমাগমে হৃদয় যমুনা উজান বহিয়া যায়, সঙ্গীত স্রোতে চরাচর ভাসিয়া যায়। তাঁহার কৃপায় মূর্খ পণ্ডিত হয়, অন্ধ দেখিতে পায়, বধির শুনিতে পায়, এবং জিহ্বার জড়তা অপসারিত হইয়া ভাষায় অলৌকিক প্রবাহ বহিয়া যায়। সতীর সম্মিলনে পুরুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সেই প্রণয়ে পরিচালিত হইয়া তদীয় চিত্ত উৎক্রমণ পূর্ব্বক স্বর্গের অপূর্ব্ব দ্বারে উপনীত হয়—মনুষ্যত্ব তখন দেবত্বের ভাব ধারণ করে।

সংকীর্ত্তন—মধুরভাব, পূর্ব্বরাগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রীকৃষ্ণ চরণে যাহার নব অনুরাগ জন্মিয়াছে, কৃষ্ণে যাহার প্রথম পিরিতি ঘটিয়াছে, তাহার দশা বড় বিষম। তাহার "খাইতে সোয়াস্তি নাই, চোখে নিদ নাই"। তাহার গৃহ কর্ম্মে মন নাই, হৃদয় সর্ব্বদাই আলোড়িত, বাত্যাতাড়িত। তাহার স্থৈর্য্য নাই, ধৈর্য্য নাই, কোন বিষয়ে একাগ্রতা নাই সে থাকে থাকে আর চমকিয়া উঠে। সে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, কখনও কখনও শূন্য নয়নে আকাশ পানে তাকাইয়া থাকে; কখনও বিনা কারণে পাগলের ন্যায় কাঁদে, কখনও বা বিনা কারণে হাসে, তাহার হৃদয় এতদিন একটা অবলম্বন ধরিয়াছিল, এক্ষণে সে আশ্রয় হারাইয়া কক্ষচ্যুত হইয়া দিশাহারার ন্যায় শূন্যপথে অপর কক্ষের

উদ্দেশে ছুটিয়াছে। লজ্জাশীলবতী কুল কামিনী কোন হতভাগিনী প্রথমে পরপুরুষ কামনা করিয়া মনে মনে তাহাকে মনোসমর্পণ করিলে তাহার দশা যেরূপ হয়, কৃষ্ণানুরাগীর দশাও ঠিক তদনুরূপ। পুংশ্চলী যেমন সর্ব্বদা লক্ষ গৃহকার্য্যের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও মুহূর্ত্ত মাত্রও ভুলিতে পারে না, সে যেমন নিশিতে ঘুমায় না, থাকে থাকে আর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, কি করিয়া একবার হৃদয় বল্লভের চাঁদ মুখখানি দেখিতে পাইবে সর্ব্বদা সেই ভাবনায় ব্যস্ত থাকে, গুরুজনদিগকে সর্ব্বদা প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় না, মুখরাগাদি হাবভাবে হৃদয়ের অনুরাগ ব্যক্ত করিয়া ফেলে, অথচ যতই তাহাদিগের কর্ত্তৃক তাড়িত, ভৎর্সিত ও লাঞ্ছিত হয়, ততই তাহার হৃদয়নাথের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়; মনে যনে জীবন যৌবন সব সমর্পণ করিয়া যাহার চরণে জনমের মত বিকাইয়াছে, সে বিন্দুমাত্রও তাহার প্রতি অনুরাগী কিনা, তাহাকে কিঙ্করী করিতে সে রাজি আছে কি না তাহা জানিবার জন্য সে যেমন উৎসুক; প্রাণচোর "ভাল বাসে" কেবল এই কথাটী জানিবার জন্য অনুরাগিনী যেমন প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে, কৃষ্ণানুরাগিনীর দশাও তদনুরূপ। সে

"ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শত বার,
তিলে তিলে এসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায়।
বসি থাকি থাকি, উঠিয়ে চমকি,
ভূষণ খসায়ে পরে"

আবার কখন সে

* * *

"থাকয়ে বিরলে, বসিয়া একলে,
না শুনে কাহারও কথা।
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা।

* * *

হসিত বয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
কি কহে দুহাত তুলি।
এক দিঠ করি, ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালীয়া বঁধুর সনে॥"

যদি কৃষ্ণানুরাগীকে জিজ্ঞাসা করা যায়, "নিগদ নিজঙ্গদ মূলং" বা "কি তোর হইল বেয়াধে" তবে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে;—

"কি হৈল কি হৈল কালা কানুর পিরিতি গো।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি গো।"

কি বিপরীত ভাবের সমাবেশ।, প্রাণ কাঁদে আবার পুলকেতে আঁখি ঝুরে;—

"শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে"

তবু ত ছাড়িবার যো নাই—

"কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে।
নবীন পানীর মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে।
এ না রস যে না জানে সেই আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানু প্রেম শেল।"

সে ভাবে "পরের কথায় ভুলিয়া কৃষ্ণ প্রেমে মজিয়া কাজ ভাল করি নাই। এ যে বিষামৃতের একত্র সমন্বয় তাহা জানিতাম না, ইহাতে প্রাণ জ্বলিয়া যায় আবার জুড়ায়। একি বিষম! এ যে রাখিতে ও পারি না ছাড়িতে ও পারি না।" বাস্তবিক সকল সাধনের প্রথমাবস্থায় সাধকের দশা ঐ রূপই হয়। কত বিভীষিকা, কত নৈরাশ্য ভোগ করিতে হয়, কত গঞ্জনা, কত যন্ত্রণা সহিতে হয়।

অনুরাগী প্রেমিক কাঁদে আর বলে;—

"কে বলে পিরিতি ভাল গো সখি,
কে বলে পিরিতি ভাল।

সে ছার পিরিতি, ভাবিতে ভাবিতে
সোণার বরণ কাল।
সোণর গাগরী, বিষজল ভরি,
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার, না করি বিচার
এবধ কাহারে লাগে।
নীর লোভে মৃগী, পিয়াসে ধাইতে,
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী, আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে।
নবঘন হেরি, পিয়াসে চাতকী,
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক কারণ, বহল পবন,
কুলিশ মিলল শেষে।”

বাস্তবিক ই কৃষ্ণ প্রেমের যত দিন গাঢ়তা না হয়, কৃষ্ণ চরণে যতদিন অহৈতুকী নিষ্ঠা না হয়, স্বার্থ শূন্য নির্ভরতা না হয়, তত দিন প্রেমিক সাধকের দশা বড়ই শোচনীয়। সে ভাবে সব ছাড়িয়া কৃষ্ণপদে শরণ ত লইলাম, এখন দয়িতের দয়া হয় কিসে? বৈষ্ণব কবিচূড়ামণি বিদ্যাপতি কি বলিতেছেন শুনুন ;—

“ কানু হেরব বড় মনে ছিল সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ।
তবধরি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝই না পারি।
শ্যাঙল ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক জ্বলয়ে পরাণ।
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পরহাতে দেলা।
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥ ”

এই পূর্ব্বরাগের অবস্থায় কৃষ্ণানুয়াগীর একমাত্র ভাবনা কিরূপে একবার প্রাণনাথের দরশন পাইবেন, কি রূপে একবার তাঁহার চরণে জীবন মন সমপণ করিয়া বলিবেন “ প্রাণবল্লভ, সকল ছাড়িয়া তোমার অভয় পদে শরণ লইলাম। আমি তোমার অযোগ্যদাস ; কিন্তু অযোগ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া পায়ে ঠেলিও না প্রাণেশ্বর। যাহারা যোগ সাধন জপতপ জানে তাহাদিগকে ত তুমি আপনা হইতেই দয়া করিয়া উদ্ধার করিবে। আমি যে সে সব কিছু জানি না, সেই জন্যইত সকল ছাড়িয়া ঐ শীতল চরণের আশ্রয় লইলাম। এখন আমার এই অভিলাষ, আমি তোমার ঐ চরণ দুখানি হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জমাঝে রাখিয়া ভকতি চন্দন মাখান প্রীতি কুসুমাঞ্জলি দিয়া যথা সাধ্য তোমার সেবা করিব। আর একবার একবার ঐ সাধনের ধন দুখানি প্রেম নয়নে দেখিব। প্রাণবল্লভ! এই বাসনা কি পূর্ণ করিবেনা? তবে তোমার পতিত পাবন নামে কলঙ্ক হইবে যে নাথ! না, না, তাহা কখনই হইবেনা। তুমি আমাকে দূরে ফেলিয়া দিলেও আমি তোমার চরণ ছাড়িব না। যে চরণের জন্য আমি গুরুগৌরব, লজ্জা শীলে অম্লান বদনে জলাঞ্জলি দিয়া অসিয়াছি, সে চরণ আমি ছাড়িতে পারিব না। আমি ফিরিয়া যাইবার স্থান রাখিয়া আসি নাই। এক্ষণ করযোড়ে নিবেদন, যে যে চরণ ধরিয়া শত শত দুঃখী তাপী কূল পাইয়াছে, সেই চরণের এক প্রান্তে আমায় স্থান দিতে হইবে। সংসারের যত সুখ সব বুঝিয়াছি, আর তথায় ফিরিব না প্রাণবল্লভ, তুমি আর ফিরাইয়া দিও না। অনেককে ত স্থান দিয়াছ’ আর এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটাণুর জন্য তোমার ঐ ত্রিভুবনব্যাপা শ্রীপাদপদ্মে তিল মাত্র স্থান নাই বলিলে শুনিব কেন?”

এই অবস্থায় হরি অনুরাগীর এই মাত্র চিন্তা যে কিরূপে প্রাণবল্লভের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে আর কিরূপে তিনি প্রাণবল্লভের চরণে দেহ মন প্রাণ ও দয়িতের করে আত্ম সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন।

ক্রমশঃ

* * *

চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব ভাগে আমি ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, যে মনের আবেগ সম্বরণ করাই, চিত্তবৃত্তি নিরোধের এক প্রধান উপায়, কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক বিষয় বক্তব্য আছে। যে চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে, অর্থাৎ যে মনের আবেগ সম্বরণ ও নিরোধ করিতে হইবে তাহা কোন উপায় দ্বারা সংসাধিত হইবে ? তাহা অবশ্য উক্ত চিত্ত-বৃত্তির কোন আবেগ দ্বারা করিতে হইবে।

এক্ষণে যে রোগ অপনয়ন করিতে হইবে সেই-রোগ-গ্রস্ত কোন দ্রব্য দ্বারা সেই রোগকে নষ্ট করিতে হইবে যথা যদি কোন ব্যক্তির হস্তে কোন স্ফোটক হয় এবং তাহা যদি অস্ত্রের দ্বারা আরোগ্য করিতে হয় তাহা হইলে অস্ত্রের প্রয়োজন কিন্তু হস্ত ও অস্ত্র বিভিন্ন বস্তু। এখানে তাহা নহে। মন দূষিত হইয়াছে, বিষয়ে তাহার প্রবল আসক্তি হইয়াছে সেই আসক্তি দূর করিতে হইবে, কে করে ? সেই মনেরই করিতে হইবে, ছুরি ও স্ফোটক দুইই এক, এই বিষয় অতি বিস্ময়কর কিন্তু ইহার উপায় আছে। চিত্ত যে সময় কিছু স্থির থাকে, সেই সময় সেই চিত্তকে কোন এক বিনোদ বস্তুতে অনুরাগগ্রস্ত করা আবশ্যক। চিত্তে এক বিষয়ের আবেগ লইয়া অন্য অন্যতর সকল আবেগকে নষ্ট করা উচিত। এস্থলে বক্তব্য যে যদি চিত্ত কোন এক অপকার্য্য বিষয়ে অনুরক্ত হয় তাহা হইলে কি সেই অনুরক্ত বিষয়ের প্রতি বিলাস আবেগ দিয়া অপর আবেগ নষ্ট করা বিধেয় ? তাহা নহে তবে কি বিষয়ের অনুরাগকে ধরিয়া অপর সকল আবেগ নষ্ট করা যায়।

মন কোন না কোন সময়ে প্রকৃতিস্থ হয়। সেই সময়ে যে বিষয় অনুরাগের ভাজন বলিয়া পরিগণিত হয় (ইহা সকল মানবের কোন না কোন সময় হইয়া থাকে) সেই সময়ে মনকে মন ধারণ করিতে হইবে। মন নিজে মনকে ধারণ করিয়া ইহাই বলিবে যে আমি আমার আবেগ ধারণ করিব। আমি আমার স্ফোটক নিজে আমি অস্ত্রাঘাত করিব। আমি নিজে

বিশেষ আবেগবান হইয়া অন্য আবেগ নিবারণ করিব এই রূপ মনের এক স্বতন্ত্র আবেগ হইলে মনের শান্তি হয়।

কিন্তু সেই আবেগ যাহা অন্য আবেগকে নষ্ট করিতে পারে সেই মনের আবেগ কি প্রকারে সঞ্চারিত হইতে পারে ইহার উপায় কি ? সকল শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন ইহা একাগ্রতা concentration of mind, abstraction কিন্তু ইহা আমি বুঝাইতে পারিব না এস্থলে একটী সামান্য প্রবাদ আছে যে “মন গিয়াছে পালিয়া পথে কুড়িয়া আনা ভার।”

মনের বৃত্তি নিয়ম এই যে যে কোন বৃত্তি বিশেষ পরিচালন করা যায় সেই বৃত্তি বিশেষ অনুরাগ হইলে তৎ শ্রেণীর অপর বৃত্তি আবেগের হ্রাস হয় এই নিয়ম ধরিয়া কার্য্য করিলে অনেক ভয়াবহ কার্য্য হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী।

কাশীতে, “ ভাস্করানন্দ স্বামী ” নামে যে পরমহংস বিদ্যমান আছেন, অনেকেই তাঁহার নাম শুনিয়াছেন, এবং অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তর প্রবাদ আছে। কেহ বলেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ—কেহ বলেন তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপ ; আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি যে কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এ রূপ মত ভেদ হইবার কারণ ও আছে। তাজমহল অনেকেই দেখিয়া আসেন। কেহবা তাহার কেবল মাত্র চাকচিক্য দেখিয়া আসেন, কেহবা তাহার শিল্প দেখিয়া আসেন, কেহবা তাহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া আসেন, আর যাঁহার সূক্ষ্মতর দৃষ্টি আছে তিনি তাজমহল দেখিয়া পার্থিব ঐশ্বর্য্যের পরিণাম ভাবিতে ভাবিতে ভীত বিস্মিত ও স্তম্ভিত চিত্তে সংসারে ফিরিয়া আসেন। স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে লোকে দৃশ্য বস্তুর মর্ম্মগ্রহণ করিয়া থাকে, ভাস্করানন্দ স্বামী যাহাই হউন, আমরা নিশ্চিত জানি যে রাজা মহারাজা হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত, রাজমহিষী হইতে ভিখারিনী পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত তাঁহার দ্বারস্থ। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর অভাব নাই, ইংরাজ, দেশীয়, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর, মূনসেফ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও চিকিৎসক এরূপ বিস্তর বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি নিরন্তর তাহার নিকট গমনাগমন

করিতেছেন। কেহবা তাঁহাকে পূজা করিতেছেন, কেহবা তাঁহার নিকট সৎকথা শুনিতেছেন। কেহবা নিজের সন্দেহ দূর করিতেছেন, কেহবা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন, কেহবা কেবল মাত্র তাঁহার জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া আসিতেছেন, কেহবা তাঁহার উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখিয়াই আসিতেছেন। এত প্রকারের লোক যাঁহার দর্শন বাঞ্ছা করে, তাঁহার বিবরণ জানিবার জন্য সহজেই লোকের ঔৎসুক্য হইয়া থাকে। ভাস্করানন্দ স্বামীর একখানি ক্ষুদ্র জীবনী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। লেখক আমাদের পরিচিত ও শ্রদ্ধাভাজন। আমরা সেই গ্রন্থ হইতে পাঠককে স্বামীজীর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপহার দিব।

কান্যবুব্জ দেশে, কান্‌হপুর নামক জেলায় মৈথেলালপুর নামক গ্রামে, ব্রাহ্মণ বংশে, হিমকর মিশ্রের কুলে, পরম হরিপরায়ন মিশ্রলালের ঔরষে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার আদিনাম মতিরাম। অষ্টমবর্ষে ইঁহার উপনয়ন হয়। সেই সময় হইতে পাণিনীয় ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি দারপরিগ্রহ করেন। যখন ইঁহার সপ্তদশ বর্ষ বয়স, তখন ইনি কাত্যায়নের বার্ত্তিক এবং ফণিভাষ্যের সহিত সমগ্র পাণিনীয় ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে গনণীয় হইয়া উঠেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ইঁহার এক পুত্র সন্তান হয়। পুত্র উৎপন্ন হইবার পর হইতেই গ্রহস্থাশ্রমঃ ধারনের ফল হইয়াছে ভাবিয়া ইনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জন্মাবধিই ইঁহার বৈরাগ্যে স্পৃহা। এক্ষণে সে স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল—গৃহত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেন।

তখন ইনি বুঝিলেন যে সংসার অলীক, বুঝিলেন যে ধন যশ-মান স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলি মায়ার শৃঙ্খল মাত্র। এই সকলের তৃষ্ণা অতি দুরন্ত সে তৃষ্ণার শেষ নাই—তাহার তৃপ্তি নাই। কেবল সুখতৃষ্ণায় মরীচিকা ভ্রমণ মাত্র কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, গৌতম, জৈমিনি প্রভৃতির কথিত সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতে করিতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে

“ন জাতু কামঃ কামানা মুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।”

বুঝিলেন যে মোক্ষই জীবনের চরম সুখ। তখন বিবেচনা করিলেন যে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে যে ব্রাহ্মণশরীর লাভ করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ করিবেন না। পরমাত্মাতে চিত্তবৃত্তি সমস্তই আরোপ করিয়া পার্থিব সুখের মমতা একেবারে ত্যাগ করিলেন। নবীন যৌবন—বলিষ্ঠ দেহ—মহামহোপাধ্যায় বাঞ্ছিত বিদ্যার গৌরব—পরমা রূপ গুণবতী ভার্য্যা—কনক পুত্তলি শিশু সন্তান সকলি উপেক্ষা করিলেন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উজ্জয়িনী নগরে মহাকালেশ্বর শিবপুরিতে গমন করিলেন। তথায় অবস্থান কালে যোগশাস্ত্র বিশেষ রূপে অভ্যাস করিলেন। তথা হইতে দ্বারকায় গমন করিলেন। সেখানে তীর্থ কার্য্য যথোচিত সমাধা করিয়া, গুজরাট ও মালবা দেশ পর্য্যটন করিলেন। পথে যে সমস্ত তীর্থ ছিল তাহা সকলি দর্শন করিলেন ও তীর্থোচিত সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিলেন। এই তীর্থ ভ্রমন কালে বেদান্ত অধ্যয়ন শেষ করেন। তাহার পর পুনর্ব্বার মহাকালেশ্বরপুরি উজ্জয়িণী নগরে গমন করেন এবং তথায় দীর্ঘকাল আত্মচিন্তায় নিরত থাকিয়া তমঃ ও রজোগুনের উপর জয়লাভ করিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন। বেদাধ্যয়ন কালে ব্রহ্মচর্য্য, তাহার পরে গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, তৎপর তীর্থপর্য্যটন কালে বানপ্রস্থের সেবা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন তাঁহার পক্ষে শ্রেয় ভাবিয়া সন্ন্যাসই গ্রহণ কারলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের সময় পূর্ব্বাশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদত্ত “মাতরাম” নামও ত্যাগ করিয়া শ্রীভাস্করানন্দ সরস্বতী, এই নাম ধারণ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহনের কিছু কাল পরে উজ্জয়িনী নগরে রেবা নদীতীরে বাস করিতে লাগিলেন। তথা হইতে কাশীধামে আগমন করিলেন। কাশীতে অল্পকাল বাস করিয়াই ফতেপুরের অন্তর্গত আসনী গ্রামে গমন করিলেন। সেই স্থানে গঙ্গাতীরে সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন দন্ত ত্যাগ করিলেন। তথা হইতে কানপুর নগরে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় রাম চরণ নামক একজন ব্রাহ্মণের সহিত পরিচয় হইল। রাম চরণ স্বামীজীর পরিচয় পাইয়া তাঁহাতে এতই অনুরক্ত হইলেন, যে তিনি তদবধি আজ পর্য্যন্ত রাজসেবা দেবসেবা সকলি পরিহার পূর্ব্বক স্বামীজীর চরণ সেবায় নিরত হইয়া আছেন। গয়াদত্ত নামে একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ক্ষত্রিয় ও কানপুরে ইঁহার পরম ভক্ত হইলেন। এই দুই সেবককে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী একবার আপন জন্মস্থান দর্শন করিয়া আসেন। তাহার পর কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়া একমাত্র পরম ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া, মৌন ব্রত ধারণ করত, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুতে বৃক্ষছায়া পর্য্যন্ত আশ্রয় না

লইয়া গঙ্গাতটে বিচরণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। এই অবস্থায় ভারতের সকল তীর্থ ই পর্য্যটন করিলেন। অবশেষে হরিদ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় পাটনা জেলার অন্তর্গত, রাঘোপুর গ্রাম নিবাসী অনন্তরাম নামক জনৈক পণ্ডিতের নিকট শারীরভাষ্য, গীতাভাষ্য, উপনিষদভাষ্য অধ্যয়ন করিলেন। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর। এয়োদশ বর্ষ ধরিয়া অত্যন্ত দুষ্কর তপঃ অতি ক্ষান্তির সহিত সেবন করিয়া, হরিদ্বার হইতে কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। "দুর্গাবাড়ীর" পূর্ব্বভাগে আনন্দবাগ বলিয়া যে উদ্যান আছে তথায় আশ্রম লইলেন। এইখানে কোপীনও ত্যাগ করিলেন। এক্ষনে এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন। এক্ষণে ইঁহার বয়স ষাটের কিঞ্চিদধিক হইবে। স্বামীজীর পিতা এই কাশীধামেই শিবত্ব প্রাপ্ত হন। ইঁহার জননী বদরিকাশ্রমে জগদীশ্বরের সেবায় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

স্বামীজীর অনেক অলৌকিক কার্য্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন ইনি বাক্‌সিদ্ধ, অনেকে বলেন ইনি মৃতব্যক্তির জীবন দান করিয়াছেন। নিতান্ত ভক্ত ব্যতীত, অন্যে ইঁহার সে সকল কার্য্যের পরিচয় পান নাই। আমরা বহুপুণ্যফলে ইঁহাকে দর্শন করিয়াছি। ইঁহার জ্যোতির্ম্ময় মুর্ত্তিখানি আমাদের হৃদয়ে নিরন্তর জাগরুক রহিয়াছে।

কুরুক্ষেত্র।

তৃতীয় সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সুভদ্রা বলিতেছেন—

জগতের সাম্যনীতি, সুখময় প্রেমগীতি,
মানবের কি শিক্ষার স্থান!
সর্ব্বত্র সমান প্রেম, সর্ব্বত্র সমান দয়া,
সর্ব্বত্র কি একত্ব মহান!
না দিদি, আমরা নারী, বিশ্ব জননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই।
বরিষার ধারামত, অজস্র জননী প্রেম,
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই।

ইহার পর আরো আছে। সুভদ্রা বলিতেছেন "মানব শৈশবে জনক জননীর মুখ ব্যতীত আর কিছুই জানে না। ক্রমে ভাই ভগ্নীর প্রতি স্নেহ

পরায়ণ হয়। পরে সন্তান, পরে আত্মীয়বর্গ, এইরূপে প্রেম ক্রমশঃ সংসারে, সংসার ছাড়িয়া বিশ্বে, বিশ্ব ছাড়িয়া শেষে অনন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।" এ সকল ঘোর দার্শনিকের কথা। মুগ্ধা সরলা, স্নেহ, মায়া, দয়া, প্রেম-বিহ্বলা রমণীর মুখে এত দর্শন বিজ্ঞানের কথা ভাল দেখায় কি? রমণী হৃদয়ের মহত্বের নিকট দর্শন অবনত-মস্তক। রমণীর স্বভাব-সুলভ মহত্ব প্রতিপাদন না করিয়া, দর্শনের মহত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া, কবি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া আমাদের ধারণা। কবি সুলোচনার চরিত্র রমণী হৃদয়ের কোমলত্বে গঠিত করিয়াছেন, সুভদ্রার চরিত্র দর্শন ও ভক্তি শাস্ত্রের উপাদানে সৃষ্টি করিতে প্রয়াশ পাইয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁহার সুভদ্রা চরিত্র অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। সুলোচনার চরিত্র স্থানে স্থানে বিকৃত হইলেও, উহার চরিত্রের সহিত সুভদ্রার চরিত্রের তুলনা করিলে, বোধ হয় সুলোচনার চরিত্রই মহত্তর।

সুলোচনার, সুভদ্রার বক্তৃতা ভাল লাগিলনা, তিনি আনন্দময়ী উত্তরার কাছে চলিলেন। আমরা হইলেও তাই করিতাম।

সুলোচনা চরিত্রের প্রধান দোষ এই, যে কবি তাঁহার ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তি অতিরঞ্জিত করিয়া, তাঁহার চিত্র বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগে সুলোচনা চরিত্রের শালীনতা নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাঠক! যখন সুলোচনার হৃদয়ের পরিচয় পাইবেন, তখন তাঁহার সকল দোষ ভুলিয়া তাঁহাকে প্রকৃত বিশ্বজননীর ছবি ভাবিয়া পূজা করিতে প্রস্তুত হইবেন।

সুলোচনা বিরক্ত হইয়া উত্তরার কাছে যাইবেন, এমন সময় দেখেন যে শিবির দ্বারে এক অপূর্ব্ব নবীন সন্যাসী। ইনি মহর্ষি বেদব্যাসের পূর্ব্ব কথিত শিষ্য। তাঁহার আদেশ মতে সুভদ্রাকে গীতা অর্পণ করিতে আসিয়াছেন।

এই নবীন সন্যাসীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, নতুবা ইহাঁর চরিত্র সহজে বোধগম্য হইবে না। ইনি পুরুষ নহেন,—রমণী-যুবতী-পরমা-সুন্দরী-নাম শৈলজা। অনার্য্য দেশের অধিপতি বাসুকির ইনি পিতৃব্য ভগিনী। অনার্য্যদের অবস্থা এখন বড় শোচনীয়। আর্য্যগণ কর্ত্তৃক তাঁরা

রাজ্যভ্রষ্ট ও অরণ্যে বিতাড়িত। শৈলজা শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা, নাগরাজ বাসুকি কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা। শৈলজা অর্জ্জুনের প্রেমকাঙ্ক্ষিনী। অর্জ্জুন ইহাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষা বুঝেন নাই। শৈলজা সন্ন্যাসীবেশে মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য হন। আত্মীয়বর্গ জানেন যে শৈলজার মৃত্যু হইয়াছে। কবি গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেই “নিবেদন” পৃষ্ঠায় বলিয়া দিয়াছেন যে “কুরুক্ষেত্রের উপাখ্যান ভাগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে রৈবতক কাব্যের উপাখ্যানের সহিত জড়িত। ইহার অনেক চরিত্রের উন্মেষ রৈবতকে—রৈবতক না পড়িলে কুরুক্ষেত্রের কাব্যরস সম্যক উপলব্ধি হইবে না।” আমরা বলি কবি এ কাষটি ভাল করেন নাই। এত বড় কাব্যের উপাখ্যান ভাগের কোন অংশ কাব্যান্তরে নির্দ্দেশ করিলে কি পাঠকের ধৈর্য্য থাকে? উপাখ্যান, এই কাব্যেই সম্পূর্ণ না হওয়ায়, শৈলজা, জরৎকারু, বাসুকি, দুর্ব্বাসা প্রভৃতির চরিত্র তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং তাহায় কাব্যের অঙ্গ সৌষ্ঠবের লাঘব হইয়াছে।

শৈলজা নবীন সন্ন্যাসীর বেশে সুভদ্রার শিবির-মন্দিরে দণ্ডায়মান। কবি তাঁহার যে মূর্ত্তিখানি চিত্রিত করিয়াছেন তাহা অতীব মনোহর। আমরা চিত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে দেখাইব।

শিবির দুয়ারে আহা! ওকি মূর্ত্তি মনোহর!
সখীর না চলিল চরণ।
নীলোৎপল প্রতিমায়, ফুটিতেছে যৌবনের,
কি মধুর প্রথম স্বপন!
সুন্দর গৈরিকে ঢাকা, অপরাজিতার রাশি,
সুকুমার দেহ মনোহর!
ললাটে চূড়ার মত, বেণীবদ্ধ কেশরাশি,
অমার্জ্জিত ধুলায় ধূসর।
সুগোল কোমল মুখে, প্রফুল্ল নয়ন ভাসে,
আকর্ণ-বিস্তৃত ছলছল।
ভাসিছে যুগল তারা, নীলিম প্রভাতাকাশে,
দুই সুখতারা সমুজ্জ্বল।
কি তারায়, কি নয়নে, শান্ত স্থির সে বদনে,
ক্ষুদ্র সেই অধর কোণায়।
কি ত্রিদিব কোমলতা, কি ত্রিদিব স্নেহ কথা,
হৃদয়ের, ভাসিতেছে হায়!

সুভদ্রা প্রণাম করিতে উঠিলে, নবীন সন্ন্যাসী নিবারণ করিয়া বলিলেন

“দেবি! আপনি আমার নমস্যা। আমি মহর্ষির আশীর্ব্বাদ সহ তৎপ্রণীত এই গীতা আপনাকে প্রদান করিতে আসিয়াছি।”

এই বলিয়া সুভদ্রাকে গীতা অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী বিদায় হইলেন। শৈলজাকে উভয়েই ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার ছদ্মবেশে তাঁহাকে যেন “চেন চেন” বোধ হইতে লাগিল। সুভদ্রা নীরবে ভাবিতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

এই সর্গে পুত্র অভিমন্যুকে মাতা সুভদ্রা গীতোক্ত ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইতেছেন বলিতেছেন যে “ভগবান যদি সর্ব্বময়—সর্ব্বভূত—মূলাধার, তবে এ বিশ্বই তাঁর রূপ; এই বিশ্বরূপে না দেখিলে মানবের পক্ষে তাঁকে বুঝিবার আর দ্বিতীয় পথ নাই।” তাহার পর “ধ্বংশ নীতি” ব্যাখ্যা করিলেন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কথা বলিলেন, ভগবানের নির্লিপ্ততা বুঝাইলেন, মানবের কি ধর্ম্ম তাহার উল্লেখ করিলেন, নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও বুঝাইলেন, শেষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি তাহাও বলিলেন। জগতে যা কিছু মহাজ্ঞান আছে তাহা সকলি বুঝাইয়া দিলেন। এ সর্গে বিস্তর গভীর জ্ঞানের কথা আছে, এত আছে যে বোধ হয় বঙ্গভাষায় আর কোন আধুনিক কাব্যে তাহা নাই। সে সকল অতি সুললিত কবিতায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু সুভদ্রার মুখে এত দর্শন শাস্ত্রের প্রবাহ আমাদের অসঙ্গত মনে হওয়ায় সর্গটি আমাদের তত প্রীতিকর হইল না। প্রথমতঃ অভিমন্যুর চরিত্রে কবি এ সর্গে এতই বালকত্ব মিশাইয়াছেন যে তাহায় তাঁহার বয়োচিত গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়ত সুভদ্রার চরিত্র জ্ঞান-প্রধান করিয়া, কবি এ সর্গেও অপার্থিব রমণী হৃদয়ের মহত্ব মলীন করিয়াছেন। যদি গীতোক্ত ধর্ম্ম বুঝাইবার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে মহর্ষি বেদব্যাস বা তাঁর কোন শিষ্যের দ্বারা সে কার্য্য সাধন করিলেই হইত। বিশেষত যে গীতার মর্ম্ম সুভদ্রার স্বামী অর্জ্জুন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া বুঝাইলেন তাহাতেও অর্জ্জুন সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন না। যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-তত্ত্ব, মহা মহা ঋষি তপস্বীগণ যুগ যুগান্তর ধরিয়া শির চালনা করিয়াও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সেই অতি দুরূহ মানবজ্ঞানাতীত তত্ত্ব সকল সুভদ্রা গ্রন্থ পাঠ মাত্র বুঝিয়া লইলেন; সুধু তাহা নহে, বালক পুত্র অভিমন্যুকে জলের মত বুঝাইয়া দিলেন;

আর পুত্রও তদ্দণ্ডে তাহা উপলব্ধি করিয়া লইলেন! এ সকল আমাদের অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অভিমন্যু ও সুভদ্রার মুখে এ সকল যেন কষ্ট কল্পনার মত বোধ হয়, বোধ হয় যেন এ সকল তাঁহাদের হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইতেছে না—যেন কবি নিজের হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি, জ্ঞান তাঁহাদের ওষ্ঠে সাজাইয়া দিতেছেন, কিন্তু যেন ওষ্ঠে তাহা ধরিতেছেনা, যেন খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। কবি এই সর্গে অভিমন্যুকে সরল ও উদার-হৃদয় করিতে গিয়া তাঁহার চরিত্রে অযথাসম্ভব বালকত্বের সমাবেশ করিয়াছেন, আর সুভদ্রাকে বিশ্বজননী করিতে গিয়া, তাঁহাকে হিন্দু ধর্ম্মের একটি "মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক" করিয়া তুলিয়াছেন। তবে নবীন বাবুর ভাষার লালিত্য ও হৃদয়ের গীতির উচ্ছ্বাস কোথায় যাইবে? তাহার গুণে এ সর্গের অধিকাংশ স্থলই এত মধুর হইয়াছে যে তাহাদের ঔচিত্য অনৌচিত্য পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় না। কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে দেখাইতেছি।

সাংখ্য যোগ কর্ম্মযোগ, অধ্যায়ে অধ্যায়ে যত,
পড়িতে লাগিল পুত্র, জননী জলের মত,
লাগিলেন বুঝাইতে, সেই ধর্ম্মতত্ত্ব রাশি,
নিত্য সত্য সনাতন, ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাস।

সুভদ্রা বলিতেছেন—

ব্রহ্মে সমর্পিয়া কর্ম্ম নিষ্কাম যে কর্ম্মে রত,
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্ম পত্রে জল মত।
সর্ব্বভূত স্থিত ব্রহ্ম ; সাধ সর্ব্বভূত হিত,
হইবে তোমার কর্ম্ম ব্রহ্মে তবে সমর্পিত।
জলধির হিত যাহা, তাহা জলবিন্দু হিত,
জগতের হিত বৎস! তোমার হিত নিশ্চিত।
অভ্যাস ও জ্ঞানবলে ইন্দ্রিয় করি সংযত,
জগতের হিতে করি নিজ স্বার্থ পরিণত,
সপ্রকৃতি অনুসারে স্বধর্ম্ম কর পালন,
এইরূপে কর্ম্মফল ব্রহ্মে করি সমর্পণ।

স্থানাভাব বশতঃ আমরা এ সর্গের আর উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। নতুবা এ সর্গের অনেক স্থল উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করে।

ক্রমশঃ।

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

১ম ভাগ—১০ম সংখ্যা। মাঘ—১৩০০।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ঃ—

শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল্ ; শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীরসময় মিত্র, এম্, এ ; শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্ ; শ্রীঅক্ষয়কুমার শূর, এম, এ, বি, এল ; শ্রীযশোদালাল তালুকদার ; শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিষয়। পৃষ্ঠা।
১। দলীপ সিংহের স্বপ্ন … … … ২৮৯
২। অদৃষ্টে বিশ্বাস … … … ২৯৫
৩। সেই সব সেই সব (পদ্য) … … … ৩০০
৪। বোম পাঞ্জা … … … ৩০৯
৫। সংকীর্ত্তন ; রূপ বা সাক্ষাদ্দর্শন ; নিবেদন বা আত্মসমর্পণ … ৩১১
৬। গান। … … … ৩১৭
৭। কুরুক্ষেত্র … … … ৩১৮

হুগলী.
সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাঘ—১৩০০।

এই সংখ্যার মূল্য ⁄১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার সম্পাদকতার ভার লইয়াছেন, কোন ব্যক্তি বিশেষ ইহার সম্পাদক নহেন।

সম্পাদক-সমিতির নাম আপাততঃ প্রকাশিত হইল না। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাস্তুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনের জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ। মাঘ, সন ১৩০০ সাল। ১০ম সংখ্যা।

দলীপ সিংহের স্বপ্ন।

পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র দলীপ সিংহ আজ অন্তিম শয্যায় শয়ান। নয়ন প্রান্ত দিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে। আজ অতীত জীবনের সমুদয় ঘটনা একে একে স্মৃতিপথে সমাগত হইতেছে। কোথায় পঞ্চনদের পবিত্র ভূমি আর কোথায় এই নির্ব্বান্ধব স্থানে বীরতনয় একাকী জীবনলীলা সংবরণ করিতেছেন। ক্ষোভে ও মনস্তাপে প্রাণ আকুল হইল। বাল্যকালে তিনি জননীর ক্রোড়ে শয়ান ছিলেন, জাগ্রত হইয়া দেখিলেন এক নূতন রাজ্যে আনীত হইয়া বিলাসশয্যায় শায়িত রহিয়াছেন। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসস্রোতে ভাসিলেন, বাল্যের স্বপ্ন ভুলিয়া নূতন রাজ্যের অধিবাসী হইয়া পড়িলেন। ক্রমে যখন বিলাসের মোহ ছুটিয়া গেল, তখন পঞ্চনদের স্বপ্ন ধীরে ধীরে স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। দেশীয়ভাবে তখন প্রাণ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। দূরদূরান্তরে থাকিলেও তখন স্বদেশের ছবি নয়নপথে ভাসিতে লাগিল। কত জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা ও আশায় প্রাণ উদ্দীপিত হইত। পিতৃদেব ও গুরু গোবিন্দের নাম স্মরণ হইলে, হৃদয়ে এমনি উচ্ছ্বাস হইত যে মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বীয় দুর্দ্দশা ভুলিয়া গিয়া ভাবিতেন, তিনি যেন পঞ্চনদের সিংহাসনে সমাসীন, আর শিখসৈন্যের জয়োল্লাসে আকাশ প্রতিধ্বনিত। এই রূপে কত কল্পনায় দিন চলিয়া যাইতেছিল।

আজ অন্তিমকালে সকল আশা সকল কল্পনা ফুরাইয়াছে। আজ আর ক্ষোভ রাখিবার স্থান নাই। একান্ত কাতর হইয়া-স্বীয় জনককে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন “পিতৃদেব! তোমার সন্তানের আজ এ কি দুর্দ্দশা! এ ভগ্নহৃদয়ে এক মুহূর্ত্ত ও শান্তি পাই নাই। এ বিষম যাতনা হইতে আমাকে শীঘ্র লইয়া যাও—আমি তোমার পদপ্রান্তে যাইয়া এ সন্তাপিত প্রাণকে শীতল করি।”

সহসা বিমান প্রান্ত বিভাসিত করিয়া এক দেবকান্তি মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। দলীপ সিংহ দেখিলেন এক বিচিত্র পুষ্পরথে রণজিৎ উপবিষ্ট হইয়া কৃপাদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। গম্ভীর স্বরে বীর কেশরী কহিলেন “বৎস! বৃথা শোক করিতেছ, শান্ত সমাহিত চিত্তে আমার অনুসরণ কর।”

দলীপ সিংহ সাশ্রুনয়নে কহিলেন “পিতঃ! আমি যদি শোক না করিব, তবে জগতে আর কে শোক করিবে? আমার এ ভগ্ন হৃদয় আমি যে কিছুতেই শান্ত করিতে পারি না।

রণজিৎ। বৎস! যদি বিধাতার গূঢ় রহস্য বুঝিতে, তবে শোকের কোন কারণই থাকিত না। মোহে মুগ্ধ থাকিয়া এত ক্লেশ পাইতেছ।

দলীপ। পিতঃ! আমার সাধ্য নাই যে বিধাতার গূঢ় রহস্যের উদ্ভেদ করি। বিধাতা কিম্বা আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকিতেন, তবে আমার এ দুর্দ্দশা হইবে কেন? কোন্ পাপে বীরতনয় রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে! এ লীলা করিয়া বিধাতার লাভ কি?

রণজিৎ। বৎস! স্থির হও। তুমি যে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে তাহা জানিতাম। ভারতের মানচিত্র যে লোহিত বর্ণে অনুরঞ্জিত হইবে তাহাও জানিতাম, তথাপি দুঃখ করি নাই এবং এখনও করি না। যদি মানুষের প্রভাবে ইহা সংঘটিত হইত, তবে তাহার প্রতিবিধান করিয়া আসিতাম, তাহা হইলে পঞ্চনদে এমনই প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া রাখিয়া আসিতাম যে তাহার সন্নিকটে আসিলে কাহারও পরিত্রাণ থাকিত না। কিন্তু যাহা ভারতের মঙ্গলের জন্য বিধাতার অভিপ্রেত তাহা প্রতিরোধ করিতে তুমি আমি কে? তোমার ন্যায় শত পুত্রের শোণিতে

ভারত ভূমি প্লাবিত হইলেও তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে আমি প্রস্তুত নহি।

দলীপ। পিতঃ! আমি শুনিয়াছি আপনি বলিয়াছিলেন যে ভারতের মান চিত্র অচিরাৎ লোহিত বর্ণে শোভা পাইবে—ইহা যে বিধাতার বিধান তাহা আমি কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না, উহা বুঝিলে আমার আর ক্ষোভ থাকে না।

রণজিৎ। বৎস! এই ভারতভূমি অপেক্ষা মহত্তর জাতির অধিবাসভূমি জগতে আর নাই। সমস্ত ইয়ুরোপখণ্ডে যত লোকের বসতি, একা এই ভারতে তত লোকের অধিবাস। এরূপ সুজল সুফল শস্যশ্যামল প্রদেশ জগতে আর নাই। বিদ্যা বুদ্ধি বীরত্বে ইহা অতুলনীয়। পবিত্রতার স্রোতে ইহা পরিক্ষালিত। শুদ্ধ একটী গুণের অভাবে ইহা যুগ যুগান্তর হীন অবস্থায় অবস্থাপিত রহিয়াছে। একতা ও স্বদেশানুরাগ অভাবে ইহার গৌরব সূর্য্য উদিত হইতে পারে নাই। সময়ে সময়ে এক এক প্রদেশের অধিবাসী উন্নত হইয়া বীরত্বে পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে অপর প্রদেশের শোণিতপাত হইয়াছে মাত্র—এক অঙ্গ প্রবল হইয়া অপর অঙ্গের ক্ষতি করিয়াছে, তাহাতে ভারতভূমি হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুর রক্তে হিন্দু এবং মুসলমানের রক্তে মুসলমান স্নান করিয়াছে, মুসলমান হিন্দুর রক্ত এবং হিন্দু মুসলমানের রক্ত পান করিয়াছে—লাভের মধ্যে জননী জন্মভূমি পুত্র শোকে কাতর হইয়া অর্ত্তনাদ করিয়াছেন। এই ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। মানব হৃদয় হইতে হিংসা বিদ্বেষের ভাব সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সমস্ত দেশবাসীকে মহাহিন্দুজাতিতে পরিণত করিবার জন্য অগ্নিকুলের উৎপত্তি ও শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। ক্রমে মুসলমান জাতির আগমনে যখন নূতন মিলনের প্রয়োজন হইল, তখন মহাত্মা নানক আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। সে মিলনে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য গুরু গোবিন্দ অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু সম্যক্ মিলন কিছুতেই হইল না। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ বিদূরিত হইল না, জন্মভূমির শোকাশ্রু থামিল না। শিখ মহারাষ্ট্রীয়কে চিনিল না, মহারাষ্ট্রীয় রাজপুতকে বুঝিল না,। মুসলমানের অত্যাচারে রাজপুত প্রভাব খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল, অপরাপর

জাতির অস্তিত্ব একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল, কেবল উত্তরে শিখ ও দক্ষিণে মহারাষ্ট্রীয়গণ ভারতকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত। এই দুই জাতির মিলন হইবার সম্ভাবনা ছিলনা আর মিলন হইলেও অপরাপর জাতি হীনতা হইতে উঠিতে পারিত না। স্বার্থপরতা তাহা কখনও সাধন করিতে দিতনা। সুতরাং শিখগৌরবে কিম্বা মহারাষ্ট্রীয় প্রভাবে ভারতের বিশেষ হিতসাধন হইত না। ভারতের সকল প্রদেশের সকল জাতির মিলন হইয়া একপ্রাণতার সঞ্চার হইয়া স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত না হইলে স্বদেশের কল্যাণের সম্ভাবনা আদৌ ছিলনা। এই একপ্রাণতার সঞ্চার করিবার জন্য বিধাতা ইংরাজকে এই দেশে প্রেরণ করিয়াছেন।

দলীপ। পিতঃ! আমরা মিলিত হইয়া স্বাধীন উন্নত জাতি হইব বলিয়া যাহারা আমাদের দেশে আসিয়াছে, এখন তাহারা আমাদিগকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছে। ইংরাজ যদি এদেশে বাস করিত কিম্বা আমাদের সহিত মিশিত তবে তাহাতেও ক্ষতি ছিল না। নর্ম্মান জাতির আগমনে ইংলণ্ডের মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল কেননা তাহারা তদ্দেশবাসীর সহিত ক্রমে এক হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজ কোন কালে আমাদের সহিত মিশিতে পারিবে না, তাহাদের সে অভিপ্রায় আদৌ নাই।

রণজিৎ। বৎস! ইংরাজ আমাদের সহিত মিশিতে আইসে নাই, আমাদিগকে মিলিত করিতে আসিয়াছে। ইংরাজ যাহা করিবে তাহাতেই সেই মিলন দৃঢ়তর হইবে। ইংরাজী শিক্ষার গুণে স্বদেশানুরাগ ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইবে। কুসংস্কার ক্রমশঃ অপনীত হইয়া জাতীয় উন্নতির অন্তরায় অপসারিত হইবে। এই জাতি দেশ দেশান্তরে যাইয়া বাণিজ্য-বিস্তার ও বিদ্যার্জ্জন করিবে। ক্রমে দেশের ধনাগম বৃদ্ধি হইবে। জাতীয় বল ও সাহস বৃদ্ধি হইবে। সমুদয় জাতির মধ্যে ভাই ভাই সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, একের জন্য অপরের প্রাণ কাঁদিবে। ঐ যে জাতীয় সমিতির অভ্যুদয় হইয়াছে উহার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিয়াছ? উহা বিধাতার বিধান। উহা ইংরাজের সহায় হইয়া দেশে একতার রাজ্য স্থাপন করিবে। সমস্ত দেশবাসী এক সুমহান জাতিতে পরিণত হইয়া জননী জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিবে।

দলীপ। পিতঃ! সমস্তজাতি মিলিত হইয়া চির অক্ষম ও পদানত থাকিলে লাভ কি? তাহাতে ত পরাধীনতা শৃঙ্খল আরও দৃঢ়তর হইবে। এদেশবাসী এত অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ যে ভাবী উন্নতির কোন প্রত্যাশাই করা যাইতে পারে না।

রণজিৎ। বৎস! যে দিন এ দেশবাসী একপ্রাণ হইবে, যে দিন স্বদেশানুরাগে জাতীয় জীবন সমুন্নত হইবে, সে দিন কাহারও সাধ্য হইবে না যে তাহাকে পদানত রাখে। মুষ্টিমেয় মার্কিন এই গুণে কত উন্নত হইয়াছে। এদেশবাসী যে দিন ভ্রাতৃবন্ধনে মিলিত হইবে সে দিন আপনা হইতেই তাহারা উন্নত হইয়া পড়িবে। তাহাদিগকে সক্ষম ও স্বাধীন করিবার জন্য ইংরাজের আগমন।

দলীপ। পিতঃ! নিজের অনিষ্ট করিয়া পরের মঙ্গল সাধন করা এ উদারতা ব্যক্তিগত চরিত্রে বিকশিত থাকিলেও জাতিগত চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় না। ইংরাজ এদেশে শাসন করিয়া সুখসম্পদে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, জগতের মধ্যে প্রধানতম জাতিতে পরিণত হইয়াছেন, ইংরাজ যদি বুঝিতে পারেন যে এদেশবাসী সম্মিলিত হইয়া স্বদেশানুরাগে অনুপ্রাণিত হইলে স্বাধীন হইবে তবে তাহারা সে মিলন হইতে দিবে কেন?

রণজিৎ। বৎস! এই খানে একটু ভাবিয়া দেখিলে বিধাতার বিধান বুঝিতে পারিবে। তুমি যে কথা বলিলে তাহা কি বিচক্ষণ ইংরাজ বুঝে না? ইংরাজ বেশ জানে যে এ দেশ চির পরাধীন থাকিবে না ও থাকিতে পারে না। এই জন্য যাহারা উদারচরিত্র বিজ্ঞলোক তাহারা একতার ও উন্নতির পক্ষপাতী, যাহারা স্বার্থপর অপরিণামদর্শী তাহারা বিচ্ছেদ বাড়াইতে যত্নশীল কিন্তু বিধাতার এমনি মহিমা যে ইংরাজ বিচ্ছেদ বাড়াইতে যাইয়া একতার পথ পরিষ্কৃত করিতেছেন। ইংরাজ এদেশবাসীকে যতই ঘৃণা বা বিদ্বেষ করিতেছেন ততই তাহাদের মধ্যে একতা ও স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে। যে স্রোত বহিতেছে কিছুতেই তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে না, বাধা পাইলে তাহার গতি আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। শত সহস্র উপায়েও এ গতি কেহই রুদ্ধ করিতে পারিবে না, উহা বিধাতার সঙ্কেতে প্রবাহিত হইয়া জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিবে। সমুদয় দেশ এক শাসনের অধীন না আসিলে সমুদয় প্রদেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতির মিলন কদাপি সম্ভবপর হইত না, এই জন্য বিধাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ধ্বংস করিয়া

এক বিরাট রাজ্য স্থাপন করত: তাহার শাসনের ভার ইংরাজের হস্তে দিয়াছেন। তোমার ন্যায় কত লোক ভাসিয়া গিয়াছে ও যাইবে—তোমাদের অশ্রু ও শোণিতে স্বদেশের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে ও হইবে। যাহাতে সমস্ত ভারতের হিতসাধন হইয়াছে তজ্জন্য দুঃখ বা ক্ষোভ করা রণজিতের পুত্রের শোভা পায় না। আইস আনন্দ মনে স্বদেশের গৌরব গাহিতে গাহিতে আমার অনুসরণ কর।

দলীপ। পিতঃ কবে কিরূপে এই দেশ উন্নত হইবে তাহা জানিতে পারিলে আমার আর ক্ষোভ থাকে না। তাহা জানিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যগ্র হইয়াছে।

রণজিৎ। বৎস! ঐ ইয়ুরোপভূমের দিকে দৃষ্টিপাত কর। দেখ একটী মেঘ কেমন ধীরে ধীরে প্রকাশমান হইতেছে। কালে ঐ মেঘ সমস্ত ইয়ুরোপ ভূমিকে সমাচ্ছন্ন করিবে। এক ভীষণ সমরানল ঐ মহাপ্রদেশে প্রজ্জ্বলিত হইবে। দুইটী প্রবল দলে এই সংগ্রাম বাধিবে। ফরাসী রুসিয়া প্রভৃতি এক পক্ষ, ইংরাজ জর্ম্মাণ প্রভৃতি অপর পক্ষ—এই উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিবে। সেই দুর্দ্দিনে স্বদেশের গৌরব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরাজ এদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। এক সময়ে রোমবাসীরা যেরূপ ইংরাজের দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছিল, ইংরাজকেও সেইরূপ বাধ্য হইয়া এদেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তখন এই মহাসমিতি দেশে শান্তি স্থাপন করিবে ও এই দেশকে শাসন করিবে। তখন সমুদয় দেশবাসী এক সুমহান জাতিতে পরিণত হইয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। বিধাতার বিধান তখন জয়যুক্ত হইবে।

দলীপ। পিতঃ! আমার মন অনেক আশ্বস্ত হইয়াছে। আর একটী কথা জানিতে পারিলে আমার আর ক্ষোভ থাকে না। উত্তরে রুসজাতি দিন দিন বল সঞ্চয় করিয়া ভারতাভিমুখে আসিতেছে। আমার আশঙ্কা হয়, ইংরাজ চলিয়া গেলে উহারা প্রচণ্ড বিক্রমে আসিয়া এই দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিবে, যে পরাধীনতায় ভারত এতকাল কাঁদিয়াছে আবার তাহার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইবে। দেশের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন দেখিতেছি না।

রণজিৎ। বৎস! সে আশঙ্কা করিও না। এদেশের পরাধীনতা চিরদিনের তরে অপসারিত করিয়া স্বাধীনতার বিমল জ্যোতিতে ইহাকে বিভাসিত করিবার জন্য ইংরাজের আগমন হইয়াছে। ইংরাজ চলিয়া গেলে সে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিবে। সত্য বটে রুস প্রচণ্ড বিক্রমে এই দেশ আক্রমণ করিবে, কিন্তু সেই আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য শত শত বীরের আবির্ভাব হইবে। বিধাতার আদেশে পূর্ব্ব বীরগণ সকলেই অবতীর্ণ হইবেন। সেই দুর্দ্দিনে পঞ্চনদে তোমার পিতা, রাজপুতানায় প্রতাপ, বঙ্গ দেশে প্রতাপাদিত্য, মহারাষ্ট্র ভূমে শিবজী, মহীশূর প্রদেশে হায়দার আলি অবতীর্ণ হইয়া অরাতিনিবহ বিতাড়িত করত স্বদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষিত করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিবেন। যদি সে দৃশ্য দেখিতে চাও, তবে একবার ভারতের উত্তর প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ঐ দেখ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অগণিত সৈনিক শ্রেণী উত্তরাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। ঐ দেখ তুমুল সংগ্রামে রুস পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ঐ শুন জয়োল্লাসের ভৈরব রবে হিমাচল হইতে কুমারীকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি নিনাদিত হইতেছে, বন্দে মাতরং শব্দে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। একবার প্রাণ ভরিয়া ঐ দৃশ্য দেখিয়া মনের বিষাদ ক্ষোভ বিদূরিত করিয়া দেও।

দলীপ সিংহ বিস্ফারিত নেত্রে শূন্য পথে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল, নয়ন যুগল হইতে আনন্দধারা নিপতিত হইল, তিনি হাসিতে হাসিতে মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। কেবল শোকের ছবি সেই দেহ ধরাতলে পড়িয়া রহিল।

অদ্ভূতে বিশ্বাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নিদ্রিত অর্থাৎ মিস্‌মেরাইসড অবস্থায় বালক দাঁড়াইয়া উঠিল। উঠিয়াই মিস্‌মেরাইসকারী উকীল বাবুকে বালক মারিতে উদ্যত হইল। তাহাতে উকীল বাবু বলিলেন।

উকীল। সাবধান আমি ব্রাহ্মণ পৈতা আছে।

বালক। (করপুটে) আপনি ব্রাহ্মণ আপনাকে প্রণাম করি।

উ। তুমি বল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

বা। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

উ। বল, হরি আমায় রক্ষা কর।

বা। হরি হরি।

উ। বল, রক্ষা কর।

বা। (নিস্তব্ধ)

উ। তুমি শোও।

(বালক শুইল)

উ। তুমি কে ?

বা। আমি, আমি শশী।

উ। শশী কি ?

বা। শশী মিস্ত্রী।

উ। তোমার বাড়ী কোথায় ?

শশি। তাহা বলিব না।

উ। তুমি ছিলে কোথায় ?

শ। আমি হালিসহরে ছিলাম।

উ। এখন কোথায় আছ ?

শ। আজি এক বৎসর হইল হুগলির চক বাজারে আছি।

উ। ইহার পূর্ব্বে কোথায় ছিলে ?

শ। পাঁচ বৎসর হালিসহরে ছিলাম।

উ। তোমার মৃত্যু কত দিন হইয়াছে ?

অপর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি সৎকার হয় নাই ?

শ। না সে সব আমার হইয়াছে আমি বেশ সুখে আছি।

অপর উ। তোমার গয়া হইয়াছে ?

শশী। নিস্তব্ধ।

অপর উ। দেখ তোমার যদি গয়া না হইয়া থাকে, আমরা অর্থ দিয়া লোক পাঠাইয়া দিতেছি, তুমি পরিচয় দাও।

শশি। (হাস্য) হা হা হা। আমাকে অর্থ দেখাইবেন না আমার প্রচুর অর্থ ছিল। দেখুন মশায়, আমি মাসে গড়ে হাজার টাকা উপায় করেছি।

প্রথম উ। তুমি কি রাজমিস্ত্রী ছিলে ?

শশী। না মশায় আমি লোককে ঠকিয়ে যোচ্চুরি করে টাকা উপায় করতাম্। কেমন জানেন কলিকাতায় নূতন বড় মানুষ হলে আমি তাদের কাছে গিয়ে জুটতুম। কিছু দিন থেকে টেকে যখন দেখতুম বাবুরা একটু বড় বাড়ী ঘর দোর করবার উদ্যোগ কর্‌তেন, জানেন মশায়, তখন বাবুরা আমাকে একটু বিশ্বাস করতেন। আমি বল্‌তুম হয় আমাকে কাঠের জন্য হউক, ইটের জন্য হোক আমাকে দশ হাজার বিশ হাজার দিন আমি আনিয়া দিব। তাহাতে বাবুরা দশ বিশ হাজার টাকা দিতেন আমি সেই টাকা লইয়া যে পলাইতাম আর সে দেশ মুখো হইতাম না। অন্যত্র গিয়া ঐ ব্যবসা করিতাম।

প্র উ। আচ্ছা, ও সব কথা যাক্। শশি ! দেখতে পাচ্চি তোমার ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে। তুমি বল দেখি তোমার কি (বালকের নাম ধরিয়া) বাপকে, মাকে, ভাই ভগ্নীকে আর বন্ধুদের কষ্ট দিবার ইচ্ছা আছে।

শ। আপনারা এখানে কে কে আছেন ?

উ। তুমি কাহাকেও এখানকার চিনিতে পার ?

শ। না, কেবল ঐ কালী বাড়ীর বামুনটাকে চিনি ওটাকে তাড়াইয়া দাও।

উকীল বাবু যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সকলের নাম করিলেন।

শ। না, আমি বালকের পিতা, মাতা, বন্ধুদের কষ্ট দিব না।

উ। এই তুমি যে বালককে কষ্ট দিচ্ছ তাতেই ত পিতা মাতা বন্ধুদের কষ্ট দেওয়া হচ্চে।

শ। মহাশয়, আমরা এ যোনিতে তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদেরও পিতা ছিল, পুত্র ছিল।

উ। তুমি বালককে কেন কষ্ট দিচ্চ ?

শ। (ঈষৎ হাসিয়া) বালককে কেন কষ্ট দিচ্চি ? আমার রাগ হয়েছে।

উ। বালকের উপর তোমার রাগ কেন ?

শ। ও আমার গায়ে পেচ্ছাব করে কেন দিলে।

উ। বালক তোমার গায়ে কি করে পেচ্ছাব করে দিলে ?

শ। স্কুলের ধারে ঝাউ তলায় পেচ্ছাব করে দিয়েছে তাইতে আমার ভারি রাগ হয়েছে ওর উপর।

উ। ও জানবে কেমন করে ? তুমি বল্লে না কেন ?

শ। আমি বারণ করেছিলাম ও শোনে নি।

উ। তা যাই হউক তুমি ওকে ক্ষমা করে ছেড়ে দাও।

শ। (ঈষৎ হাসিয়া) ছেড়ে দেবো ? মশায় আপনি কে ?

উ। (নিজ নাম বলিলেন।)

শ। আপনি কি করেন ?

উ। আমি উকীল।

শ। হুঁ—তা যাই হোক আমি মশায় ছাড়তে টাড়তে পারব না।

উ। তা বল্লে চল্‌বে না। তোমাকে ছাড়তে হবে, না ছাড়লে তোমার হাতে পৈতা জড়াইয়া ধরিব। আমরা সকলে ব্রাহ্মণ তোমায় অনুরোধ কচ্চি।

শ। না মশায় এমন কাজ করবেন না, পৈতা হাতে দিবেন না, এক জন্মেরই এই ফল আবার।

উ। তা না ছাড়িলে পৈতে নিশ্চয়ই দেবো।

শ। না পৈতে দেবেন না ছাড়বো।

উ। কবে ছাড়বে।

শ। আজ কোন তারিখ মশাই ?

উ। ১৭ই কার্ত্তিক।

শ। ইংরাজী কত হল ?

উ। ২রা নবেম্বর।

শ। (বালকের নাম করিয়া) ওর স্কুল খুলবে কোন তারিখে ?

বালকের পিতা। ২০শে।

শ। আঠার দিন। আচ্ছা আপনারা সকলে অনুরোধ কচ্চেন। আমি একুশ দিন পরে ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।

উ। তা হবে না। তোমাকে আজকেই যেতে হবে। বালককে কষ্ট দিতে পাবে না।

শ। (হাস্য) হা হা হা। আজকে যেতে হবে। ও সব কথা বল্‌বেন না মশায়।

উ। তা না হলে তোমার হাতে পৈতে দেব।

শ। না মশাই ও কথা বল্‌বেন না, আমি তা পারবো না। আমার উপায় নেই, আমার সঙ্গে আর একজন আছেন, তিনি ওকে ধরেচেন, তিনি ভারি রাগী।

উ। তবে যে তুমি এতক্ষণ বল্‌ছিলে তুমি ধরেছ সে কি মিথ্যা কথা।

শ। আমি তাঁর আদেশ মত ওই সব কথা বলিছি।

উ। তিনি কে ?

শ। বল্‌ব কিন্তু আজ বল্‌বো না।

উ। তা না বল তোমাকে ছাড়তেই হবে। এই হাতে পৈতা দিলাম। (বলিয়া পৈতা লইয়া অগ্রসর।)

শ। না মশায় অমন কর্ম্ম করবেন না, করবেন না সব বলছি। তুমি ব্রাহ্মণ তোমাকে প্রণাম করি। মশায় আমায় মাপ করবেন তুমি তুমি বলিয়াছি আপনাকে প্রণাম করি। দেখুন আপনারা দশ জন ভদ্র লোক অনুরোধ কচ্চেন। যে ওকে ধরেছে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। তা তাঁকে বুজয়ে সুজয়ে রাখ্‌ব। তা আমি এই প্রতিজ্ঞা করচি যে আর ষোল দিন থেকে চলে যাব এর কম হবে না হবে না।

উ। আচ্ছা তুমি এক কাজ কর আর দুই দিন থেকে যাও।

শ। হা হা হা। না মশায়, আট ডবল দুদিন।

উ। না তা হবে না তুমি যদি না যাও তোমার হাতে এই পৈতা দিলাম। (পৈতা লইয়া অগ্রসর)

শ। না মশায় অমন কাজ করবেন না করবেন না। আমি ও পারবো না যে ধরেছে তাঁকে বলিগে।

উ। তিনি কে ?

শ। তিনি সতীশ বাবু।

বালকের পিতা। তুমি বল্‌লে তিনি বড় রাগী তুমি হচ্চ ঠাণ্ডা মানুষ তুমি সব করে যাও।

শ। না মশাই আমা দ্বারা হবে না তবে আমি এই প্রতিজ্ঞা কচ্চি

যে আপনাদের জন্যে তাঁকে আমি বিশেষ করে অনুরোধ করে বল্‌বো। তা মশাই আপনি এক কাজ করুন সতীস বাবুকে ডাকুন।

উ। কি করে ডাকবো।

শ। তিন বার বলুন, সতীশ বাবু, সতীশ বাবু, সতীশ বাবু।

উ। সতীশ বাবু, সতীশ বাবু, সতীশ বাবু।

(বালক অন্য একটি গম্ভীর স্বরে বলিল—কে ?)

শ। আমি শশী।

সতীশ (অর্থাৎ বালক ঐ নূতন স্বরে বলিল—কে ?)

শ। আমি শশী।

সতীশ। (অর্থাৎ বালক ঐ নূতন স্বরে)—আচ্ছা। (এক মিনিট কাল সকলেই নিস্তব্ধ।)

উ। আপনি কে ?

স। আমি সতীশ। (ক্রমশঃ)

সেই সব সেই সব।

যাও যাও যাও প্রাণ তব হেথা নাহি স্থান
আনন্দ উথলে হেথা সেই সব সেই সব
সেই তরু সেই লতা সেই সোহাগের কথা
সেই খেলা যথা তথা সেই সব সেই সব
সেই চন্দ্র সেই তারা সেই মুকুতার ধারা
সেই পিক মাতোয়ারা সেই সব সেই সব
সেই জলদের কোলে সেই যে চপলা খেলে
সেই ফুল হেলে দুলে সেই সব সেই সব
সেই পুত্র সেই দারা সেই গৃহ প্রেমভরা
সেই আমি সেই তুমি সেই সব সেই সব
সেই দিবা সেই নিশি সেই ভালবাসা বাসি
সেই হাসি সেই খুসি সেই সব সেই সব

বোম পাঙ্গা।

এ জীবনে অনেক খেলা খেলিয়াছি। ইহ সংসারে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব; না জানি, ততদিন আর কত খেলাই খেলিতে হয়। সেটি অনিশ্চয়। যদি একান্তই খেলিতে হয়, তবে খেলিব; কিন্তু খুব সাবধানে। সাবধানতার বিনাশ নাই। এ জগতে যে যত সতর্ক; সে তত বিপদ-মুক্ত। এ জগৎ সংসার, ত্রিতাপ পরিপূরিত ও সম্পূর্ণ অসার। এখানে অনুমাত্রও সারত্ব নাই; সকলি মায়াবৃত, সমস্তই ইন্দ্রজাল! তাই, এই কুহক পরিপূর্ণ ধরাতলে, তুমি যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারিবে না। যদি কর, পদে পদে বিপদ-গ্রস্ত হইবে। জান, তোমার চতুর্দ্দিকের লোক সমুদয়, সতৃষ্ণলোচনে, তোমার প্রত্যেক কার্য্য; প্রত্যেক পাদ বিক্ষেপ; প্রত্যেক অঙ্গ বিলোড়ন; এমন কি তুমি যে কথোপকথন কর, কটাক্ষকর; তাহা পর্য্যন্ত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে। এবং তোমার ছিদ্রানুসন্ধানে কোনও যৎসামান্য দোষ পরিলক্ষিত হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধানের যথেষ্ট চেষ্টা করেন, তোমাকে নির্য্যাতন করিয়া, তোমার যথেচ্ছাচারিতার বাধা দিতেও কিছুমাত্র ত্রুটী করেন না। এমতাবস্থায়, তুমি সতর্ক হইবে না কেন? সতর্কতার কি ফল, পরে বলিব।

তাসের প্রধান খেলা,—গ্রাবু। এটিরই প্রচলন বেশী। অন্দর মহলে পর্য্যন্ত প্রতিপত্তি। মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় "গ্রাবু" লিখিয়া, সাহিত্য জগতে প্রভূত প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। এবং তাঁহার সেই লিপি-চাতুর্য্যে, যে তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহা অনির্ব্বচনীয়-প্রতিভা-বিকাশক। আমরা গ্রাবু খেলার অন্তর্গত, "বোমপাঙ্গা" সম্বন্ধে গুটি দুই কথা বলিব। পাঠকদের নিকট, সেগুলি কতদূর আদৃত হইবে বলিতে পারি না। কারণ, আমাদের প্রতিভা, হীনপ্রভ।

আজ খেলিতে বসিয়াই দেখি, বিষম বিপদ! প্রতিপক্ষ, আমাদিগকে উপর্য্যুপরি "ছক্কা ও পাঞ্জা" করিতেছেন। তাঁহাদের চোটে দাপটে, আমরা চোখে মুখে পথ দেখিতে পাইতেছি না — দিশাহারা হইয়া তাস তুলিতেছি আর খেলিতেছি। বিপক্ষ, আমাদের দূরবস্থা দেখিয়া অট্টহাসি

হাসিতেছেন,—টিট্‌কারী দিতেছেন। আমরা তবুও অবস্থা বুঝিয়া, সহিষ্ণুতার সহিত ও বিনীত ভাবে খেলা করিতেছি। জানা ছিল, সহিষ্ণুতার জয় সর্ব্বত্রই। যে যত সহিষ্ণু, সে তত উন্নত। তবে কিনা দুদিন অগ্র-পশ্চাৎ। নেপোলিয়ানের সহিষ্ণুতা ও বিনয়, উন্নতি ও কার্য্য সাধনের চরম দৃষ্টান্ত। বিনয়ে, সংসার বশীভূত; শত্রু, হীনপ্রভ। বিনয়ে, প্রবল শত্রুও মিত্রবৎ আচরণ করিয়া থাকে।

যাহা হউক, আমরা এত যে সহিষ্ণু; তথাপি মনে হইতেছে প্রথমেই এত বিপদ, এত লাঞ্ছনা পাইব; স্বপ্নেও ভাবি নাই। বরং না খেলাই ভাল ছিল। সংসারেও দেখা যায় যে, জন্ম পরিগ্রহের পর হইতেই, অনেকে অনেক প্রকার ক্লেশ পাইয়া থাকেন। এমন কি কার্য্যক্ষম হইয়াও অনেকে কি রূপে পরিবারবর্গ রক্ষা ও সংসার প্রতিপালন করিতে হয়; তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অবস্থাহীনের ত কথাই নাই! তাহার সংসারে থাকা না থাকা সমান। বস্তুতঃ অবস্থার এমনি প্রভাব যে, পরিবারবর্গের গঞ্জনায়, কতজন অস্থির হইয়া পড়েন; কত আত্ম ধিক্কার দেন, ইয়ত্তা নাই। অবশেষ, ইহাও মনে করেন, কেন জন্ম হইল? জন্মিলাম ত সেই মূহূর্ত্তে মরিলাম না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু, পাঠক, তোমাকে বলি শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিও না, এবং অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত যথোচিত যত্নবান হইও। জানিও—রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি, ক্রমে আসিতেছে—যাইতেছে। চিরস্থায়ী কিছুই নয়। সকলেরই পরিবর্ত্তন আছে। কারণ, এ সংসারই পরিবর্ত্তনশীল।

প্রতিপক্ষ, তাসিতেছেন—আমরা যৎসামান্য খেলা পাইতেছি, কিন্তু 'তুরুপ' পাইতেছি না। এটিই আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে, আর প্রতিপক্ষের এমনি 'পড়তা' পড়িয়াছে যে, প্রতি বারেই হয় তাস, না হয় "ছক্কা" ধরিতেছেন। তাসের এ লীলার অর্থ,— তোমার প্রতিদ্বন্দীর উন্নতির সময়। এ সময়, কেহই বাধা দিতে পারিবে না। কারণ, "জয়কালে ক্ষয় নাই, মরণ কালে ঔষধ নাই।" এ প্রবাদ সম্পূর্ণ সত্য। তুমি আমি শত সহস্র চেষ্টা করিলেও সেই উন্নতিতে বাধা দিতে পারিব না। উন্নতি-স্রোতের নিকট ইংরাজ পরাভূত। এ স্রোতে, তাঁহারা "পুল" দিতে পারেন না পাষাণ দ্বারাও স্রোত গতি ফিরাইতে অক্ষম। এখানে ইংরাজের বুদ্ধি

কৌশল নিস্ফলপ্রদ! আর তুমি বুঝিবে, তোমার শোচনীয় অবস্থা। দরিদ্রতা পরিপূর্ণ ভাবে বিরাজমান। কিন্তু, যে প্রকার তাস পাইতেছ; তাহার আভাসে, কিঞ্চিৎ বুঝিতে পার যে, পূর্ব্বে যেন সংসারে সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল; এখন গ্রহ বৈগুণ্যে যেন সেই সুখ-শশী অন্তর্হিত হইয়াছে। দিন আনিয়া যে দিন উদর পূরিয়া খাইবে; তাহারও সংস্থান নাই। এত দুঃখের সংসারে তোমার প্রভূত সুখ এই যে, (তুরুপ না হওয়াতে) সংসারে একটিও কলঙ্কের চিহ্ন পড়ে নাই। আমরা সচরাচর দেখিতে পাইতেছি যে, উত্তম অবস্থার নিচতম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, পদমর্য্যদা, মান, সম্ভ্রম প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে অপসারিত হয়। এবং যশস্বী বংশেও নানা প্রকার কলঙ্ক পতিত হইতে দেখা যায়। যতদিন না কলঙ্কের ডালি মাথায় নিতে হয়; ততদিনই সুখ শান্তি। যে বংশে কলঙ্ক পড়ে, সেই বংশের মর্য্যদা কোথায়? শাকান্নে উদর পূর্ণ করা, কি অনাহারে জীবন যাপন করাও ভাল; তথাপি যেন কাহাকেও কলঙ্কের ডালি মস্তকে ধারণ করিতে হয় না।

তাস খেলায়, আমরা আর একটি লীলা দেখিতে পাই। সেটি এই:— তাস খেলিবার সময়, স্বপক্ষের ও বিপক্ষের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, অনেকেই বসিয়া থাকেন। তাহারা তাহাদের আশ্রিত পক্ষের উন্নতি ও মঙ্গলার্থ, "এটি খেল, ওটি খেলিও না;" প্রভৃতি অনেক প্রকারে বলিয়া দিয়া থাকেন। এ সংসার ভিতরেও দেখা যায়, রাম ও শ্যামের পক্ষে, অনেক ব্যক্তি আছেন। যাঁহারা, তাঁহাদের উন্নতির নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন, সময় অসময়ে, বিপদে আপদে, বুদ্ধি পরামর্শ প্রদান করেন, এবং তাঁহাদের অবনতিতে কি অনিষ্টপাতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হন।

যাহাহউক, প্রতিপক্ষ, আমাদিগকে এমনি জব্দ করিতেছেন যে, আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি সত্য; কিন্তু, এ অবস্থায়ও হৃদয়রাজ্যে একটী আশা-প্রদীপ মিট্ মিট্ ভাবে জ্বলিতেছে। মনে হইতেছে—এ দুঃখের দিনও যেন যাইবে; পুনরায় যেন সুখের কমনীয় সুস্নিগ্ধ মুখ দেখিতে পাইব। প্রতিবাসী রমাপতি বাবুর পূর্ব্বে কি অবস্থা ছিল? শুনিয়াছি, সামান্য দোকানদারী করিয়া জঠর জ্বালা নিবৃত্তি করিতেন, কিন্তু আজ তিনি

অত্যুচ্চ প্রাসাদোপরি, ‘ইজি চেয়ারে’ বসিয়া, আলবোলায় গোলাপ জল ভরিয়া, সুগন্ধি তামাক খাইতেছেন। হুকুমের অগ্রে গণ্ডায় গণ্ডায় ভাণ্ডারী খাটিতেছে। আজ তাঁহার “মুদি” নাম ঘুচিয়া গিয়া, বাবুত্বে পরিণত হইয়াছে; আজ তাঁহার অতুল বিভব ও সুখ—অপরিসীম সন্মান; তাই তিনি অনন্ত আনন্দে উৎফুল্ল। আমাদেরও ত তদ্রুপ হইতে পারে। অমানিশার অবসানে, শশি-বিভা প্রকাশিত হয় না কি? মুনিদের বাক্য কি সত্য নহে, “চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানিচ দুখানিচ?” আমি কিন্তু কি সংসারের খেলায়, কি তাসের খেলায়, মুনিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়াই খেলিতেছি। পরন্তু আমার সাহায্যকারী বড়ই বিমর্ষ ও ক্ষুব্ধ চিত্ত। কারণ তিনি তাস কাটিতেছিলেন।

তিনি মনে করিতেছেন, যে তাঁহার কাটানের দোষেই এত বিপদ ঘটিতেছে। সেটি ভুল। হইতে পারে, সংসারে আমি যাহাকে সাহায্যকারী পাইয়াছি; তিনি নাও জানিতে পারেন কেন এরূপ বিপদ ঘটিতেছে। স্বাভাবিক বিপদের কারণ দুর্জ্ঞেয়। তিনি ত আমার মঙ্গলের নিমিত্ত কত ক্লেশ, কত কষ্ট, কত দুর্ভোগ ভুগিতেছেন; নির্ণয় নাই,—এমন কি আমার উপকারার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও নিয়ত প্রস্তুত। তথাপি তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই আমার অমঙ্গল ঘটিতেছে। ইহা দেখিয়া, তিনি অসন্তুষ্ট কি ক্ষুব্ধ হইতে পারেন সত্য; কিন্তু, আমার মতে তাহাও নিস্প্রয়োজন। কেন না, আমার হিতৈষীর সৎপ্রবৃত্তিমূলক কার্য্যেও যখন অনিষ্ট হইতেছে; তখন আমারই অদৃষ্ট মন্দ বলিতে হইবে! আমরা বাঙ্গালী, অদৃষ্টবাদী বলিয়াই অদৃষ্টের কথা তুলিলাম। সাহায্যকারীর দোষ কি? অনেকে আছেন, সৎসাহায্যকারী কর্ত্তৃক অনুপকার হইলেই তাঁহাদিগকে অত্যন্ত লাঞ্ছনা প্রদান করেন। এটি ঘোর গর্হিত কার্য্য। কারণ, তুমি যখন দেখিতে পাও যে, তোমার সাহায্যকারী নিস্বার্থভাবে, তাঁহার জীবনটি পর্য্যন্ত তোমার মঙ্গল কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন; মায়া মমতা পরিবর্জ্জন করিয়া, তোমারি হিতার্থে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন; এমতাবস্থায় যদি তুমি তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে যে মহত্ত্ব নাই, তাহাই প্রকাশ পাইবে। বরং সেই অবস্থায়, তুমি নিজে একবার আত্মবল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। দেখাও খুব উচিত। আর একটি কথা, তুমি এরূপ

পুরাতন সাহায্যকারী (কর্ম্মচারী) পরিত্যাগ করিও না। তৃণ জ্ঞানে, সযত্নে রাখিয়া দিও। এ তৃণে, সময়ে তোমার অনেক উপকার দিবে। মনে রাখিও,—এ তৃণ, তোমার গৃহছিদ্র, সমস্তই সম্যক প্রকারে পরিজ্ঞাত।

ঘটনাক্রমে, আমাদের সময় ফিরিয়াছে। এখন বেশ খেলা পাইতেছি। এখন আর আশাপ্রদীপ মিট্ মিট্ জ্বলে না, এখন প্রদীপে জোর ধরিয়াছে আলোতে গৃহের সামান্য জিনিষ ও দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইতাম না। এ কেই বলে সময়ের জোর। প্রতি পক্ষের পড়্তা ফিরিরাছে। তাঁহারা তাস কি ছক্কা প্রভৃতি কিছুই ধরিতে পারিতেছেন না। বরং সম্পত্তি লাটে উঠিতেছে। আমার সাহায্যকারী, এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, একটুকু দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছেন। আমি ফলবান বৃক্ষ দেখাইয়া উপদেশ দিতেছি। উপদেশে কিন্তু ফল হইতেছে না। এ দিকে আমাদের উন্নতিতে প্রতিদ্বন্দী ঈর্ষান্বিত হইতেছেন। এখন ও প্রতিপক্ষ আমাদের অপেক্ষা প্রভূত বলবান। কারণ, তাঁহাদের এখন ও দুখানা “ছক্কা” ও এক খানা “পাঞ্জা” রহিয়াছে। আমরা দুখানা “ছক্কা” ও তিনখানা পাঞ্জা তুলিয়াছি। একবার আমি বিন্তি ডাকিলাম; প্রতিপক্ষ, আমার বিন্তি ডাক শুনিয়াই বিষম কুটিল কটাক্ষ করিল। আমি সেই কটাক্ষে ও অটল অচল হিমাদ্রিবৎ। সেই কটাক্ষের অর্থ—আমার বিন্তি ডাকা বৃথা। দু’কুড়ি সাতের খেলা রাখাই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে। আমার কিন্তু সেই ভাবনা কম কারণ, আমি যে প্রকার তাস পাইতেছি, তাহাতে দু’কুড়ি সাতের খেলার জন্য ভাবনা করা নিস্প্রয়োজন। সংসারের এ রহস্য বড় আশ্চর্য্য ঃ—প্রভূত উন্নতিশীল ব্যক্তি ও অন্যের উন্নতিতে কাতর, ঈর্ষান্বিত, নব্য: উন্নত বক্তির নামে দশের নিকট কুৎসা প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করে না; এবং উন্নতির মূলে বাধা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ইংরাজ বণিকের মধ্যে, ইহার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরাজ বণিকের competition, সম্প্রদায় বিশেষের উন্নতির অন্তরায়। যাহা হউক, যে তোমার উন্নতির অন্তরায়; তাহাকে তোমার প্রবল শত্রু বলিয়া জানিও। যেখানে শত্রু প্রবল পরাক্রান্ত, আর তুমি দুর্ব্বল; সেখানে দুর্ব্বল বলিয়া যদি তুমি শত্রুর শত্রুতায় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হও, উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দেও, তবে কস্মিনকালে উন্নত হইতে পারিবে না। বরং তোমার প্রতি পদে বিপদ ঘটিবে। লাই দিলে

কুকুর যেমন পাতে বসিয়া খায় ; তেমনি শত্রুকে ও লাই দিলে, সে ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। একবার ঘাড়ে বসিতে পারিলে, তোমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া খাইতে ও ভ্রূক্ষেপ করিবে না। কাজেই বলি শত্রু পরাজয়ের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে দোষ কি ? শত্রু পরাজয়ের সহজ উপায়,—শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন শত্রুতা করিবে না ; হৃদয়ের ভাব প্রছন্ন রাখিয়া, শত্রুর হিতৈষী হইবে ; শত্রুর যথার্থ মঙ্গলার্থী হওয়া শত্রুপরাজয়ের প্রকৃষ্ট পথ ; শত্রুকে প্রলোভন দিয়া, শত্রুতার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। আর এসব করিতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিবে। আর উন্নতির সময়ে, বিনম্র ও নতশির হইবে। দাম্ভিকতা, উন্নতির প্রতিবন্ধক। তাই, সাহায্যকারীকে বৃক্ষ দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলাম,—ফলবান বৃক্ষ—নতশীল। কি বলিতেছিলাম ?

বিপক্ষের কথা। ক্রমে ক্রমে বিপক্ষের “ ছক্কা ” ও ‘ পাঞ্জা ’ সকলি উঠিয়া গেল। এতক্ষণে সহিষ্ণুতার আশ্চর্য্য ফল ফলিল। কিন্তু, সহসা আবার যেন অবস্থার পরিবর্ত্তনের উপক্রম হইয়া উঠিল। নীলনভ, অকস্মাৎ ঘন তিমিরাচ্ছন্ন হইল ; আবার যেন দুঃখার্ণবে পড়িব, এমনি আশঙ্কা হইতে লাগিল। ইহা বুঝিয়া, সাহায্যকারী মহাশয় মুখভারী করিয়া বসিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন ; “ ছক্কা ” হইবার ভয়ে ভগ্নোৎসাহ হইলেন। কারণ, আশানুরূপ তাস পাইতেছি না ; পড়তা যেন ফিরিবার উপক্রম হইয়াছে। বিশেষতঃ এবার এম্নি অবস্থা হইয়াছে যে, “ ছক্কা ” হইব নিশ্চয়। পাঠক, কার্য্যক্ষেত্রে ও দেখিতে পাই—ধরণীধর রায়, প্রত্যেক কার্য্যেই প্রচুর লাভ করিয়া আসিতেছেন কোন কার্য্যেই, এ যাবৎ লোকসান দেন নাই। কিন্তু মাঝখানে, কোন কার্য্যে, এমন অবস্থা হইতে পারে যে, যদি ধরণী বাবু চালে ভুলেন ; তবে আর নিস্তার থাকিবে না দেউলিয়া ত নিশ্চয়ই,—তার উপর আবার লোক গঞ্জনা ! তখন আমি সাহায্যকারীকে দেখিয়াই, তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। এ সংসারে কেহই একাকী কোন মহৎ কি ক্ষুদ্র কার্য্য উদ্ধার বা সুসম্পন্ন করিতে পারে না। অর্জ্জুনাদি অমিত তেজস্বী মহারথীদের ও ভগবান কৃষ্ণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সময় বিশেষে, ভগবান কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে কত উৎসাহ, কত সাহস, কত বলভরসা ও কত উপদেশ দিয়াছিলেন যে নির্ণয় নাই। অর্জ্জুন সেই উদ্যম উৎসাহ পরিপূরিত বাক্যের প্রভাবে কৌরবকুল অনায়াসে বিধংস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন, সেই উদ্যম উৎসাহ পূর্ণ উপদেশ না পাইলে, বোধঃহয়, মহাভারতের পাণ্ডবলীলা বিপরীত আকার ধারণ করিত। তাই আমি ও সাহায্যকারীকে ভগ্নোৎসাহ দেখিয়া, প্রচুর উৎসাহ ও সাহস দিতে লাগিলাম। সাহসিকতা, কার্য্যসিদ্ধির একটি প্রধান অঙ্গ। সক্তির সঙ্গে সাহসিকতার সংস্রব খুব অল্প। ইহার গতি বড় দুর্জ্জয়। বিচক্ষণ ব্যক্তির পরিচালনায়, সময় বিশেষে যথেষ্ট উপকার দর্শে। অজ্ঞের পরিচালনায় প্রচুর অনিষ্ট সংঘটন হয়। মিবারের বীর শ্রেষ্ঠ প্রতাপ সিংহের অলৌকিক সাহস ও উৎসাহ ছিল বলিয়াই তিনি দেওয়ীরের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারগ হইয়াছিলেন। আর তুমি আমি কত বিষয়ে জয়লাভার্থ, কত অসমসাহসিকতা করি যে, অনেক সময়, প্রাণ নিয়া বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইতে হয়। সাহায্যকারীকে খেলিতে সাহস দিলাম সত্য ; কিন্তু, তিনি খেলিতে পারিতেছেন না। তাঁর হাতে তাস উঠিতেছে না। তখন আমি ভাবিলাম, যাহাকে লইয়া সংসার চালাইতে হইবে, যাহার সাহায্য প্রতি পলে পলে প্রয়োজন, তাহার কার্য্য-তৎপরতা বিশেষ আবশ্যক ; সে এরূপ নিশ্চেষ্ট ও উদ্যমশূন্য হইলে সংসার চলিবে কেন ? তাহাকে যে ভাবে হউক, কার্য্যতৎপর, উৎসাহী ও সাহসী করিয়া, আমার গঠিত করিয়া লইতে হইবে। যাহা আমার না হইলে চলিবে না, যাহা আমার নিত্য প্রয়োজন, তাহা আমার নিজেরই দেখিয়া শুনিয়া করিয়া লওয়া উচিত। তাই, তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত উপর্য্যুপরি অনেক উৎসাহবাক্য বলিতে লাগিলাম।

হল্‌দিঘাটের যুদ্ধের কিছুদিন পর, প্রতাপসিংহ, আপনার কষ্টদূর করিবার জন্য আকবরের নিকট আত্ম সমর্পণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ, সেই পত্র পড়িয়া, প্রতাপসিংহকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত, উৎসাহ পরিপূরিত কয়েকটি কবিতা লিখিয়া, প্রতাপসিংহের মুহ্যমান দেহে জীবনী শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পুনরায় স্বদেশের গৌরবকর মহৎ কার্য্য সাধনে সমুত্তেজিত করিয়াছিলেন। সেই উত্তেজনার ফল কি হইল ? না, শাহবাজ খাঁ, দেওয়ীরের যুদ্ধে হত হইলেন ; প্রতাপ সিংহ জয়লাভ করিলেন। বস্তুতঃ অনেক সময়, উৎসাহ

বাক্যে অনেক উপকার দর্শে। সেইরূপ আমার উৎসাহ বাক্যে ও সাহায্যকারীর মৃতপ্রায় দেহে যেন প্রভূত বল সঞ্চার হইল। এবং তৎক্ষণাৎ তিনি ইস্কাফনের বিবি খেলিয়া দিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতিপক্ষের ইচ্ছা আমাদিগকে " ছক্কা " করেন। তাই, আমি তাস দেওয়া মাত্র, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই, আমার দক্ষিণের দ্বন্দী রঙের এগার দ্বারা তুরুপ করিয়া পিট নিলেন। ঐ যে শত্রু, যে আমাকে সমাজের বহির্ভূত করিতে অভিলাষী, তাহাকে আমার বড়ই ভয় করিয়া, চলিতে হয় বৈকি ? কিন্তু, তেমন অবস্থায় যদি আমি শক্তি সম্পন্ন লোকের সাহায্য প্রাপ্ত হই ; অথবা চাল দিতে না ঠকি ; বুদ্ধি বিবেচনার সহিত উৎকৃষ্ট চাল দিতে পরি ; তবে, বোধহয়, শত্রুকে ভয় না করিলে ও চলিতে পারে। এবং চালের গুণে বিপদে না ও পড়িতে পারি। কারণ, শক্তি সম্পন্ন আশ্রয়ে ও প্রকৃষ্ট জ্ঞান শক্তির প্রভাবে, নির্ভয়তা জন্মে। তাই, প্রতিপক্ষের তুরুপে আমার বিশেষ সাহস হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম, প্রতিপক্ষ চালে ঠকিলেন। বুঝিতে পারিলাম বলিয়াই, ভরসা হইল—" ছক্কা " হইব না।

আর এক কথা, আমার দক্ষিণের দ্বন্দী, পিঠ তুলিয়াই, তাঁহার সাহায্যকারীর দিকে চাহিলেন। সেই সময়, তাঁর সাহায্যকারী ও জোরপূর্ণ কটাক্ষ করিলেন। ইহা দেখিয়া, তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, তদীয় সাহায্যকারীর কোমরে বড়ই জোর এ জোরে তাঁহাকে অকূল সমুদ্র পার করিতে পারিবেন। কিন্তু, এটি বুঝিলেন না যে, সাহায্যকারী শত্রুরূপী, প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন। তাঁহার মুখে অমৃত, অন্তরে গরল। তিনি যথাসর্ব্বস্বাপহারী,—সমূলে বিনাশকারী। ঐ যে প্রলোভন পরিপূর্ণ কটাক্ষ, সে কেবল তোমাকে উত্তেজিত করা বৈ আর কিছুই নহে। কারণ, তাঁহার হাতে কিছু মাত্র জোর নাই। তুমি উত্তেজিত হইলেই, তোমার কার্য্যে ভ্রম জন্মিবে। আয় ব্যয়ে দিশাহারা হইবে। কাজেই তোমাকে যে চাল দিতে বলিবে ; তুমি সেই চালই দিবে। তখন তোমার গোমস্তা কর্ম্মচারীর প্রভুত লাভ—তোমার প্রচুর অনিষ্ট ! এ সংসারে, এখন কার দিনে, এই প্রকার সাহায্যকারী, ও গোমস্তা কর্ম্মচারীদের সংখ্যাই বেশী। এখন আর প্রভুর উন্নতির দিকে কেহ চাহে না, কেবল আপনার উদর পরিপূর্ণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করে। প্রতিদ্বন্দী ও সেই লোভপূর্ণ কটাক্ষে ভুলিয়া, রঙের কুড়ি খেলাতে, আমার হাতে রঙের চৌদ্দ বড় হইয়া গেল। মোটে কিন্তু আমি রঙের চৌদ্দ ও সাতা পাইয়াছি। আমার সাহায্য কারী মাত্র রঙের আটা পাইয়াছেন। ফ্রাইর নাম গন্ধ ও নাই। চৌদ্দ যেই বড় হইল, তখন কার সাধ্য আমাকে আর " ছক্কা " করে ? কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, প্রধান দ্বন্দী, কুড়ির মাথা নিয়াই, মাথা চুলকাইতে লাগিলেন ; দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগলেন, তদীয় সাহায্যকারীর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিলেন। সাহায্যকারী, এখন পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়াছেন ; এখন আর সেই কটাক্ষ ও নাই, বলিবার ক্ষমতা ও নাই। সংসারে ও দেখা যায়, যে তোমাকে যে পরামর্শ দিয়া বিপদে ফেলিয়াছে, সে বিপদকালে আর দেখা দেয় না, তফাতে তফাতে থাকিয়া, গা ঢাকা দিয়া চলিয়া যায় আমার প্রতিদ্বন্দীর ও সেই দশা। যাহার জন্য তিনি এত করিলেন ; সে এখন ফিরিয়া ও চাহে না। আমি তখনই বুঝিতে পারিলাম যে, শত্রু ত বিপদাপন্ন। বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু, তখন আশ্রয় দিবার ক্ষমতা ছিল না। কাজেই প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি একান্তই আশ্রয় দিতে না পারি ; তবে যথাসাধ্য উপকার করিবার চেষ্টা করিব। অনিষ্ট করিব না, তখন আমার অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু, মনে পড়িল,—

> " The fairest action of our human life,
> Is scorning to revenge an injury."
>
> LADY E. CAREW.

এখন আমি একটুকু ধৈর্য্যশীল ও বীতস্পৃহ। সহিষ্ণুতা, উন্নতির সোপান। সহিষ্ণুতার ধ্বংস নাই, কিন্তু, ক্রমোন্নতি। বীতস্পৃহের মুক্তির দ্বার পরিষ্কার। লোভে পাপ, পাপেই মৃত্যু ! সে মৃত্যু ও সুখপ্রদ নহে। কাজেই আমি বীতস্পৃহ আমার সম্মুখে, হীরা, মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য রত্নাদি পড়িয়া থাকিলে ও আমি তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করি না। আমার সম্মুখ দিয়া, প্রতিপক্ষ, দুটা দশযুক্ত মার নিয়া গেল ; ভ্রূক্ষেপ ও করিলাম না।

ইচ্ছা করিলেই চৌদ্দটি দিয়া মার রাখিতে পারিতাম। কিন্তু, তাহা না করিয়া তৎপর আর কি হয় তাহাই দেখিতে লাগিলাম। সাতখানা রঙ গিয়াছে ; আমার দক্ষিণের দ্বন্দী ভাবিতেছেন, বক্রী রঙ্ খানা, তাঁহার

সঙ্গীর,হাতেই। তাই তিনি বড় জোরে পিঠ নিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা ছয়টি পিট নিয়াছেন। মাত্র দুটি মার অবশিষ্ট। আমার হাতে একটি বদরঙের সাহেব ও চৌদ্দ মাত্র আছে। আমি এতক্ষণ ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম। কিন্তু, দেখিলাম যে, এখন আর ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া চলিলে লাভ নাই। ইতিপূর্ব্বে, ইচ্ছা করিয়াই শত্রুর বিরুদ্ধে কিছু করি নাই; করিলে অনেক করিতে পারিতাম। এখন বাধ্য হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মের গতিকে ১টী দশের উপর চৌদ্দ দিয়া তুরুপ করিলাম। তজ্জন্য অবশিষ্ট মারটি ও আমরাই পাইলাম। কারণ, বদ রঙের সাহেবই আমার ফ্রাই হইল। টেক্কা পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। সেই সাহেবের পিটে ও আমরা ভাগ্যগুণে দুটী দশ পাইলাম। কাজেই হাতের পাঁচটী আমাদের দু’কুড়ি সাতের খেলা রহিয়া গেল। বিপক্ষ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন।

এরপর, আমরা ক্রমে চারিখানা তাস ধরিলাম। এই চারিখানা তাসের সময়, প্রতিপক্ষের গাত্রদাহ জন্মিল। তাঁহারা ‘মুচিরাম ঘোষ,’ নিমাই বসু হঠাৎ বাবু প্রভৃতির নাম নিতে লাগিলেন। এবং তাসগুলির গায় হাত বুলাইতে লাগিলেন প্রতিপক্ষ কিন্তু বলিতে লাগিলেন—নামের গুণে তাস উঠিয়া যাইবে। কিন্তু দুঃখ এই পঞ্চমবার আমার তুরুপ দিবার অসাবধানতা বশতঃ পাঞ্জা হইল না। যে সময় তুরুপ দিলে, বিপক্ষের খেলা থাকে না; সেই সময়, তুরুপ না দিয়া, অন্য সময়ে দিয়াছিলাম। তাহাতেই বিপক্ষেরা দু’কুড়ি সাতের খেলা রাখিল; অধিকন্তু পাঞ্জা হইল না। অসাবধানতার ফল ফলিল। তখন আমার সাহয্যকারী, আমার ভ্রম দেখিয়া, বড়ই চটিয়া উঠিলেন। অমি কেন উচিত সময়ে তুরুপ দিয়া মার রাখিলাম না; তজ্জন্য আমার প্রতি মহাবিরক্ত হইলেন। সংসার ক্ষেত্রে ও অসাবধানতায় অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

যাহা হউক, আমার সাহায্যকারী আমার ভ্রমে এতদূর চটিলেন যে, তিনি তাস ফেলিয়া উঠিয়া চলিলেন। ইহাতে আমি বুঝিলাম, শত্রু বধে যাহারা সাহায্যকারী, তাহারা যদি সুযোগ পাইয়া শত্রুবধ করিতে না পারে; তবে, তাহাদের চিত্ত ‘প্রসাদ জন্মিতে পারে না। ইহা বুঝিয়া, আমি কি করিলাম, ? না, হাসিয়া সাহায্যকারী কে বসাইলাম। বলিলাম, “এবার আমরা তাসিতেছি। নিশ্চয়ই “ মূর্ত্তিমান বোম ” করিব। বোম করিতে পারিলেই ত সন্তুষ্ট হও ?”

সাহায্যকারী নাসিকা সঙ্কুচিত করিলেন।

“আর যা হইবে তা হরি মল্লিকের টেকে।”

আমি কে আচ্ছা, দেখা যাউক।

এই বলিয়া, তাসিলাম। খেলিলাম,—হরি! হরি! সত্য সত্যই সেই বার প্রতিপক্ষ বোম হইলেন। তখন আমার সাহায্যকারীর প্রফুল্ল হাসি দেখে কে ? তিনি এমন লাফিয়ে উঠিলেন যে, আমার হাসি পাইল। আমি মনে মনে ভাবিলাম, হনুমান কি এর চেয়ে বেশী লম্ফ দিতে পারিতেন ? পরে, আমার সঙ্গীকে বলিলাম “ছি! শত্রু পরাজয়ে কি হাসিতে আছে ? বরং; শত্রুকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিক্ষা কর।”

প্রতিপক্ষ, এ কথায় কি ভাবিলেন বলিতে পারি না; কিন্তু দেখিলাম তাঁহাদের মুখমণ্ডলে কালিমার ছায়া পড়িয়াছে। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেলেন।

সংকীর্ত্তন ; রূপ বা সাক্ষাদ্দর্শন ; নিবেদন বা আত্মসমর্পণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণে নবানুরাগীর সেই দারুণ চাঞ্চল্যের অবস্থায়, অনুরাগের সেই প্রথম আবেগের অবস্থায়, প্রেমের সেই অস্থিরতার অবস্থায় তাহার সহিত তাহার প্রেমগুরুর সাক্ষাৎ হইলে তিনি বুঝাইয়া দেন “প্রিয়, কত ভাগ্য বলে বিনা সাধনে তোমার যদি কৃষ্ণচরণাম্বুজে রতি হইয়াছে তবে একথা হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে লুকাইয়া রাখ, অধীর হইলে চলিবে না, চঞ্চলতায় তোমারই প্রেমানন্দ সুখের ব্যাঘাত জন্মাইবে। তোমার অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম ঘটিয়াছে সত্য কিন্তু এখনও তোমার অহৈতুকী নিষ্ঠা হয় নাই, এখনও

তুমি পূরা স্বার্থত্যাগ করিতে পার নাই, নিজ সুখবাঞ্ছা পরিহার করিতে পার নাই। এ কি বলিতেছ

"সুখের লাগিয়া, পিরিতি করিলাম,
শ্যাম বঁধুয়ার সনে।"

কিন্তু তুমি কি জান না

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম"
"কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেম তার নাম।"

আত্ম সুখের জন্য কৃষ্ণ প্রেম করিতে গেলে সুখ কখনও মিলিবে না, জীবন নানা আকাঙ্ক্ষা, নানা তৃষ্ণার অধিষ্ঠান হইয়া যন্ত্রণার কারণ হইবে মাত্র। তবে যদি আপনার ষোল আনাকে ভুলিয়া কৃষ্ণ সুখের জন্যই, কৃষ্ণের তুষ্টির জন্যই কৃষ্ণ প্রেমে মজিতে পার, তবে এই সকল চঞ্চলতা, এই সকল জ্বালা এড়াইতে পারিবে। প্রভুর ইচ্ছা হয় তোমাকে আনন্দে রাখুন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হয় তোমাকে যন্ত্রণা সাগরে নিক্ষেপ করুন তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? তুমি জানিও যে তুমি কেবল কৃষ্ণ সেবার জন্যই কৃষ্ণ সেবা কর, অন্য কোন পুরস্কারের জন্য নয়। এই ভাব ধারণ করিতে পারিলেই তোমার বাহ্যিক চঞ্চলতা দূরে যাইবে। বাহ্য অন্তর এই দুই দেহ তোমাকে কৃষ্ণসাধনে নিযুক্ত করিতে হইবে।

"বাহ্য অন্তর এই দুই ত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন।
মনে নিজ সিদ্ধ দেহে করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"

তুমি হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে গোপন করিয়া কৃষ্ণ চিন্তা করিতে থাক, চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণের কৃপায় তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। তোমার রত্যঙ্কুর জন্মিয়াছে; রত্যঙ্কুর

—"গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম।"

তুমি হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়নাথকে ভাবিতে ভাবিতে প্রেমের স্থায়ী গাঢ় ভাব লাভ করিতে পারিলেই তোমার বাহ্যের চাঞ্চল্য যাইবে। তখন দেখিবে কৃষ্ণ প্রেম বিষামৃতের সমন্বয় নয়, ইহা অত্যুজ্জ্বল উন্নত রসের প্রবাহ। ভাব স্থায়ী হইলেই তুমি দেখিবে তোমার হৃদয়বল্লভ তোমার হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জে আসিয়া তোমার প্রাণ লইয়া রমণ করিতেছেন।"

বৈষ্ণব কবি গাহিতে গাহিতে কি বলিতেছেন শুনুন।

সুন্দরি, ধরবি বচন হামার।
কানুক প্রেম, রতন পুন গোপবি,
বেকত করবি কুলাচার।
ধৈরজ লাজ, করণ তুয়া সমুচিত,
শুনবি গুরুজন ভাষ।
আপনক মন, আপে পুন রাখবি,
যৈছে নহত উপহাস॥

* * *

"ভাব অন্তরে যব, হোয়ত অঙ্কুর,
আনতহি দেয়বি চিত।
গোবিন্দ দাস কহ, ঐছে প্রেম নহ,
অনুরাগ গতি বিপরীত।"

প্রেমিক সাধক চূড়ামণি, চণ্ডীদাস বলিতেছেন ;—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে জন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরিতি, যেজন জানয়ে,
সেই সে পাইতে পারে।
পিরিতি পিরীতি, তিনটী আঁখর,
জানিবে ভজন সার।
রাগ মার্গে যেই, ভজন করয়ে,
প্রাপ্তি হইবে তার॥

* * *

পুত্র পরিজন, সংসার আপন,
সকল ত্যজিয়া লেখ।
পিরিতি করিলে, তাহারে পাইবে,
মনেতে ভাবিয়া দেখ।
পিরীতি পিরীতি, তিনটী আঁখর,
পিরীতি বিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে,
হইবে একই মত॥"

উপরোক্ত উপদেশ মত কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে যখন সাধকের রতি গাঢ় হয়, ভাব স্থায়ী হয় ও প্রেম গভীর হয়, তখন সে চরাচর মধ্যে যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুষমাময় দেখে তাহাতেই

আপনার ইষ্ট দর্শন করে। সে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে শ্যামরূপ দেখে, সে নবজলধরে স্নিগ্ধ নবজলধর কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখে, সে স্রোতস্বিনীর নীল সলিলে নীলমণি নিন্দিত শ্যামবপুঃ দেখিতে পায়। যে যাহা কিছু সুকুমার, যাহা কিছু মনোহর, যাহা কিছু নবীন কিশোর, যাহা কিছু স্নিগ্ধ ও নয়নাভিরাম তাহাতেই চৈতন্য স্বরূপ নিরাকার মূর্ত্তি দেখে না; ভাগবতের দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাম্বর পরিহিত বনমালাধারী স্ময়মান-মুখাম্বুজ রসময় শ্যামমূর্ত্তি দেখে।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ.
পীতাম্বর ধরঃ শ্যামঃ সাক্ষান্মন্মথোমন্মথঃ॥

সে দেখে তটিনীর জল বিধৌত পবিত্র পুলিন প্রাণ বল্লভের লীলাস্থল, কাননের সুগন্ধি কুসুমাবলি প্রাণনাথের গলার বনমালা; আর যে সুশৃঙ্খলা যে ঐকতান অবলম্বন করিয়া এই বিশ্ব নাচিতে নাচিতে চলিতেছে তাহা ভুবনমোহনের ভুবনমোহন বাঁশি, যে তালে তালে এই বিশ্ব নাচিতেছে তাহা তাঁহার চরণের নুপুর; আর যে প্রেমে ত্রিভুবন কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত মুগ্ধ তাহা তাঁহার চাঁদ মুখের হাসি। সে অমনি কীর্ত্তনের সুরে গাইয়া উঠে;—

"জলদ বরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু,
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাহি হয়।"

আবার কখন গায়;

"বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনি কত কোটী কাম,
বদন জিতল কোটী শশী।
ভ্রূ ধনী ভঙ্গী ঠাম, নয়ন কোণে পুরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধা রাশি।"

কিম্বা;—

"পেখনু শ্যামরু ধাম।
কুঞ্জ সমীপে, নীপ অবলম্বই,
রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম।
চরণ অবধি, বনমালা বিরাজিত,
হেরইতে উনমতি হোই।
মধুকরী ছলে কত, ব্রজ রমণী চিত,
তাঁই রহি গতি মতি খোই।"

কিম্বা গায়;

"উজল জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
মূরতি মদন; ধনু ভাঙ বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শর নয়ান তরঙ্গ॥

চূড়ায়ে উড়ায়ে মত্ত ময়ূর শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড।
অধরে সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজন মোহন মধুরিম হাস।
অবনী বিলম্বিত গলে বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততই রসাল॥
তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥"

সে অন্তরে দেখে যে, যে ঈশ্বর অন্য সাধনার এতদূর, এত দুরারাধ্য, সেই প্রাণ রমণ তাহার প্রাণরূপিণী রাধাকে লইয়া নিরন্তর হৃদয়ের নিভৃত নিধুবনে ক্রীড়া করিতেছেন, প্রেমানন্দে হৃদয়কে নাচাইতেছেন, মধুরতার মদিরায় মনকে মাতাইতেছেন। পাঠক ইহারই নাম মধুর ভাব, এই ভাবের সহিত পার্থিব কোন ভাবের সাদৃশ্য নাই। এ ভাবে ঈশ্বরের মাধুর্য্য ব্যতীত আর কিছু উপলব্ধি হয় না। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের মধুরতা ব্যতীত অন্য অংশ বৈষ্ণবের নয়নে প্রতিভাত হয় না।

কোন কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়াছেন "পাপিন্! তোমার পাপের ভার আমাকে দিয়া নিশ্চিন্ত থাক, আমি ঈশ্বরের সমীপে তোমার ওকালতী করিয়া তোমাকে খালাস করিব।" বৈষ্ণব বলে, পাপ পুণ্য অত বুঝি না, "পাপ পুণ্য মম প্রভুর চরণ খানি।" স্বর্গ নরকের ভাবনা ভাবি না। ধিক্ জীবনে, প্রভুকে পাপের ভার দিব? যে চরণে সুকোমল প্রসূন দিয়া পূজা করিতে ভয় করি, সামান্য স্বর্গ সুখের জন্য সেই চরণে পাপের ভার দিতে পারিব না। না হয় কোটী-কল্প নরক যন্ত্রণা ভোগ করিব, যদি জন্মান্তর হয়, তবে না হয় কীট পতঙ্গ হইব। তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। কৃষ্ণ এই করুন যদি

কিয়ে মানুষ পশু, পাখী জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুন পুন,
মতি রহুঁ হরি পর সঙ্গে।"

কোন ধর্ম্মের পরিত্রাতা বলিয়াছেন " My Kingdom is not of this World " আমার রাজত্ব এই পৃথিবীর নয়। " বৈষ্ণবের কৃষ্ণ বলেন "জীব! আমার রাজত্ব, আমার সিংহাসন" তোর হৃদয়ে। ভয় কি? যখনই ভক্তিভরে হৃদয় খুলিয়া "প্রাণ রমণ" বলিয়া আমায় ডাকবি, তখনই সচ্চিদানন্দরূপে তোর হৃদয়ে উদয় হইয়া আমি মনের আনন্দে তোর হৃদয়ে বিহার করিব।" পাঠক ইহা অপেক্ষা মধুর ভাব আর আছে কি? বৈষ্ণব এইরূপে প্রেমের স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়াসনে প্রাণরমণকে বসাইয়া কর যোড়ে বলিতে থাকে "প্রাণনাথ? অনেক ভাগ্যবলে তোমা হেন গুণনিধি বঁধু পাইয়াছি,

এখন করযোড়ে এই প্রার্থনা আমি যোগ্য হই বা অযোগ্য হই যেন এই অকিঞ্চন জনকে তোমার দাস্য দিও। আমি ধন জন, মান সম্পদ কিছু চাহি না, পাপ পুণ্য বুঝি না, মুক্তি বন্ধনের ধার ধারি না, স্বর্গ নরকের সংবাদ রাখি না, তুমি যেন জন্মে জন্মে আমার প্রাণ বঁধু হইও। আমি যেন তোমার যুগল চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া পুজা করিতে পাই।” সাধকের হৃদয় তখন প্রাণ ভুলান কীর্ত্তনের সুরে, হৃদয় নাচান লোফার তালে গাহিতে থাকে ;

“বঁধু কি আর বলিব আমি।
(আমার) জীবনে, মরণে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈয় তুমি ॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে
বাঁধিলাম প্রেমের ফাঁসি।
সব সমপিয়া, একমন হইয়া,
নিশ্চয় হইলাম দাসী।”

আবার বলে ;—

“বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ, তুমিহে কালিয়ে,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম মতিহীনী,
না জানি ভজন পুজন।
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি
প্রাণ নাহি আন ভার।
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ।
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডী দাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণ খানি ॥”

কখন সোহাগ ভরে গায় ;—

“প্রাণ নাথ কেমন করিব আমি।
তোমা বিনে মন, করে উচাটন,
কে জানে কেমন তুমি।
না দেখি নয়ন, ঝুরে অনুক্ষণ,
দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন, মুরছিত হেন,
মুদিয়ে রহিয়ে আঁখি।
শ্রবণে শুনিয়া, তোমার চরিত,
আন না ভাবয়ে মনে।
নিমেষের আধ, পাশরিতে নারি,
ঘুমালে দেখি স্বপনে।
জাগিলে চেতন, হারাই যে আমি,
তোমা নাম করি কাঁদি।
পরবোধ দেই, এ রায় বসন্ত
তিলেক থির নাহি বাঁধি।”

(ক্রমশঃ)

গান।

স্থান—কলিকাতা আর্য্য মিসান স্কুলের দ্বার।

গায়ক—দুখা বাউল।

বাউলের সুর।

আছে কি আর সে দিন এখন আর।
ঘোর কলি, নব নব ফুট্‌ছে কলি চমৎকার ॥
বামুন বাইতি, বাগদী তাঁতি, এক সান্‌কীর, সবে ইয়ার ;
স্বর্ণকরে, বর্ণ ভেদাভেদ, যেতে চল্লো, জাত বিচার ॥
দোছোটে, ওটেনাকো মন, দেখে কোটেরি, বাহার ;
পর্‌তে খড়ম চট্টি, পাইনে একটি, বুট্‌টিতে নজোর সবার ॥
হলাম হদ্দ, আবাল বৃদ্ধ, গুষ্টি শুদ্দোর, মদের ধার ;
বেড়ায় হয়ে মাতাল, হিন্দুর বেয়াল, বাকী নাই কো পুঁটীর মার ॥
ভবের যিশু, ভজে শিশু, ভুলে কৃষ্ণ অবতার ;
রাজা রাম মোহনের, পরম জ্ঞানে, ধ্যানে কেহ, নিরাকার ॥
উঠলো কালে, বিগ্র(হ) নীলে, শিলে হলো নুড়ি সার ;
রহে ঘরে ঠাকুর, দ্বারে কুকুর, মৃতলে নাইকো তত্ত্ব কার্‌ ॥
প্রণামের নাম করে না কেউ, দেখে হাত নাড়ায় ব্যাপার ;
পরম পূজনীয় পরিবর্ত্তে, বাপ খুড়ো মাই ডিয়ার সার ॥

মাগের মণ্ডা, মায়ের ভাগ্যে, মাত্র কড়ি গণ্ডা চার ;
ছেলের মাথায় বাছা, টুপী সাঁচা, জেলে কাছা বাপদাদার ॥
বাবুর মেজাজ চড়া, কথা টেঢ়া, রাগ ভরা দিলের মাঝার ;
ভাবেন বুড়োর দলকে, বেঁড়ে বাঁদর, নিজে বুদ্ধির ইষ্টিমার ॥
হুকো সট্‌কা-মুখে কিবা, পায় শোভা পাইপ্‌সিগার ;
যে দেয়ালে সাজতো দুর্গীর খসম, আজ তথা রাণীর ভাতার ॥
সহোদর হচ্ছে পর, মাগের নাম হয় " পরিবার ;"
শালগ্রামের পৈতে ভেঙ্গে, রাঁড়ের পায়ের অলঙ্কার ॥
এতো জুটেছে ঠক্, সহর যুড়ে, মাথা নাড়্‌তে ঠকাঠক্ ;
বাঁ-হাতের পয়সা ড্যান্ হাতেতে রাখ্‌তে ভাবনা বারংবার ॥
কাট্‌তে টিকী, হয় গো সুখী, দেখি নিজে ন্যায়ালঙ্কার ;
সাজে শাকের তেলে টেঢ়ী, মাগে অন্ন মাগে দ্বারে দ্বার ॥
নাইকো লজ্জা, করে সজ্জা, ঘরের বৌ হয় রাস্তার বার ;
ছুঁড়ীর কাণ্ড দেখে অবাক্ বুড়ী গেরো দেয় চুলে আবার ॥
গিন্নির চিংড়ি, মুর্গীর টেংরি ঝোলে হয় কর্ত্তার ডিনার ;
যার ভোজনেতে, চামচে সানক পাত চাটে জনক তার ॥
মলে পতি, দেখি সতী, পায় পতি পুনর্ব্বার ;
যৌবন ষোল কলা, পূর্ণ হলে, তবে ছাল্‌নাতলা পার ॥
নূতন ঢঙ্গের চালান, বিলেত হতে আস্‌চে চলে অনিবার ;
ওযে তারি তোড়ে, যাচ্ছে নোড়ে, সে কেলে আচার ব্যাভার ॥

কুরুক্ষেত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম সর্গ।

বাসুকির ভগ্নী জরৎ-কারু, বাসুকি ও দুর্ব্বাসার কথোপকথন লইয়া এই সর্গ রচিত। পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অভাবে এ কয়েকজনেরি চরিত্র অপরিস্ফুট —সেই জন্য আমরাও পাঠককে এই কাব্য পড়িবার পূর্ব্বে " রৈবতক কাব্য " পাঠ করিতে বলি !

জরৎ-কারুর চরিত্রের স্থানে স্থানে ইউরোপীয় ভাব সমাবেশ করিয়া, কবি তাঁহার চরিত্র বৈদেশিক করিয়া তুলিয়াছেন। এ সর্গের আরম্ভটি কিন্তু বড় সুন্দর। পাঠক ! দেখুন,

হেমন্ত শৈশব সন্ধ্যা ধীরে বিষাদিনী
উত্তরিলা কুরুক্ষেত্রে ; উত্তরিলা ধীরে

অদূর দক্ষিণারণ্যে, বসিয়া যথায়
সন্ন্যাসিনী জরৎ-কারু সন্ধ্যাস্বরূপিণী।

জরৎ-কারুর একটু পূর্ব্ব বৃত্তান্ত না বলিলে পাঠক, এ সর্গের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন না। জরৎ-কারু বাসুকির ভগ্নী। শ্রীকৃষ্ণের অলোকসামান্য রূপ গুণ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে মন প্রাণ সমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও জরৎ-কারুকে স্নেহ মমতা করিয়াছিলেন। জরৎ-কারুর বিবাহ হইল দুর্ব্বাসা ঋষির সহিত। জরৎকারু পরমা রূপগুণবতী বিশেষ তিনি নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিণী। সুতরাং তিনি ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি অসভ্যাকৃতি ক্রূঢ় উদ্ধত স্বভাব দুর্ব্বসা ঋষিতে তুষ্ট হইবেন কেন ? তিনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ চিন্তাই করেন, স্বামী নিকটে আসিলেই থ্যাঙ্‌রা ধরেন। সেই জরৎকারুর সহিত তাঁর স্বামী দুর্ব্বাসা ঋষির ও তাঁর ভ্রাতা বাসুকির কথোপকথন এই সর্গের বিষয়। জরৎকারু শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান ভাবিয়া মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন , সেজন্য আমরা তাঁহাকে দুষিতে পারি না, কিন্তু স্বামীর প্রতি তাঁহার জঘন্য আচরণ, আমাদের আদৌ ভাল লাগিল না। ভগবানে প্রেম থাকিলে কি স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম থাকিতে নাই ? শ্রীকৃষ্ণকেও বৃন্দাবনের সে প্রেমের সে ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ করেন নাই। নবীন বাবু "কুরুক্ষেত্র কাব্য" লিখিয়াছেন শুনিয়াই আমরা আশা করিয়াছিলাম যে এই বার বৃন্দাবনের গোপাল ভাবে ও কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ ভাবের অনির্ব্বচনীয় সমবায় দেখিয়া আমরা জীবন সার্থক করিব। কিন্তু আমাদের সে আশা সফল হইল না।

আর এক কথা। রৈবতক কাব্যেও দেখিলাম, আর এ কাব্যেও দেখিলাম, যে ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণদের উপর কবির বড়ই রাগ। গরিব ব্রাহ্মণরা এত কি অপরাধ করিয়াছেন, যে কবি তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত। এককালে ব্রাহ্মণেরা আপন শক্তির অপব্যবহার করিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু কবি কি বশিষ্ঠের ন্যায় ব্রাহ্মণকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন ? এমন মনুষ্য জগতে আছে কি যে অস্বীকার করিতে পারে, যে ভারতের মহত্ত্ব ব্রাহ্মণগণ দ্বারাই অর্জ্জিত ও রক্ষিত হইয়াছিল এবং এখনো যে ভারতের নাম লোপ হয় নাই, তাহাও তাঁহাদিগের পুণ্যে। ভাল মন্দ লোক সকল শ্রেণীর মধ্যেই আছে। মেকলে চিনে বাজারের দালাল দেখিয়া বাঙ্গালী চরিত লিখিয়াছেন, কবিও কি দুই এক জন উদ্ধত স্বভার ঋষি দেখিয়া ব্রাহ্মণ চরিত লিখিতে প্রস্তুত ?

আর একটি কথা বলিয়া আমরা এ সর্গের আলোচনা শেষ করিব। জরৎকারুর মাতৃস্নেহ অতি গভীর, অতি মধুর। জরৎকারু বলিতেছেন—

শুনিয়াছি মহাবনে আছে তরুবর,
কঠিন কঠোর দেহ, হৃদয় তাহার,

দুগ্ধে ভরা, সেই তরু মম সহোদর,
শিলারোধে অবরুদ্ধ স্নেহের সাগর।
মুখে মুখে বুকে বুকে অনাথা দুজনে
বিহঙ্গ শাবক মত করিলা পালন
কত দুঃখে কত স্নেহে কতই আদরে!

এ শৈশব অবস্থার কথা। তাহার পর যৌবনে জরৎকারুর সহোদরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে

উচ্ছ্বাসে লইয়া বুকে চুম্বিয়া আদরে
কহিলা বাসুকি, নেত্র স্নেহে ছল ছল,

* * *

আবার আবার স্নেহে চুম্বিলা বদন—

* * *

জরৎকারু ভ্রাতাকে দেখিয়া

ছুটিয়া রমণী বেগে আনন্দে অধীরা
পড়িল বাসুকি বক্ষে। * *

যুবতী ভগ্নী জ্যেষ্ঠ সহোদরের বুকে পড়িয়া তাঁহাকে চুম্বন দান করা, অথবা ভ্রাতার ও যুবতী ভগ্নীকে হৃদয়ে ধরিয়া চুম্বন করা, এ দেশের প্রথা নহে। ভারতে কোন কালে, কোন অঞ্চলে এরূপ প্রথা ছিল বলিয়া মনে হয় না। সাহেব বিবিদের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে তাহা জানি। এরূপ দৃশ্য লিপিবদ্ধ না করাই কবির উচিত ছিল। কাব্য গত চরিত্রগুলি যে যে সময়ে যে ভাষায় লিখিত হয়, সেগুলি সেই সময়েরও সেই দেশের উপযোগী না করিয়া লইলে কাব্যের নাটকত্ব নষ্ট হইয়া যায়। সেক্ষপীরের কোন নাটক, বঙ্গ ভাষার কেবল মাত্র অনুবাদ করিলে কি লোকের প্রীতিকর হয়? যদি তাহা হইত, তাহা হইলে সেক্ষপীরের নাটকগুলির অনুবাদ বঙ্গদেশে আদৃত হইয়া পড়িত। সেক্ষপীরের নাটকের দৃশ্য ঘটনা ও চরিত্রগুলি, অস্মদ্দেশীয় দৃশ্যে, স্থানে ও চরিত্রে রূপান্তরিত না করিতে পারিলে, সে সকল বৈদেশিক বলিয়া পাঠকের তাহায় সহানুভূতির অভাব হইয়া পড়ে। কুরুক্ষেত্রের কবি, বৈদেশিক চরিত্রের মাধুর্য্যগুলি স্বীয় কাব্যে যোজনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহাতে দুষি না। তিনি কুরুক্ষেত্র কাব্যে এ সকল সৌন্দর্য্যের সমাবেশ না করিয়া কাব্যান্তরে করিলেই সঙ্গত হইত। (ক্রমশঃ)

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

১ম ভাগ—১১শ সংখ্যা। ফাল্গুন—১৩০০।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ঃ—

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন; শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল্; শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্; শ্রীরসময় মিত্র, এম্, এ; শ্রীরামগোপাল ঘোষ, বি, এল।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	অদ্ভূতে বিশ্বাস	... ৩২১
২।	শ্রীচৈতন্য এবং যিশু খৃষ্ট	... ৩৩০
৩।	সরস্বতী (সংকীর্ত্তন)	... ৩৪১
৪।	সংকীর্ত্তন;—রসোদ্গার	... ৩৪২
৫।	নিশীথ চিন্তা (পদ্য)	... ৩৪৭
৬।	কুরুক্ষেত্র	... ৩৪৮

হুগলী,
সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফাল্গুন—১৩০০।

এই সংখ্যার মূল্য /১০ দেড় আনা।

অপরিচিত প্রদেশে এমন সময়ে কোথায় যাইব—এই ভাবনা মনে উদিত হইল। অন্ধকারে পর্ব্বত হইতে নিষ্ক্রমণ বিপদজনক, বিশেষ অবতরণ করিবার কোন পথ লক্ষিত হইল না, এ কারণ সেই স্থানেই রজনী যাপন করিব স্থির করিয়া মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সেই শিলাতলে শয়ন করিলাম এবং অনতিবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। তদবস্থায় একটী বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম।

সহসা সেই পর্ব্বতের দক্ষিণ দিক হইতে এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। দ্রুতপদে তদভিমুখে যাইয়া দেখিলাম—নিম্নে এক প্রচণ্ডবেগা নদী ভীষণ গর্জ্জনে বহিয়া যাইতেছে এবং তাহার মধ্য হইতে মনুষ্যের আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে। ব্যাকুলহৃদয়ে পর্ব্বত হইতে নামিয়া সেই নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এমন ভীষণাকৃতি নদী জীবনে কখনও দেখি নাই। রজনীর অন্ধকার নদীবক্ষে গাঢ়তর হইয়া অগাধ বারিরাশিকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে এবং তন্মুহূর্ত্তে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে। নদীবক্ষস্থিত কৃষ্ণাকৃতি পর্ব্বতগহ্বর প্রতিধ্বনিত করিয়া সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর গর্জ্জন স্রোতনাদে মিশিয়া সন্ত্রাস উৎপাদন করিতেছে।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। সহসা পশ্চাদ্ভাগের সেই পর্ব্বত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই প্রচণ্ড অগ্নির তাপ আসিয়া প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। মহা বিপদে পড়িলাম। আকুলহৃদয়ে নদীতীরে ছুটিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ এক অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী রমণী অবতীর্ণা হইয়া আমাকে আশ্বাসবচনে কহিলেন "ভয় নাই, তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে নদী পার করাইয়া নিশ্চিন্তপুরে পাঠাইয়া দিব।" এই বিপদের সময়ে এইরূপ সান্ত্বনা পাইয়া মনে বল পাইলাম, তথাপি রজনীযোগে অপরিচিতা রমণীর সহিত যাইতে মন সঙ্কুচিত হইল। রমণী আমার মনোগত ভাব বুঝিয়া সহাস্যবদনে গর্ব্বিতবচনে কহিলেন "পথিক! তোমার ন্যায় এইরূপ বিপদে পড়িয়া কত লোক আমার শরণাপন্ন হইয়া উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। এ বিপদে লালসাময়ী ভিন্ন তোমার উদ্ধার কে করিবে?" আমি সে মুখের দিকে তাকাইয়া সে রূপমাধুরীতে বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম। আর কিছুমাত্র বাক্যব্যয় না করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া নদীবক্ষে এক বিচিত্র সেতু দেখিতে পাইলাম। ঐ সেতু যাইয়া নদীবক্ষস্থিত এক প্রশস্ত শৈলে মিশিয়াছে। লালসাময়ীর সঙ্গে সেতুপথে গমন করিয়া সেই শৈলে উপনীত হইবামাত্র পশ্চাদ্দিক্ হইতে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল, প্রতিনিবৃত্ত হইবার আর সম্ভাবনা রহিল না।

যে শৈলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম তাহার নাম বিলাসশৈল। কর্ম্মনাশা নদীর প্রবল স্রোত ভেদ করিয়া সেই বিচিত্র শৈল বিরাজ করিতেছে। একটী প্রশস্ত গহ্বর অপূর্ব্ব আলোকে সমালোকিত। কত অমূল্যরত্নরাজি তাহাতে সঞ্চিত রহিয়াছে। মধ্যস্থলে স্থাপিত মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণ সিংহাসনে বিলাসময়ী সমাসীন, তদীয় চরণতলে নির্দ্দিষ্ট আসনে আমি উপবেশন করিলাম। কত শত সহচরী বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিল। সেই প্রমোদাগারের প্রত্যেক প্রান্ত হইতে বীণা বাদিত হইতে লাগিল অমনি সঙ্গীতের মোহন মূর্চ্ছনায় একেবারে ডুবিয়া গেলাম। হাস্য প্রমোদ ও কৌতুকে সকলেই প্রমত্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে সকলে সুরাপানে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সেই সময়ে গহ্বরের একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল এবং বিকটাকৃতি বহুতর পুরুষ আসিয়া রমণীগণের কেশাকর্ষণ করিয়া পলায়ন করিল। কি বীভৎস দৃশ্য। প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই প্রমোদাগারের চারি পার্শ্বে সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। যাহা দেখিলাম তাহাতে প্রাণ উড়িয়া গেল। কেহ কাহারও বক্ষে পদাঘাত করিতেছে। কেহ শাণিত অসির দ্বারা কাহারও মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতেছে। কেহ কাহাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। কেহ কাহাকে বান্ধিয়া কর্ম্মনাশা নদীতে ফেলিয়া দিতেছে। কেহ অন্যের বুকের মাংস ছিড়িয়া খাইতেছে। কেহ ভীষণাকৃতি সর্প আনিয়া অন্যের গলদেশে বান্ধিয়া দিতেছে। এই অসংখ্য লোকের মধ্যে ছয়টী পুরুষ বিষম অনর্থ ঘটাইতেছে। একজন লালসাময়ীকে স্কন্ধে করিয়া ভীষণবেগে ছুটিতেছে এবং সম্মুখে যাহাকে পাইতেছে তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া মালা গাঁথিয়া লালসাময়ীর গলায় পরাইয়া দিতেছে। একজন আরক্তিমলোচনে যাহার দিকে চাহিতেছে সেই অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছে।

স। ইংরাজী জানি, কথা বার্ত্তা কহিতে পারি, কিন্তু দেহান্তর হইলে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় ঠিক বলা যায় না।

অপর উকিল বাবু। থাক্ তাহাতে কাজ নাই, বাঙ্গালাতেই কথা হৌক। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)

স। মহাশয় আপনি কে?

উ। (নিজ নাম বলিলেন)

স। কি করেন?

উ। ওকালতী।

স। কোন আদালতে?

উ। জজ সাহেবের আদালতে।

স। কত দিন ওকালতি করিয়াছেন?

উ। পাঁচ বৎসর।

স। মিথ্যা কথা বলিবেন না। সত্য করিয়া বলিবেন। আপনি সাত বৎসর ওকালতী করিয়াছেন।

উ। হাঁ হাঁ আমি দুই বৎসর Lower Grade করিয়াছি। পাঁচ বৎসর Higher Gradeএ ওকালতী করিয়াছি।

হাঁ। তাই বলুন।

উ। আপনার মত লোকের এই বালকের পিতা মাতাকে কষ্ট দেওয়া কি উচিৎ।

স। পিতা কে?

উ। (নাম বলিলেন)

স। (ক্ষণকাল পরে চিন্তা করিয়া) হাঁ হাঁ এই সময়টা আমার স্মরণ হইতেছে। উনি কি কর্ম্ম করেন।

উ।———চাকরী।

স। ওরূপ কোন পদ নাই।

অপর উকীল। (পদের শুদ্ধ নাম বলিলেন।)

স। হাঁ, তাই বলুন। আপনি কে মহাশয়?

অপর উ। (নিজের নাম বলিলেন)

প্র উ। উনিও একজন উকীল!

স। হাঁ—হাঁ, আপনারা অনেক ভদ্রলোক এখানে আছেন দেখ্‌চি (বালকের পিতার নামোচ্চারণ করিয়া) হাঁ ওকালতী করিবার সময় ইহাঁর নাম শুনিয়াছি। উনি নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপরায়ণ। গবর্ণমেণ্টে ওঁর খুব সুখ্যাতি আছে না?

অপর উ। হাঁ।

প্র উ। তা যাই হোক এ বালকের উপর অত্যাচার কেন?

স। ও সমস্ত কথা আমি কিছু বলব না, শশী সমস্ত বলিয়া গিয়াছে।

উ। তা যাই হউক আপনাকে বালককে ত্যাগ করিতে হইতেছে।

স। শশী সমস্ত বলিয়াছে ও সে আমায় একটু অনুরোধও করিয়াছে। সে যেরূপ বলিয়াছে সেই রূপই হইবে।

উ। তা হইবে না আপনাকে যাইতেই হইবে, আপনার হাতে পৈতা দিব।

স। আমাকে পৈতার ভয় দেখাইবেন না, তা শশীকে দেখাবেন। আমি একজন ব্রাহ্মণ।

উ। আপনি ব্রাহ্মণ!

স। হাঁ।

উ। আপনার পৈতা কোথায়?

স। আছে।

উ। কই?

স। হা হা হা! আমি মরিলে যখন শ্মশানে আমার শব দাহ হয়। তখন অগ্নিতে পৈতা পুড়িয়া গিয়াছে। মহাশয় আনিতে পারিবেন?

উ। কোন্ শ্মশানে?

স। যে শ্মশানে পুড়িয়াছিলাম। সেই শ্মশানে।

উ। সে কোথায়?

স। আবার সেই কথা, পুর্ব্বে বলিয়াছি ও কথা বলিব না। আমার জেরা।

উ। তা যাই হোক্। আপনাকে বালককে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে।

স। তা যাইব।

উ। অদ্যই যাইতে হইবে।

স। তা যাইব যদি সপরিবার এই বালককে লইয়া অদ্যই বালকের পিতা এ বাটী ত্যাগ করেন।

উ। বালকের পিতা এখানে কর্ম্ম করেন। এ রাত্রে কি প্রকারে এখান হইতে যাইবেন ?

স। বালকের পিতা মাতার যাইবার প্রয়োজন নাই। (বালকের নাম করিয়া) কে অন্যত্র লইয়া গেলে আমি আমার দল বল সহ অদ্যই চলিয়া যাইব।

উ। আচ্ছা (অপর উকীলের নাম করিয়া) তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইতেছি।

স। (ঈষৎ হাস্যে) এত সহজ নয়, হুগলী সহর ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

উ। তা কেমন করিয়া হইবে ? বালক স্কুলে পড়ে উহার পড়া শুনা হইবে না।

স। ওর স্কুল খুল্‌বে কবে ?

উ। ২০শে নবেম্বর।

হুঁ আজ হ'ল ২রা নবেম্বর। তা যে দিন ওর স্কুল খুল্‌বে তার পর দিন ও এখানে আসিবে।

উ। বালক ছেলে মানুষ তা কেমন করে হবে, পিতা মাতা ছেড়ে কি করে থাকবে ?

স। তা না হলে আজ আমি যেতে পারব না।

উ। মহাশয় আমরা ঘরে সকলে ব্রাহ্মণ রহিয়াছি। আপনাকে অনুরোধ করিয়া বলিতেছি।

স। মিথ্যা কথা বলিবেন না, ঘরে সকলেই ব্রাহ্মণ নহে অপর জাতি আছে দেখুন। (ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখা গেল বাটীর শূদ্র চাকর ও অপর একজন ভদ্র কায়স্থ ঘরে রহিয়াছেন।)

উ। হাঁ ভুল হইয়াছিল ঘরে দুই জন শূদ্র আছে।

স। তাই বলুন। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)—শশী অনুরোধ করিয়াছে, তা সে যা বলিয়াছে তাহাই হইবে।

বালকের পিতা। মহাশয় শশী হল নীচ জাতি আপনি ব্রাহ্মণ বিদ্বান আপনি কৃপা করিয়া বালককে ত্যাগ করুন আপনার কাছে আমার এই নিবেদন।

স। জানেন মশায় শশে বেটা বড় বজ্জাৎ বেটা ৩টা খুন করে বেঁচে এয়েচে, বেটা চোরের শিরোমণি। যাই হক্ বেটা আমায় মান্য করে আমি তাকে বড় ভাল বাসি।

উ। মহাশয় আপনাকে ত্যাগ করে যেতে হইবে।

স। তা দেখুন আমি এক কথার লোক যা বল্‌ব তা নড়চড় হবে না।

উ। মহাশয়, আমাদের একটি অনুরোধ আছে তাহা শুনিয়া বলিবেন। বালকের পিতা মাতার উপর কৃপাদৃষ্টি করিয়া বলিবেন।

স। ডাকুন দেখি হরি ঘোষকে।

উ। কি করে ডাক্‌বো।

স। দশ বার বলুন হরি ঘোষ, হরি ঘোষ।

উ। হরি ঘোষ, হরি ঘোষ, হরি ঘোষ, হরি ঘোষ, হরি ঘোষ, হরি ঘোষ, হরি ঘোষ, হরি ঘোষ, হরি ঘোষ, হরি ঘোষ, (বালক অন্য একটি ক্ষীণ স্বরে।)

হরি। আজ্ঞা।

স। কে রে ?

হরি। আমি ঘোষজা।

স। আচ্ছা।

হ। আপনারা কে মশায় ?

উ। আমি ব্রাহ্মণ।

হ। আপনি ব্রাহ্মণ (যোড় হস্তে) প্রণাম হই।

উ। তুমি কে ?

হ। আমি হরি ঘোষ।

উ। তোমার বাড়ী কোথায় ?

হ। তা বলব না।

উ। তুমি কি করিতে ?

হ। আমি ডাকাতী করিতাম। আর সতীশ বাবুকে ছেলে বেলায় কুস্তী শেখাতাম। শেষকালে বুড় বয়সে ওঁর কাছেই চাকর ছিলাম।

উ। সতীশ বাবু তোমায় কিছু বলে দিয়ে গেলেন।

হ। হাঁ বলে গেলেন—তাই যাই হক্ আপনার নাম কি ?

উ। (নাম বলিলেন)

হ। এথানে আর কে আছেন ?

উ। অপর উকীলের নাম করিয়া বলিলেন) উনিও উকীল।

হ। ও বাবা কল্লেন কি ? আপনারা উকীল আপনাদের কাছে বলিলাম ডাকাতী করতুম। আপনাদের বিশ্বাস নেই। ধরে টরে যেন জেলে দেবেন না। সেথান থেকে পালিয়ে এসেছি।

উকীল দ্বয়। (এক যোগে) না না তোমার সে ভয় নাই।

প্র উ। তা যাই হোক্ তুমি দেথছি বুড় মানুষ তোমার ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে এবং সতীশ বাবুও তোমায় ভাল বাসেন। তুমি এ বালকের উপায় করিয়া দেও।

হ। তা মশায় বল্‌চি কর্ত্তার কথার নড়চড় হবে না তিনি বলে দিয়েছেন আজ হল বৃহস্পতিবার এই (আঙ্গুল গণিয়া) এই বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি, সোম, মঙ্গল ;—অমাবস্যার দিন তুপুর বেলা ছেড়ে চলে যাবেন আর এই কয় দিন দিনে রেতে অনেক বার আসবেন আর খুব কষ্ট দেবেন।

উ। না তা হইবে না। তুদিন থাকিয়া যাহাতে যান তা তোমায় করিতেই হইবে।

হ। মশায় যা হবে না তা আমি করতে পারবো না।

উ। (হস্তে পৈতা লইয়া) তোমার হাতে পৈতা দিব। তোমায় এ কার্য্য করিতেই হইবে।

হ। না মশায় পৈতা দিবেন না, অমন কাজ করবেন না।

উ। তবে তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে করবে।

হ। প্রতিজ্ঞা করলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম, না তিন সত্য করা হবে না। তবে আমি ভাল করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবো এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রতিজ্ঞা করিলাম (জনান্তিকে) তিন সত্য ত করিলাম। শশে বেটা যে বদ লোক সে থাক্‌তে কিছু যে হয় তা বোধ হয় না। যাহোক্ ব্রাহ্মণের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি চেষ্টা করবই। (প্রকাশ্যে) মশাই আপনি একটু বসুন আমি আসছি। বাবুর কাছে যাই।

উ। আচ্ছা।

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)

সতীশ। (অর্থাৎ বালক সতীশের স্বরে) কে রে হরি (অর্থাৎ বালক হরির স্বরে) আজ্ঞা আমি ঘোষজা।

স। সব বলে ঠিক করে এয়েচিস।

হ। আজ্ঞা। হাঁ-া-া——তবে কি তাঁরা ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক তাঁদের কষ্ট দেওয়াটা ভাল নয়। বড্ড কান্না কাটি কচ্চেন। আপনি একটু অনুগ্রহ করুন।

স। যা-যা-যা। তোর আর বলতে হবে না।

শশী। (অর্থাৎ বালক শশীর স্বরে) বস্থু ক দিন বলেছ।

স। সাত দিন।

শ। হাঁ—আমি হলে চোদ্দ দিন বলতাম, ও বেটা আবার বলতে এয়েচে ? যা-যা-যা।

স। যা বুঝয়ে বলে আসগে যা।

হ। (মাথা চুলকাইয়া) যে আজ্ঞা।

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)

হ। মশায় গো, আমি এয়েছি।

উকীল। তা তুমি শশীকে লুকিয়ে কেন বলিলে না ?

হ। সে কি মশায় আমি যে অনেক দূর গিয়ে এই সব কথা কহিছি। আপনি শুনিলেন কি করে ?

(এই সময় অপর উকীল প্রথম উকীলের গা টিপিয়া চুপি চুপি বলিলেন ও সব কথায় আর কাজ নাই।)

প্র উ। তা তুমি কি করে এলে ঘোষজা।

হ। মশায় প্রাণপণে চেষ্টা ত করিলাম কিছুই ফল হল না। শশী বেটা কাছে থাকতে কিছুই হবে না। ও বেটা বাবুকে যা বলবে বাবু তাই করবে ? ও বেটা বদমায়েসের একশেষ।

উ। তা তুমি ওকে সরিয়ে কেন কথা বললে না।

হ। মশাই, রাত্রি কালে কথা কহিলে আমরা সব শুনতে পাই ও চুপি চুপি বলিলেও শুনতে পাওয়া যায়।

উ। তা যাই হোক বাপু তোমাকে আমরা ছাড়্‌চি না তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে তোমা হইতেই এ কাজ হবে।

হ। মশায় আমার বড় কষ্ট হয়েছে যাতায়াত করতে আর পারিনে। আমা হতে আর হইবে না।

উ। তা আমরা তোমায় আর ছাড়িতেছি না তোমায় যেতেই হবে।

হ। না মশাই।

উ। না গেলে তোমার হাতে পৈতে দিব।

হ। না মশাই অমন কাজ করবেন না, করবেন না, আমি বলছি শুনুন আমি যাব একটা মতলব ঠাওর করিতেছি।

(ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ)

দেখুন মশাই, ঠিক হয়েছে। এই যেমন আপনাদের মধ্যে খাওয়া দাওয়া নিমন্তন্ন আছে তেমনি আমাদের এ যোনিতেও সেইরূপ আছে। শশে বেটা বড় ফলার ভাল বাসে। একটা মিথ্যে ফলারের ছুত করে বেটাকে এক জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে যদি কিছু কয়িতে পারি। তা আপনারা একটু বসুন আমি আসি।

(ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ)

হ। ও শশে আর ঝাউ গাছের আগায় বসে কেন, নেবে আয় এক মজা আছে।

শশী। কিরে ঘোষজা কি বলনা ?

হ। আরে আজ একটা বড় মস্ত ফলার আছে জানিস।

শ। না রে, কোথায় ?

হ। আরে ও পাড়ায়।

শ। বটে—তুই যাবিনি ?

হ। হাঁ আমি একটু পরে যাব।

শ। তা আমি এগিয়ে চলিলাম।

(ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ)

সতীশ। কে রে ?

হ। আমি ঘোষজা।

স। সব ঠিক হল ?

হ। মশাই, আমি আপনার পুরাণ চাকর আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করতে হবে, আমি আপনার পায়ে ধরে বলচি আমি ব্রাহ্মণদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে এয়েছি আপনাকে আর বালককে কষ্ট দিতে দিব না।

স। যা যা তোর আর ওকালতী করতে হবে না।

হ। আমি এত দিনের চাকর। আমার এ কথা রক্ষা করিতেই হবে।

স। (ক্ষণ কাল পরে) তা যাই হোক তুই বলচিস তখন এই রকম করলুম শোন, আমার কথা নড়চড় হবে না, এর উপর যদি কথা কোস তা হলে দূর করে দিব। তুই বলগে যা যে আর কষ্ট দেবে না, দিনে দুবার রেতে একবার যাব কষ্ট দিব না। আর একটা ওর বাপকে চুপি চুপি বলে আসিস যেন (বালকের নাম ধরিয়া) কে একলা থাকতে দেয় না, কষ্ট দেয় না যাতে সে আনন্দে থাকে তা যেন করে, এর ত্রুটি হলে আমি অত্যন্ত কষ্ট দিব।

হ। যে আজ্ঞা মশাই আর ত চলে যেতে পারিনে অনেকদূর রাস্তা।

স। যা আমার পাল্কীটে নিয়ে যা।

হ। যে আজ্ঞা।

(ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ)

হ। মশাই গো আমি এসেছি।

উ। কি করিয়া আসিলে বাপু।

(হরি ঘোষ সতীশ বাবুর আদেশ অনুযায়ী সকল কথা বলিয়া)

হ। আজি আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অনুমতি দেন ত আজ যাই।

উ। আচ্ছা আজ যাও।

হ। যে আজ্ঞা, প্রণাম হই।

(বালক গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল, দেহ ক্রমশঃ বক্র হইয়া পার্শ্ব চীৎ হইয়া শুইল ও চক্ষু উন্মীলন করিয়াই, পিতার বন্ধুগণকে দেখিয়া বলিল—আপনারা এখনও বসে আছেন। সমবেত ব্যক্তিগণ বলিলেন যে আমরা বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। বালক তাহাতে বলিল যে আমার আজ বেশ ঘুম হয়েছিল, শরীরটা এখন আমার খুব হালকা বোধ হচ্ছে।

উল্লিখিত ঘটনা গত ২রা নবেম্বর ১৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ঠিক সন্ধ্যার পর হইতে আরম্ভ হইয়া রাত্রি ১০॥০ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া হইয়াছিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীচৈতন্য এবং যিশু খৃষ্ট।

মধুরেণ সমাপয়েৎ, কোনরূপ মিষ্ট পান ভোজন দ্বারা আহার সমাপ্তির বিধি আমাদের মধ্যে প্রচলিত। শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মক্ষেত্রেও এই বিধির অনুসরণ করেন। আড়ম্বর পূর্ণ পূজা, ব্রত, হোম ব্রতাদির পরিবর্ত্তে জীবকে তিনি মধুর প্রেম রস পান করাইয়াছিলেন এবং সেই মধু স্বয়ংও আস্বাদন করিয়াছিলেন। তিনিও মধুরেণ সমাপয়েৎ করেন। বাঙ্গালা ভাষার মধুরতা এই মধু পানের আংশিক ফল। আমাদের হৃদয় এবং ভাষাকে শ্রীচৈতন্য মধুময় করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

ইংরাজী ভাষার উৎকৃষ্টতা ও অনেকাংশে যিশু দ্বারা সম্পাদিত। যিশু না জন্মিলে, ইংরাজী সাহিত্য ভাণ্ডার অনেক পরিমাণে ঘৃত তণ্ডুল শূন্য হইত। ইংলণ্ডাদি স্থানের লোকের হৃদয় তিনি কোমল মধুর করিতে পারিয়াছিলেন এবং করিতেছেন কি না তাহা ঘোর সন্দেহের বিষয়। কুরুসেড এবং অন্যান্য বহুতর ভয়ানক সমর খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রসূত।

যিশুর জীবনী লেখকের মধ্যে জন্ এবং ম্যাথিউ তাঁহার শিষ্য। "সুসমাচার" লেখক লুক চিকিৎসক, সুতরাং স্বাধীন বৃত্ত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ মুরারি গুপ্তের মুখে শুনা যায়। গুপ্ত মহাশয় তাঁহার ভক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সমকালিক আর একটি লোক বাসুদেব ঘোষ। ঘোষ মহাশয় ও শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক অনেক "পদ" রচনা করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস, শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দৌহিত্র। তাঁহার মাতা নারায়ণী দেবীর চারি বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত হওয়া এবং শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভ করা প্রকাশ পায়। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতোক্ত অনেক কথা স্বীয় প্রসূতির স্থানে শুনিয়া থাকা সম্ভব। এই গ্রন্থ ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত হওয়া অনুমানিত হয়। খৃঃ ১৫৭৩ সালের পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত লিখিতে পারেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ খৃঃ ১৪৮৫ সালে অবতীর্ণ এবং খৃঃ ১৫৩৩ সালে তিরোভূত হন। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ১৫ বৎসর মধ্যে চৈতন্য ভাগবত এবং ৫২ বৎসর মধ্যে চৈতন্য চরিতামৃত লিখিত হয়।

তৎকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ "পণ্ডিত" নামে অভিহিত হইতেন না। শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দৌহিত্র বৃন্দাবন দাসও পরম পণ্ডিত ছিলেন এবং তজ্জন্য শ্রীচৈতন্য ভাগবত অতীব শ্রদ্ধেয় এবং প্রামাণিক গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ জাতিতে বৈদ্য হইলেও বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ এবং পরম পণ্ডিত ছিলেন। যিশু খৃষ্টের জীবনী লেখক লুক চিকিৎসক বলিয়া অলৌকিক ঘটনা (miracle) বিষয়ে তাঁহার কথা অতি প্রামাণিক। মুরারি গুপ্ত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চিকিৎসক এবং স্বাধীন বৃত্ত ছিলেন। এই সঙ্গে উভয়ের পাণ্ডিত্য স্মরণ করিলে ইহাঁদের শ্রীগৌরাঙ্গ বিরচিত কথা বিশেষ বিশ্বাস যোগ্য।

জুডিয়া র্‍যাবিস অর্থাৎ পণ্ডিতদের আবাস ভূমি এবং এই জুডিয়াতে যিশু প্রসূত হইয়াছিলেন। নদীয়াও পরম পণ্ডিত পৌরাণিক এবং দার্শনিক দিগের নিবাস স্থান। এই নদীয়াতে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন। নদীয়ার রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় নৈয়ায়িক অদ্যাবধি জগতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। নদিয়ার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অষ্টাবিংশতি স্মৃতি অদ্যাবধি বঙ্গ দেশ শাসন এবং কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার বহুতর লোকের উপর আধিপত্য করিতেছে। এই সকল ব্যক্তি এবং "জগদীশের" গুরু ভবানন্দ এবং অন্যান্য পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গী এবং সমকালিক লোক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। দিধীতি গ্রন্থকার রঘুনাথ শিরোমণির কোন কঠিনতম তর্কের মীমাংসা করিয়া দিলে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে "তুমি মানুষ নও" বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্য এবং রঘুনাথ শিরোমণি উভয়েরই অধ্যাপক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে নিবাস কালে আচার্য্যের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। এই সম্মিলনে আচার্য্যের জ্ঞানগর্ব্ব চূর্ণ হইলে তিনি ভক্তি পথাবলম্বী হন এবং শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে নিজ ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখান।

জুডিয়াবাসীরা যিশুকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করেন নাই অন্যথা পক্ষে তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ দেব নদীয়ায় এবং অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত এবং পূজিত হন। তিনি স্বকার্য্য সমাপ্তির পর যথাকালে তিরোভূত হইয়াছিলেন।

অশেষবিধ সম্পত্তিশালিনী নদীয়া নগরীতে অতি শুভক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হন। ১৪৮৫ সালের ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমাতে তিনি মর্ত্তলোকে

আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চন্দ্রগ্রহণে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রোপরি পতিত হয়। উপরোক্ত দিনে ঊর্দ্ধ গগনে যাহা ঘটিয়াছিল ধরণীতলে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহেও তদনুরূপ ব্যাপার হইয়াছিল। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র দেহে পার্থিব শরীররূপী ছায়ার সম্পাত হইয়া তাঁহাকেও একরূপ রাহুগ্রস্ত করে। তাঁহাকে ভবিষ্যতে পতিত জনের পাপ তাপ স্বীয় স্কন্ধে লইতে হইয়াছিল, তাহারই পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ মলিনতার প্রতিকৃতি মানব শরীর তাঁহার অবতারের কালে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর দেহকে আবৃত করিয়াছিল।

ইংলণ্ডের কবি চসার যৎকালে ক্যাণ্টারবারি টেলস কীর্ত্তনে পার্থিব সুখ বর্ণণে মাত্র ব্যাপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস পরম পবিত্র প্রেম রস বঙ্গ দেহে সিঞ্চন করিতেছিলেন। যে স্বর্গীয় প্রেম রাজ্য শ্রীগৌরাঙ্গ জগতে সংস্থাপিত করেন তাহার অস্ফুট বার্ত্তা শ্রীগৌরাঙ্গের আসিবার অগ্রে তাঁহারা লোকের কর্ণে কহিয়াছিলেন। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যের উদয়ের ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। যিশুর আগমন বার্ত্তা জান্‌দি ব্যাপটিষ্ট অগ্রেই প্রচার করেন। জীবের উদ্ধার জন্য, জগতের হিতের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান বাসুদেব সত্বর ইহ সংসারে অবতীর্ণ হইবেন, অদৈতাচার্য্য এই সুসংবাদ গৌরাঙ্গ অবতারের অগ্রেই নদীয়ার লোককে প্রদান করেন।

অনেক অবতারেই নরদেহধারী ভগবান অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন। গৌরাঙ্গদেব কুষ্ঠীর কুষ্ঠ বিমোচন করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জামতা অমোঘ বিসূচিকা রোগে কালমুখে পতিত হইতে ছিলেন। শচী দুলালের আদেশে অমোঘ গাত্রোত্থান করত কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য এবং আত্মীয় স্বজনের চিন্তা এবং মনোকষ্ট দূর করেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের মৃত পুত্র বিষয়ে যাহা ঘটিয়াছিল তদ্‌সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিচিত্রতা আছে। যিশুর কথায় ল্যাজারাস্ পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্বীয় ভগ্নী মার্থার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকেন। কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিতের মৃত পুত্রকে শচীনন্দন কথা কহাইয়া সকলকে স্তম্ভিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত করেন। পরে পণ্ডিত পুত্র "প্রভু! আপনার নিয়ম অলঙ্ঘ্য" শ্রীচৈতন্যকে এই কথা বলিয়া "নির্ব্বন্ধিত" পুরে গমন করে। শ্রীচৈতন্য কোন প্রাকৃতিক বিধি বা নিয়ম উল্লঙ্ঘন বা বিধ্বংস করেন নাই।

যিশু ৩০ বৎসর বয়সে সাধারণ্যে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই তিনি য়িহুদীদের নিকট বিশেষরূপ পরিচিত হন। ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ তাঁহার শৈশব কৈশোর এবং যৌবন প্রারম্ভে এবং তৎপরে তিনি কি করেন তাহার সমাচার তাঁহার জীবনী লেখকেরা দেন নাই। মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট কালের সমস্ত সংবাদ আমাদিগকে দিয়াছেন। তিনি শৈশবে বহুতর লীলা খেলা করেন। তাঁহার কৈশোরের বিস্ময়কর কার্য্যের সংখ্যাও অল্প নহে। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা কালেও তিনি বহুতর অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন। দারপরিগ্রহে, পতিতোদ্ধারে, সন্ন্যাসে, নীলাচল বাসে, দাক্ষিণাত্যে এবং শ্রীবৃন্দাবন ধামে তাঁহা কর্ত্তৃক অনেক মধুর হিতকর এবং আশ্চর্য্য ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। যিশু সংসার আশ্রমের প্রধান কার্য্য দারপরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু চৈতন্যদেব তাহা করেন। আর নিদান কালে পিতা জগন্নাথ মিশ্রকে স্বীয় স্কন্ধে লইয়া তিনি গঙ্গাতীরস্থ করেন এবং সর্ব্বদা মাতা শচী দেবীর প্রতি যথোচিত প্রীতি এবং ভক্তি প্রদর্শন করেন।

অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেকের মতে এইরূপ কার্য্য দ্বারা ঐশ্বরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হয়। এটি ভ্রম। ভগবানের আজ্ঞায়, তাঁহার নিয়মে, সূর্য্য প্রতিদিন উদয়াস্ত হইতেছে। তাঁহারই আদেশে মধ্য গগনে দিনকরের গতি স্থগিত হইলে, তিনি স্বীয় সংস্থাপিত বিধির উল্লঙ্ঘন করিলেন, এরূপ বলা যাইতে পারে না। জগৎ মধ্যে জগন্নিয়ন্তা ভগবান রহিয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছায় জগতের যাবতীয় কার্য্যস্রোত একভাবে চলিতেছে। ইচ্ছা করিলে তিনি সেই ভাবের ভাবান্তর ঘটাইতে পারেন। ইহাতে বিচিত্র কি? আর ভগবান স্বয়ংই একটি পরম অলৌকিক ব্যাপার (miracle)। তাঁহাকে না বুঝিয়া তাঁহার কার্য্য কলাপ বুঝিতে যাওয়া ঘোর বিড়ম্বনা।

হারমান্ গিরিতে যিশুর দেহে ঈশ্বরাবির্ভাব হয়। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক বার ঈশ্বররূপে পরিদৃশ্যমান হন। তৎকালে তাঁহার নরদেহে শ্রীভগবান বিরাজ করিতেন এবং সেই সময় তাঁহার দেহ হইতে যে তেজঃপুঞ্জ বাহির হইত তাহা মানব নয়নে সহ্য হইত না। শ্রীবাস গদাধরাদি ভক্তবৃন্দ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন।

এক দিন শ্রীবাস গৃহে নিজ দেহে শ্রীভগবানের বিরাজ কালে নিমাই স্বীয় মাতা শচী দেবীর মাথার উপর আপন পা তুলিয়া দেন। নিমাইএর এই কাণ্ড লইয়া অনেক লোকে অনেক কথা কহিয়া থাকে। কিন্তু ব্যাপারটি একটু তলাইয়া বুঝিলে মনে কোনরূপ দ্বিধার স্থান থাকে না। নিমাইএর যে পদ তৎকালে শচী দেবীর মাথায় উত্তোলিত হইয়াছিল তাহা রক্ত মাংস অস্থি রচিত শচী দেবীর সে পুত্রের পা নহে, তাহা সেই শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম। সেই জগৎব্যাপী বিপুল পাদপদ্ম প্রতিনিয়ত শচী দেবীর মাথায় ছিল, তাহা সেই দিবস সর্ব্ব প্রথম তাঁহার শিরোপরি সংস্থাপিত হয় নাই। এই স্থানে মনে রাখা উচিত, যে সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য বাটীর বাহির হইবার অগ্রে জননীকে প্রদক্ষিণ এবং তাঁহার পদধূলী শিরে ধারণ পূর্ব্বক নিমাই বাটীর বাহির হইয়াছিলেন। উপরের কথিত কাণ্ড আশীর্ব্বাদ করণোদ্দেশে স্বয়ং বাসুদেব জগন্নাথ করিয়াছিলেন, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই তাহা করেন নাই।

যিশুর জীবনী লেখক ডাক্তার ফারার বলেন যিশুর প্রতি চাহিলেই লোকে তাঁহার দেবত্ব অনুভব করিতে পারিত। নূতন টেষ্টমেণ্ট মধ্যে যিশুর রূপের বর্ণনা নাই। নদীয়ার লোকে গৌরঙ্গ দেবকে সোণার মানুষ বলিত। পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঘোষ মহাশয় শচী দেবীর প্রাঙ্গণে শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া বলিয়াছেনঃ—

“কিয়ে হাম পেখনু কনক পুতলিয়া।” গৌরাঙ্গ দেবের হস্ত পদ যেন হিঙ্গুল রঞ্জিত, নয়ন দ্বয় পদ্মদল তুল্য আয়ত এবং সুখতারা সদৃশ উজ্জ্বল ছিল। অবিরত প্রেমবারি বর্ষণে সেই চক্ষু একটু রক্তাভ দেখাইত। সেই চক্ষের কটাক্ষ পুরুষকে পর্য্যন্ত বিমোহিত করিত। নিমাই চাঁদ স্ত্রীলোকের প্রতি চাহিতেন না। নয়ন পথে পুরুষ পতিত হইলে কুলবালাগণ যেমন কুণ্ঠিত হন, স্ত্রীলোক দেখিলে তিনি সেইরূপ সঙ্কুচিত হইতেন। কটাক্ষে মোহিত করিয়া তপন মিশ্রকে বারাণসী পাঠান এবং কেশব কাশ্মীরিকে উদাসীন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ললাটদেশ অতীব প্রশস্ত এবং উন্নত ছিল। চাচর চিকুরের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট যে, সন্ন্যাস গ্রহণ কালে তাঁহার সেই চুল তাহাকে কাটিতে হইবে ভাবিয়া নাপিতকে ক্ষুর হস্তে ক্রন্দন করিতে হইয়াছিল। নিমাই চাঁদের রক্ত মাংসের শরীর ভিতর দিয়া যেন তাঁহার ঐশিকী মূর্ত্তিটি উকি মারিত। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় ঠিক বলিয়াছেনঃ—

অঞ্চলে ঢাকিতে যায় কমলের গন্ধ।
মাণিকের ছটা কি কাপড়ে পায় বন্ধ॥

যিশুর জীবনে আড়ম্বর মাত্র ছিল না। তিনি সুস্থকায় এবং শ্রমশীল ছিলেন। তিনি যে কখন পীড়িত হইয়াছিলেন নিউ টেষ্টমেণ্ট পাঠে এরূপ অবগত হওয়া যায় না। নিজে দুঃস্থ, তিনি পরের দুঃখে দুঃখী হইতেন। তিনি পরের সন্তাপে এতদূর সন্তপ্ত, পরের শোকে এতদূর মুহ্যমান হইতেন, যে তাঁহাকে Man of sorrows অর্থাৎ আর্ত্তের বন্ধু বলা হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য ও দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার অশনে বসনে কোনরূপ আড়ম্বর ছিল না। তিনিও শ্রমশীল ছিলেন, নিয়ত কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ ছিল। তবে একবার মাত্র তাঁহার এক দিন মাত্র জ্বর হইয়াছিল। সে জ্বর অধিকক্ষণ ছিল না। তিনি মানব দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তাই এই সামান্য ব্যাপারেও একটু বিশেষ স্বাভাবিকতা, সুসঙ্গততা দৃষ্ট হয়। তাঁহার ন্যায় পর দুঃখে দুঃখী জগতে কখন উদয় হয় নাই। পর সন্তাপ সহ্য করিবার নিমিত্ত দরিদ্রের গূঢ় হৃদয়ভার বহন করিবার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি পাপী তাপীর বিনা পয়সার মুটে। বিনা বেতনে পরের বোঝা বহিবার জন্য তিনি নিয়ত প্রস্তুত। এক কথায়, তিনি “কাঙ্গালের ঠাকুর।”

শ্রীগৌরাঙ্গের যখন ২৫ বৎসর বয়স তখন তিনি সন্ন্যাস আশ্রয় এবং গৃহ ত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন তিনি গৃহে থাকিয়াও ধর্ম্মাচারণ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনা করিতে পারিতেন। সত্য ; কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষা, লোক শিক্ষার জন্য তাঁহার অবতার। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর গৃহে থাকা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। তাই শচী দেবীর অনুমতি লইয়া, বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিয়া কহিয়া তিনি গৃহ ত্যাগ করেন। জগতের মঙ্গল সাধন জন্য ব্যগ্রচিত্ত নিমাই স্বীয় ভবনের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ পরিত্যাগে দিগন্ত ব্যাপ্ত ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রশস্ত পথের পথিক হইয়াছিলেন। ভগবানের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে হয় স্বীয় প্রত্যক্ষ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা জগতে দেখাইবার জন্য পুত্র বাৎসল্য বিহ্বলা

শচী দেবী এবং পরম প্রেম-লতিকা বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারা অধ্যুষিত জগন্নাথ মিশ্রের সেই আদরের কুটীর তিনি চির দিনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করেন।

শাক্যসিংহও এইরূপ অল্প বয়সে সংসার ত্যাগী হন। ত্যাগ স্বীকার সম্বন্ধে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনে অনেকে ব্যস্ত। নিবিষ্ট চিত্তে শ্রীচৈতন্য চরিত সমালোচনায় এ ভ্রম দূর হওয়া সম্ভব। শচী দেবীর পরপর অনেকগুলি সন্তান নষ্ট হয় এবং নিমাই সন্ন্যাসের বহু পূর্ব্বে নিমাইএর অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। শচী দেবীর চৈতন্য দেব শেষ পুত্র। নিমাই শচী মাতার অঞ্চলের ধন, নয়নের মণি ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইএর পরম আদরের পত্নী নয়নানন্দ ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন সন্তানাদি হয় নাই। পতি বিয়োগে সন্তানাদি থাকিলে পত্নীর কথঞ্চিৎ সান্ত্বনার উপায় থাকে। নিমাইএর ছাত্রগণ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। স্বীয় ভক্তবৃন্দকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। নবদ্বীপে, বঙ্গের সেই পাণ্ডিত্যের সর্ব্ব প্রধান ভূমিতে শ্রীচৈতন্য নিমাই পণ্ডিত আখ্যাত হন। পণ্ডিতের পক্ষে পাণ্ডিত্যের স্থান, পণ্ডিত মণ্ডলী, ছাত্রবৃন্দও বহু আদরের, বহু স্নেহের বিষয় বটে। নবদ্বীপ সুরধনী গঙ্গাতীরস্থিত এবং জ্ঞানগর্ব্বিত আচার্য্যদের আবাস স্থান ছিল। ভাগবতের পক্ষে এরূপ স্থান অতীব আদরণীয়। আর জ্ঞানোপরি ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। নিমাইএর সেই মানস সাধন পক্ষে নবদ্বীপ অতি উপযুক্ত স্থান ছিল। নিমাইএর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে শচী দেবীর পতি বিয়োগ হইয়াছিল। সংসার ত্যাগে শাক্য সিংহ সাম্রাজ্য, সবৎসা পত্নী এবং পুত্র বৎসল পিতাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রসব করিয়াই শাক্য সিংহের প্রসূতি পরলোকগত হন। এখন দেখা যাউক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে যাইয়া নিমাইকে কি কি কঠোর কার্য্য করিতে হইয়াছিল। মৃতভর্ত্তা বৃদ্ধা শচীর তিনি অন্ধের যষ্টি ছিলেন। কোন সন্তানাদির দ্বারা বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রোড় পরিশোভিত ছিল না। ছাত্রবৃন্দ নিমাইএর পরম প্রিয় এবং ভক্তবৃন্দ তাঁহার হৃদয়ের ধন ছিল। শাক্য সিংহের সাম্রাজ্যাপেক্ষা এই সকল সম্পত্তি এবং অনেক সাধের নবদ্বীপ নগরী নিমাইএর চক্ষে কম মূল্যের কম, আদরের এবং অনুরাগের বিষয় ছিল না। পর হিতার্থে প্রকৃততত্ত্ব জ্ঞানী নিমাই লোষ্ট্রবৎ এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

যিশু, ক্যাপারনেয়াম্, নেন্, গ্যালালি, জারুজিলাম, টায়র প্রভৃতি নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। পতিতোদ্ধার, প্রেম বিতরণ জন্য, শ্রীচৈতন্য রাঢ়, বঙ্গ, দাক্ষিণাত্য, উৎকল, শ্রীবৃন্দাবন এবং অন্যান্য স্থানে গিয়াছিলেন। জীবিতাবস্থায় যিশুর শিষ্যসংখ্যা অধিক ছিল না। কিন্তু জ্ঞানী কি অজ্ঞানী শত শত লোক হরিধ্বনি করত শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী এবং পশ্চাদ্ধাবিত হইত। রাঢ়ে, বঙ্গে, উৎকলে তাঁহার ভক্তবৃন্দের সংখ্যা করা যাইত না।

বজ্রধ্বনিত আকাশ হইতে কোন অদৃশ্য পুরুষ প্রেরিত হইয়া "দশ আজ্ঞা" (The Ten Commandments) সাইনে পর্ব্বতে মোজেজের হস্তেনীত হয়। কুরান্ হাটিন্ গিরি শিরে যিশু দণ্ডায়মান এবং গিরির নিম্ন দেশে য়িহুদিগণ সমবেত। সাক্ষাৎকারে যিশুর বদন নিঃসৃত মহাবাক্য (Sermon on the mount) তাহারা শুনিল। ঈশ্বরকে বলি উপহারাদি প্রদান এবং ব্রতোপবাস করিয়া য়িহুদীরা "দশ আজ্ঞা" পালন করিত। প্রার্থনায় যিহোভা বলিয়া পরমেশ্বরকে সম্বোধন করিত। যিশু "দশ আজ্ঞা" বজায় রাখিয়া তাহাদিগকে অন্য বিধ উপদেশও দিলেন। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিতে বলিয়া দিলেন। "কোনটি প্রধান আজ্ঞা" কোনও ফ্যারাসিস্ ব্যবহারাজীব জিজ্ঞাসা করিলে যিশু বলিয়াছিলেন, "হৃদয় মন আত্মার সহিত ঈশ্বরকে প্রীতিকর, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য, ইহার উপর কার্য্য আর নাই।" এটিও একরূপ বাহিরের কার্য্য, এই প্রকার নির্দ্দেশ করত, শ্রীচৈতন্য জীবের উদ্ধার জন্য একটি অনুপম আশ্চর্য্য, অত্যুদার কথার, ব্যাপারের অবতারণা করেন। কি কর্ত্তব্য এবং সে বিষয়টি কি করিয়া নিষ্পন্ন করিতে হইবে, তাহা নিজ কার্য্য, স্বীয় ব্যবহার দ্বারা শ্রীচৈতন্য নির্দ্দেশ করেন। ঈশ্বর বাক্য, বেদ তন্ত্র মন্ত্রাদির কোনরূপ উপেক্ষা না করিয়া শ্রীচৈতন্য ভক্তগণকে বলিয়াছিলেনঃ—"আত্মা দ্বারাই আত্মাকে ধরা যাইতে পারে। পরমাত্মা ভগবানকে আত্মা দ্বারাই ধরিতে যত্ন করিবে। জগতে যে প্রেম স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে শ্রীকৃষ্ণই তাহার হরিদ্বার। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রেমিক। প্রেমিকা ভিন্ন প্রেমিককে ধরিতে পারে না। স্বয়ং পত্নী হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কর। অনুরাগের একাগ্রতায় কুলটার স্বরূপ হইয়া আপনাকে সাবিত্রীসমা করত প্রাণ, মন, দেহ সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ কর। সেই প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের রঞ্জনার্থ উত্তম

বেশ ভূষা নৃত্য গীতাদি কর। নিজে কোনরূপ কামনা করিও না। প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের গলে বনফুলের মালা দাও। তাঁহার ললাট বক্ষে শীতল চন্দন অর্পণ কর। তাঁহাকে সুখাদ্য ভোজন করাও। তাঁহাকে কোমল শয্যায় শায়িত ও তাঁহাকে ব্যজন এবং তাঁহার পদ সেবা কর। শ্রীকৃষ্ণ রাধারমণ রূপে তোমায় আলিঙ্গন করিবেন। তুমি সিন্ধু মুক্ত হইবে। সেই আনন্দ, প্রেম সাগরে নিমগ্ন, প্রবিষ্ট হইয়া তুমি সোহং হইবে।” জীব সিন্ধুর তরঙ্গ কিন্তু সিন্ধু নহে। শ্রীভগবান জীবকে আনন্দ সাগর স্বীয় হৃদয়ে লইলে সে আনন্দ স্বরূপ হইয়া সেই সাগরে মিলিত হইয়া যায়। তৈল জল মধ্যে প্রবেশ করে না। জীব সোহং অর্থাৎ সেই আনন্দময়ের স্বরূপ আনন্দভূত না হইলে মুক্ত হয় না। পরম জ্ঞানী সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন ঠিক বলিয়াছেন “চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।” আর সাধ্বী নারীর পক্ষে পতি হৃদয় ভিন্ন সমধিক বাঞ্ছনীয় কি আছে? সূর্য্যের শ্বেত রশ্মিতে অন্য সকল বর্ণই নিহিত আছে। শ্রীচৈতন্য অবতারিত এই মধুর রস মধ্যে অন্য সব রস ওত প্রোত ভাবে নিবদ্ধ। পতি পত্নীর সখা এবং গুরু। ভালবাসায় বিভোর হইয়া পত্নী কখন কখন পতির প্রতি আজ্ঞা প্রচারও করেন এবং পতিও তাহা সানন্দে প্রতিপালন করিয়া থাকেন! এই সময় স্বামী স্বীয় স্ত্রীর খাটো, অর্থাৎ ছোট হয়েন। পত্নী ভাবে প্রেমের সকল রূপেরি পুজা হইতে পারে।

“নম্রশীল, অবনত মস্তকের ঈশ্বর পুরস্কার করিবেন। তিনি ইহাদের স্বীয় ধামে লইয়া যাইবেন। অন্যে দয়া না করিলে তিনি তোমাদের দয়া করিবেন না।” এই সকল বাক্য দ্বারা যিশু লোককে বিনয়ী হইতে, দয়া করিতে উপদেশ দেন। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ। তিনি সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেনঃ—

জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন।
ইহা বই গতি নাই শুন সনাতন॥

আর রায় রামানন্দকে বলিয়াছেনঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ো সদা হরিঃ॥

প্রথম কবিতার প্রথমাংশে প্রাণী মাত্র প্রতি হিংসা দ্বেষ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই উপদেশানুসারে বৃক্ষের ফল ফুল পর্য্যন্ত সাবধানে তোলা উচিত। শুষ্ক না হইলে বৃক্ষাদি ছেদন করা এবং তাহার ডাল ভাঙ্গা অকর্ত্তব্য। এই উপদেশ সম্বন্ধে “থালীর ভিতর হাতী” এই কথার প্রয়োগ হইতে পারে। “জীবের হিংসা করিও না” এই একটি নীতিবাক্য মধ্যে সমস্ত নীতিশাস্ত্র সন্নিহিত হইয়াছে। এই একটি নীতি প্রতিপালনে সমস্ত দণ্ডবিধির সম্যক সম্মান রক্ষা করা হয়। সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষ ভিন্ন অন্যের মুখ হইতে এরূপ উদার অতি প্রশস্ত নীতি বাক্য বাহির হওয়া সম্ভব নহে। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা এবং শ্রীহরি কীর্ত্তন করিতে হইবে উক্ত বাঙ্গালা কবিতার শেষ ভাগে এবং সংস্কৃত শ্লোকে তদ্বিষয় কথিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন, নরগণ তোমরা শ্রীকৃষ্ণ নামে রুচি কর, তোমাদের মুক্তি হইবে। বিষয়াসক্তি-ব্যাধিতে আমাদের শ্রীকৃষ্ণ নামে অরুচি, তাই শ্রীচৈতন্য সেই নামে রুচির বিধান করিয়াছেন। মানুষের নাম, নামধারীর আবরণ মাত্র, আমের খোসার স্বরূপ। আমের খোসায় রুচি জন্মিলে আম যে কি রুচিকর, মধুর লাগে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই জিহ্বায় অগ্রে কৃষ্ণনাম লইবার বিধান। কৃষ্ণ নামে রুচি হইলে তাহা মধুর লাগিলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে কত মধুর লাগিবে তাহা বলা বাহুল্য। শ্রীকৃষ্ণলাভের আর একটি সোপান বৈষ্ণব সেবা। আমি তোমাকে ভাল বাসিলে তোমার পরিজন ভৃত্যগণকে আমার ভাল বাসিতে হইবে। ইহা না করিলে তোমার প্রতি আমার অনুরাগের পুর্ণতা হয় না। সেবকগণ ভগবানের আত্মীয় অথবা প্রিয় ভৃত্য। বৈষ্ণব সেবা ব্যতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয় না। ভক্তপ্রিয় শ্রীচৈতন্য তাই বৈষ্ণব সেবার বিধান করিয়াছেন। অপরন্ত সাধুকৃপা সাধূপদেশ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অবগত হওয়া সুদুর্লভ।

তৃণাপেক্ষা তুচ্ছ সামান্য পদার্থ আর নাই। ইহা রস শূন্য শুষ্ক, সকলের পদ দলিত। সময়ে লোষ্ট্রের প্রয়োজন হয় কিন্তু একটি তৃণের কেহ কোন খবর রাখে না, তাহার কোন অনুসন্ধান করে না। তৃণ সামান্য বায়ুতে উড়িয়া যায় এবং ঝাঁটার যোগে কোথায় নিক্ষিপ্ত হয় তাহার ঠিকানা থাকে না। তরুসম কাহারো সহিষ্ণুতা নাই। বজ্র, বারি, রৌদ্র, তরু সকলি

শিরে ধারণ করে। তরু কুঠারাঘাত ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করে। তৃণ সম হীন এবং তরুর মত সহিষ্ণু হইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিবার কারণ শ্রীচৈতন্য উপদেশ দিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, আপনাকে একবারে মানহীন মনে করিয়া ও মানীর সম্মান করিয়া পরে হরি সংকীর্ত্তন করিবে। ঈশ্বরার্চ্চনা সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা উচ্চ সারবান কথা, কেহ বলিয়াছেন কি না তাহা সন্দেহের বিষয়।

শ্রীচৈতন্য যেরূপ বলিয়াছেন সেইরূপ নীচ, বিনয়ী নম্র এবং সহিষ্ণু না হইলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন শ্রীকৃষ্ণ লাভ দুষ্কর। "অস্মদ" শব্দ একবারে পরিত্যাগ করত ভবৎ অথবা যুষ্মদ্ শব্দের ব্যবহার সাবধানে এবং দৃঢ় ভাবে আরম্ভ করা উচিত। এইরূপ করিলে, এবং আমি কিছুই নয়, তিনিই সব, এইরূপ নিশ্চয় ভাবিতে এবং স্থির বিশ্বাস করিতে পারিলে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহে সমর্থ হওয়া যাইতে পারে।

আদিম পাপে মানুষের আত্মা কলুষিত। এই মলা দূর হওয়া চাই। স্বীয় স্কন্ধে পাপভার লইয়া যিশু পাপীর পরিত্রাণের বিধান করিয়াছেন। এই সকল খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রধান কথা। প্রায়শ্চিত্তাদির কার্য্যকারিতার বিচার দূরে রাখিয়া আমরা নয়ন ফিরাইলেই দেখিতে পাই যে নদীয়ানাথ শচী-দুলাল চৈতন্য দেব আমাদের পাপভার নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য প্রস্তুত।

প্রাণ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে যিশু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেনঃ— "জগদীশ্বর! তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিলে?" ইহার অর্থ এই, যে মৃত্যু সময়ে যিশু আদম সুতদের পাপভার লওয়ায় তিনি তৎসময়ে অপবিত্র এবং তজ্জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। জগাই মাধাই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যকে আপনাদের সমস্ত পাপ উৎসর্গ করিয়া দিলে তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিলেন। সকলে দেখিল যে অমনি শ্রীগৌরাঙ্গের সোণার বর্ণ কাল হইয়া গেল। আমার একাত্মা কাত্যায়নী স্বামীর একটি গীত নিম্নে উদ্ধৃত করত প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

খাম্বাজ। একতালা।

এমন দয়াল হবে কেবা আর।
প্রেমের অবতার॥

ক'রলে প্রহার, হেঁসে তুলে,
দেয় গলে প্রেমেরই হার॥
দন্তে তৃণ কুটা ধরি, বলে ও ভাই বল হরি,
দুবাহু পসারি চায়
নিতে পাপীর পাপের ভার॥
প্রেম বিনে শুকায় ধরা, দেখি গৌর প্রাণে সারা,
গোলক হতে প্রেমের ধারা, এনে ভাসালে সংসার॥

সরস্বতী।

(সংকীর্ত্তন)

১।

আয় মা দেবি সরস্বতি! জ্ঞান স্বরূপিনি! আয়!
[ওমা!] নির্ম্মল আলোকে ধরা, আলোকিয়া আয় মা আয়।

২।

বসন্ত পঞ্চমী শোভা,
অঙ্গে তব মন লোভা,
[ওমা!] বসন্তের রবিশশী শ্বেত বর্ণে শোভা পায়,
নীল নভঃ নীল কেশ ইন্দুমুখি! আয় মা আয়!

৩।

নবীন কুসুম প্রাণ,
নবীন কোকিল গান,
[ওমা!] নবীন মলয় শ্বাসে আনন্দ ঢালিয়া আয়,
নব বসন্তের পুষ্পে পুষ্পময়ি! আয় মা আয়!

৪।

এক করে পুস্তক মার,
অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার,
[ওমা!] শোভে অন্য করে বীণা, বীণাপাণি আয় মা আয়!
সঙ্গীত সাহিত্য শিল্প প্রসবিনি আয় মা আয়!

৫।

জ্ঞানপদ্ম নিরমল,
শ্বেতদল শতদল,
[ওমা !] শোভিছে চরণ তলে, শ্বেতাব্জ বাসিনি ! আয় !
জ্ঞানালোকে শুভ্রকান্তি শ্বেতভুজে আয় মা আয়।

৬।

ভারতে মা কত কাল,
জ্ঞানপুর্ণ সুবিশাল,
[ওমা !] খোলে নাই এই কাব্য বাজেনি এ বীণা হায় !
খুলিলে না আর কি কভু আর কি বাজিবেনা হায় !

৭।

এ হেমন্ত করি অন্ত,
সঞ্চারি নব বসন্ত,
[ওমা !] খুলিয়া তোর মহাগ্রন্থ বীণা বাজাইয়া আয় !
প্রেমের পলাশ পুষ্পে চরণ পূজিব আয় !

নবীন।

সংকীর্ত্তন ;—রসোদ্গার।

বৈষ্ণব সাধক যখন ঈশ্বর কৃপার মধুরিমা আস্বাদন করিয়া বিভোর হয়, যখন তাঁহার গুণ স্মরণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হয়, তাঁহার প্রেম অনুভব করিয়া আত্মহারা হয়, তখন কোন কৃষ্ণানুরাগী সুতরাং সহানুভূতিশালী মরমের মানুষের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, ঈশ্বরের গুণের, প্রভুর কৃপার, দয়িতের দয়ার, প্রাণ চোরের স্নেহের যে পরিচয় দিতে থাকে, তাহাকে কীর্ত্তনের ভাষায় “রসোদ্গার” বলে। সে যখন দেখে যে দয়াময়ের দয়ার অবধি নাই, তাঁহার স্নেহের ইয়ত্তা নাই, তাঁহার গুণের সীমা নাই, তখন তাহার হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। তাহার প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া পড়ে। তখন সে সতঃই কোন ব্যথার ব্যথীকে লইয়া প্রভুর গুণের পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারে না। সুখের কথার অংশী জুটিলে

সুখ দ্বিগুণিত হয়, আনন্দের সাগর উথলিয়া উঠে। নবপ্রণয়িণী যেমন একজন মর্ম্মসখীর নিকট আনন্দে গদগদ হইয়া নিজ প্রাণপতির কেলি বিলাসের কথা, প্রাণবঁধুর আদরের কথা বলিতে থাকে, সাধক বৈষ্ণবও ঠিক তাই করে। প্রাণবঁধুর কথা গরব করিয়া না বলিলে যেন সুখের অপূর্ণতা হয়। সে দেখে প্রাণবল্লভ তাহাকে কত যত্নে রক্ষা করেন, কত আদরে, কত স্নেহে পালন করেন। তিনি তাহাকে পিপাসায় সুশীতল সলিল প্রদান করেন, আতপে ছায়া দেন, ক্ষুধায় আহার প্রদান করেন, শান্তির পর বিশ্রামদায়িনী নিদ্রা দেন। শুধু তাহাই নয়, সংসারের ঘোর বিভীষিকায় অভয় দেন ; পাপের তাড়নায়, রিপুর শাসনে, ঘোর যন্ত্রণার মধ্যে একবার প্রাণ ভরিয়া “দয়াময় হরি” বলিয়া ডাকিলেই পরম শান্তি, পরমানন্দ প্রদান করেন। তিনি ভক্তকে অসংখ্য বিপদে রক্ষা করেন, প্রলোভন হইতে দুরে রাখেন, পদে পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি যেন হাতে ধরিয়া তাহার নিরাকরণ করেন। তিনি ভক্তের পায় কাঁটা ফুটিতে দেন না ; অগ্র পশ্চাৎ যেন স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিপদ প্রলোভন, ক্লেশ যাতনাকে যেন ভক্তের অঙ্গ স্পর্শন করিতে দেন না। সে মনে বুঝিয়া দেখে যে প্রভু যেন ঠিক তাহাকে আপন বক্ষোদেশে রক্ষা করিতেছেন। সে বেশ বুঝিতে পারে যে দয়াময়ের দয়ার উৎস সর্ব্বদা ছুটিতেছে, প্রেম পিযূষের প্রবাহ অবিরত চলিতেছে, স্নেহের ধারা অবিশ্রান্ত বহিতেছে। সে তাহার পূর্ব্বের অবস্থার সহিত তাহার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া দেখে তাহার জীবনে কি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তখন সে প্রেমাবেশে, হৃদয়ের আবেগে ঢলিতে ঢলিতে বলে, “সখিরে, আমার বঁধুর গুণের কথা কি বলিব ? একটী গুণ হইলে বলিতাম কিন্তু একটী বলিতে আরম্ভ করিলেই তাঁহার কোটী গুণ মনে উদয় হয়। কোন্‌টী রাখিয়া কোনটী বলিব ? বিধাতা যে একটী বই মুখ দেয় নাই। আমার বঁধুর গুণ আমাকে দিয়াই কেন দেখ না ? আমি আগে কি ছিলাম, এখন কি হইয়াছি। আগে ঘৃণিত লোহা ছিলাম এখন আমি সোণা হয়েছি।”

“ প্রেম কলপ তরু, আমার বঁধুয়া গো,
এমন পিরিতি কেবা জানে।

এক গুণ কহইতে, কোটী গুণ দেয়ই,
এমন না দেখি ত্রিভুবনে ॥
পিরিতি মূরতি মোর পিয়ে।
প্রতি অঙ্গে প্রেমরস, ঝরিয়ে পড়য়ে গো,
পিরিতি গঠিত তাঁর হিয়ে ॥"

অথবা ;—

"ওগো আমার বঁধু সে পরশ মণি।
সে অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার,
সোণার বরণ খানি ॥
কত না আদর, জানয়ে নাগর,
কত উঠে তার মনে।
পালঙ্ক শয়ন, না জানি কেমন,
বঁধুর হৃদয় বিনে ॥

অথবা ;—

"নব নব গুণ গণ, শ্রবণ রসায়ন,
নয়ন রসায়ন অঙ্গ !
রভস সম্ভাষণ, হৃদয় রসায়ন,
পরস রসায়ন অঙ্গ।
এ সখি রসময় অন্তর হার।
শ্যাম সুনাগর, গুণগণ আগর,
কো ধনী বিছুরয়ে পার ॥

সে কখন কখন অনুরাগভরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলে "সখি, কৃষ্ণ বিমুখ জনের জীবন যে এত ভয়ানক তাত জানিতাম না। এমন দয়ার সাগর, প্রেমের পারাবার কৃষ্ণে যাঁহার মতি হইল না সে কেন জন্মিয়াছিল ? সে কেন বৃথা দেহভার বহন করিয়া মরে ?"

"বংশী গানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন ;
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ?

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে ;
কাণাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হইল অকারণে ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত,
সুধাসার স্বাদ্ বিনিন্দন ;
তার স্বাদ যেনা জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম ॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥
কৃষ্ণ কর পদতল, কোটী চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শ মণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারে খার,
সেই বপু লৌহসম জানি ॥"

প্রেমিক বৈষ্ণব আবার খানিক এইরূপ নীরবে কাঁদিয়া বলে "ছি! আমি একি বিড়ম্বনা করিতেছি! আমার কৃষ্ণের প্রেম, আমার প্রভুর দয়া আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি কোটী কোটী জন্ম সে প্রেম আস্বাদন করিলেও তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব না। তাহার কণা স্পর্শে যখন অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড মুগ্ধ ও বিভোর হয়, তখন ছার কীটাণুকীট আমি তাহার স্বরূপ বুঝিব কি করিয়া ? সে প্রেম যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন ! সে অমিয় সাগররূপ রাশিতে যখনই নয়ন দিই তখনই মনে হয়, সে রূপের মাধুরী যেন কখনও দেখি নাই। সেই অমৃত নিস্যন্দী মধুর বচন যতবার শুনি, ততবারই মনে হয় যেন কখনও সে বচন আমার শ্রুতিপথে প্রবেশ করে নাই। কতবার প্রাণবল্লভকে হৃদয়ে রাখিয়া চরণ সেবা করিয়াছি কিন্তু মনে হয় হৃদয়ের আশা যেন মিটিল না, হিয়ার তাপ যেন প্রচুর পরিমাণে জুড়াইল না !"

বৈষ্ণব কবি এই ভাব বুঝিয়া গাহিয়াছেন ;—

সখি ! কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি, অনুরাগ বাখানিতে,
তিলে তিলে নুতন হোয়।
জনম অবধি হাম, রূপ নেহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল, শ্রবণ হিঁ শুননু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী, রভসে গোঁয়াইনু,
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।”

বৈষ্ণব ভক্ত বলে “আমি কৃষ্ণ প্রেমের মহিমা বুঝি না, বুঝিতে কখনও পারিব না ; তবে এই মাত্র জানি ;”——

“কানু সে জীবন, জাতি প্রাণ ধন,
এদুটী নয়নের তারা।
পরাণ অধিক, হিয়ার পুতলী,
তিলেক বাসিয়ে হারা।
গঞ্জে গুরুজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে, অঙ্গ বেচিয়াছি,
তিল তুলসী দিয়া।

ক্রমশঃ।

নিশীথ চিন্তা।

(জাহ্নবী তীরে)

১

বসিয়া জাহ্নবী তীরে নিশীথ সময়,
হেরি গগনের ছবি বিস্তৃত আকাশে,
শশীসহ তারাদল অসংখ্য অযুত,
স্বশরীর চির-জ্যোতি মরতে প্রকাশে।

২

নিম্নে ভাগীরথী শশি-প্রেম-ভিখারিণী,
ধরেছে সে চারু ছবি হৃদয় উপরে,
আসি নৈশ সমীরণ, বিলাস-তৎপর,
তটিনীর স্থির বক্ষ তরঙ্গিত করে।

৩

দুই তীরে তরুরাজি, চাঁদের কিরণে,
কৃষ্ণবর্ণ রেখা দুটী যেন মনে হয়,
যতদূর চলে দৃষ্টি, ক্রমে সেই খানে,
মিলেছে আকাশ, নদী, নক্ষত্র নিচয়।

৪

কেবলি চাঁদের আলো যে দিকে নেহারি,
কিবা স্থল, কিবা জল, কিবা নীলাকাশ,
বসুধা রজতময়ী, কোন যাদু-করে
এ হেন রূপের রাশি করেছে প্রকাশ ?

৫

বহু দিন পরে আজি প্রকৃতি সুন্দরি !
উদিছে মানসে মম বিগত কাহিনী,
নানা রঙে, নানা চিত্রে, হইত না যাহা,
না হেরিলে তব মুখ ভুবন মোহিনি !

৬

হেরি তব চন্দ্রমুখ লো চারু প্রকৃতি !
আর এক চন্দ্রানন উদিছে অন্তরে,
উষার মধুর কান্তি বরাঙ্গে যাহার,
গোলাপ কপোলে যা'র, গোলাপ অধরে।

৭

দেহের জীবন সম ছিল সে আমার,
না হেরিলে ক্ষণ তারে হতাম অস্থির,
হায় ! সে আমারে এবে গিয়াছে ত্যজিয়া,
শূন্য করি রেখে গেছে হৃদয়-মন্দির।

৮

কত দিন হ'ল গত দেখিতে দেখিতে,
তবু সে দিনের কথা বলি মনে লয়,
দুর্নিবার কাল স্রোতে কত ভেসে গে'ল,
এখনো সে সব যেন তবু বোধ হয়।

ক্রমশঃ।

কুরুক্ষেত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ষষ্ঠ সর্গ।

এ সর্গের নাম কুরুক্ষেত্রে পুঁতুল খেলা। এ সর্গের সহিত উপাখ্যান ভাগের কোন সম্বন্ধ নাই। বধূ উত্তরার, সরল হৃদয়ের একটি সুন্দর ছবি এই সর্গে চিত্রিত হইয়াছে। তিনি শ্বশুরের প্রতি কিরূপ স্নেহ ও ভক্তি পরায়ণা তাহারও দৃষ্টান্ত এই সর্গে আছে। ভীষণ যুদ্ধ ক্ষেত্রেও সরলা উত্তরা, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের আনন্দ প্রতিমা বা শান্তি-প্রদায়িনী দেবী হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। ইহাই এ সর্গের মূল কথা। স্থানে স্থানে বর্ণনাগুলি অতি সুন্দর। কিন্তু বউ মার শ্বশুর শাশুড়ী ও শ্রীকৃষ্ণের কাছে পুঁতুল খেলাটা কেমন কেমন দেখায়; কেননা, তিনি তখন নিতান্ত

বালিকা ছিলেন না। আর চুম্বনের ছড়াছড়িটে একটু বুঝে সুজে হইলে ভাল ছিল। বউমা যখন পুঁতুল খেলা করিতেছেন ও শ্বশুরকে চুম্বন দান করিতেছেন, তখন বউমা পোয়াতি! তবে "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।"

সপ্তম সর্গ।

এই সর্গের নাম দাবাগ্নি। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে জরৎকারুর হৃদয়ে যে ভীষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল তাহারি দৃশ্য এই সর্গে চিত্রিত। পাঠক জরৎকারুর পরিচয় পঞ্চম সর্গে পাইয়াছেন। এখন কবিবর্ণিত দুর্ব্বাসার পরিচয় দিই। দুর্ব্বাসা কুটিল ব্রাহ্মণ, বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের অগ্রণী। শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে উদ্যোগী, দুর্ব্বাসা তাহার বিষম বিরোধী। সুতরাং দুর্ব্বাসা শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রভূত বলশালী, ভারতের সমগ্র রাজাদিগের পরিচালক, দুর্ব্বাসা তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্ব্বাসার অভিসন্ধি এই যে কোন উপায়ে ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস করেন, ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস হইলে তিনি অনার্য্যরাজ বাসুকিকে অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ আধিপত্যের পুনরুত্থান করেন। এই উদ্দেশেই তিনি আর্য্যাবর্ত্ত ছাড়িয়া আসিয়া দক্ষিণারণ্যে বাস করিতেছেন, বাসুকির সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার ভগ্নী জরৎকারুর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, বাসুকির সহিত নানা প্রকার গুপ্ত মন্ত্রণা করিতেছেন, তাঁহাকে গুপ্ত চর করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সংবাদ লইতেছেন। বাসুকির মুখে ভীষ্মের শরশয্যার কথা শুনিয়া ভাবিলেন, সেই উপলক্ষে কুরু পাণ্ডবের সন্ধি হইতে পারে। তাহা হইলে আর ক্ষত্রকুল বিনাশ হইবে না, সেই আশঙ্কায় যাহাতে সন্ধি স্থাপন না হয়, তাহার চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। কর্ণ দুর্ব্বাসার বড় অনুগত, দুর্ব্বাসা বাসুকির দ্বারায় কর্ণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জরৎকারু সে কথা শুনিলেন। নিরন্তর পর্য্যটনে ভ্রাতার শরীর ক্লিষ্ট, সেই জন্য স্নেহ পরায়ণা ভগ্নী তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া, নিজে কর্ণের নিকট চলিলেন, একান্ত বাসনা এই উপলক্ষে একবার শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আসেন। এ সর্গে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। কোন্ স্থান ফেলিয়া, কোন্ স্থান উদ্ধৃত করিব, তাহা আমরা সহজে স্থির করিতে পারি না।

দুরাশার ক্ষীণালোকে চলিয়াছে কারু,
পাণ্ডব-শিবির-মুখে ধীরে বিষাদিনী !

ছাড়ি অলক্ষিতা, অঙ্গপতির শিবির।
শবে ভগ্নরথ কাষ্ঠে, স্খলিত চরণ,
হইতেছে পদে পদে, নাহি জানে বামা ;
ছুটিতেছে চারি দিকে নৈশ পর্য্যটক,
মাংসাহারী হিংস্র পশু, না দেখে নয়নে,
বিকট চীৎকার স্থানে স্থানে পশুদের,
বীরকণ্ঠ উচ্চ হাসি, উচ্ছৃঙ্খল গীত,
সৈনিকের স্থানে স্থানে উঠিছে ভাসিয়া,
নৈশ নিরবতা বক্ষে রহিয়া রহিয়া,
না শুনে শ্রবণে বামা, খর-চিন্তা-স্রোতে
ছিন্ন লতাসম কারু চলেছে ভাসিয়া।

যাইতে যাইতে ভাবিতেছেন—

আসিলাম কুরুক্ষেত্রে,—কুরুক্ষেত্রে যথা
বিরাজিছে অভাগীর হৃদয় ঈশ্বর
অঙ্গের বাতাস তাঁর অঙ্গের সুবাস !
সেই ফুল্ল কম্বুকণ্ঠ,—বহু দিন শ্রুত
নিশীথ নির্জ্জনে দূর বাঁশরীর রব,—
ভেবেছিনু মনে, বহি নৈশ সমীরণে
জুড়াইবে হায় ! এই প্রাণের উচ্ছ্বাস।

অনুসন্ধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শিবির চিনিয়া লইলেন,—দেখিলেন শিবির দ্বারে নীল সূর্য্যরশ্মি এক আলোক জ্বলিতেছে—

ভাবিলেন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন, ওই যেন তিনি শিবির অভ্যন্তরে সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক অঙ্কে শায়িত রহিয়াছেন।

দেখিলেন—জলধি যেন পূর্ণ শশধর !

আর ভাবিলেন—

কিবা অঙ্গ ভঙ্গিমায়,   মহিমা ভাসিয়া যায়,
কিবা বক্ষঃ মহিমা পূরিত !
মহিমা নয়নে ভাসে,   মাহমা অধরে হাসে,
বীরকণ্ঠে মহিমা সঙ্গীত॥

পূর্ণচন্দ্র বিভাসিত,   সুনীল আকাশ সম,
কি ললাট মহিমা-দর্পণ !
যৌবনেয় পূর্ণতায়,   উচ্ছ্বসিছে মহিমায়,
রমণীর কি স্বর্গ স্বপন !
দুরাকাঙ্ক্ষা কুহকিনী,   বলেছিল এক দিন,
সেই সর্গ হইবে আমার !
আমি অতি দীন হীনা,   পাইব হীরক মণি !
চকোরী পাইবে সুধাসার !
যদি নাই পাইলাম,   কেন নাহি মরিলাম,
হায় নাথ ! চরণে তোমার।
জীবন স্বপন সহ,   জীবন না পোহাইল,
জ্যোৎস্না হইলে অন্ধকার !

জরৎকারু শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকে ভাল বাসিয়া ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় মাধুর্য্যকে ভাল বাসিতে পারেন নাই। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে মহিমা দেখিতেছেন, ললাটে মহিমা দেখিতেছেন, নেত্রে মাহমা দেখিতেছেন, ওষ্ঠে মহিমা দেখিতেছেন, কণ্ঠে মহিমা অনুভব করিতেছেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ মহিমার অবতার। যে দুজনের মধ্যে কেবল মহিমাই লক্ষ্যস্থল, সে দুজনের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। যেখানে পিরীত সেখানে মহিমাবোধ থাকে না। তাই রাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা বলিতে গিয়া কি বলিয়া ফেলিলেন, পাঠক শুনুনঃ—

সুধা ছানিয়া কেবা,   ও সুধা ঢেলছে গো,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।

অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা,   খঞ্জন আনিল রে,
চাঁদ নিঙ্গারি কৈল মেহা॥

সে মেহা নিঙ্গাড়ি কেবা,   মুখ বনাইল রে,
জাবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।

বিম্ব ফল জিনি কেবা,   ওষ্ঠ গঠলরে,
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড॥

কম্বু জিনিয়া কেবা, কণ্ঠ বনাইল রে,
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাথিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে,
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা, রতন বনাইল রে,
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম-কুসুমে কেবা, সুষমা করিছে রে,
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আদলি উপরে কেবা, কদলি রোপল রে,
ঐছন দেখি উরু যুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা, দর্পণ বসাইল রে,
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ॥

জরৎকারু শ্রীকৃষ্ণকে ধরিতে না পারুন, তাঁর ছায়া ধরিয়াছেন বটে। যখন ছায়া ধরিয়াছেন, তখন আসল খুঁজিয়া পাইবেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভাবিতে ভাবিতে কল্পনা বেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, শিবিরের দিকে ছুটিতে গেলেন, পারিলেন না, ছিন্ন পাতার ন্যায় পড়িয়া গেলেন। তখন কাতর কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী। জগৎকারুর প্রতি করুণার উদয় হইল। জরৎকারু সহসা অদূরে সুমধুর কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন। ত্রিদিব সঙ্গীতে প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইল, পারিজাত পরিমলে নৈশ সমীরণ প্লাবিত হইল, জরৎকারুর চক্ষে শান্ত সুশীতল স্বর্গ খুলিয়া গেল, জরৎকারু মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। জরৎকারু কি দেখিলেন, কি শুনিলেন, কেন মূর্চ্ছিতা হইলেন, তাহা কবি কিন্তু খুলিয়া বলেন নাই। ভাবে বুঝিলাম, জরৎকারু যে মহিমার ছায়া দেখিয়া উন্মত্ত, সেই মহিমার পূর্ণার্ণব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, কাজেই জরৎকারু সে মহিমা সহ্য করিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। বহু দিন পরে সহসা দেখা হইল বলিয়া মূর্চ্ছা হইল বলিলে, জরৎকারুর প্রেম সামান্য রমণী প্রেম হইয়া পড়ে সুতরাং তাহা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

ক্রমশঃ।

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

১ম ভাগ—১২শ সংখ্যা। চৈত্র—১৩০০।

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ঃ—

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীরসময় মিত্র, এম্, এ; শ্রীরামগোপাল ঘোষ, বি, এল; শ্রীসাগরচন্দ্র শূর; শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিষয়। পৃষ্ঠা।
১। অশান্তি ৩৫৩
২। সংকীর্ত্তন ;—মান ৩৬১
৩। নিশীথ চিন্তা (পদ্য) ৩৬৮
৪। ভারতবর্ষে বাণিজ্যের আশা ৩৭০
৫। কুরুক্ষেত্র ৩৭৭

হুগলী,
সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চৈত্র—১৩০০।

এই সংখ্যার মূল্য ⁄১০ দেড় আনা।

পূর্ণিমার গ্রাহকগণের নিকট নিবেদন।

মহোদয়গণ——

আপনাদের অনুগ্রহে পূর্ণিমার এক বৎসর বয়স হইতে চলিল। আপনারা এই সময়ে স্বীয় দেয় মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা উৎসাহের সহিত দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। পূর্ণিমা যে ভাবে পরিচালিত হইয়াছে তাহা আপনারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—এস্থলে অধিক কিছু বলা অনাবশ্যক। স্থানীয় বলে পত্রিকা খানি স্থায়ী হইবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্ণিমা নিজের প্রেসে মুদ্রিত হয়। উহার লেখকগণ অধিকাংশই স্থানীয়। গ্রাহক সংখ্যাও আশাতিরিক্ত হইয়াছে। এই জন্য আমরা ভরসা করি যে পত্রিকা খানি স্থায়ী করিতে পারিব। সদাশয় গ্রাহকগণ যথা সময়ে মূল্য প্রেরণ করিলে কোন ভাবনাই থাকে না, আমরা সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্য সাধন করিতে পারি। পূর্ণিমার যেরূপ সামান্য মূল্য তাহাতে গ্রাহকগণ একটু মনে করিলেই আর বাকি পড়ে না, পত্রিকারও যথেষ্ট উপকার করা হয়। আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে যাঁহারা অদ্যাপি মূল্য প্রেরণ করেন নাই, তাঁহারা আর বিলম্ব করিবেন না।

নিবেদক শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ,—হুগলী।

Successful Competition-Essays for the K. C. G. Gold Medal of the Chaitanya Library and Beadon Square Literary Club.

BY

BABU KAILAS CHUNDER KANJILAL, B.L.

Prospects of our Young Men, price As. 3.
Postage 6 pie.

The Poverty of India—Its causes and remedies,
Price As. 4. Postage 6 pie.

The above Essays have been favourably reviewed by the Press and contain mature thoughts on momentous questions affecting the public interest.

To be had at the Sabitri Press, Hugli.

HARI DASS PAUL,
Publisher.

সূচী পত্র।

বিষয়। লেখকের নাম। পত্রাঙ্ক।
অদ্ভূতে বিশ্বাস (শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্) ২১২।২২৫।২৯৫।৩২১
অমিয় নিমাইচরিত (শ্রীনবীনচন্দ্র সেন) ৬১।৬৫
অনুতাপ (শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল) ১৫৩
অশান্তি ঐ ৩৫৩
অদৃষ্টবাদ (পণ্ডিত শ্রীরামচরণ শর্ম্মা) ২৫৭
আবাহন (শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ৩৩
আমাদিগের শিক্ষা (শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল) ১৩৩
আমি তোর এত কি সুন্দর (শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ১৫৮
ইচ্ছাচার (শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল) ১৬৯
ইসারা (শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার) ৪
ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ (শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বি, এ) ১৭৯
উচ্ছ্বাস (শ্রীঅক্ষয়কুমার শূর এম, এ, বি, এল) ৯৫
একটী পুরাতন কথা (শ্রীরামগোপাল ঘোষ বি, এল) ৮৯
এক রজনী (শ্রীদাশরথি ঘোষ এম, এ, বি, এল) ১২০।১৩৮।১৭৫
কালীপ্রতিমা (শ্রীদীননাথ ধর বি, এল) ২৪১
কুরুক্ষেত্র (শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ২৪৫।২৪৭,৩১৮।৩৪৮।৩৭৭
গান (শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার) ৯৫
গান (শ্রীদীননাথ ধর বি, এল) ১৫২
গান (শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ১৮৭
গান (শ্রীদীননাথ ধর বি, এল) ৬১৭
গৌরগীতি (শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ৯৬
চন্দ্রগুপ্ত (শ্রীআশুতোষ আঢ্য বি, এল) ১১১
চিত্তবৃত্তি নিরোধ (শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল) ১১৫।২৮০
জিজ্ঞাস (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম, এ, বি, এল) ২০৪
জ্যোতিষ প্রবন্ধ (শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ) ৫৩।৬৮

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ। চৈত্র, সন ১৩০০ সাল। ১২শ সংখ্যা।

অশান্তি।

ভাবিয়া দেখিলে অশান্তির ছায়া যেন জগতে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বাহিরের উল্লাস শোভার অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় অশান্তি বহিয়া যাইতেছে। কেমন সুন্দর ফুলটী ফুটিয়া আছে—ভিতরে কীট। কেমন মেঘদলে আকাশ পরিবৃত হইয়াছে—উহার অন্তরালে অশনির সংহারক বহ্নি জ্বলিতেছে। কলঙ্কের রেখা বুকে করিয়া আকাশের চাঁদ তেমন প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারিতেছে না। সুস্থির সলিলোপরি সুবিমল শশাঙ্ক প্রতিভাত—অভ্যন্তরে মকর কুম্ভীরাদি ক্রীড়া করিতেছে। সাগর বক্ষে অপূর্ব্ব লহরীলীলা—ভিতরে বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত। মানুষ এ জগতে আসিয়া চারি দিকে এই বৈষম্য ভাব দেখিয়া স্বয়ং তাহার পরিচয় দিতেছে। মানুষ কত হাসিতেছে, কত কি অভিনয় করিতেছে, কিন্তু অন্তরে অহর্নিশ তুষানল জ্বলিতেছে, প্রাণ যার পর নাই আকুল হইতেছে।

পিঞ্জরের দোষে পাখীটীর সুখশান্তি নাই। একটু নড়িতেছে আর পিঞ্জরে লাগিয়া পক্ষ ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। উল্লাসে নৃত্য করিবার উপায় নাই—নিরাশ বিহঙ্গ নীরবে ম্লান ভাবে বসিয়া আছে। ক্রমে শরীরে কীট প্রবেশ করিয়া তাহার পূর্ব্বের সে শ্রীকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। পাখী অন্তিমের দিন গণিতেছে। জগতের কত লোকের এই শোচনীয় দশা। অত্যাচার অপচারে শরীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, জীর্ণ

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ। চৈত্র, সন ১৩০০ সাল। ১২শ সংখ্যা।

অশান্তি।

ভাবিয়া দেখিলে অশান্তির ছায়া যেন জগতে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বাহিরের উল্লাস শোভার অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় অশান্তি বহিয়া যাইতেছে। কেমন সুন্দর ফুলটী ফুটিয়া আছে—ভিতরে কীট। কেমন মেঘদলে আকাশ পরিবৃত হইয়াছে—উহার অন্তরালে অশনির সংহারক বহ্নি জ্বলিতেছে। কলঙ্কের রেখা বুকে করিয়া আকাশের চাঁদ তেমন প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারিতেছে না। সুস্থির সলিলোপরি সুবিমল শশাঙ্ক প্রতিভাত—অভ্যন্তরে মকর কুম্ভীরাদি ক্রীড়া করিতেছে। সাগর বক্ষে অপূর্ব্ব লহরীলীলা—ভিতরে বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত। মানুষ এ জগতে আসিয়া চারি দিকে এই বৈষম্য ভাব দেখিয়া স্বয়ং তাহার পরিচয় দিতেছে। মানুষ কত হাসিতেছে, কত কি অভিনয় করিতেছে, কিন্তু অন্তরে অহর্নিশ তুষানল জ্বলিতেছে, প্রাণ যার পর নাই আকুল হইতেছে।

পিঞ্জরের দোষে পাখীটীর সুখশান্তি নাই। একটু নড়িতেছে আর পিঞ্জরে লাগিয়া পক্ষ ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। উল্লাসে নৃত্য করিবার উপায় নাই—নিরাশ বিহঙ্গ নীরবে ম্লান ভাবে বসিয়া আছে। ক্রমে শরীরে কীট প্রবেশ করিয়া তাহার পূর্ব্বের সে শ্রীকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। পাখী অন্তিমের দিন গণিতেছে। জগতের কত লোকের এই শোচনীয় দশা। অত্যাচার অপচারে শরীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, জীর্ণ

তরী আশ্রয় করিয়া বাত্যাবিতাড়িত সাগর বক্ষে প্রাণ আকুল হইয়া পড়িয়াছে। স্বাস্থ্য চিরদিনের তরে অপগত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে আশা ও শান্তির যে ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছে, এখন সকলই তমসাবৃত। স্বাস্থ্য হারাইয়া আজ রাজাধিরাজ সুরম্য প্রাসাদ বিন্যস্ত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াও আর্ত্তনাদ করিতেছেন এবং স্বাস্থ্যের প্রভাবে ঐ দরিদ্র প্রান্তরস্থিত বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া সুমধুর সঙ্গীতে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রতিপালিত না হওয়ায় জগতে এত হাহাকার, আর্ত্তনাদ ও বিলাপ পরিতাপ শ্রুত হইতেছে। স্বাস্থ্য হারাইয়া সুখশান্তির অত্যাশা করা দূরাশা মাত্র।

একটি নৌকার আরোহিগণ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিত আছে, সহসা স্রোতবেগে নৌকাখানি ভাসিয়া গেল। কাহারও দৃক্‌পাত নাই, নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে। ভাসিয়া ভাসিয়া এক বিষম আবর্ত্তে পড়িয়া নৌকা নিমগ্ন হইল, সেই সঙ্গে আরোহিগণেরও জীবনলীলা শেষ হইল। আলস্যে মুগ্ধ হইয়া কত লোকেই নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। মোহাচ্ছন্ন মানব ভাবিতেছে, দিন এইরূপই চলিয়া যাইবে। এই নিদ্রিত হইলাম, জাগিয়া দেখিব, জগতের সুখ সম্পদ আমার পদতলে বিন্যস্ত রহিয়াছে, কিন্তু হায়! ভীষণ আবর্ত্তে যে ডুবিতে হইবে, কয়জন তাহা ভাবিয়া থাকেন। জীবনের ঊষা বড়ই মনোরম—কিন্তু মাধ্যাহ্নিক প্রখর তাপে যে জ্বলিতে হইবে, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। ভাবিয়া দেখেন না, তাই জগতে এত দুঃখ দারিদ্র্য অহর্নিশ প্রাণকে আকুল করিতেছে। প্রথম বয়সে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধ করেন না এবং কিরূপে অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ ও তদুপযোগিনী শক্তির প্রসারণ করেন না, এই জন্য চিরজীবন অর্থাভাবে অশেষ ক্লেশ পাইতে থাকেন। আলস্য ও ঔদাসীন্য যত অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অর্থের অভাবে নিজে সুখী হওয়া যায় না, অপরকেও সুখী করা যায় না। চারিদিক অভাব পরিবৃত করিয়া আছে, সাধ্য নাই যে তাহা নিরাকৃত করি, এই জন্য অর্থহীন ব্যক্তির কিছু মাত্র সুখশান্তি থাকে না। মনের বাসনা পূর্ণ না হওয়ায় ক্ষোভ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া অতি হীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, জগৎ যেন অশান্তির ভীষণ মরুভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোন কোন লোক আবার এরূপ হতভাগ্য যে প্রচুর ধনের অধিকারী কিম্বা বিলক্ষণ উপার্জ্জনক্ষম হইয়াও পাপবিলাস ও অতিব্যয়িতা দোষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নিতান্ত হীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন। বুদ্ধি দোষে তাঁহারা নিজের সর্ব্বনাশ নিজে আনয়ন করেন। অট্টালিকা হইতে নামিয়া আসিয়া পথের ভিখারী হইয়া কে হৃদয়ে শান্তি পাইতে পারে? অতীতের স্বপ্ন প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিষাদ-বহ্নি জ্বালিয়া দেয়, তাহাতে দগ্ধ হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকে না। এ জগতে যাঁহারা সুখশান্তিতে থাকিতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে ধনোপার্জ্জন ও ধনের সদ্ব্যবহার শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

মানুষ যন্ত্রের ন্যায় অনবরত খাটিতে পারে না, খাটিতে হইলে জীবন ভারবহ হইয়া উঠে, কিছু মাত্র সুখশান্তি থাকে না। বেশী হউক আর কম হউক, একটু বিরাম চাই। শ্রমের পর বিরাম বড়ই মধুর। শ্রমের অমৃতময় ফল বিরাম। শ্রমের পর বিরাম না হইলে গরলের উৎপত্তি হয়। আলস্যের বিষময়ফল অবসাদ। স্বর্গ ও নরকে যত প্রভেদ, বিরাম ও অবসাদে তত প্রভেদ। বিরাম শান্তিকুণ্ডের পবিত্র বারি। সেই বারির এক কণিকা না হইলে, অশান্তি তৃষ্ণা নিবারিত হইবার নহে।

শ্রমে আসক্তি ও বিরামে তৃপ্তি না হইলে অশান্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। যে দিকে মনের দৌড়, সেই দিকে মন দৌড়িতে না পারিলে সুখ হয় না। নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তি মত কার্য্যক্ষেত্র নির্ণয় করিয়া, শ্রম করিতে পারিলে, সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে অনবধান বশতঃ অনেকেই চিরজীবন অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতে থাকেন। আমার বিষয় বুদ্ধি নাই, বাক্‌শক্তির তেজ বা ক্ষমতা নাই, আমাকে উকিল সাজাইলে ফল কি? আমি যাহা সাজিতে চাহি না বা পারি না, আমাকে তাহাতে সাজাইলে ফল কি? যে ব্যবসায় বেশী অর্থলাভ হইতে পারে সেই ব্যবসার অনুসরণ না করিয়া, আমার যে শক্তি বা বুদ্ধি আছে তদ্দ্বারা কোন বিষয়ে মনোযোগ বিধান করিলে অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা তাহাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অমুক শস্য মূল্যবান অতএব তাহাই রোপণ করিতে হইবে এরূপ বিবেচনা না করিয়া কোন্ ক্ষেত্রে কোন শস্য ভাল জন্মিবে ইহা ভাবিয়া কার্য্য করিলে কাহা-

কেও নিরাশ হইতে হর না, সকলেই শান্তির অমৃতাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। কার্যক্ষেত্রে বিফল হইয়া অনেকে বলিয়া থাকেন এ পথে আসিতে আমার কিছু মাত্র ইচ্ছা ছিল না, কেবল অমুকের অনুরোধ বা আদেশে আমাকে চলিতে হইয়াছে। ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। মনের এরূপ ভাব লইয়া নিজেও সুখী হওয়া যায় না এবং যাঁহার জন্য নিজে অসুখী হইয়াছি মনে হয়, তাঁহার প্রতি ততদূর ভক্তি বা শ্রদ্ধা থাকে না। মনে মনে তাঁহাকে অভিসম্পাৎ করিয়া নিজে চিরক্ষোভে জীবনপাত করা অপেক্ষা আপনার সাধ্যানুরূপ পথে চলা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে কার্য্য আমার প্রবৃত্তির বিরোধী, সে কার্য্য কোন মতেই করা উচিত নহে, তাহাতে সিদ্ধকাম হইলেও সুখের প্রত্যাশা নাই। শ্রম সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও যখন কোন কার্য্যসিদ্ধি না হয় তখন বুঝিতে হইবে যে আমি সে কার্য্যের উপযুক্ত নহি এবং যে মুহূর্ত্তে সেই জ্ঞান হইবে তন্মুহূর্ত্তে কার্য্যান্তর অবলম্বন করা বিধেয়। নিজের শক্তি নিজে বুঝিয়া প্রবৃত্তি অনুসারে চলিলে ক্ষোভ ও বিষাদের কঠোর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়; অশান্তির নিষ্পেষণে আর নিষ্পেষিত হইতে হয় না।

একটী বাড়ীতে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ ক্রোধান্ধ হইয়া একটী ফলবান বৃক্ষ ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অপর ভ্রাতারা বৃক্ষটী রক্ষা করিবার জন্য তাহার মস্তকে অনবরত জল ঢালিতে লাগিলেন। এ উপায়ে কি বৃক্ষটীর রক্ষা হইতে পারে? যে স্থানে বিপদের আশঙ্কা সেই স্থানে প্রতিবিধান করা উচিত, অন্যত্র চেষ্টা করিলে ফল দর্শিবে কেন? আমার গৃহে আগুণ লাগিয়াছে, আমি অন্যত্র জল ঢালিলে উপকার হইবে কেন? আমার ভিতরে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আমি অন্যত্র ব্যাকুল হইয়া প্রতীকারের চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? মানুষ বৃথা অপরের দোষ দিয়া থাকেন, মনে করেন অপরের দোষে আমার সুখ শান্তি হইল না। কিন্তু নিজেকে প্রকৃতরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে অপরের দোষ দিবার তত প্রয়োজন থাকে না। নিজে ভাল হইলে জগতের সকলকেই সুন্দর দেখায়, তখন অপরের দোষে আমাকে দুঃখ পাইতে হইল এ কথা বলিবার অবসর থাকে না। মানুষ নিজের দোষেই এত অশান্তি ভোগ করিতেছে। রিপুর উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। হিংসা, বিদ্বেষ, অমৃতকে গরল করিয়া তুলিতেছে। মানুষ উন্নত হইয়াও অপরের উন্নতি দেখিয়া নিজের সুখ সৌভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। কিছুরই অভাব নাই, অথচ চরিত্র দোষে অসন্তোষের প্রস্রবণে অবিরত নিমগ্ন রহিয়াছে। ক্রোধ ও অপ্রেম দ্বারা সকলকে পর করিয়া তুলিলে একা নির্ব্বান্ধব জগতে থাকিয়া শান্তি বা তৃপ্তি কোথায়? কাহারও সহিত মিশিতে পারি না, কাহাকেও ভালবাসিতে পারি না, তবে অপরে আমাকে সুখী করিতে ব্যাকুল হইবে কেন? সেরূপ অবস্থায় অপরকে দূষিলে লাভ কি?

এ সংসারে গৃহই আমাদের শান্তির নিকেতন। নিজের বুদ্ধি ও স্বভাব দোষে যিনি সেই গৃহে অগ্নি জ্বালিয়া দেন, আত্মীয় স্বজনকে অস্থির ও ব্যাকুল করিয়া তুলেন, সুখশান্তি তাঁহার ভাগ্যে অসম্ভব। পারিবারিক বন্ধনে চরিত্রের বিকাশ হইয়া থাকে। পরিবারের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া, আমরা স্নেহের মধুর আস্বাদে পরিতৃপ্ত হই। যে স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়াছি, তাহা ক্রমে বিলাইতে শিখি। বিলাইয়া মনে কত তৃপ্তি হয়। ক্রমে জীবন-পথে এমন একজন আসিয়া অধিষ্ঠিত হয়, যাহার ভালবাসা পাইয়া ও যাহাকে ভাল বাসিয়া তৃপ্তির অনন্ত উৎস খুলিয়া যায়। প্রীতির অপূর্ব্ব প্রবাহে তখন ধরাতল ভাসিতে থাকে। তখন মনে হয় আজ আমি শান্তির নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করিলাম, তথায় সুখকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আমরা চিরকাল বাস করিব। যাঁহার সেই আশা ও কল্পনা ফলবতী হয়, তিনি ধন্য। তাঁহার জীবন চিরবসন্তময়। তিনি ময়ূরের কেকারবে, কোকিলের মধুর কাকলী শুনিতে পান, বজ্রগম্ভীর মেঘগর্জ্জনে প্রেমচক্রের সুমধুর আবর্ত্তন সঙ্গীত শুনিয়া থাকেন, তমসাচ্ছন্ন রজনীর অন্তরালে কি এক অনুপম রূপ দর্শনে মুগ্ধ হন। তাঁহার নয়ন যুগল কি এক রসাঞ্জনে অনুরঞ্জিত, তিনি যাহা দেখেন তাহাই সুন্দর। তাঁহার কর্ণকুহরে কি এক সঙ্গীত কোন অলক্ষ্য প্রদেশ হইতে প্রতিনিয়ত সুধাবর্ষণ করিতে থাকে, তিনি তাহাতে একেবারে মগ্ন হইয়া যান। তাঁহার হৃদয় প্রেমের প্রস্রবণ, সুখের উৎস, শান্তির অমৃতকুণ্ড। তাঁহার সন্নিধান তৃপ্তির বেলাভূমি।

যে দাম্পত্য প্রেম মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে তাহার অভাব বড়ই শোচনীয়। পতি পত্নীর মধ্যে প্রেম নাই, অথচ উভয়কে একত্রে

থাকিয়া বিবাদ বিসম্বাদে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর কি হইতে পারে ? এই অবস্থায় থাকিয়া শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। জগতে এত যে অশান্তি বিরাজ করিতেছে ইহার প্রধানতম কারণ পতি পত্নীর মধ্যে সদ্ভাবের অভাব। উভয়ের দোষ ভিন্ন এই অসদ্ভাব পূর্ণ মাত্রায় দাঁড়াইতে পারে না। আবার এক জনের বুদ্ধির গুণে অপরকে অনেক পরিমাণে সংশোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। স্বামী চান বশ্যতা ও শুশ্রূষা, স্ত্রী চান ভালবাসা ও আদর। যে স্থলে স্ত্রী কোমল প্রকৃতি ও বশ্যতা স্বীকারে সম্মতা, এবং স্বামী প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত, সে স্থলে তত অশান্তির কারণ হয় না। কিন্তু স্ত্রী উগ্রপ্রকৃতি ও স্বার্থপর হইলে এবং স্বামী তাহাকে অগ্রাহ্য করিলে আগুণ জ্বলিয়া উঠে। স্বামী বুদ্ধিমান হইলে অতি দুর্বৃত্ত স্ত্রী লইয়াও এক প্রকার সংসার চালাইতে পারেন, এবং স্ত্রী সহিষ্ণু ও কোমল প্রকৃতি হইলে অতি দুর্বৃত্ত স্বামীকেও ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিতে পারেন। কর্ত্তব্যবোধ না হইলে দম্পতী-প্রেম স্থায়ী হইতে পারে না। তুমি যখন আমার স্ত্রী হইয়াছ, তখন তোমাকে সুখী করা আমার কর্ত্তব্য, তুমি আমার স্বামী তোমার অধীন হইয়া তোমার সেবা করা আমার ধর্ম্ম—এই জ্ঞান থাকিলে পারিবারিক জীবন অশান্তিময় হইবার তত সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণতঃ স্বামী অধিক সৌন্দর্য্য ও গুণের প্রত্যাশা করিয়া তাহার অভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ক্ষুব্ধ হয়েন, পত্নী অধিক সুখসম্পদ ও ভালবাসার প্রত্যাশা করিয়া বঞ্চিত হইয়া কাতর হয়েন। কল্পনার প্রেম ও সুখ জগতে না পাইয়া উভয়েই নিরাশ। কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া উভয়ের মধ্যে মিলন সদ্ভাব সঞ্চার করিতে কেহই প্রয়াস পান না, তাই পরিণামে উভয়ে অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতে থাকেন। যে সম্বন্ধ চিরস্থায়ী তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ নহে। যত্ন ও কৌশলে বনের হিংস্র জন্তুকে বশীভূত করা যায়, আর দম্পতীর মধ্যে মিলন হইবে না, ইহা বড়ই অস্বাভাবিক। বুদ্ধি ও বিবেচনা দোষে উভয়কে চিরজীবন ক্লেশে অতিবাহিত করিতে হয়

এ জগতের লোক ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যস্ত। ভালবাসা না পাইলে ক্ষোভের আর সীমা থাকে না, কিন্তু কেহই ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে ভালবাসা পাইবার অগ্রে ভালবাসিতে শিক্ষা করা উচিত। দান গ্রহণ অপেক্ষা দান করা মহত্ত্বের চিহ্ন, সেইরূপ যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা ভালবাসা বিলাইতে আসিয়াছেন, প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন না। সকলেই যদি ভিক্ষুক হইবে, তবে দাতা কে হইবে ? এইরূপ ভিক্ষুক হইলেও তত আশঙ্কার কারণ ছিল না। মানুষ কি শুদ্ধ ভালবাসা পাইয়া নিরস্ত, না, তাহা নহে, যাহার ভালবাসার জন্য লালায়িত, তাহাকে ডুবাইতে উদ্যত এবং সে ডুবিলে আর তাহার দিকে লক্ষ্য থাকে না। বিশুদ্ধ ভালবাসার তরঙ্গ জগতে যতই খেলিত, ততই মঙ্গল সাধিত হইত। কিন্তু ভালবাসার সঙ্গে স্বার্থপরতা ও লালসা মিশ্রিত হইয়া বিষম গরল উৎপাদন করে। ঐ যে প্রেমের ছবিখানি দেখিয়া যুবক উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন ; ঐ যে বাতায়ন পথে সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া ইহজীবনে সে দৃশ্য আর ভুলিতে পারিতেছেন না, ঐ যে প্রমোদ উদ্যানে চারি চক্ষুর মিলনে উভয়ে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, একি বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচায়ক ? এ প্রেমে যদি লালসার গরল বিমিশ্রিত না থাকিত, তবে কে সে প্রেম প্রবাহে বাধা দিত। আর বাধা না পাইয়া যদি মিলন হয়, সে মিলন কি স্থায়ী হয় ? লালসার গরল প্রেমের অমৃতকে কলুষিত করিরা, জীবনকে বিষাদময় করিয়া তুলে। কল্পনা তখন অন্তর্হিত হয়। আকাশপটে চন্দ্রের পার্শ্বে যে ছবি এক দিন ভাসিয়াছিল, আজ তাহা রাহুকবলিত হইয়া সন্ত্রাশ উৎপাদন করে। যে গুণের সৌরভে প্রাণ উন্মত্ত হইয়াছিল, তাহা আর সহ্য হয় না, তখন মনে হয় এ পিশাচমূর্ত্তি হইতে পরিত্রাণ কবে পাইব। যুবক ! এই না তোমার ভালবাসা ? এই না তোমার প্রেমের পরিণাম ? তুমি যদি অশান্তির অনলে দগ্ধ না হইবে তবে আর কে হইবে ?

এই অনন্তবাহী পবনের সঙ্গে সঙ্গে শোকের বিষাদ সঙ্গীত অবিরাম বহিয়া যাইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে কত যে হৃদয় ভেদী শ্বাস বহিতেছে ও কত অশ্রুপাত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে ? নিরাশার কাতরতা, শোকের অশ্রু এবং অনুতাপের অন্তর্দাহ মিলিত হইয়া নীরব রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া উঠিতেছে। নির্ম্মম জগতের তৎপ্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য নাই। কিন্তু সে প্রবাহ রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যুবরাজকে নিদ্রা হইতে চকিতের ন্যায় জাগাইয়া আকুল করিতেছে।

অস্থির হৃদয়ে কাতর প্রাণে অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে ঐ হাহাকার লক্ষ্য করিয়া যুবরাজ ছুটিতেছেন। আবার দেখুন, ঐ হাহাকার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবা মাত্র বঙ্গের সানান্য কুটীর হইতে এক মহাপুরুষ বহির্গত হইয়া শোকতাপগ্রস্ত মানবকুলকে বক্ষে ধারণ করিয়া, শান্তির স্রোতে সকলকে ভাসাইতেছেন। তাঁহার প্রাভবে প্রেমের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে শোক তাপ সব নিমেষ মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে।

মানুষ সার দুর্ল্লভ বস্তু ভুলিয়া মোহমরীচিকার অনুসরণ করিতেছে, তাই জগতে অশান্তিশিখা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। পরকালে বিশ্বাস থাকিলে ও পরকালের বিধাতাকে চিনিলে আর কোন আশঙ্কাই থাকে না। কোন প্রতিকূল অবস্থাই তখন মনকে স্থায়ীভাবে ব্যাকুল করিতে পারে না। এ জীবন জলবিম্ব, সুতরাং তাহার কোন পরিবর্ত্তনই মনকে কাতর করিতে পারে না। দারুণ রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া রোগী ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া ভক্তির প্রবাহে আনন্দে সন্তরণ করিতে থাকেন, মুহূর্ত্তমধ্যে সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যান। জগতের অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইয়াও তিনি সহাস্যবদন। অনাহারে শীর্ণ হইয়াও তিনি প্রেমামৃতপানে পরিতৃপ্ত। জগতের ভালবাসা না পাইয়া তিনি কাতর হইবেন কেন? তিনি যে জগৎপতির ক্রোড়ে সুখাসীন। বাহিরের সুখের জন্য তিনি লালায়িত হইবেন কেন, তাঁহার হৃদয় যে সুখের অনন্ত উৎস। তিনি ত জগৎবাসী নহেন; তিনি স্বীয় অন্তরাজ্যের অধিবাসী। সেই রাজ্যের পবিত্র তপোবনে তিনি যোগনিরত মহর্ষি, অশান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে কেন?

সংকীর্ত্তন ;—মান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পাঠক মহাশয়, যদি কখনও আপনার ষোল আনাকে ভুলিয়া কোন নর নারীর প্রণয়ে মজিয়া থাকেন তবে সংকীর্ত্তনের মান কাহাকে বলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস বুঝিতে পারিবেন। যেখানে প্রণয়ের গভীরতা, স্নেহের প্রাচুর্য্য সেই খানেই অধিকার, অভিমান আছে। আপনি কোন ব্যক্তির প্রণয়পাশে দৃঢ় আবদ্ধ; তিনি আপনার হৃদয়ের বন্ধু, তিনি আপনার সুখের সুখী, দুঃখের ভাগী। তিনি আপনাকে কত দিন কত সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, কত দিন আপনার কত উপকার করিয়াছেন; কিন্তু সকল দিন সকলের মনের ভাব সমান যায় না, সকলের শরীর সকল দিন সমান থাকে না। আপনার প্রাণের বন্ধু এক দিন হয় ত আপনার প্রতি কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন; অথবা তিনি কোন ঔদাসীন্য প্রদর্শন না করিলেও আপনি কল্পনার সাহায্যে মনোমধ্যে তাঁহার কিছু ত্রুটি অনুমান করিলেন, অমনি আপনি তাঁহার পূর্ব্বকৃত সমুদয় সহানুভূতি, সমুদয় উপকার মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইলেন, আপনার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ অভিমানের, কিঞ্চিৎ দুঃখের উদয় হইল। তিনি যদি আপনার সমক্ষে অন্য এক ব্যক্তির সহিত বেশী আগ্রহের সহিত আলাপ করেন, অধিক কি, যদি তিনি আপনার নিকট অপর কোন ব্যক্তির অধিক পরিমাণে সানুরাগ প্রশংসা করেন, অমনি আপনার মনে হইবে আপনার বন্ধু বুঝি আপনা অপেক্ষা অপর ব্যক্তিকে অধিক ভাল বাসেন। আপনার প্রণয়িণী আপনার পদে জীবন মন সমর্পণ করিয়া দিবা নিশি আপনার পদসেবায় নিরতা আছেন, একদিন তাঁহার কিছু বাস্তব বা কাল্পনিক ত্রুটি লক্ষিত হইল, অমনি তাঁহার উপর আপনার কিঞ্চিৎ অভিমান আসিল। অথবা আপনি আপনার প্রণয়িণীকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসেন, তিনিও তাহা বেশ অবগত আছেন, তথাপি কোন কারণ বশতঃ আপনার কোন ঔদাসীন্য দেখিলে তিনি অমনি মানে বসিলেন। অথবা আপনি কত আদর করিয়া তাঁহার মান ভাঙ্গাইবেন সেই আদর দেখিবার জন্য; সেই সুখ ভোগ করিবার জন্য

কখন কখন তিনি অভিমানিনী হন। এ ঘটনা প্রতি প্রণয়ীর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। যেখানে অধিকার, সেই খানেই অভিমান ; যেখানে আদর, সেই খানেই আবদার ; যেখানে প্রাণভরা ভালবাসা, সেই খানেই কৃত্রিম বামতা ; যেখানে সাধা, সেই খানেই মান। এক দিন ভ্রুকুটী ভঙ্গি দেখাইয়া, একদিন রুক্ষ্ম বদনে প্রণয়িনীর মান অপনোদন করিয়া দেখিবেন সেই দিন হইতে “মান” আর আপনার পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইবে না। “কর্ত্তব্যতা” রাজত্ব করিতে থাকিবে বটে, কিন্তু প্রেমের মধুরতার এক পরিচ্ছেদ চির দিনের মত সাঙ্গ হইবে।

কেহ কেহ বলিবেন প্রণয়ীর ঔদাসীন্য বা ত্রুটি কল্পনা করিয়া বা অন্যের প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া অভিমান করা বলীয়ান্ চিত্ত পুরুষের কার্য্য নয়, উহা নারীর স্বভাব মাত্র। কিন্তু পুর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষ্ণ প্রেমের মধুরিমা আস্বাদন করিতে হইলে কতক পরিমাণে নারী প্রকৃতিক হওয়া চাই। প্রেমের স্বভাবই এই যে কখনও কোন কারণ বশতঃ কখনও বা বিনা কারণে প্রণয়ীর প্রতি অভিমান আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্য বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন ;—

“অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনর্মান উদঞ্চতি ॥”

কিন্তু বৈষ্ণবের ভরসা এই যে তাঁহার প্রাণনাথ রসরাজ কৃষ্ণ what nonsense বিমিশ্র ভ্রুকুটিবিভঙ্গী দেখাইয়া মানিনীর মান ভঙ্গ করেন না। তিনি পরম প্রেমিক ; প্রেমের মধুরতা আস্বাদন করিতে জানেন, আস্বাদন করাইতে জানেন। তিনি বৈষ্ণবের নিকট প্রতিশ্রুত আছেন ;—

“প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদ স্তুতি হইতে তাহা হরে মোর মন ॥”

“কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভৎর্সনে।
যথা যোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাহে সুখ পান,
ছাড়ে মান অলপ সাধনে ॥”

বৈষ্ণবের কৃষ্ণ নাকি প্রেমিক চূড়ামণি, রসিক শেখর, প্রেমময় বপুঃ ভক্ত প্রেমাধীন ; বৈষ্ণব নাকি জানে যে সে অভিমান করিলেও কৃষ্ণ তাহাকে তাড়না ভ্রূকুটী করিবেন না, বরং আদর ত সদাই করিতেছেন, আরও কিঞ্চিৎ আদরের বৃদ্ধি হইলেও হইতে পারে। তাই সে কখন কখন কারণে বা বিনা কারণে প্রভুর প্রতি অভিমান করিয়া থাকে। সে নাকি জীবন প্রাণ দেহ মন যথা সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ চরণাম্বুজে সমর্পণ করিয়াছে ; তাই সে ভাবে প্রাণরমণের উপর তাহার বিশেষ অধিকার ; সেই অধিকার বজায় রাখিবার জন্যই নারীপ্রকৃতিক বৈষ্ণব প্রাণনাথের উপর কখন কখন অভিমান করিয়া থাকে।

মনে করুন, বৈষ্ণব প্রেমিক এক দিন যেন একাগ্রমনা হইয়া প্রাণরমনের ভাব ভাবিতে লাগিল। সে বিশুদ্ধ স্থানে আসন পাতিয়া ভক্তি পুষ্পে হৃদয় সিংহাসন সাজাইয়া প্রভুকে তথায় বসাইবার আশায় তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার নিজের কোন অপরাধে বা চিত্তের সম্পূর্ণরূপ একাগ্রতা না হওয়ায় হয় ত তাহার সম্যকরূপ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইল না। হয়ত সে দিন প্রভুর চিদানন্দময় বপু, শান্তিময় রসময় রূপ তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল না। সাধকের সে দিন হৃদয়ের পিপাসা মিটিল না, মনের আশা পূর্ণ হইল না। কীর্ত্তনের ভাষায় তাহার “বাসক সজ্জা” বিফল হইল। হৃদয়েশ্বরের আবির্ভাব হইলে সে প্রেমে বিহ্বল হইত, আত্মহারা হইত, আজ তাহার অদৃষ্টে তাহার সে ভাবের উদয় হইল না। অন্য চিন্তা তাহার মনে উঠিতে লাগিল। সে লীলাময়ের লীলার কূট রহস্য বুঝিতে না পারিয়া, চক্রী কোন কৌশল চক্রে এই বিশ্ব চালাইতেছেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া, হয়ত ভাবিয়া দেখিল, কোন পাপাত্মা ব্যক্তি বিশেষ সুখ সচ্ছন্দে আছে, কিম্বা কোন ব্যক্তি ধনজন সম্পদের জন্য হরি অর্চ্চনা করিয়া তৎসমুদায়ই প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে বেশ সুখে আছে, আর সে স্বসুখবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া যথা স্বর্ব্বস্ব হরিচরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবায়, তাঁহার কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়াও জ্বালা যন্ত্রণা রোগ শোক এড়াইতে পারিতেছে না। এই সকল ভাবিয়া দেখিয়া তাহার মনে স্বভাবতঃই একটু অভিমান, একটু নির্ব্বেদ জন্মিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল “লীলাময়! তোমার এ কেমন

লীলা ? আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণে শরণাগত হইয়াছি, নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া তোমার কার্য্যে ব্যাপৃত আছি, কিন্তু এত করিয়াও আমি তোমাকে পাই না। আজ এত যত্ন করিয়া দেহমন্দির সাজাইয়া রাখিলাম তুমি আসিলে না ; আজ আমার হৃদয় নিকুঞ্জ শূন্য পড়িয়া রহিল। আমি আশাপথ চাহিয়া রহিলাম, তুমি আশা পূরাইলে না। এখন আমি সব আঁধার দেখিতেছি, আমার জীবন শুষ্ক মরুভূমিবৎ বোধ হইতেছে। আর যে তোমার সেবা জানে না, যে তোমাকে নিজ সুখের জন্য আহ্বান করে, ধনজন কামনা করিয়া স্বার্থের জন্য তোমার পূজা করে তাহার প্রতি তোমার যথেষ্ট আদর। আমি বুঝি না তোমার এ কেমন বিচার, জানি না তোমার এ কেমন প্রেম। আমি তোমার নিকট কিছু প্রত্যাশা রাখি না, চাহি কেবল তোমার সেবা করিতে ; কিন্তু তাহা তোমার ভাল লাগিল না। যেজন নিজ স্বার্থের জন্য তোমার আরাধনা করে, তাহার বেগার খাটিতে তোমার বড় ভাল লাগে। তাহার প্রতি তোমার বেশী প্রেম। তাহার বরাত যোগাইতে তোমার যে ক্লেশ তাহাতে তোমার ভ্রুক্ষেপ নাই, কিন্তু আমার প্রাণের পূজা লইতেও তোমার ক্লেশ হয়। তোমার অঙ্গে চন্দন দিব তাহা তোমার ভাল লাগে না, কিন্তু যেখানে নখাঘাত পাও, তাহা তোমার বড় মধুর লাগে। অতএব যাও প্রাণনাথ তুমি সেই খানে যাও, আমার সঙ্গে তোমার পীরিতি কিসের ? আজ হইতে আমি তোমার প্রেমের পথে প্রণাম করিলাম।”

বৈষ্ণব মানিনী হইল বটে, কিন্তু এ অবস্থায় সে কতক্ষণ থাকিতে পারে ? সে অমনি আবার কাঁদিতে থাকে “হায় ! আমি কি করিলাম। অভিমান ভরে একি কথা বলিলাম। ঈশ্বরের লীলা রহস্য আমি বুঝিব কি করিয়া ? তিনি কি কারণে কাহাকে অনুগ্রহ কাহাকে নিগ্রহ করেন আমি তাহার বিচার কি করিয়া করিব ? আমার প্রাণবল্লভ যে বহুবল্লভ। শুধু আমাকে লইয়াই এ বিশ্ব নয় ; প্রাণনাথ আমার একচেটিয়া নহেন ; তিনি কি উদ্দেশ্যে আমাকে নিগ্রহ করিয়া আজ দেখা দিলেন না তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব ? আমি কোন অপরাধ করিয়াছি তাই আমার আজ এ নিগ্রহ হইল। আমি ঘোর অপরাধী এক দিন প্রভু আসিলেন না বলিয়া কৃষ্ণ কৃপায় অবিশ্বাসী হইলাম। আমার জীবনে

ধিক্। অন্ধ প্রেম আমাকে দেখিতে দিল না, যে কৃষ্ণকে সমুদয় জগতের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়। কেবল মাত্র আমাকে লইয়াই তাঁহার বিশ্ব নয়।” সে অমনি গায় ;—

“আঁধল প্রেম, পহিল নাহি হেরনু,
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে, বিবাদ করি তা সঞে,
অহর্নিশি জ্বলত পরাণ।”

আবার মর্ম্ম সখীর গলা ধরিয়া বলে ;—

“সজনি ! তোরে কহি মরমকি দাহ।
কানুক দোখে, যো ধনী রোখই,
সেই তাপিনী জগমাহ।
যো হাম মান, বহুত করি মাননু,
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ, শরে ভেল জর জর,
তাকর দরশ না পেখি।
ধৈরজ লাজ, মান সঞে ভাগল,
জীবন রহিতে সন্দেহ।
গোবিন্দ দাস, কহয়ে সতী ভামিনী,
ঐছন কানুক লেহ।”

কিম্বা কখন সংস্কৃত আশ্রয় করিয়া গায় ;—

“সীদতি সখি মম হৃদয় মধীরং।
যদভজমিহ নহি গোকুল বীরং।”

আবার কাঁদিতে কাঁদিতে গায় ;—

“যাকর দরশ, পরশরস বিন হাম,
তিল এক রহই না পারি।
করমক দোখে, রোখ করি তা সঞে,
মাননু আপনা বিবাগী।
কত যুগ লাখ, নিমিখে বহি যায়ত,
কাহে মিলায়ব কান।

রাধাবল্লভ ভণে, সোই পুরুখ পানে,
আপনি ধায়ল প্রাণ।”

তাহার সঙ্গী তখন তাহাকে বুঝায় “প্রেমিক এক দিন নিজ আনন্দের ব্যাঘাত হইল বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমে অবিশ্বাসী হইয়া কাজ ভাল কর নাই। কৃষ্ণ প্রেম রাখা সহজ কথা নয়। এখনও কিছু কিছু স্বার্থ তোমাতে দেখিতেছি। তুমি কি জান না রোষে, অভিমানে, অবিশ্বাসে, বা অজ্ঞান বশতঃ যেজন কৃষ্ণত্যাগী হয় তাহার জীবন কি ভয়ানক ?

”সে হেন রসিক, নাগরের সনে,
কেন বা করিলি কলহ ?
আগে না বুঝিলি, কাঁদিলি কাঁদালি,
অব মুঝে কাহে বলহ ?
ছি ছি! নারিলি পিরিতি রাখিতে।
একি প্রতিদিন, কলহ করবি,
নারি মেনে আর সাধিতে।

* * *

কৃষ্ণ হেন ধন, যে করে ত্যজন,
তার কি জীবনে আশ।
তার জীবনে কি ফল, মরণ মঙ্গল,
কহত গোবিন্দ দাস।”

তখন প্রেমিক বলে, “এখন আমি আমার অযোগ্যত্ব বুঝিয়াছি, আর কখনও তাঁর প্রেমে অবিশ্বাসী হইব না। যদি প্রভু কৃপা করিয়া হৃদয়-মন্দিরে উদিত না হয়েন, তবে সেই মুখ চাঁদ হৃদয়ে স্মরণ করিতে করিতে যমুনার জলে প্রবেশ করিযা কৃষ্ণবিমুখ এই প্রাণকে বিসর্জ্জন করিব।”

“সো মুখ চাঁদ, হৃদয়ে ধরি পৈঠব,
কালিন্দী বিষ হ্রদ নীরে।”

তখন সঙ্গী বুঝায় “বৃথা কাঁদিয়া জীবনকে ধিক্কার দিলে কি হইবে ? একবার সরল মনে, একাগ্র চিত্তে প্রাণনাথকে ডাক, তিনি তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। আজ তোমার কিছু শিক্ষা হইল এই পর্য্যন্তই ভাল। ভবিষ্যতে ঈশ্বরের কার্য্যের দোষ গুণের বিচার করিতে যাইও না।

সুখে থাক বা দুঃখে থাক, “প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ হউক” বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও। অধিক্যর আছে বলিয়া তাঁহার উপর অভিমান করিও না।”

এই উপদেশ মত কার্য্য করিয়া প্রেমিক যখন অনুতাপ পূর্ণ হৃদয়ে ডাকিতে থাকে, তখন প্রাণারাম ভক্তের ডাক কতক্ষণ এড়াইতে পারিবেন, অমনি তাঁহাকে শান্তিময়রূপে তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে হয়। অমনি ভক্ত গাহিয়া উঠে—

“ছি ছি! ছার মানের লাগি,
প্রাণ বঁধুরে হারাইয়েছিলাম।
(এখন) শ্যামল সুন্দর, মধুর মূরতি,
পরশে শীতল হলাম।
শ্রীমধু মঙ্গলে,* আন কূতুহলে,
ভুঞ্জাও ওদন দধি।
হারা ধন যেন, আসিয়া মিলিল,
সদয় হইল বিধি।”

আবার কর যোড়ে প্রভুর গায়ে ধরিয়া বলে ;—

“মাধব, এক নিবেদন করি তোয়।
মরম না জানিয়ে, মানে হাম দগধিনু,
মাপ করবি সব মোয়।”

“অহে নাথ কিছুই না জানি।
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী।
জাগিতে ঘুমাতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পরাণ পুতলি তুমি জীবনের সখি।
অঙ্গ আভরণ তুমি, নয়নে অঞ্জন।
বদনে বচন তুমি শ্রবণ রঞ্জন।
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।
রায় বসন্ত কহে তুমি প্রেম রাশি।”

ক্রমশঃ।

---

* শ্রীমধুমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ সখা। ব্রাহ্মণ ভোজন মাঙ্গলিক কার্য্যে সকল শাস্ত্রেরই ব্যবস্থা দেখিতেছি।

নিশীথ চিন্তা।

(জাহ্নবী তীরে)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৯

কত আশা একে একে জলবিম্বপ্রায়
হৃদয়ে উঠিল পুনঃ হৃদয়ে মিলিল,
এই সে মধুর আলো হেরি বিশ্বময়—
আবার আঁধারে পুনঃ জগত ডুবিল।

১০

সে সব নিহত আশা আজি গো রজনি !
স্বপনের সম মনে হ'তেছে উদয়,
মৃগ-তৃষ্ণা-মরীচিকা-চিত্ত-মরুভূমি
হেরি প্রাণ হুহু করে মনে হয় ভয়।

১১

তরাসে পরাণ কাঁদে ভুলি আপনায়
মনে হয় সব বুঝি ফুরা'ল জগতে ;
নিবেছে আশার দীপ, পূরবের মত
জ্বলে না আঁধার ঘরে আলো কোনমতে।

১২

তুমি হে চন্দ্রমা আজি শীতল কিরণে
আঁধার অন্তর মম করহে উজ্জ্বল
আসি নিতি নিতি শশি ! তরঙ্গিনী তীরে
নিরখিব তব মুখ—পবিত্র নির্ম্মল।

১৩

পবিত্র তোমার বারি দেবি ভাগীরথি !
পরশনে পাপ নাশ হয় কহে লোকে,
অনন্ত তুষার মাঝে জনম তোমার,
কর সুশীতল তারে জীর্ণ যেই শোকে।

১৪

কত শত বর্ষ কত যুগ যুগান্তর
বহিতেছ নদি তুমি কে কহিতে পারে ?
তরঙ্গে তরঙ্গে তব প্রাচীন কাহিনী
চলেছে কাতর স্বরে গাহিয়া দু ধারে।

১৫

পুরাকালে তব কূলে আর্য্য ঋষিগণ
আনন্দে বিভোর বেদ করিত সঙ্গীত
করি সোমরস পান ধ্যান-নিমগন
ষড়দরশন করেছিল বিরচিত।

১৬

পুরাকালে তব তীরে আর্য্য বীরগণ
ধাইত অকুতোভয়ে বীরমদে মাতি।
সে বীর-হৃদয় সব হায়রে কোথায় ?
শার্দ্দূলের রাজ্যে কেন শৃগাল বসতি ?

১৭

কোথা সেই আর্য্যনারী রূপে দেবাঙ্গনা,
নব্য সভ্য গৌরাঙ্গিনী জিনি বিদ্যাবতী,
পতিপ্রাণা লজ্জাশীলা, সঙ্গীত নিপুণা
সমাজ শিক্ষিতা নহে, প্রকৃতি সন্ততি।

১৮

তব বক্ষে তরঙ্গিনি, কত রণতরী,
ভাসায়ে বিজাতিগণ মেতেছে সমরে
নর-রক্তে তরবারি হয়েছে রঞ্জিত,
সর্ব্বসহা, সহিয়াছ সব অকাতরে।

১৯

কেন সহেছিলে গঙ্গে ? ভীম প্রহরণে
উত্তাল তরঙ্গ তুলি কেন না নাশিলে ?
ভৈরব মূরতি ধরি প্রভঞ্জন বলে
কেন নাহি দস্যুদলে রসাতলে দিলে ?

২০

তুঙ্গগিরি শৃঙ্গ হ'তে যবে নেমেছিলে
ভীষণ তরঙ্গ রঙ্গ দেখালে যেদিন
কেন নাহি সে তরঙ্গে ডুবালে সলিলে
শত্রুগণে, বঙ্গ আজি রহিত স্বাধীন।

২১

কালের কুঠারাঘাতে তুমি কৃশাঙ্গিনী
কৃশতর হ'বে আরো ওহে স্রোতস্বতি!
কাল-চক্রে লক্ষপতি হয় হে ভিখারী,
কালে রম্য হর্ম্ম্য হয় পেচক বসতি।

ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষে বাণিজ্যের আশা।

হে ভারতবাসী রাজবংশীয় ও ধনাঢ্য মহোদয়মণ্ডলী! ভারতে নাই কি? সকলই আছে, তবে আজ ভারত সর্ব্বপ্রকারে এত অধীন কেন? যে ভারতের ধনে ইংলণ্ড আজ ধনীর অগ্রগণ্যা, সে ভারতের লোক কাঙ্গাল কেন? যে দেশে বাণিজ্য দ্রব্যের অতুল পর্য্যাপ্তি, সে দেশের লোকই বা গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত লালায়িত ও আজ পরমুখপ্রত্যাশী কেন? ইহার কোন অনুসন্ধান করা কি উচিত হয় না, ইহার প্রতীকারে সচেষ্ট হওয়া কি কর্ত্তব্য নহে? জন্মভূমির দুর্দ্দশা দেখিতে কি সন্তানের দুঃখ হয় না? আপনারা যদি চিরকাল নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, তবে সচেষ্ট হইবেন কবে? তাই আজ বাণিজ্য সম্বন্ধীয় একটা প্রস্তাব উপহার দিতেছি, আপনারাই উহার যোগ্যপাত্র।

পৃথিবীতে যত দেশ আছে তন্মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি চিরকালাবধি সকল রাজার লক্ষ্য কেন? তাহার অন্য কোন কারণ উপলব্ধি হইতে পারে না, প্রধান কারণ এই যে শস্য, পরিধেয়, মণি, মুক্তা, কাঞ্চনাদি মনুষ্যের যত কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে তাহা এই ভারতবর্ষে জন্মে।

সত্য যুগাবধি যে কেহ এই দেশের অধীশ্বর হইয়াছেন, তাঁহাকেই এক প্রকার সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি বলিলেও বলা যায়, যে হেতু এই স্থান ব্যবসায় দ্রব্যের আকর, সুতরাং সর্ব্বদেশীয় বণিকদিগকে এই স্থানে আকর্ষণ করে, আর যে স্থানে বণিকের সমাগম, সেই স্থানই সৌভাগ্যশালী। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" এ বিষয় বলা বাহুল্য উহা সকলেই প্রতীত আছেন। লক্ষ্মীর এক নাম "শ্রী", যে দেশে বণিকের বহুলতা সেই দেশই শ্রীযুক্ত আর যে স্থানে ঐ সকল লোকের অভাব সেই স্থানই শ্রীভ্রষ্ট। এই যে কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, দিল্লী, লাহোর, মৃজাপুর, গাজিপুর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, কাল্না, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান এত বিখ্যাত কেন? কেবল ব্যবসায়ীগণের সমাগমে। বণিকগণ স্বদেশের উন্নতির মূলাধার ও গৌরব। এ বিষয় অধিক কি বলিব, সংপ্রতি ইংলণ্ড রাজ্য, যাহার অধীনে আমরা বাস করি, যে এত প্রাদুর্ভূত ও পৃথিবীময় এত মানিত ও গণিত হইয়াছে তাহার মূল কারণ বণিকগণ ব্যতীত আর কেহই নয়। এই যে ভারতবর্ষ ইংরেজদিগের করতলস্থ হইয়াছে তাহাও বণিকগণ হইতে। বণিকের আর এক নাম মহাজন, আপনারা সকলেই মহাজন, মহাজন অর্থাৎ মহৎ ব্যক্তি; ধনী ও শিষ্ট সম্প্রদায় মাত্রেই মহতের অনুগামী ও সকলেই মহতের আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা করে, অপর লোকদিগের কথা কি বলিব, দেশের রাজার ও মহাজনগণের পরস্পর আনুকূল্য ব্যতীত রাজ্যের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি হয় না, ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর। সাংসারিক ও ঐহিক বিষয়ে যেমন মহাজন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, পারত্রিক পথেও তেমনি মহাজন অনুসরণ ব্যতিরেকে পরিত্রাণের উপায় নাই। এই হেতু জগতের সকল লোক মধ্যে মহাজনেরা উৎকৃষ্ট, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের মহাজনমণ্ডলী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যে হেতু পৃথিবীর যত প্রকার ব্যবসায় সামগ্রী আছে, তাহার অধিকাংশ এই ভারতবর্ষে জন্মে, ও তৎসমুদয়েরই মহাজন আপনারা। একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন এই দেশ হইতে কি কি ব্যবসায়ের দ্রব্য অন্যান্য দেশে না যাইতেছে ও তদ্দ্বারা সেই দেশের লোকেরা কি পর্য্যন্ত বিপুল অর্থ উপায় করিয়া স্ব স্ব দেশকে ধনে পূর্ণ করিতেছে ও দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে।

চাউল, গম, তিসি, গুড়, চিনি, সোরা, রেশম, কুসুম ফুল, লাক্ষা, তুলা, নীল, পাট, শৃঙ্গ, চর্ম্ম, মণি, মুক্তা, প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য আমরা

উৎপাদিত ও একত্রিত করিয়া এই ভাবিয়া বসিয়া আছি যে কবে অন্য প্রদেশের সওদাগরেরা আসিয়া ঐ সমস্ত ক্রয় করিয়া লইবে আবার আমাদিগের এই দেশ হইতে তুলা, পাট, রেশম, সোরা ইত্যাদি নানা প্রকার রং সমেত পাঠাইয়া দিয়া হা প্রত্যাশায় বসিয়া আছি কবে বিদেশী সওদাগরেরা বস্ত্রাদি, কাগজাদি, কাচের দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিবে, তবে আমরা আবার ক্রয় করিয়া বেচিব, অঙ্গে পরিধান করিব ও গৃহ সাজাইব। হায়! আমরা সমস্ত অঙ্গসম্পন্ন ও সক্ষম থাকিয়া অঙ্গহীন অক্ষমের ন্যায় এক প্রকার পরের দয়ার ও সহায়তার প্রতি নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। যখন দেখিতেছি আমাদেরই দ্রব্যাদি ও ধনের সাহায্য লইয়া অন্য দেশীয় লোকেরা ব্যবসায় করিয়া এত সমৃদ্ধিশালী ও প্রবল প্রতাপের সহিত বিখ্যাত হইতেছে, আমরা, সমস্ত উপায় সত্ত্বেও অন্য দেশীয় বণিকগণের সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, অধীনতায় কালক্ষেপ করিতেছি। ব্যবসায়ের সমস্ত দ্রব্যই আমাদিগের দেশজাত, ঐ সকল দ্রব্যের উৎপাদক ভূমির অধিপতি আমাদিগেরই দেশের লোক, উৎপাদনের পর ঐ সকল দ্রব্যের ক্রেতা আমাদিগেরই দেশীয় মহাজনগণ, সমস্ত ভারতবর্ষে যত প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় সকলই প্রথমে আমাদিগের দেশীয় বণিকগণের হস্তগত ও নানা স্থান হইতে উহাদিগেরই দ্বারা চালিত ও আনীত হয়, তবে বিদেশে পাঠাইতে হইলে আমরা কোন্ বিষয়ের অপ্রতুলতার জন্য ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন জাতির হস্তে অল্প মূল্যে সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে চতুর্গুণ ও অষ্টগুণ লাভ করিতে দেখিয়াও উহাদিগের এত বশীভূত হইয়া থাকি তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাইবেন যে কেবল একটি বিষয়ের অভাব হেতু আমাদিগের এত হীনতা ও দুর্গতি, সে অভাবটী এই যে, আমাদিগের কাহারও জাহাজ নাই আর ঐ একটি অভাবের জন্য উহার আনুসঙ্গিক বিবিধ অসুবিধা ঘটিতেছে এবং ভোগ করিতে হইতেছে।

আমি বিশ্বস্তচিত্তে ও সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে আমাদিগের বঙ্গদেশীয় ও পশ্চিম অঞ্চলের কয়েক জন রাজবংশীয় এবং বণিক মহোদয় সমবেত হইয়া প্রযত্নের সহিত প্রণালীবদ্ধ হইয়া যদি কিছুকাল কার্য্য করেন তাহা হইলে এই ভারত সমুদ্রবক্ষে, মহাগঙ্গার তটে যত জাহাজ আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে সকলই আপনাদিগের নিজের ব্যতীত অন্য কোন

প্রদেশের সওদাগরের আর আসিবার আবশ্যক হইতে পারে না। এই বিষয় প্রণিধান করিতে হইলে দূরদর্শিতার আবশ্যক হয় না, তাহার কারণ, যত দ্রব্যাদি রপ্তানি হয় সমস্তই আমাদিগের দেশজাত ও এই দেশীয় মহাজনদিগের, ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে মূলধন ও ব্যবসায়ের দ্রব্য সমস্তই আমাদিগের তবে অপর দেশীয়দিগের যে এত প্রাধান্যতা তাহা কেবল জাহাজের নিমিত্ত। ঐ সকল জাহাজ যদি আমাদিগের হয় তাহা হইলে উহাতে আমরা যে কেবল সওদাগরি সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানি করিতে পারিব, তাহা নয়, উহার দ্বারা আমরা সর্ব্বদেশে এজেন্সি অর্থাৎ নিজ নিজ আড়ৎ খুলিয়া নিজের ব্যবসায় নিজে চালাইতে সক্ষম হইয়া পরাধীনতা ও পরবশতার লাঞ্ছনা ও দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি পাইব এবং সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণাপেক্ষা অনেক গুণে অধিক লাভবান হইতে পারিব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই ভারতবর্ষে কত শত মহাজন আছেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজের দ্রব্য নিজ নিজ জাহাজে পাঠাইতে সক্ষম, কিন্তু কেন যে তাঁহারা এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট তাহা বোধ হয় ভীরুত্বাবশতঃ নহে কেবল অপ্রথা প্রযুক্তই হইতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে সেটি ভ্রমমূলক ও তাহা দূরীকরণ করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে ও শীঘ্র করা বিধেয়। দেখুন পূর্ব্বে নীল, চিনি, পাট, তিসি প্রভৃতি এদেশীয় বণিকগণেরই ব্যবসায় ছিল, কিন্তু উহা এক্ষণে বিদেশীয় বণিকগণের এক চেটিয়া ব্যবসায়ের মধ্যে হইয়াছে। এইরূপ যাহাতে অধিক লাভ দেখিবে তাহাই তাহাদের একচেটে হইবে। প্রথা ও প্রণালী কালে পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী। পূর্ব্বের প্রথা ও প্রণালী অনুসারে চলিলে ডাকে চিঠি পাঠান হয় না, রেলে যাতায়াত ও মাল আমদানি রপ্তানি না করিয়া নৌকা ও পথ অবলম্বন করিতে হয়, কলের জাহাজে, ঢাক্কা, সিরাজগঞ্জ, কমিলা, মান্দ্রাজ, সিংহল, বোম্বাই প্রভৃতি দেশে গমনাগমন ও মাল প্রেরণাদি স্থগিত করিতে হয়। আর যদি তাহা করা যায়, তাহা হইলে যাতায়াত ও ব্যবসায় কি আর চলে, ইংরাজি চিকিৎসাও রহিত করিতে হয়। আর কত প্রকার প্রথা দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবার সোপান হইয়া পরিবর্ত্তিত হইবে এবং ঐ পরিবর্ত্তনের ক্রম বা স্রোত যে কোন প্রকারে রোধ হইবার নহে তাহা প্রণিধান করিলেই

জানিতে পারা যায়, যে লোকের যাহাতে সুবিধা ও ব্যয়ের ন্যূনতা হয় তাহাই জনসমাজে অবলম্বনীয় হয়। অতএব যে প্রথা ও পদ্ধতিতে মানের লাঘবতা, দেশের গৌরব হ্রাস, পরাধীনতা, ও পদে পদে অপমান আর উহার সঙ্গে সঙ্গে লাভের ও বলবীর্য্যের হ্রাস প্রতীয়মান হইতেছে, হে মহাত্মাগণ! আপনারা কাহার অনুরোধে ও কাহার ভয়ে দেশের অমঙ্গল ও নিজ নিজ সর্ব্বস্ব ক্ষতির মূলীভূত হইতেছেন? একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, বিদেশীয়দিগের হস্তে এক প্রকার সকল ব্যবসায়ই ত পড়িয়াছে, কেবল কতকটা ভূসার কারবার ও অতি অল্প পরিমাণে রেশম ও পশমের বস্ত্র যাহা দেশীয় ব্যবহার্য্য মাত্র দেশীয়দিগের হস্তে এখনও আছে, কিন্তু ক্রমে যেরূপ গতিক দাঁড়াইতেছে, অল্পদিনের মধ্যে বিদেশীয়গণ নিজ নিজ আড়ৎ খুলিয়া বসিবে ও মোকাম স্থাপিত করিবে, তখন আর নিস্তার থাকিবে না। মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে হইবে ও ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে হইবে। এ কি সর্ব্বনাশ, বিদেশীয় মহাজনেরা আড়ৎ ও মোকাম পর্য্যন্ত খুলিল, আমাদিগের ব্যবসায়ের পথ আর কি রহিল।

ভাল, আমরাই বা কেন ইংলণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশস্থ পোর্টে না যাই; বোধ হয় জাতিভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, যদি ঐ জাহাজ যদ্দ্বারা যাতায়াত হইবে ও মালাদি রপ্তানি ও আমদানি হইবে, উহা যদি আমাদিগের নিজের হয় ও তাহাতে বাসোপযোগী স্বতন্ত্র গৃহ ও পাকশালা করা যায় এবং উহাতে ম্লেচ্ছ কাপ্তেন কিম্বা নাবিকগণের সংস্পর্শ না থাকে, কেবল নিজ নিজ ভৃত্য, পাঁচক, কর্ম্মচারীগণ দ্বারা ঐ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করা হয় তাহা হইলে কোন্ দোষ আসিতে পারে? এবং যে দেশে যাইতে হইবে তথায় যদি নিজ নিজ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বা ভাড়া লইয়া স্বজাতীয় কর্ম্মচারী দ্বারা স্ব স্ব জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ব্যবসায়াদি আরম্ভ করা যায় তাহা হইলে ধর্ম্মের বা সাধারণ রীতি নীতির কি ক্ষতি হইতে পারে?

পূর্ব্বে আমাদের ঐ সকল দেশে যাইবার আবশ্যক ছিল না কাজে কাজে উপায় ও পদ্ধতি নাই বলিয়া কেবল একটা ধোঁকা হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কার্য্যগতিকে যখন নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে, এমন কি আতুরে নিয়মোনাস্তি বৎ দেশের সময় উপস্থিত হইয়া পড়িতেছে, যখন কিঞ্চিৎ

চেষ্টা এবং সাহস করিলেই সফল হইতে পারা যায়, আবার যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে আমাদিগের প্রধান প্রধান হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশীয় ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ, তাহাদিগের অনুচরগণ এবং মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণগণ ঐ প্রণালীতে ইয়ুরোপখণ্ডে বিদ্যা এবং ভ্রমণোপলক্ষে অবলীলাক্রমে ও অবাধে যাতায়াত করিতেছেন অথচ জাতি বা ধর্ম্মের ব্যাঘাত হইতেছে না তখন দেশের বাণিজ্য রক্ষার্থ ও সঙ্গে সঙ্গে দেশোন্নতির এবং ভারতভূমির গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করা এবং তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া কি বিধেয় হইতেছে না। একবার ধ্বংস হইলে পর পুনর্জ্জীবিত কি কখন হইয়া থাকে, বিদেশীয়েরা সমস্ত গ্রাস করিলে কি আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে।

হে রাজবংশীয়গণ, মহাজনগণ! আরও কি নিশ্চেষ্ট থাকা যুক্তিযুক্ত হয়? আরও কি চক্ষের উপর বিদেশীয়দিগের দ্বারা সর্ব্বস্বাপহরণ সহ্য হয়? আরও কি সমূলেন বিনশ্যতি হইয়া ভিখারী হইতে সাধ হয়? অতএব এ সকল দেশ শোষণের পথ অবরোধ করা আবশ্যক হইয়াছে। দেখিতেছেন কি! যদি উপায় ও ক্ষমতা সত্বে সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উদ্যোগী না হন, তবে অধিক কি বলিব, আর অল্প দিনের মধ্যে সকলকেই সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত বিদেশীয়গণের প্রত্যাশী হইতে হইবে। তাও কি হইতেছে না? তাই কি বাকী আছে? যাহা কিছু ইদানীং আমরা ব্যবহার করিতেছি, তাহার অধিকাংশই বিদেশজাত, কি দুঃখের কি লজ্জার বিষয়। এখন বাণিজ্যও বিদেশীয়দিগের হস্তে এক প্রকারে অর্পণ করা হইয়াছে এখন সকলই বিদেশীয়, এখন যাহা কিছু তাহারা এ দেশ হইতে প্রাপ্ত হইবে, আমাদের কাঙ্গালী করিয়া তৎসমুদায়ই নিজ নিজ দেশে লইয়া যাইবে, একবার আমাদের মুখপানেও তাকাইবে না। অতএব যাহাতে বিদেশীয়গণ ভোগা না দেয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক হইয়াছে। আপনারা যখন একত্রিত হইতেছেন তখন যে ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়া দেশের ধনোন্নতি ও গৌরবের সোপান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেখুন দেখি দেশে যত মাল ক্রয় ও বিক্রয় হয় তাহা বিদেশীয় দালাল দ্বারা কার্য্য না চালাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশীয় দালালগণ দ্বারা কার্য্য চালাইলে আপনাদিগের মাল বিক্রয়ও হইবে অথচ কি পর্য্যন্ত স্বদেশীয় গৃহে ধনাগম

হইতে পারে, তাহা না করিয়া কেন যে বিদেশীয় দালালের উদর পূরাই, তাহার ত কোন কারণ দেখি না।

পাট, তুলা, লাক্ষা, তিল, চিনি প্রভৃতি নিজ হস্তে উৎপাদন করিয়া বিদেশজাত বস্ত্র, ছিট ইত্যাদির বিনিময়ে বিক্রয় না করিয়া যদি এই দেশেই কল ও কারখানা স্থাপিত করিয়া আপনারাই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি তাহা হইলে দেশের জিনিস দেশেই থাকে অথচ পরের পেট ভরান হয় না এবং দেশও কতদূর ধনশালী হইতে পারে ও এ সকল বিষয়ে ভিন্ন দেশীয়ের মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। তাহা না করি কেন?

এতদ্ভিন্ন আরও কত শত দ্রব্য এ দেশে জন্মিয়া থাকে এবং যাহা অপর দেশে পাঠাইয়া অন্য রকমে পুনঃ আমাদিগের হস্তে আসিতেছে। ইহাতে আমরা পরিশ্রম করিয়া মরিব অথচ লাভের বেলায় বিদেশীয়গণ হাত পাতিবেন। কিন্তু আপনারা ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে এই সকল করিয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারেন। প্রায় সকল প্রকার ব্যবসায়, কারবার ও ধনোপায়ের পথ বিদেশীয়েরা হস্তগত করিয়া বসিয়াছে ও অল্প দিনের মধ্যেই সমস্তই গ্রাস করিবে ও এ দেশের সকল ধনই অপর দেশের লোকেরা লইয়া যাইবে।

অতএব হে দেশীয় রাজবংশীয়গণ, ধনাঢ্য ও মহোদয়গণ! আপনারা সকলে এখনও সময় থাকিতে থাকিতে একমত হইয়া যাহাতে মাতৃভূমির সন্তানগণের অবস্থা উন্নত হয় তদ্বিষয়ে ও এই ভারত পৃথিবীর সকল দেশাপেক্ষা যে চিরগৌরবযুক্ত ছিল তাহার সংরক্ষণে চেষ্টিত হউন, ইহাই আমার ঈশ্বর সমীপে একাগ্র প্রার্থনা ও আপনাদিগের নিকট নিবেদন।

কুরুক্ষেত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অষ্টম সর্গ।

এই সর্গ আরো সুন্দর; ইহার সকল সৌন্দর্য্য আমরা স্থানাভাব বশতঃ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, সেজন্য বড় আক্ষেপ রহিল। সংক্ষেপে এ সর্গের পরিচয় দিতেছি।

কৃষ্ণা অষ্টমী নিশি, নির্ম্মল আকাশে অনন্ত নক্ষত্ররাশি, হিরন্বতী নদী তীরে, নির্জ্জন স্থানে, নিরুপমা সুন্দরী জরৎকারু মূর্চ্ছিতা, তাঁহার নীলাব্জের হার দেহখানি অঙ্কে করিয়া, নীরবে অবনত মুখে, মূর্ত্তিমতী মমতা সুভদ্রা উপবিষ্টা, পার্শ্বে জগত সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বীরবেশে, ভূমে জানু পাতিয়া, অঞ্জলি করিয়া, জরৎকারুর নিমীলিত নেত্রে ও ললাটে বারি সিঞ্চন করিতেছেন। মরি! মরি! কি মধুর দৃশ্য।

জরৎকারুরঃ—

কুন্তল আলুলায়িত, পড়িয়াছে ধরাতলে,
অষ্টমীর অন্ধকার করিয়া আঁধার।

জরৎকারু চক্ষু উন্মীলন করিবা মাত্র, সুভদ্রার অবনত মুখ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

ভাবে মনে মনে কারু, "মরি মরি! একি মুখ,
দয়ার দর্পণে যেন চিত্র পরদুঃখ!

জরৎকারু জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

কে তুমি রমণী? তুমি দেবী, কি মানবী?

সুভদ্রা আপনার নাম বলিলেন।

সুভদ্রা! চমকি কারু, আবার রহিল চাহি,
ঐ সেই মুখপানে, স্থির বিস্মিত অন্তরে।
নিরখিল সেই মুখ, শোভিতেছে অন্ধকারে,
ফুল্ল অরাবন্দ যথা নীল সরোবরে!

সুভদ্রার অঙ্ক জরৎকারুর বোধ হইল যেন
সুশীতল সুকোমল স্বর্গ অবনীর!
আর——বুঝিল এরূপ নহে, ভুতলে রূপের স্বপ্ন;
বুঝিল, হইল দুই চক্ষু ছল ছল।

জরৎকারু যেমন কৃষ্ণানুরাগিণী, তাঁহার ভ্রাতা বাসুকিও তেমনি সুভদ্রার রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রেমাভিলাষী। জরৎকারু তাহা জানিতেন, ভ্রাতার সে সাধ পূর্ণ হইলে ভ্রাতৃসুখে সুখিনী হইতেন ত বটেই, তাহা ছাড়া তাঁর নিজেরও একটি বড় মধুর সুখের সৃষ্টি হইত। সে কি সুখ পাঠক! তাহা জরৎকারুর মুখেই শুনুন।

জরৎকারু ভাবিতেছেনঃ—

নিরখি দাদার সুখ, নিরখি এ দেবী মুখ,
জুড়াতেম মরুদগ্ধ জীবন আমার!

তাহা ছাড়া সুভদ্রা মূর্ত্তিতে কৃষ্ণ মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য প্রায় সকলই বিরাজিত।

সেই মুখ, সেই বুক, সেই চক্ষু, সেই নাসা,
সে মহিমা, সে ভঙ্গিমা, শোভা নিরুপমা,
উভয়ের কিবা রূপ! অনন্ত হৃদয়প্লাবী!
কিবা শোভা উভয়ের, আকাশ, জ্যোৎস্না!
ইহাকে লইয়া বুকে, ভাবি "এই কৃষ্ণ মম",
পাইতাম কিবা সুখ! সে ভ্রান্তি স্বপনে,
ইহার সুরভিশ্বাস, ইহার কোমল কণ্ঠ,
জাগাইত কি উচ্ছ্বাস মরমে মরমে।

শ্রীরাধিকার প্রেম হইতে জরৎকারুর প্রেম নিকৃষ্ট হইলেও, এ প্রেমের তুলনা জগতে অতি বিরল। জরৎকারু শ্রীকৃষ্ণের মহিমাই ভালবাসিয়া ছিলেন, তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানুরাগিণী, তখন শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্যে, পাণ্ডিত্যে, বুদ্ধি, কৌশলে আসমুদ্র গিরি ভারতবর্ষ পরিপূরিত। শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানুরাগিণী, তখন শ্রীকৃষ্ণের কেবল বংশী মাত্র সম্বল। জরৎকারুর শ্রীকৃষ্ণ রাজরাজেশ্বর, শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালক মাত্র। তথাপি শ্রীরাধিকা বলিতেছেনঃ—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ!
দেহ মন আদি, তোহাঁরে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।

গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার গায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণ খানি॥

আর, মহিমাময় শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তা জরৎকারুকে যখন সুভদ্রা বলিলেন, যে "তুমি মানবের কামনা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমময় হরিকে হৃদয়ে ধারণ কর, তোমার প্রেমের সকল সাধ মিটিবে।" তাহার উত্তরে জরৎকারু বলিলেন।

"হায়! এক বিন্দু বারি, দেখিল না যেই জন,
সে কেমনে বুঝিবেক মহাপারাবার!"

যদি কেহ বলেন যে জরৎকারুর প্রেমের সহিত শ্রীরাধিকার প্রেমের তুলনা করিবার কি আবশ্যকতা আছে? একটু আবশ্যকতা আছে। "কুরুক্ষেত্রের" শ্রীকৃষ্ণের চিত্র অনুভব করিতে হইলে, তাঁহাতে যাহারা অনুরক্ত তাঁহাদের হৃদয়ে তিনি কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছেন তাহা না দেখিলেতাঁহান স্বরূপ প্রতিকৃতি ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। তাঁহার প্রতি যে কজন অনুরক্ত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে জরৎকারু একজন প্রধান, সুতরাং জরৎকারুর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির কিরূপ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তাহা আমাদের দেখা আবশ্যক, এবং সেই সঙ্গে শ্রীরাধার হৃদয় প্রতিভাত বৃন্দাবনের সেই রাখালের মূর্ত্তিও দেখা আবশ্যক, নহিলে উভয়ের পার্থক্য বুঝিব কি করিয়া?

"কুরুক্ষেত্রের" শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ না হইলেও, ইহাঁর চরিত্র বিস্ময়কর। পাঠক পরে তাহার পরিচয় পাইবেন। এক্ষণে আমরা জরৎকারুর কথা বলি। জরৎকারু বাসুদেবের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দেখিলেন যেঃ—

সে মূর্ত্তি মহিমাময়,   দাঁড়াইয়া এক পার্শ্বে,
নীরবে চাহিয়া আছে তাহার বদন।
অষ্টমীর অন্ধকারে,   অস্ফুট অস্ফুট মাত্র,
ভাসিয়াছে সেই বীর মূর্ত্তি মনোহর।
তথাপি দেখিল কারু,   যেন অন্ধকার পটে,
রেখেছে আঁকিয়া কোন দক্ষ চিত্রকর।
কত দিন কত বর্ষ,   কত বর্ষ কত যুগ,
এইরূপ জরৎকারু দেখেনি নয়নে;
চেয়ে আছে অভাগিনী,   নিদাঘ বিদগ্ধ ধরা,
কাতরা পিপাসাতুরা চাহি নবঘনে।

জরৎকারু সুভদ্রার মুখে শুনিলেন যে তাঁর মূর্চ্ছিত দেহ শ্রীকৃষ্ণ বক্ষে করিয়া তুলিয়া লইয়া শিবিরে আনিয়াছিলেন, সেই কথা এখন মনে পড়িল। ভাবিলেন—

লাগিয়াছে অঙ্গে অঙ্গ লাগিয়াছে হায়! কারু
হৃদয়ে হৃদয় বুঝি! শিহরিল কায়।
অঞ্চলি বারিতে তাঁর ভিজেছে ললাট মুখ,
লাগিয়াছে অঞ্চলি কি কপোলে তাহার,
নীলোৎপল রক্তোৎপলে? আর না, হইল বামা
সেই স্মৃতি সুখাবেশে মূর্চ্ছিতা আবার,

বাসুদেব দ্রুতপদে অদূরবর্ত্তী নদী হইতে জল আনয়ন করিয়া জরৎকারুর মুখে ও চ'খে সিঞ্চন করিলেন, এবার বাসুদেবের কর কম্পিত হইল, চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল!

রমণী মেলিল আঁখি, সরিয়া গেলেন কৃষ্ণ,
সুভদ্রার মুখ পানে রহিল চাহিয়া
শ্বেত নীলাম্বুজ দুটি, যেন এক বৃন্তে ফুটি
চেয়ে আছে পরস্পরে মোহিত হইয়া।

জরৎকারু আবার ভাবিলেন—

"হায় নিদারুণ নাথ! যেই অঙ্গ আলিঙ্গন
দিলে মূর্চ্ছিতায়, তাহা পাব কি জীবনে?
মূর্চ্ছায় পাইনু যাহা, মরিলেও পাই যদি,
লও,—পদে সমর্পিব দুঃখিনীর প্রাণ।
সহিতে না পারি আর এবে দয়া কর নাথ।
ফিরাইল মুখ বামা; কৃষ্ণ অন্তর্ধান।

তাহার পর সুভদ্রার সহিত জরৎকারুর কথাবার্ত্তা হইল। জরৎকারু বলিলেন "আমি অনার্য্যা, আমাদের ছায়া মাড়াইলেও তোমাদের পাপ হয়, তুমি যে আমায় এত আদর যত্ন করিলে সে ঋণ আমি কিরূপে সুধিব!" অনার্য্যা জরৎকারুর আত্মগ্লানি শুনিয়া সুভদ্রা তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন। সে সকল সান্ত্বনা বাক্য গভীর জ্ঞান পুর্ণ। সুভদ্রা জরৎকারুর পরিচয় চাহিলে জরৎকারু বলিলেন।

নাগকন্যা ঋষিপত্নী,   মনসা আমার নাম,
দারুণ কপাল গুণে যৌবনে যোগিনী,
বেড়ায় সে বনে বনে,   শৈলে শৈলে নিরজনে,
বনমাতা প্রকৃতির প্রেমে উন্মাদিনী।
যথায় ঝটিকা গর্জ্জে,   করি বন আলোড়িত,
করিয়া তরঙ্গ ভঙ্গে সিন্ধু বিধূনিত;
যথায় জলদ যুদ্ধে,   দৃপ্ত বজ্র বিস্ফুরিত,
ঘন দীপ্ত দিগ্মণ্ডল, ধরা প্রকম্পিত;
তথায় বেড়াই আমি,   প্রকৃতির মহাপটে,
হৃদয়ের প্রতিকৃতি নিরখি আমার,
পাই বড় শান্তি মনে,   আসিয়া ছিলাম তাই,
দেখিতে এ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পারাবার।

এমন হৃদয় না হইলে, জরৎকারু শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানুরাগিনী হইবেন কেন? কিন্তু জরৎকারু কি সুধু কুরুক্ষেত্রই দেখিতে আসিয়াছিলেন?

সুভদ্রা বুঝিলেন,—তুমি আমি ও বুঝি,—যে জরৎকারুর হৃদয়ে কি ভীষণ ঝটিকা বহিতেছে। তখন সুভদ্রা তাঁহাকে তাঁহার এই নিদারুণ

নৈরাশ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জরৎকারু, উত্তরে বিস্তর আক্ষেপ করিলেন, সে আক্ষেপগুলি এতই মর্ম্মমিশ্রিত যে পড়িতে পড়িতে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। অবশেষে জরৎকারু বলিলেন।

ভগিনি ! আমার দুঃখ, রমণীর মর্ম্মব্যথা,
রমণীর প্রাণে নাহি সহিবে তোমার ;
ভগিনি ! আমার দুঃখ, রমণীর মহা দুঃখ,
ততোধিক রমণীর দুঃখ নাহি আর।
সংসারের যত দুঃখ,———রোগ, ভিক্ষা, উপবাস,
পদাঘাত, অসিধার,—রমণীর প্রাণ—
সহিবে প্রফুল্ল মুখে, প্রফুল্ল পঙ্কজ যথা,—
যতক্ষণ নাহি হয় দিবা অবসান।
সহে ঝড়, বজ্র বৃষ্টি ; সেই দিবা, সেই সর্গ,
রমণীর প্রেম আহা রমণীর প্রাণ।
সেই প্রেমে, সেই প্রাণে, রমণী প্রাণের প্রাণে,
নিরাশার কীট হায় পাতিলে আসন;
হউক কুবের পত্নী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা,
জগতে দুঃখিনী নাহি তাহার মতন।
কৈশোর নিশির শেষে, দেখিলাম সুখ তারা,
হৃদয় আকাশে মম শান্ত সমুজ্জ্বল,
যৌবন প্রভাতে মম, হইল সে অস্তমিত,

* * * *

সুভদ্রা সান্ত্বনার ছলে বলিলেনঃ—

হৃদয় হইতে এই, করাল কামনা ছায়া—
মুছে ফেল পাবে শান্তি হৃদয়ে তোমার,
তুমি আমি, কে আমরা ? যিনি করিলেন সৃষ্টি,
তিনি করিলেন পূর্ণ কামনা তাঁহার।

* * *

মুছে ফেল মুছে ফেল, করাল কামনা ছায়া,
আশায় নিরাশা ফলে, দুঃখ কামনায় ;

রমণী সৃজনে তাঁর, আছে যে মঙ্গল ইচ্ছা,
জীবন অর্পণ কর তার সাধনায়।

জরৎকারু বলিলেনঃ—

"মুছিব কি ? মুছিবে কে ? রমণী ?" কহিল কারু,
"পারে কি প্রেমের ছবি মুছিতে কখন ?
অনন্ত সিন্ধুর বক্ষে, ভাসে সুধাকর ছবি,
সিন্ধুও ত পারে না তা মুছিতে কখন।
তুলিয়া তুমুল ঝড়, প্রসারি তরঙ্গ কর,
ডুবাইতে ছবি, সিন্ধু চাহে যদি আর,
এক ছবি হয় শত, হয় শত সংখ্যাতীত,
শতগুণ উদ্বেলিত করে পারাবার।"

শেষে কারু আক্ষেপের সহিত বলিলেন, জগৎস্রষ্টার এ নিস্ফল আশার সৃষ্টি কেন ? উত্তরে সুভদ্রা যাহা বলিলেন তাহা সুগভীর জ্ঞানপূর্ণ,—ধর্ম্মের ও দর্শনের নিগূঢ়তত্ত্ব তাহায় নিহিত। আমাদের বড়ই দুঃখ হইতেছে যে সে সকল আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠককে উপহার দিতে পারিলাম না। কয়েকটি স্থল মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"কেন ?" কহিলেন ভদ্রা,—"জগতের এই 'কেন ?'
কি সাধ্য বুঝিব বল ক্ষুদ্র নরনারী।
কেন এ অনন্ত সৃষ্টি,———রবি শশী গ্রহতারা ?
কেন ক্ষুদ্র বালুকণা ? কে বলিতে পারি ?

* * *

এ বিশ্ব সৌন্দর্য্যে ভরা, যাহার অনন্তরূপ,
সেই বিশ্বরূপ চেয়ে বল কি সুন্দর ?
চাহ গুণ ? এই বিশ্ব, যাঁর গুণ লীলাভূমি,
সেই গুণাতীত চেয়ে গুণী কে আবার ?
চাহ প্রেম ? এই বিশ্ব যাঁর প্রেম পারাবার,
সেই প্রেমময় হরি হৃদয়ে তোমার।
সেই প্রেম পারাবারে ঝাঁপ দেও নাগবালা,
এই প্রেম-মরীচিকা কর নিমজ্জিত ;

অনন্ত প্রেম-পিপাসা, মানবের, মানবে কি
পুরাইতে জুড়াইতে, পারে কদাচিত?

আমরাও হতাশ প্রেমিক, প্রেমিকাকে এই উপদেশ গ্রহণ করিতে বলি। যাহার প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, তাহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা মধুরতর ও মহত্তর শিক্ষা আর নাই।

জরৎকারু বলিলেন, যে প্রেমের বিন্দুমাত্র আস্বাদ (প্রতিদান?) পাইল না, সে প্রেমের মহা পারাবার কিরূপে বুঝিবে? যাহার প্রেম অঙ্কুরে পুড়িয়া গেল, সে অনন্ত প্রেমে কি করিয়া সাঁতার দিবে? সুভদ্রা এ কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তুমি একজন শ্রেষ্ঠ ঋষির পত্নী, তোমার জীবন-মরীচিকা তাঁহার প্রেম-নির্ঝরে ভাসাইয়া, প্রেম-গঙ্গা সঙ্গমে বহিয়া যাও।" জরৎকারু কতকটা উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বনপথে ছুটিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ লুক্কাইত স্থান হইতে একবার অস্ফুট রবে ডাকিলেন, "কারু"। কারু উন্মাদিনী জ্ঞানশূন্যা উল্কার ন্যায় আঁধারে মিশিযা গেলেন। এই সর্গের শেষাংশ আমাদের তত প্রীতিকর হইল না। সে অংশে সুন্দর নাটকত্ব থাকিলেও, জরৎকারুর পতির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাবের সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। আমরা ভরসা করি, কুরুক্ষেত্রের কোন যুবতী পাঠিকা সে অংশের কবিত্বে ও মাধুর্য্যে ভুলিয়া, কৃষ্ণ প্রেমানুরাগিণী হইয়া, যেন পতিবিদ্বেষিণী বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ না করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জরৎকারুর শ্রীকৃষ্ণানুরাগিনী হওয়ায় আমরা সুখী বা দুঃখিত নহি; কিন্তু ভগবৎ প্রেমানুরাগনী হইলে যে স্বীয় পতি বিদ্বেষিণী হইতে হইবে কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এ ভাব আমরা বৃন্দাবনের গোপিনী চরিত্রেও দেখি নাই। এই সর্গ সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি এইটুকু মাত্র। নতুবা এ সর্গ পাঠ করিতে করিতে মনে হইতেছিল যেন কি এক অপূর্ব্ব সুমধুর জাগ্রত সপ্নে ভাসিয়া যাইতেছি। বঙ্গ ভাষায় এরূপ কবিত্ব রচনা কেবল নবীন বাবুর রচনাতেই আমরা দেখিতে পাই, অন্য কোন কবির রচনায় এরূপ স্বপ্ন সুখ অনুভব করিতে পারি নাই।

ক্রমশঃ।